আগমনী

আমাদের কথা

আগমনী! কথাটা শুনলেই বাঙালীর প্রাণ আনচান করে ওঠে। যদিও আগমনী মানে হচ্ছে—কারুর বিশেষ করে আসা, কিন্তু বহুদিন ধরে এই শব্দটি একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহার হচ্ছে। আজ আগমনী মানে মা দুর্গার মর্ত্যে আগমন।

এই আগমনকে উপলক্ষ্য করে যুগে যুগে বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে নানা গান, নানা কবিতা। সমালোচকদের মতে, বাঙালীরা তাঁদের নিজের মেয়ের দুঃখ ফুটিয়ে তুলেছেন এই আগমনীর গানে। যেমন ধরা যাক্—'এবার আমার উমা এলে, আর উমাকে পাঠাব না', কিংবা 'যাও যাও গিরি আনিতে উমারে।'

এই গান বাংলার বৈরাগীর মুখে শুনে প্রত্যেক বাঙালীর মন চঞ্চল হয়। কারণ তারা জানে, জগদ্ধাত্রীকে সূচনা করে এইবার শুরু হবে দেশের বৃহত্তম উৎসব। ছেলেমেয়েদের মনও চঞ্চল হয়, কারণ তারা এবার পাবে নতুন পোশাক ও উপহার।

দেব সাহিত্য কুটীর প্রতি বছরের মত এবারও তাঁদের পূজা-বার্ষিকী বের করছেন। নাম রেখেছেন—'আগমনী'। বাংলা দেশের সব লেখকই এতে লেখা দিয়েছেন। এছাড়া বিখ্যাত সব চিত্রকরেরা এতে ছবি এঁকেছেন। চকচকে নতুন এই বই যদি তোমাদের হাতে পড়ে দেবী দুর্গার আগমনের সুরকে বাড়িয়ে দিতে পারে, তবেই আমরা আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব।

জয়হিন্দ্

দেব সাহিত্য কুটীর

যে সব লেখা আছে

সচিত্র পাদপূরণ

জ্বালিয়ে বাতি চেয়ারটায়
তলায় রেখে ভাইপো তাঁর

ভিতরে ঢুকেই শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল।

লণ্ডনে হরেকৃষ্ণ

—সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়

এক

ডিনার খাওয়া যখন প্রায় হয়ে এসেছে, আমি পুডিং-এর চামচ শেষবারের মত মুখের কাছে তুলেছি আর শেখর চায়ের কাপে খুব সাবধানে চুমুক দিচ্ছে তখন মাইকেল ড্রিনিং হঠাৎ আমাদের বললেন, "বাই দি ওয়ে, শুনে খুশী হবে, কাল থেকে তোমরা আর একজন ভারতীয় সঙ্গী পাবে। তোমাদের ঘরে আর একজনেরও থাকবার জায়গা আছে তো—" তিনি ন্যাপকিন তুলে নিয়ে ভাঁজ করতে-করতে বললেন, "অবশ্য নতুন অতিথি তোমাদের প্রদেশের লোক না হলে আমি কথা দেয়ার আগে তোমাদের অনুমতি নিশ্চয়ই নিতাম। কী বল, দেশের নতুন লোক পেয়ে খুশী হবে না?"

কী করে ড্রিনিং-এর মুখের ওপর বলি, না, আমরা সাত সমুদ্র পার হয়ে বাঙালীর সঙ্গে গলাগলি করতে আসি নি। যদি আমাদের ঘরে একজন ইংরেজ ছাত্রর থাকবার ব্যবস্থা করতেন তাহলে আমরা সত্যি খুশী হতাম।

মনে মনেই এসব ভাবলাম, মুখে কিছু বলতে পারলাম না। শেখরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওর মুখ ড্রিনিং-এর কথা শুনে বেশ করুণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু পরেই ও সতর্ক হয়ে উঠল। অর্থাৎ আমরা ড্রিনিংকে বুঝতে দিতে চাই না যে এই সুখবর শুনে কেউই খুশী হই নি।

মাইকেল ড্রিনিং-এর স্ত্রী ডাফনী বোধহয় আমাদের মনের ভাব আঁচ করতে পেরে তার স্বামীকে বলল, "আবার কাকে এদের ঘরে ঢোকাবে, পড়াশুনোর অসুবিধা হবে না এদের?"

মাইকেল ড্রিনিং হাসলেন, "সেকথাও আমার মনে হয়েছিল, তবে ছেলেটি বেশীদিন এদেশে থাকবে না, কী একটা রিসার্চের ব্যাপারে এসেছে। মাস কয়েকের মধ্যেই ওর কাজ শেষ হয়ে যাবে—ইণ্ডিয়া হাউস থেকে আমাকে সেই রকম জানাল।"

যাক, কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কিন্তু তবু খাওয়া শেষ করে মনে মনে বেশ অপ্রসন্ন হয়ে আমি আর শেখর দোতলায় আমাদের ঘরে চলে এলাম। ভাবছিলাম যেন অজ পাড়াগাঁ থেকে কাল একজন আমাদের মধ্যে এসে পড়বে। এসে গেঁয়োর মত ব্যবহার করে এই ইংরেজ দম্পতির মনে ভারতবর্ষের মানুষ সম্পর্কে একটা বিশ্রী ধারণা করবার সুযোগ দেবে।

আমাদের এই রকম ভাবনা হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে বৈকি। মাঝে মাঝে ভারতবর্ষ থেকে লণ্ডনে প্রথম এসে দু-একজন এমন কাণ্ড করে যে ভারতীয় বলে পরিচয় দিতে আমাদের লজ্জায় মাথা কাটা যায়। এবং ইংরেজরা ভাবে আমরা এখনো অসভ্য অশিক্ষিত আর একেবারে গরিব।

একটা মজার গল্প বললেই তোমাদের কাছে ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই তো মাস দু-এক আগেকার কথা। ঘটনাটা আমরা শুনেছি আমাদের আর এক বন্ধু দেবেনের কাছে। লণ্ডনের আর্লস কোর্ট অঞ্চলে একটা প্রাইভেট বোর্ডিং হাউসে দেবেন থাকে। তার পাশের ঘরে একদিন এসে উঠল আর এক বাঙালী ছাত্র। সবে দেশ থেকে এসেছে। তার কাণ্ডকারখানা দেখে প্রথম রাতেই দেবেনের ল্যাণ্ডলেডির চক্ষু ছানাবড়া।

তোমরা নিশ্চয়ই জান লণ্ডনের প্রত্যেক বাড়ির বাথরুমে বাথ টব থাকে স্নানের জন্যে। ঠাণ্ডা আর গরম জলের কল একসঙ্গে খুলে টব ভরে নিয়ে মানুষ তার মধ্যে বসে হাত-পা ছড়িয়ে আরামে স্নান সেরে নেয়। সেখানে স্নান করার রীতি রাতে খাওয়ার পর। ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে স্নানের পাট সেরে সোজা চলে যেতে হয় একেবারে বিছানায় তিন-চারটে কম্বলের তলায়।

কিন্তু এত কথা হয় তো না শোনালেও চলত। যাহোক, আর্লস কোর্টে দেবেনের বোর্ডিং-এর সেই বাঙালী ছাত্র বাথরুমে গিয়ে টবে জল-টল তো বেশ ভরল। ভরে বোধহয় ভাবল, টবে আমি বসতে যাব কেন? আমি কি বাচ্চা ছেলে? সে হাতের কাছের মগটা নিয়ে কাঠের মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে টব থেকে জল নিয়ে ঝুপঝুপ করে স্নান করতে লাগল।

কিন্তু বেচারির বেশীক্ষণ মাথায় জল ঢালতে হল না। নীচের তলার ভাড়াটেরা হইচই করে উঠল। তাদের কার্পেট ভিজছে, গায়ে মাথায় কাঠের মেঝে ভেদ করে ঝরঝর করে জল পড়ছে। কী ব্যাপার ঘটছে ওপরে?

ব্যাপারটা ল্যাণ্ডলেডি বুঝল অল্প পরেই। কিন্তু বাঙালী ছাত্রটি কিছুতেই বুঝতে চায় না। ল্যাণ্ডলেডির সঙ্গে সমানে তর্ক করে আর সেই এক কথাই বলে, আমি বাচ্চা ছেলে নাকি যে ওই টবে বসে হাত-পা ছুড়ে স্নান করব?

গল্পটা হাসির সন্দেহ নেই। কিন্তু কোন ভারতীয় এই রকম কাণ্ড করলে আমাদের নাড়ী ছেড়ে যায়। মনে হয়, আমাদের মানসম্ভ্রম সব গেল। ইংরেজরা ধরে নেবে আমরা এমনই অসভ্য অমার্জিত যে বাথ টব কখনো চোখে দেখি নি।

কিন্তু আমাকে আর শেখরকে দেখে তেমন ধারণা করার সুযোগ যে এদেশের একজন ইংরেজও পাবে না সে-বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম। কেননা আমরা দুজন খুব সতর্ক ও সপ্রতিভ হয়ে লণ্ডন শহরে চলাফেরা করি। প্রথম প্রথম একটু বোকা-বোকা ভাব ছিল আমাদের চোখে-মুখে, অল্প পরেই ঘষে-মেজে তা আমরা একেবারে তুলে দি। এখন এখানকার কেউ আমাদের দেখলে এবং আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললে হঠাৎ বুঝতে পারে না যে আমরা ভারতীয়। এমন কি, প্রথম দিন আমাদের দেখে মাইকেল্ল ড্রিনিং-এর স্ত্রী ডাফনী কোন দ্বিধা না করেই বলেছিল, "না বললে আমি ধরতেই পারতাম না যে তোমরা ভারতীয়। তোমাদের দেখলে মনে হয় তোমরা স্পেইন কিংবা ইটালীর লোক—"

ডাফনীর কথা শুনে আমরা একেবারে গদগদ হয়ে ইংরেজি আদব-কায়দা আরও বেশী করে রপ্ত করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলাম। হয়তো এসব কথা শুনে তোমাদের হাসি পাচ্ছে—ভাবছ আমরা পাগল কিংবা গণ্ডমূর্খ।

আরে লিখতে লিখতে বিলেতে আমাদের ছাত্রজীবনের কথা ভেবে আজ আমারও হাসি পাচ্ছে। কিন্তু এখনও তোমাদের না বলে পারছি না যে, ইংল্যাণ্ডের, বিশেষ করে লণ্ডন শহরের একটা আলাদা মোহ আছে। আমরা যখন পড়াশুনো করতে লণ্ডনে গিয়েছিলাম তখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় নি—তখন ইংরেজের ওপর, তাদের আচার-ব্যবহারের ওপর আমাদের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সেটাই একমাত্র কথা নয়, ইংরেজের দেশে তাদের সঙ্গে সমানে তাল রেখে আমরা এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম যে রূপগুণ বিদ্যাবুদ্ধি কথাবার্তা আদব-কায়দা চাল-চলন—তাদের চেয়ে আমরা কিছুতেই কম যাই না। আমরাও তাদের মত হতে পারি।

আমি আর শেখর সে কথা প্রমাণ করতে পেরেও ছিলাম। কিন্তু হরেকৃষ্ণ আমাদের সংসারে ঢুকেই দিল সব পণ্ড করে। আমরা এইরকম আশঙ্কা করেই তটস্থ হয়েছিলাম। হরেকৃষ্ণ হল সে-ই নতুন বাঙালী অতিথি যার আসবার কথা মাইকেল ড্রিনিং আমাদের কাছে আগেই গেয়ে রেখেছিলেন।

হরেকৃষ্ণর চেহারা আর সাজ-পোশাক দেখে আমাদের মুখ কাঁদ-কাঁদ হয়ে এল। আমরা এত দিন ধরে ভারতবর্ষের যে ছবি ফুটিয়ে তুলেছি ডাফনী আর তার স্বামীর মনে হরেকৃষ্ণ তার আবির্ভাবেই মুহূর্তে তা টুকরো-টুকরো করে ফেলবে। আমরা তাকে দেখে মা দিদিমার বলা একটা বহু পুরনো কথা মনে মনে উচ্চারণ করলাম, "ধরণী দ্বিধা হও!"

হরেকৃষ্ণর গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। দেহ নাদুসনুদুস। চোখ দুটো পানতুয়ার মত গোলগোল। সে রীতিমত বেঁটে। আর তার গলার স্বর মিহি—ঠিক মেয়েদের মত। এই তো গেল হরেকৃষ্ণর আকৃতির কথা। পরনে তার সাদা ওভারকোট, বহু পুরনো। বোধহয় তার পূর্বপুরুষও এটা ব্যবহার করে গেছেন। প্যাণ্টটাও সাদা—যা এদেশে কেউ পরে না। আর তার পায়ে পুলিসরা যেমন ব্যবহার করে তেমন ভারী কালো বুট। তাও বহুকালের।

মাইকেল ড্রিনিং যথারীতি ডাফনী আর আমাদের সঙ্গে হরেকৃষ্ণর আলাপ করিয়ে দিলেন। দিয়ে বললেন, "ভারতবর্ষের অনেক নতুন খবর পাবে এর কাছ থেকে। খুব আনন্দ হচ্ছে, না?"

আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম। মাইকেলের কথার কোন উত্তর দেওয়া দরকার মনে করলাম না। আমাদের মনের অবস্থা কী রকম আশা করি তোমরা সেকথা বেশ ভাল করেই বুঝতে পারছ। যা হোক, ওদিকে হরেকৃষ্ণ তার গোল-গোল চোখ মেলে প্যাটপ্যাট করে তাকাচ্ছিল ডাফনীর দিকে।

একটু পরে সে ফিক করে হেসে মেয়েদের মত সরু গলায় তাকে বলল, "তুমি আমার বৌদি—" পরে মাইকেলের দিকে ফিরে সটান তার কাঁধে একটা হাত রাখল, "আর আপনি হলেন আমার দাদা। ইণ্ডিয়াতে আমরা এইরকম সম্পর্ক পাতাই কিনা।"

মাইকেল আর ডাফনী অল্প হেসে হরেকৃষ্ণকে প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠল, "ধন্যবাদ।"

হরেকৃষ্ণ যেন খুব একটা বাহাদুরীর কাজ করে ফেলেছে এমন খুশী-খুশী মুখ করে বলল, "এক কাপ চা খাওয়াবে বৌদি? না বললে শুনব না। আমাদের দেশে দেওররা কিন্তু আবদার করে করে বৌদিদের ভীষণ জ্বালায়—" হরেকৃষ্ণ মুখ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করে হাসল, "আমিও তোমাকে জ্বালাতন করব বৌদি।"

ডাফনী তার বিশুদ্ধ দিশী উচ্চারণে বলা ইংরেজি কতটা বুঝল জানি না তবে তৎপর হয়ে হেসে বলল, "আমি এখুনি তোমার জন্যে চা করে আনছি।"

ডাফনীর কথা শুনে আমাদের মত তাকে 'থ্যাঙ্ক ইউ' না বলে পায়ের ওপর পা তুলে নাচাতে লাগল হরেকৃষ্ণ।

প্রথম দেখবার পর থেকেই লোকটাকে আমাদের মনে হচ্ছিল সার্কাসের ক্লাউনের মত। তার কথাবার্তা ভাবভঙ্গি সাজপোশাক—সবই সেইরকম। এইরকম একটা উদ্ভট জীবেদের সঙ্গে আমরা কেমন করে এক ঘরে থাকব সেকথা ভেবে পাচ্ছিলাম না।

কিন্তু থাকতেই হল। শুধু থাকা নয়, এক সঙ্গে খাওয়া বসা গল্প করা—সবই করতে হল। হরেকৃষ্ণ থপথপ করে আমাদের সঙ্গেই ব্রেকফাস্ট টেবিলে আসে, হাপুসহুপুস করে চা-খাবার খায়। ডাফনীকে কথায়-কথায় নানা ফরমাশ করে, মাইকেলকে শোনায় যত আবোল-তাবোল গল্প।

দাদা বৌদি দেওরের সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে রাতে খেতে খেতে একদিন সে তাদের গোটা রামায়ণের কাহিনী সংক্ষেপে শুনিয়ে দিল। বলতে বলতে সে ঠং ঠং করে কাচের প্লেটে ছুরির বাড়ি মারল। হি-হি করে হাসল। হাত নাড়ল। মাথা নাড়ল।

ডাফনী তার গল্প শুনল মন দিয়ে। মাইকেল তাকে দু-একটা প্রশ্ন করলেন। এক কথার বদলে

দশ কথা বলল হরেকৃষ্ণ। বলে তাকে পালটা প্রশ্ন করল। কী বলল আমরা শুনি নি কেননা তার অবান্তর প্রলাপের ঘটা দেখে রাগে আমাদের কান ভোঁ-ভোঁ করছিল।

এক বাড়িতে এক ঘরে থাকলেও হরেকৃষ্ণ সম্পর্কে আমাদের কোন কৌতূহল ছিল না। তার সঙ্গে আমরা কথা-টথাও বেশী বলতাম না। সে বকবক করতে এলে তাড়া মেরে আমরা থামিয়ে দিতাম। বলতাম, "আমরা পড়াশুনো নিয়ে হিমশিম খাচ্ছি বিরক্ত করবেন না।"

হরেকৃষ্ণ প্রথম কয়েক মুহূর্ত কথা বলত না, ড্যাবা ড্যাবা চোখ মেলে যেন একটু বিমর্ষ হয়ে ওপরে তাকিয়ে থাকত। পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আস্তে বলত, "আপনারা কেমন যেন হয়ে গেছেন। দেশের লোক বলে আপনাদের মনে করতে ভয় হয়!"

শেখরের রূঢ়স্বর শুনে কুলকুল করে হাসত হরেকৃষ্ণ।

"ভয় হয় তো?" শেখর তাকে ধমকে উঠত, "আর আপনাকে দেশের মানুষ ভাবতে আমাদের লজ্জা হয়।"

একটা ঢোক গিলে করুণ প্রশ্ন করত হরেকৃষ্ণ, "কেন? আমার অপরাধ?"

"এদেশে আসবার আগে একটু তৈরী হয়ে আসতে পারেন নি? এই রকম কোটপ্যান্ট পরে কেউ এখানে ঘোরাফেরা করে?"

শেখরের রূঢ়স্বর শুনে কুলকুল করে হাসত হরেকৃষ্ণ, "এই আমার অপরাধ? মশাই, জামা-কাপড়ে কি এসে যায়? মহাত্মা গান্ধী কি এখানে এসে ঝকঝকে স্যুট টাই পরে চলাফেরা করতেন?"

এরপর ধৈর্য রাখা আমার পক্ষে কঠিন হত। আমি চোখ পাকিয়ে হরেকৃষ্ণর দিকে তাকিয়ে বেশ জোরে বলে উঠতাম, "আপনিও কি নিজেকে মহাত্মা মনে করেন?"

"কী যে বলেন?" হরেকৃষ্ণ ভীষণ লজ্জা পেয়ে জিব কেটে বলত, "আমি তাঁর পায়ের নখেরও যোগ্য নই। তবে হ্যাঁ—" সে বুক টান-টান করে বলত, "আমি তাঁর দেশের লোক। ভারতবর্ষের লোক। এটাই আমার গর্ব।"

হরেকৃষ্ণর রকম দেখে আমাদের হাসি পেত। বলতাম, "আপনার গর্ব নিয়ে আপনি থাকুন

মশাই। যাক গে, এদেশে এসেছেন কী করতে? শুনছিলাম কী বিষয়ে যেন রিসার্চ করবেন? বিষয়টা কি? গান্ধী আর আপনার সাদৃশ্য নাকি?"

আমার প্রশ্নে বিদ্রূপের খোঁচা বুঝতে পারত হরেকৃষ্ণ। একটা বিবর্ণ আভায় ছেয়ে যেত তার মুখ। সে থেমে থেমে আস্তে বলত, "আমি আপনাদের মত বড়লোক নই। গরিব—খুব গরিব। এদেশে পড়াশুনো করবার পয়সা কোথায়?"

"তাহলে এলেন কেন?"

"এলাম একটা অপারেশন করতে—থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড। মামাই এদেশে আসার খরচ দিলেন। এখানে তো চিকিৎসার খরচ লাগে না। মামা বললেন, ভারতবর্ষে অপারেশনের যা টাকা লাগবে তা দিয়ে নাকি জাহাজের ডেক প্যাসেঞ্জার হয়ে বিলেত ঘুরে আসা যায়। মানে একটা নতুন দেশ দেখা আর অপারেশন দুই-ই হয়ে যায়।"

"ও, তাই এসেছেন?"

"হ্যাঁ, মশাই। ওসব রিসার্চ-ফিসার্চ বাজে কথা—" হরেকৃষ্ণ এসব বলত বেশ করুণ করে।

শেখরের স্বরেও বিদ্রূপ খেলত। সে জিজ্ঞেস করত হরেকৃষ্ণকে, "তা অপারেশনের কিছু ব্যবস্থা হল?"

"প্রায় হয়ে এসেছে। শীগগিরই যেতে হবে হাসপাতালে। আপনারা আমাকে দেখতে যাবেন তো? দাদা বৌদিকে বলেছি। ওরাও যাবেন—কথা দিয়েছেন। বেশ ঘাবড়ে যাচ্ছি মশাই।"

হরেকৃষ্ণর কথা শুনে অবাক্ হয়ে যেতাম। পরে তাকে জিজ্ঞেস করতাম, "আপনার দাদা-বৌদি আছেন নাকি এদেশে?"

"হ্যাঁ, আছেন বৈকি—" হরেকৃষ্ণ হেসে বলত, "এই তাদের বাড়ি। সেখানেই তো আছি আমরা।"

রাগ হত আমাদের। হরেকৃষ্ণকে বোঝাবার চেষ্টা করতাম এই রকম গায়ে পড়ে আত্মীয়তা করবার রীতি এদেশে নেই। ওসব ন্যাকামি হয় তো ডাফনী আর মাইকেল—কেউই পছন্দ করে না।

কিন্তু হরেকৃষ্ণ আমাদের কথা শুনত না—বুঝত না। সে তার মোটাসোটা দেহ দুলিয়ে পা নাচাতে নাচাতে চিৎকার করে মিহি গলায় গান গাইত।

> "কত অজানারে জানাইলে তুমি
> কত ঘরে দিলে ঠাঁই।
> দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
> পরকে করিলে ভাই।"

"আঃ, থামুন থামুন!" হরেকৃষ্ণকে তাড়া দিয়ে ভাবতাম লোকটা তাড়াতাড়ি এখান থেকে বিদায় হয়ে হাসপাতালে গেলে আমরা বাঁচি। সেখানে গিয়ে টেঁসে গেলে তো কথাই নেই। এরকম ভয়ে-ভয়ে তাহলে আর এই ইংরেজ পরিবারে আমাদের থাকতে হবে না। লোকটা কখন কী করে, মাইকেল আর ডাফনীর সামনে কী যা-তা বলে বসে ঠিক নেই তো। তবে ছুটির দিনে ব্রেকফাস্ট

কিংবা লাঞ্চ খেতে বসে আর প্রায়ই সন্ধ্যায় লাউঞ্জে সোফায় গা এলিয়ে হরেকৃষ্ণ অনর্গল বকে যায় ডাফনী আর মাইকেলের সঙ্গে। কিন্তু যাচ্ছি যাব করেও সে আর হাসপাতালে যায় না। ডাফনীর মুখে শুনি ডাক্তার তাকে মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে, ওষুধপত্র দেয়। হাসপাতালে ভরতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাকি তার অপারেশন হবে।

আমরা ডাফনীর কথা কানে তুলি না। হরেকৃষ্ণর ব্যাপারে, তাকে কোন প্রশ্নও করি না। বুঝতেই তো পারছ ওরকম একটা সঙকে নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন ইচ্ছে আমাদের নেই। তাছাড়া বোকা হলে যা হয়—লোকটা রীতিমত গোঁয়ার। আমরা এদেশের আদব-কায়দা সম্বন্ধে কিছু বোঝাতে গেলেও শুনতে চায় না। সেই এক ভঙ্গিতে পা নাচাতে-নাচাতে দাঁত বের করে হাসে।

এক রবিবার দুপুরে লাঞ্চের টেবিলে মাংসর হাড় জংলীর মত কড়মড় করে চিবোতে-চিবোতে হরেকৃষ্ণ মাইকেলের দিকে তাকিয়ে বলল, "দাদা, বৌদিকে নিয়ে একবার ভারতবর্ষ ঘুরে আসুন। খুব ভাল লাগবে।"

আমি আর শেখর হরেকৃষ্ণর দিকে কটমট করে তাকালাম। পরে শেখরের কানের কাছে মুখ এনে আস্তে বললাম, "ছাই লাগবে।"

মাইকেল হেসে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী রকম?"

"দেখবেন গঙ্গা। দেখবেন হিমালয়—প্রকৃতির অপরূপ রূপ। এক-এক ঋতুতে ভারতবর্ষ বিশেষ করে আমাদের প্রদেশ বাংলা এক-এক রকম—" হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতে হরেকৃষ্ণ বলল, "তবে গ্রীষ্মকালে আপনাদের খুব কষ্ট হবে। কিন্তু ফলের রাজা আম খেতে পাবেন। তা ছাড়া [illegible] লিচু—এসব তো আছেই। আহা, আমের কথা ভাবলে জিবে জল আসে।"

[illegible] বলল, "আমাদের ভারতবর্ষে যাবার খুব ইচ্ছে। তবে অনেক খরচের ব্যাপার যে।"

[illegible] হয়ে যাবে। কলকাতায় গিয়ে পড়তে পারলে আর তোমাদের ভাবনা [illegible]—" হরেকৃষ্ণ বেশ জোর দিয়ে বলল, "সোজা আমাদের বাড়িতে গিয়ে উঠবে।"

"ধন্যবাদ।"

"অনেক নতুন অভিজ্ঞতা হবে তোমাদের—" হাপুসহুপুস করে খেতে খেতে হরেকৃষ্ণ বলে [illegible] "আমাদের সাজপোশাক, ধর্ম, আচার-ব্যবহার, খাওয়া-দাওয়া—সবই অন্যরকম।"

মাইকেল থেমে থেমে বললেন, "যদি কোনদিন সুযোগ হয়, নিশ্চয়ই যাব ভারতবর্ষে—" তিনি হেসে হালকা স্বরে বললেন, "আর সত্যি তোমার বাড়িতে গিয়েই উঠব কিন্তু।"

"নিশ্চয়ই। আমার মা-বাবা, মামা—সকলে আপনাদের দেখে খুব খুশী হবে—" খাওয়া থামিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে কী যেন ভাবল হরেকৃষ্ণ। পরে যেন আপনমনেই বলল, "এইরকম যাওয়া-আসার ভিতর দিয়েই তো আমরা অচেনাকে চিনি। কত ভুল ধারণা ভাঙে। কত কুসংস্কার কেটে যায়—" হঠাৎ সে টেবিল চাপড়ে খুব হাসতে শুরু করল, "অনেক আগে যারা বিলেতে আসত ভারতবর্ষে ফেরবার পর কেউ তাদের সঙ্গে মিশত না, তাদের একঘরে করত—হি-হি-হি—এসব আপনারা ভাবতে পারেন? এই তো আপনাদের ব্রিস্টল শহরে আছে রাজা রামমোহনের সমাধি।

তিনি ভারতবর্ষের কুসংস্কার দূর করবার জন্যে জীবনপণ করেছিলেন—" এই কথার সূত্র ধরে হরেকৃষ্ণ ভুল উচ্চারণে কাঁচা-কাঁচা ইংরেজিতে মাইকেল আর ডাফনীকে শোনাল ভারতবর্ষের অশিক্ষা দারিদ্র্য এবং কুসংস্কারের কথা—শোনাল সেই সব মহামানবের কাহিনী যাঁরা এসব দূর করবার জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধীর কথা সে তো তাদের আগেই শুনিয়ে রেখেছে।

ডাফনী আর মাইকেলের সামনে হরেকৃষ্ণকে ধমক দেয়া অভদ্রতা। আমরা তাই মনে মনে গজরাচ্ছিলাম, মুখে তাকে কিছু বলতে পারছিলাম না। বললাম খাওয়া শেষ হওয়ার পরে আমাদের ঘরে বিশ্রাম করতে এসে। হরেকৃষ্ণ তখন খুব শব্দ করে একটা ঢেঁকুর তুলেছে। তা শুনে আমাদের মেজাজ আরও বিগড়ে গেল।

আমি বেশ রাগ-রাগ স্বরে হরেকৃষ্ণকে বললাম, "আপনি ভেবেছেন কী? এটা আপনার দিশী আত্মীয়র বাড়ি? যা ইচ্ছে তাই করবেন?"

হরেকৃষ্ণ প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেল, পরে ভয়ে-ভয়ে বলল, "কী বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না। কী আমি করলাম?"

"এদের সঙ্গে এত বকবক করতে কে বলেছে আপনাকে? বিলেতে এলে কে কাকে একঘরে করত না করত—এসব হাঁড়ির খবর না শোনালে চলত না? একেই এদের ধারণা আমরা গরিব, অশিক্ষিত—তার ওপর আপনি আবার ফলাও করে ঢাক পিটিয়ে সব বলুন।"

হরেকৃষ্ণ এবার হেসে ফেলল, পেটে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "আপনারা বড্ড পিটপিট করেন। আমাদের দোষত্রুটির কথা না বললে জাতটাকে এরা বুঝবে কেমন করে?"

শেখর রেগে উঠে বলল, "কে বুঝতে চায়? আপনিই তো বকবক করেন শুনি। এদের কোন কৌতূহল আছে ভারতবর্ষ সম্পর্কে?"

"নেই?" হরেকৃষ্ণ হাসি-হাসি মুখ করে খুব নরম স্বরে বলল, "আছে মশাই আছে। একটা মহান্ দেশের কথা এরা জানতে চাইবে না তা কি হতে পারে?"

"আপনি দু দিন এসেই সব টের পেয়ে গেছেন, না? আপনার কথা শুনে এরা আপনাকে কৃপা করবে— সেকথা বোঝবার মত বুদ্ধিও আপনার নেই। এক্কেবারে গবেট।"

হরেকৃষ্ণ শেখরের রূঢ় কথা শুনেও রাগল না, ফিকফিক করে হাসতে হাসতে বলল, "করুক কৃপা। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতমাতার উদ্দেশে বৈষ্ণব কবির ভাষায় একবার বলেছিলেন, 'তোমারই লাগিয়া কলঙ্কের বোঝা বহিতে আমার সুখ'!"

আমি এবার চিৎকার করে বললাম, "থামুন মশাই, মুখে খালি বড় বড় কথা। শুনুন, একটু বুঝে শুনে কথা বলবেন। আপনি তো কেটে পড়বেন দুদিন পরে। আমাদের এখানে অনেকদিন থাকতে হবে। আপনার জন্যে আমাদের মানসম্ভ্রম যেন না যায়।"

হরেকৃষ্ণর মুখ অবোধ শিশুর মত হয়ে এল, "কিন্তু আমি তো দাদা বৌদির কাছে আপনাদের কথা একবারও বলি না। আমি দেশের কথা বলি। রাধাকৃষ্ণর কাহিনী বলি। বুদ্ধদেবের গল্প বলি। ভারতবর্ষের শিল্প সাহিত্য, মন্দিরের বিচিত্র কারুকাজ—আর কী কী বলি আপনারা শোনেন তো সব—"

"না মশাই, আমরা কিছু শুনি না। আপনার মত মানুষের লেকচার শোনবার জন্যে আমরা এদেশে আসি নি।"

এ কথায় হরেকৃষ্ণ যেন বেশ লজ্জা পেয়ে গেল, "লেকচার বলছেন কেন? আমি কতটুকুই বা জানি! আপনারা কত বেশী জানেন। আমি আর আপনাদের কী শোনাব!"

হরেকৃষ্ণর এইরকম ন্যাকা-ন্যাকা কথা শুনে শেখরের মেজাজ বোধহয় আরও বিগড়ে গেল। সে মুখ বিকৃত করে তাকে জিজ্ঞেস করল, "কবে হাসপাতালে ভরতি হবেন বলুন তো?"

"কাল। এই ধরুন বেলা তিনটে-চারটের সময় এখান থেকে বেরিয়ে পড়ব—" একটু চুপ করে থেকে গরুর মত চোখে শেখরের দিকে তাকিয়ে হরেকৃষ্ণ বলল, "মনে মনে বেশ দুর্বল হয়ে পড়ছি। কেমন যেন ভয়-ভয় লাগছে। আপনারা যাবেন আমাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে?"

বোকাটার একটু লজ্জাও নেই। এ কথা আমাদের এখনো বলতে সাহস পায় কেমন করে? ওইরকম একটা অদ্ভুত জীবকে নিয়ে আমরা বেরোবো রাস্তায়? পরিচয় দেব ওর দেশের লোক বলে? আশ্চর্য!

শেখর কিছু বলবার আগেই আমি বললাম, "ভারতবর্ষ থেকে তো একাই এলেন বিলেতে। এখন সঙ্গী সাথী নিয়ে হাসপাতালে যাবার দরকার কী? আমাদের অনেক কাজ, আমরা যেতে-টেতে পারব না।"

হরেকৃষ্ণ প্রথমে আমার মুখের দিকে তাকাল, পরে দেখল শেখরকে। কিছু আর বলল না। ইজিচেয়ারে বসে পা টান-টান করে চোখ বুজে ঝিমোতে লাগল।

পরদিন ক্লাসের পর এক ইংরেজ বন্ধুর বাড়িতে চা খেয়ে আমাদের ফিরতে বেশ দেরি হয়ে গেল। হরেকৃষ্ণকে এড়িয়ে যাবার জন্যে আমরা ইচ্ছে করেই দেরিতে ফিরেছিলাম। ফিরে দেখলাম আমাদের ঘরে হরেকৃষ্ণর কিছু টুকটাক জিনিসপত্র এদিক-ওদিক পড়ে আছে। কিন্তু সে নেই। ডাফনীর মুখে শুনলাম সে ঠিক তিনটের সময় হাসপাতালে চলে গেছে।

কথা শুনে আমাদের বুকের ওপর থেকে একটা ভারী বোঝা যেন নেমে গেল। আর আমাদের ভয়ে-ভয়ে থাকতে হবে না, একটা গেঁয়ো ভূতকে এক ইংরেজ পরিবারে আগলে রাখতে হবে না। আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। শেখর খুশীর চাপে আপন মনে একটা ইংরেজি গানের কলি গুনগুন করে ভাঁজতে লাগল।

দুই

আমরা যে পাড়ায় থাকি তার নাম শেফার্ডস্ বুশ। লণ্ডন শহর থেকে বেশ কিছু দূরে। চারপাশ চুপচাপ, ফাঁকা-ফাঁকা। হঠাৎ এলে মনে হয় আমরা যেন একটা বিলিতী গ্রামে এসে পড়েছি। লণ্ডন শহর থেকে কিছু দূরে থাকলেও শহরে পৌঁছতে আমাদের দেরি লাগে না। কাছেই শেফার্ডস্ বুশ টিউব স্টেশন। তা ছাড়া দোতলা বাস তো আছেই।

এক পাড়ায় আমরা বেশী দিন থাকি না, কিছু পর-পরই নতুন জায়গায় উঠে যাই। কারণ

আমরা চাই গোটা লণ্ডন শহর আর সব শহরতলি চষে বেড়াতে। এক-এক ইংরেজ পরিবারে থেকে নতুন-নতুন মানুষকে জানি, তাদের সব রকম আচার-ব্যবহার, আদব-কায়দা প্রাণপণ করে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করি। অর্থাৎ খুব সহজেই আমরা যে কোন ইংরেজ পরিবারের বাড়ির ছেলের মত হয়ে উঠি। সকলের এত আপনার হয়ে যাই, তাদের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে যাই যে বাড়ির কর্তা কিংবা গিন্নী কেউ না কেউ আমাদের একসময় না একসময় বলবেই, "এত ভারতীয় পেয়িং গেস্ট থেকেছে আমাদের পরিবারে কিন্তু তারা কেউই তোমাদের মত নয়। তাদের চেহারা, কথাবার্তা বলার ধরন একেবারেই অন্য রকম। কিন্তু তোমরা ঠিক এদেশের লোকের মত।"

এই ধরনের প্রশংসা আমরা অনেক শুনেছি। এক বাড়ি ছেড়ে যখন আমরা অন্য পরিবারে আশ্রয় নিতে গেছি তখন পুরনো কর্তা গিন্নী বাড়ির ছেলেমেয়েরা ছলোছলো চোখে আমাদের বিদায় দিয়েছে। হাত ধরে বলেছে, "যেখানেই থাক, মাঝে-মাঝে ফোন কর। উইকএণ্ডে সময় পেলে আমাদের এখানে এসে চা খেও।"

আমরা তাদের কথা রেখেছি। নতুন নতুন পরিবারে গেলেও পুরনো বাড়ির কাউকে ভুলি নি। এমন করেই এদেশে বেড়েছে আমাদের বন্ধুসংখ্যা। এখন বহু ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা। আমাদের মত এত সহজে এত ইংরেজ পরিবারের আপনার লোক হয়ে যেতে যে আর কোন ভারতীয় পারে নি সে-বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না।

যা হোক নতুন-নতুন পাড়া চষে বেড়াবার ইচ্ছে থাকলেও ঠিক এই সময় শেফার্ডস্ বুশ ছেড়ে যাওয়ার কোন ইচ্ছে আমাদের ছিল না। সামনেই একটা পরীক্ষা। এ সময় ওঠাউঠি করলে পড়াশুনোর ক্ষতি হবে। নতুন জায়গায় মন বসাতেও তো কিছুদিন সময় লাগে। তাছাড়া মাইকেল আর ডাফনী—দুজনকেই আমরা একটু বেশী রকম পছন্দ করি। ওদের পরিবারও ছোট। শুধু স্বামী আর স্ত্রী। ফলে আমাদের পড়াশুনোর কোনরকম ব্যাঘাত হয় না।

কিন্তু এই সুবিধা থাকলেও আমাদের আর কোনমতে এখানে থাকা চলবে না। যত শীগগির হয় এ বাড়ি থেকে তল্পী গুটিয়ে সরে পড়তে হবে। কেন বল তো? তোমরা বোধহয় ঠিক বুঝতে পার নি কেন আমরা এ বাড়ি ছেড়ে পালাবার জন্যে মনে মনে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। এবার তোমাদের কারণটা খুলে বলি।

হরেকৃষ্ণ হাসপাতালে গেছে। কিন্তু সে তো আর চিরকাল সেখানে থাকবে না কিংবা সেখান থেকে সোজা দেশে ফিরে যাবে না। সে আবার এসে উঠবে এই বাড়িতে আমাদের এই ঘরে। কেননা এখানে সে তার জিনিসপত্র রেখে গেছে। একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কুৎসিত লোক আমাদের ঘরে শুয়ে গোঙাবে ভাবতেও আমাদের গা ঘিনঘিন করে ওঠে। এই রকম অতৃপ্তি নিয়ে আমাদের পড়াশুনো করা তো দূরের কথা, খাওয়া-দাওয়াও করতে প্রবৃত্তি হবে না। কাজেই আমরা ঠিক করলাম এখান থেকে কেটে পড়ব। মাইকেল আর ডাফনীকে কিছু বুঝতে দেব না—এখন থেকেই গাইতে আরম্ভ করব, পাড়াটা বড় দূর। আমাদের কলেজে যেতে-আসতে অনেক সময় নষ্ট হয়—এই রকম আর কী!

কিন্তু মাইকেলের ওপর আমরা মনে মনে খুব চটে গেলাম। এই রকম কাণ্ড করে আমাদের জব্দ করার কী দরকার ছিল তাঁর? এটা যে ইংরেজের স্বভাববিরুদ্ধ। পরের সুবিধা-অসুবিধার কথা ওরা সবচেয়ে আগে বোঝে। হয়তো তিনি মনে মনে অনুতাপ করছেন। কিন্তু এখন তো আর কিছু করা সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। কাজেই আমাদেরই বিদায় নিতে হবে।

আমরা চুপেচাপে অন্য কোন পাড়ায় নতুন আস্তানার সন্ধান করতে লাগলাম। যদিও হরেকৃষ্ণর কোন খবরই আমরা রাখি না। আমরা জানি না সে কেমন আছে—তার অপারেশন হয়েছে কিনা। মাইকেল কিংবা ডাফনীও হরেকৃষ্ণর কথা একদিনও তোলে নি আমাদের কাছে, কোন প্রশ্নও করে নি। এমনিতেই পরের ব্যাপারে ইংরেজের কৌতূহল খুবই কম, তার ওপর ওদের দুজনের এ কথা বোঝবার মত বুদ্ধি নিশ্চয়ই ছিল যে হরেকৃষ্ণকে আমরা একেবারেই পছন্দ করি না।

একদিন হল্যাণ্ড পার্ক অঞ্চলে আমরা নতুন আস্তানার সন্ধান পেলাম। ইংরেজ দম্পতি। একটিমাত্র মেয়ে তাদের, বয়েস বছর ছ'য়েক হবে। আমরা নিশ্চিন্ত হলাম। আর দু-তিন সপ্তাহ পরে আমরা চলে আসব হল্যাণ্ড পার্কের নতুন পরিবারে। ওদের কে একজন অতিথি আছে এখন। সে চলে গেলেই আমরা আসব।

প্রস্থানের ব্যবস্থা যে পাকা করে এসেছি সেকথা সঙ্গে সঙ্গে মাইকেল আর ডাফনীকে জানাতে আমাদের কেমন যেন দ্বিধা হল—যদি ওরা বুঝতে পারে কেন আমরা উঠে যাচ্ছি। যাক, এখনো তো সময় আছে। যাবার দিন সাতেক আগে জানালেই চলবে। তা ছাড়া এই সপ্তাহ শেষে আমাদের দিন তিন-চারের জন্যে লণ্ডনের বাইরে বেড়াতে যাবার কথা আছে। ভাবলাম, কর্নওয়ালের সমুদ্রতীর থেকে ফিরে এসে মাইকেল আর ডাফনীকে এই বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার কথাটা বলব।

দিন তিন-চার পরে নয়, ঠিক এক সপ্তাহ পরে আমরা কর্নওয়াল থেকে আবার লণ্ডনে ফিরে এলাম। বিকেলের ফিকে আলো কখন কুয়াশায় ঢেকে গেছে। চারপাশ বিষণ্ণ, ভারী একটা বেদনায় যেন থমথম করছে। ইংল্যাণ্ডে এ সময়টা কেমন যেন করুণ, মায়াময়। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। এখন এখানে শরৎকাল। ইংল্যাণ্ডে এই ঋতু আমাদের শরতের মত প্রকৃতিকে অপরূপ করে তোলে না, তাকে বিবর্ণ করে। বিষণ্ণ একটা ক্লান্ত ছায়া যেন ছড়িয়ে থাকে সর্বত্র। পাতা ঝরে যায়। ফুল কোথায় লুকিয়ে থাকে কে জানে। থেকে থেকে বাড়ির বাগানে রবিন পাখি আর উড়ে এসে বসে না। আসন্ন ভারী শীতের পথ প্রস্তুত করতেই যেন এদেশে আসে নীরস কঠিন শরৎ। হিমশীতল গাছপালা গুম হয়ে থাকে। চারপাশ শূন্য, রিক্ত।

কর্নওয়াল থেকে ফিরে ভিক্টোরিয়া স্টেশনের বাইরে এসে আমরা একটা ট্যাক্সি নিলাম। শেফার্ডস্ বুশে আমাদের বাড়িতে যখন এসে পৌছলাম তখন হিমে ভেজা ভারী অন্ধকার বেশ ঘন হয়ে উঠেছে। বাড়ির সামনের বাগানটা ভিজে ভিজে। কোথা থেকে ছিটকে পড়া বৈদ্যুতিক আলোর ক্ষীণ রেখায় দেখলাম ঘাসের ওপর শিশির চিকচিক করছে।

দরজার হাতলও ঠাণ্ডা। শেখর সুইচ টিপল। শুনলাম বাড়ির ভেতরে ঘণ্টার রিনরিন ধ্বনি খেলে গেল। একটু পরেই দরজা খুলল ডাফনী।

সে কিছু বলবার আগেই আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে তাকে বললাম, "কর্নওয়ালে কখনও গেছ ডাফনী? সমুদ্রের শোভা অপূর্ব!"

"হ্যাঁ, গেছি—" ডাফনী ম্লান স্বরে খুব আস্তে বলল, "এস ভেতরে। ভাল ছিলে তো?"

কী হয়েছে ডাফনীর? তাকে বড় বিষণ্ণ মনে হচ্ছে। তার কথায়ও যেন প্রাণ নেই। ভেতরে এসে আমি আস্তে দরজা বন্ধ করলাম। হাতের স্যুটকেস নামিয়ে রাখলাম। পরে একটু ইতস্ততঃ করে ডাফনীকে স্পষ্টই জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে তোমার ডাফনী? মাইকেল কোথায়?"

"এই যে। লাউঞ্জে বসে আছে। এস তোমরা।"

ডাফনীর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ঢুকলাম লাউঞ্জে। একটু দূরে কয়লার আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে। মাইকেল বসে আছে চুপচাপ একদিকে। আমাদের দিকে সে করুণ করে দেখল। কথা বলল না। আঙুল নেড়ে ইসারায় বসতে বলল। ডাফনী ততক্ষণে বসে পড়েছে। সে-ও একেবারে চুপ। মুখ নামিয়ে একমনে বোধহয় মাইকেলের জন্যে পশমের সোয়েটার বুনে যাচ্ছে।

ব্যাপারটা কী? এই কয়েক দিনের মধ্যে এ বাড়ির মানুষ দুটো এমন ম্লান, বিষণ্ণ হয়ে উঠল কেন? আমি আর ধৈর্য ধরতে না পেরে অধীর হয়ে মাইকেলকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে আপনাদের? মুখে কথা নেই? হাসি নেই? আমরা কিছু বুঝতে পারছি না—"

মাইকেল কিছু সময় স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল আমার দিকে। পরে যেন খুব কষ্ট করে এক-একটি কথা উচ্চারণ করল, "কিংস ক্রশ হাসপাতালে কাল দুপুরে হরেকৃষ্ণ মারা গেছে। অপারেশন ভালই হয়েছিল। চার-পাঁচদিন পরে হঠাৎ তার অবস্থা ভীষণ রকম খারাপ হয়ে পড়ে।"

মাইকেলের কথা শুনে চমকে উঠলাম। বুকের ভেতর কীরকম করে উঠল। মনে পড়ল তার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে একদিন আমিই তার মৃত্যু কামনা করেছিলাম। কিন্তু হরেকৃষ্ণর মৃত্যুসংবাদের চেয়ে আরও অনেক বড় আঘাত তখনো আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে ছিল।

শেখর মাইকেলকে জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের কে খবর দিল?"

মাইকেল বলল, "হাসপাতালে ভরতি হওয়ার সময় হরেকৃষ্ণ তার অভিভাবক হিসেবে আমারই নাম দিয়েছিল। হাসপাতাল থেকেই আমাকে জানায়। আমি ইণ্ডিয়া হাউসে ফোন করেছিলাম—" মাইকেল তার কোটের বুক-পকেট থেকে ধবধবে সাদা রুমালটা আস্তে টেনে নিয়ে চোখে বুলিয়ে নিলেন, "আজ দুপুরে গোলার্ডস গ্রীন ক্রিমেটোরিয়মে তোমাদের হিন্দু রীতি অনুসারে ইলেকট্রিক চুল্লীতে হরেকৃষ্ণের দেহ দাহ করা হয়—" এতটা বলে তিনি মুখ নীচু করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

হরেকৃষ্ণ ক'দিনই বা আমাদের সঙ্গে ছিল। তার শোকে ইংরেজ দম্পতিকে এত বিহ্বল হয়ে পড়তে দেখে আমরা একটু অবাক্‌ই হলাম। তবুও তাদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে বললাম, "কিন্তু হরেকৃষ্ণ আপনাদের পরিবারে খুব অল্পদিন তো ছিল—"

"হ্যাঁ, খুব অল্প দিনই—" মাইকেল টেনে টেনে বললেন, "কিন্তু তবুও তার অভাব আমরা বোধ করছি ভীষণ ভাবে।"

"কেন?"

মাইকেল দেখলেন আমার দিকে।—তার দৃষ্টি অদ্ভুত। পরে হাসলেন। তার হাসিও কী রকম যেন মনে হল আমার। তিনি একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, "কিছু মনে কর না, তোমরা এ দেশে আস আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার—সব কিছু গ্রহণ করে নিজেদের পরিপূর্ণ করে তুলতে—"

শেখর নম্রস্বরে বলে উঠল, "সেই জন্যেই তো আমরা এদেশে এসেছি।"

"ঠিক। আর তোমাদের শ্রমও সার্থক হয়েছে। এই দেশ থেকে, আমাদের পরিবার থেকে তোমরা সব কিছু গ্রহণ করতে পেরেছ নিখুঁত ভাবে—"

শেখর খুশী হয়ে বলল, "অনেক ধন্যবাদ।"

মাইকেল শেখরের দিকে তাকিয়ে তাকে করুণা করার মত বললেন, "তোমাদের মত হাজার-হাজার মানুষ এদেশে আসে, যায়। তারা আমাদের কাছ থেকে শুধু নেয়। আমাদের কিছু দেয় না, দিতে পারে না।"

কি হয়েছে আপনাদের? মুখে কথা নেই? হাসি নেই। [পৃ. ১২

আমি কৃতার্থের মত হেসে বললাম, "আপনাদের দেশে এসে আমরা আপনাদের কী দিতে পারি বলুন!"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ধীর গম্ভীর স্বরে মাইকেল বললেন, "হরেকৃষ্ণ কিন্তু অল্প কদিনে আমাদের অনেক দিয়েছিল। সে ছিল সারল্যের প্রতিমূর্তি। তার ব্যবহারে এতটুকু কৃত্রিমতা ছিল না! সে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম!"

আমি বিস্মিত হয়ে মাইকেলকে প্রশ্ন করলাম, "কিন্তু কী সে দিয়েছিল আপনাদের?"

মাইকেল বিহ্বল স্বরে বললেন, "হরেকৃষ্ণ আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরেছিল ভারতবর্ষের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির উজ্জ্বল রূপ। আমরা যা জানতাম না তা জেনেছি তার কাছ থেকে, আমরা যা শুনিনি তা শুনেছি তারই মুখ থেকে। এক মহান্ দেশের সঙ্গে সে-ই আমাদের পরিচয় করিয়ে

দিয়েছিল—" মাইকেল চোখে আর একবার রুমাল বুলিয়ে নিলেন। পরে ধরা গলায় আস্তে বললেন, "মে হিজ সোল রেস্ট ইন পীস।"

কয়লার আগুন নিভে আসছিল, কিন্তু সেদিকে দেখল না কেউ। ডাফনীর চোখ জলে ভরে এসেছে। শেখর মাথা নীচু করে বসে আছে চুপচাপ। আর আমি? মাইকেলের সঙ্গে আর কথা বলার ভাষা আমার ছিল না। গলার দামী টাই ফাঁসের মত লাগছিল। নিজেকে মনে হচ্ছিল ভিখিরীর মত।

কীরকম ঘোরে শেখরের একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে হরেকৃষ্ণর আত্মার শান্তি কামনার জন্যে আমিও আস্তে—খুব আস্তে উচ্চারণ করলাম, "মে হিজ সোল রেস্ট ইন পীস!"

কয়লার আগুন নিভে গিয়েছিল।

● ধরি মাছ না ছুঁই পানি—

ফাঁসির আসামী

—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

এ কাহিনী কাউকে কোন দিন বলি নি। জানি, বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না।

আমার নিজেরই মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় ব্যাপারটা আদৌ ঘটেছিল কিনা। যখন হাতে কোন কাজ থাকে না, বারান্দায় বেতের চেয়ার পেতে চুপচাপ বসে বসে কলকাতার ঘনায়মান সন্ধ্যার দিকে চেয়ে থাকি। রাস্তার যানবাহনের শব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে, তখন সব ঘটনাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

অনেক বছর আগের কথা।

আমি তখন ম্যাণ্ডেলে জেলের ডেপুটি-সুপার। ম্যাণ্ডেলে উত্তর-বর্মার প্রাচীন শহর। ম্যাণ্ডেলেকে বাংলায় লেখা হয় মান্দালয়।

সেই জেলে একবার এক দুর্ধর্ষ আসামী এসেছিল। সামান্য কিছু টাকার জন্য সে ভাইকে ছোরা দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছিল।

লোকটার নাম পে মঙ। বয়স খুব বেশী নয়। বছর বাইশ তেইশ। বাপ ছিল না। দু ভাই ঠাকুর্দার কাছে মানুষ। পে মঙ স্কুলের ধার দিয়ে যেত না। কেবল লুকিয়ে পরের পুকুরে ছিপ ফেলা, পরের গাছের ফলপাকুড় পাড়া, সিনেমা দেখে দেখে বেড়ানো, এই সব করত।

পে মঙের ছোট ভাই ঠিক তার বিপরীত। লেখাপড়া তো করতই। অবসর সময়ে ঠাকুর্দার চাষবাসের সাহায্য করত। সপ্তাহে সপ্তাহে চাষের তরিতরকারি হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত।

এইভাবে সে কিছু পয়সাকড়ি জমিয়েও ছিল।

একদিন পে মঙ ভাইকে বলল, দশটা টাকা ধার দিবি, শহরে যাব। রেলভাড়া আর হোটেল খরচ লাগবে। তোকে টাকাটা আমি একমাসের মধ্যে শোধ করে দেব।

ভাই দাদাকে খুব ভালই চেনে। এর আগে কয়েকবার যে টাকা ধার দিয়েছিল, সেটাই ফেরত পায় নি।

আর দাদা ফেরতই বা দেবে কোথা থেকে! তার এক পয়সা তো উপার্জন নেই। তাই বলল, আমার কাছে পয়সা নেই। থাকলেও দিতাম না।

এই নিয়ে কথা কাটাকাটি, গালাগালি তারপর মারামারিও শুরু হয়ে গেল। পাড়ার লোক এসে দুজনকে ছাড়িয়ে দিল।

দুজনেই দুজনকে শাসাল, দেখে নেব।

পে মঙ-এর ভাই সব কিছু ভুলে নিজের কাজে মেতে গেল। পে মঙ ভুলল না। তক্কে তক্কে রইল।

একদিন ভোরে পে মঙের ভাই হাটে চলেছে। মাথার ঝুড়িতে শাকসবজি, ফলপাকুড়। পে মঙ পিছু নিল।

নির্জন রাস্তা। অত ভোরে বিশেষ লোক চলাচল নেই। হাটের জিনিস নিয়ে গরুর গাড়ির সার আগের রাতে চলে গেছে।

মাঝামাঝি রাস্তায় পে মঙ পিছন থেকে ভাইয়ের গলা চেপে ধরল। এইবার কে তোকে বাঁচাবে। দে, সঙ্গে যা টাকাকড়ি আছে।

আচমকা আক্রমণে ভাইয়ের মাথা থেকে ঝুড়িটা ছিটকে রাস্তার ওপর পড়ে গিয়েছিল। সে ফিরে দাঁড়িয়ে লড়বার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারে নি।

পে মঙ কোমর থেকে ছোরা বের করে ভাইয়ের বুকে বার তিনেক বসিয়ে দিয়েছিল।

রক্তে তার গেঞ্জি আর লুঙ্গি লাল হয়ে গিয়েছিল।

ভাইয়ের পকেট থেকে টাকা সাতেক বের করে নিয়ে পালাতে গিয়েই থামতে হয়েছিল।

পুলিসের দারোগা একেবারে সামনে।

একটা খুনের তদারক সেরে পাশের গাঁ থেকে দারোগা পুলিস সঙ্গে নিয়ে সাইকেলে ফিরছিল, পে মঙকে একেবারে হাতে নাতে ধরে ফেলল। এই হচ্ছে পুলিসের কাহিনী।

তারপর হাজত, হাজত থেকে কোর্ট, কোর্ট থেকে জেল।

পে মঙকে বাঁচাবার জন্য তার ঠাকুর্দা অনেক চেষ্টা করেছিল। একটা নাতি তো গেছেই, আর একজনকে যদি বাঁচাতে পারে। বাঘা বাঘা উকিল দিয়েছিল।

কিছু হয় নি।

জেলা কোর্ট ফাঁসির হুকুম দিল। হাইকোর্ট সে হুকুম বহাল রাখল।

পে মঙ যখন ম্যাণ্ডেলে জেলে এল, তখন সে বিলাতে রাজার কাছে প্রাণদণ্ডের আদেশ মুকুব করার আবেদন করেছে।

পে মঙ বরাবর বলে এসেছে ভাইকে সে মারে নি। ভাইয়ের সঙ্গে গালিগালাজ ধস্তাধস্তি হয়েছে বটে, কিন্তু মেরেছে অন্য লোক। পাশের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে মেরে পালিয়েছে।

পে মঙকেও মারত কিন্তু দারোগা এসে পড়ায় পারে নি।

পে মঙের এ কাহিনী ধোপে টেকে নি।

প্রমাণ হয়েছে, এ ছোরা তার। দারোগা নিজের চোখে দেখেছে পে মঙ ভাইয়ের বুকে বার বার তিনবার ছোরা বিঁধিয়ে দিয়েছে।

দারোগার সঙ্গে পে মঙের কোন শত্রুতা নেই যে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলবে।

হঠাৎ একটা অব্যক্ত আর্তনাদ করে পে মঙ মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল। [পৃ. ১৮

আমি যখন পে মঙের সেল-এ যেতাম তখনও তার এক কথা।

হুজুর বাঁচান, আমার বিনাদোষে ফাঁসি হবে। মরতে আমার বড় ভয় হুজুর। কিই বা আমার বয়স। আমি বাঁচতে চাই।

আমি তাকে কোন আশ্বাস দিতে পারতাম না। কেবল বলতাম, আজ বিকালে ফুঙ্গি (বৌদ্ধ পুরোহিত) আসবেন, তাঁর কাছে তোমার যা বলবার বল।

ফুঙ্গি এলেই পে মঙ খেপে উঠত। কোন ধর্মের কথা সে শুনতে চাইত না। চিৎকার করে বলত, আমাকে বিনাদোষে যারা ফাঁসি দেবে, তাদের আমি ছাড়ব না। আমি শয়তানের কাছে রক্ত বিক্রি করে যাব। আমার আত্মা প্রতিশোধ নেবে।

পে মঙের কথা শুনে শুনে আমার নিজেরই মাঝে মাঝে কেমন সন্দেহ হত। সত্যিই হয়তো পে মঙ দোষী নয়। বিচারেও তো কত সময়ে ভুল হয়।

কিন্তু ডেপুটি-জেলার হিসাবে আমার কিছু করার নেই।

বিলাত থেকে অর্ডার এল। আবেদন মঞ্জুর হয় নি।

তার মানে ফাঁসি ছাড়া পথ নেই।

খবরটা পে মঙকে জানিয়ে দেওয়া হল।

কিছুক্ষণ গরাদ ধরে আমার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে হঠাৎ একটা অব্যক্ত আর্তনাদ করে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

ভয় পেয়ে গেলাম। অনেক দুর্ধর্ষ আসামীও ফাঁসির হুকুম শুনে জ্ঞানহারা হয়ে যায়। কিংবা রীতিমত অসুস্থ।

ফাঁসির আসামীদের খুব সাবধানে রাখা হয়। যাতে তারা আইনকে ফাঁকি দিয়ে আত্মহত্যা না করতে পারে।

তাদের সেলের চার দেয়াল খড় দিয়ে নরম করে দেওয়া হয়, যাতে আসামী দেয়ালে মাথা ঠুকে না মরতে পারে। রোজ ডাক্তার এসে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে। খাওয়াদাওয়ার খুব তরিবৎ।

খবর শোনার পর থেকে পে মঙ একেবারে বদলে গেল।

চুপচাপ বসে থাকে। দিনরাত বিড়বিড় করে কি বলে। ফুঙ্গি কাছে এলে তাকে গালিগালাজ করে তাড়িয়ে দেয়।

ওয়ার্ডারকে বলে, আমি খুন করি নি, তবু এরা আমাকে ফাঁসি দিচ্ছে। আমি কাউকে ছাড়ব না। সবাইকে দেখে নেব।

ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া সত্ত্বেও তার চেহারা শীর্ণ হয়ে যেতে লাগল।

বোঝা গেল, এটা হচ্ছে মানসিক চিন্তায়।

অবশেষে সেইদিন এল।

জেলার সাহেব ছুটিতে, কাজেই দায়িত্ব আমার ওপর।

একজন ম্যাজিস্ট্রেট থাকবে, একজন ডাক্তার আর আমি।

ভোর পাঁচটা দশে ফাঁসি।

সাড়ে চারটে থেকে আমরা তৈরি।

আসামীকে স্নান করিয়ে আনা হল। ফুঙ্গি ধর্মের বাণী উচ্চারণ করল। কোন গোলমাল নয়, চুপচাপ শুনল।

গোলমাল বাধল ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাবার সময়।

কিছুতেই যাবে না। পাগলের মতন চিৎকার!

তোমরা একজন নিরীহ লোককে ফাঁসি দিচ্ছ। ফয়া (ভগবান) তোমাদের ক্ষমা করবেন না। নির্বংশ হবে তোমরা। কুষ্ঠরোগে মারা যাবে।

টেনে হিঁচড়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হল।

ঠিক সময়ে কাজ শেষ।

কালো কাপড়ে ঢাকা দেহটা থরথর করে কেঁপে উঠেই নিস্পন্দ হয়ে গেল চিরদিনের জন্য। একটা মানুষের আকৃতি, প্রতিরোধ সব শেষ হয়ে গেল।

এর দিন দুয়েক পরেই ব্যাপারটা ঘটল।

রাত তখন বারোটা হবে। একটু আগে পড়া শেষ করে সবে শুয়েছি, দরজায় প্রচণ্ড করাঘাত।

জেলের মধ্যে আমাদের সব সময়ে সন্ত্রস্ত হয়ে বাস করতে হয়। অঘটন একটা ঘটলেই হল।

দরজা খুলে দেখি রাতের ওয়ার্ডার।

দুটো চোখ বিস্ফারিত। উত্তেজনায় প্রশস্ত বুক ওঠানামা করছে। শীতের রাত কিন্তু সারা মুখ ঘর্মাক্ত।

কি হল?

হুজুর পে মঙ?

কে?

পে মঙ হুজুর। যার ফাঁসি হয়ে গেল।

ধমক দিয়ে উঠলাম, কি নেশা ভাং করেছ নাকি? মাঝ রাত্তিরে আজে বাজে কথা বলছ। তোমাকে জরিমানা করব।

বিশ্বাস করুন হুজুর, আমি একলা নয়! অন্য কয়েদীরাও দেখেছে।

বেরিয়ে পড়লাম। দেখে আসি কি রহস্য।

—হুজুর, পে মঙ?

গিয়ে দেখলাম পে মঙের সেলের আশেপাশের কয়েদীরা সব গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি যেতেই চেঁচামেচি শুরু হল।

হুজুর, পে মঙ।

অনেক কষ্টে তাদের থামিয়ে আসল কথাটা শুনলাম।

কোন এক কয়েদীর প্রথম চোখে পড়ে।

চাঁদের আলোয় চারদিক পরিষ্কার। কোথাও একটু অন্ধকার নেই।

একটা চাপা গোঙানি কানে যেতে কয়েদীটা পে মঙের সেলের দিকে দেখেই চমকে উঠেছিল। কালো কাপড়ে ঢাকা একটা মূর্তি শূন্যে ঝুলছে। ঠিক ফাঁসিকাঠ থেকে যেমন ঝোলে।

একজনের চিৎকারে অন্য সবাই উঠে পড়ে।

সকলেরই চোখের সামনে এক দৃশ্য।

তাদের হল্লায় রাতের ওয়ার্ডার এসে হাজির।

সেলের সামনে এগিয়ে গিয়েই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

কালো কাপড় ঢাকা মূর্তিটা মৃত্যুযন্ত্রণায় থরথর করে কাঁপছে।

আর সে অপেক্ষা করে নি। প্রাণপণে ছুটে আমার দরজায় ধাক্কা দিয়েছে।

সেলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেল ফাঁকা। কোথাও কিছু নেই।

চাঁদের আলো থাকা সত্ত্বেও হাতের টর্চটা সেলের এদিকে ওদিকে ফেললাম। কড়িকাঠেও। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

ঘুরে দাঁড়িয়ে জোর ধমক দিলাম।

মরা মানুষ আবার ফিরে আসে নাকি? যত সব বাজে ঝামেলা। যাও সব শুয়ে পড়।

ওয়ার্ডারকে কড়া করে বকলাম।

ফের এরকম ছেলেমানুষি ব্যাপার করলে চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে।

সবে তন্দ্রা এসেছিল, এমনই সময়ে উটকো ঝামেলায় মেজাজ রুক্ষ হয়ে গেল। জানি না, আবার কখন ঘুম আসবে।

দ্রুতপায়ে নিজের কোয়ার্টারে ফিরে এলাম। একলাই থাকি। তখনও বিয়ে করি নি।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকেই শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল।

বাইরের ঘরে বাতি জ্বালানোই ছিল। এই ঘর দিয়েই আমাকে শোবার ঘরে যেতে হবে।

বাইরের ঘরটা অফিস ঘর। কোণের দিকে একটা টুলের ওপর পে মঙ বসে।

বিস্ফারিত দুটি চোখ। মনে হল, চোখের মণি দুটো বুঝি বের হয়ে আসবে। জিভটা ঝুলছে। গলায় লাল দাগ, ফাঁসির দড়ির।

আমি ভীতু এমন অপবাদ শত্রুও দিতে পারে না, কিন্তু মুহূর্তের জন্য আমার মনে হল বুকের হৃদস্পন্দন আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে উঠেছে। সমস্ত শরীর কাঁপছে ঠকঠক করে। তালু শুকিয়ে কাঠ।

একটু জল পেলে হত। ঠাণ্ডা এক গ্লাস জল।

কে? ভয়ার্ত গলায় প্রশ্ন করলাম।

আমি পে মঙ হুজুর। বড় কষ্ট পাচ্ছি। বড় যন্ত্রণা। তাই আপনার কাছে এসেছি।

খুব সাবধানে দেয়াল ধরে আস্তে আস্তে এপাশের চেয়ারের ওপর বসে পড়লাম। দাঁড়িয়ে থাকার আর শক্তি ছিল না।

এ তো চোখের ভুল নয়। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, পে মঙ আমার সামনে বসে রয়েছে। মাত্র হাত চারেক দূরে। ফাঁসির পরের অবস্থা।

মৃদুকণ্ঠে বললাম, আমার কাছে কি দরকার?

বুঝতে পারলাম কণ্ঠস্বর আমার আয়ত্তের মধ্যে নয়।

আপনার কাছে ছাড়া আর কার কাছে আসব হুজুর। যা কিছু বলার আপনার কাছেই তো বলে এসেছি।

কি বলবার আছে বল?

আমি নির্দোষ হুজুর। এ খুন আমি করি নি।

এখন আর এসব কথা বলে লাভ কি। তোমার তো যা হবার হয়ে গেছে।

আছে হুজুর। পরকাল আছে, সেখানে আমি শান্তি পাচ্ছি না।

কি উত্তর দেব। চুপ করে রইলাম।

পে মঙই বলতে লাগল।

সেদিন ভাইকে খুন করতে আমি চাই নি হুজুর। পিছন থেকে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার টাকা পয়সা কেড়ে নিতে চেয়েছিলাম। ঝাঁপিয়ে পড়েওছিলাম তার ওপর। দুজনে রাস্তার ওপর যখন গড়াগড়ি খাচ্ছি, তখন পাশের ঝোপ থেকে একজন লাফিয়ে বের হল। আমি ওপরে ছিলাম। আমার কোমর থেকে ছোরাটা বের করে আমার ভাইয়ের বুকে বার কয়েক বসিয়ে দিল। আমাকেও হয়তো মারত, কিন্তু দারোগার সাইকেল দেখতে পেয়ে আবার ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। আমি পয়সার জন্যই যদি খুন করব হুজুর, তাহলে পুলিস আমার কাছ থেকে কি কোন পয়সা উদ্ধার করতে পেরেছিল?

স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর নয়। শ্বাসনালীতে চাপ পড়লে যেমন ফ্যাঁসফেঁসে শব্দ হয়, ঠিক তেমনই আওয়াজ।

কথার সঙ্গে সঙ্গে জিভ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়তে লাগল মেঝের ওপর।

ঠিক আছে, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করলাম।

পে মঙের বীভৎস রক্তাক্ত মুখে হাসি ফুটে উঠল।

করলেন তো হুজুর, তাতেই আমার শান্তি। দারোগাকে বলেছি কোর্টে বলেছি, কেউ বিশ্বাস করে নি হুজুর। আপনার ওপরওয়ালা জেলারও নয়। তাই আমার এই অবস্থা। আমার মোটে তেইশ বছর বয়স হুজুর, এর মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল।

কতক্ষণ এ কাহিনী চলবে জানি না।

দূরে জেলের ঘড়িতে ঢং করে একটা বাজল।

বাইরে রাতের ওয়ার্ডারের ভারী জুতোর শব্দ ভেসে আসছে। মস, মস, মস।

এবার পে মঙ দাঁড়িয়ে উঠল।

যাচ্ছি হুজুর, তবে যারা আমার এ সর্বনাশের জন্য দায়ী তাদের আমি ছাড়ব না।

বুকটা দুপদুপ করে উঠল।

তার চরম অবস্থার জন্য পে মঙ কি আমাকেও দায়ী করছে। আমার ওপরও প্রতিশোধ নেবে?

বেশ বুঝতে পারলাম, ঘাড়, পিঠ ঘামে একেবারে ভিজে গেছে।

রুমাল বের করে ঘাম মুছব, সে শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছি।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। বাইরে বরফ পড়লে যেমন হয়। সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল।

কুণ্ডলি পাকানো ধোঁয়া। ধোঁয়াটা সরে যেতেই দেখলাম পে মঙ নেই। চেয়ার খালি।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালাম।

বাকি রাতটুকু আর ঘুম হল না। এপাশ ওপাশ করলাম। চোখ বন্ধ করলেই পে মণ্ডের বীভৎস, রক্তাক্ত মূর্তি ভেসে ওঠে।

ভোরে উঠে চোখে মুখে জল দিয়ে নিজেকে বোঝালাম।

সবই মিথ্যা। নিজের মনের ভয়টাই বাইরে তার প্রতিবিম্ব ফেলেছে। পে মণ্ডের দেহ তো গতকালই কবর দেওয়া হয়েছে। সে ফিরে আসবে কি করে!

কয়েদীদের ভীতি আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল।

বারান্দায় চা নিয়ে বসলাম।

খবরের কাগজটা দিয়ে গিয়েছিল।

খবরের কাগজের প্রথম পাতার ওপর চোখ বুলিয়েই চমকে উঠলাম।

জেলা জজ বেকার নিহত। গত রাত্রে শয়নকক্ষে বেকারকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তাঁর কণ্ঠনালী ছিন্ন। আশ্চর্যের বিষয়, বাড়ির কোন জিনিসপত্র চুরি যায় নাই। পুলিস এই রহস্যজনক হত্যাকাণ্ডের কিনারা করিতে সর্বশক্তি নিয়োজিত করিয়াছে।

মিস্টার বেকারের এজলাসে পে মণ্ডের বিচার হয়েছিল।

গতকাল রাত্রেই তো পে মণ্ড প্রতিশোধ নেবার কথা বলে গিয়েছিল। সব ব্যাপারটা কেমন গোলমাল হয়ে গেল।

তবে কি পে মণ্ডের প্রেতাত্মা সত্যিই এসেছিল আমার কাছে?

তা কি সম্ভব!

খবরের কাগজ হাতে করেই বাইরের ঘরে এলাম।

সব স্বাভাবিক। পে মণ্ড এসেছিল, তার কোন চিহ্ন কোথাও নেই।

কোণের এই টুলেই তো সে বসেছিল।

মেঝের দিকে চোখ পড়তেই আঁতকে উঠলাম।

লাল রক্তের কয়েকটা ফোঁটা জমে কালো হয়ে গেছে।

পে মণ্ডের জিভ থেকে এই রক্ত ঝরেছিল।

ফাঁসির পর এরকম রক্ত তো বের হয়।

গোলকমামার এলেন
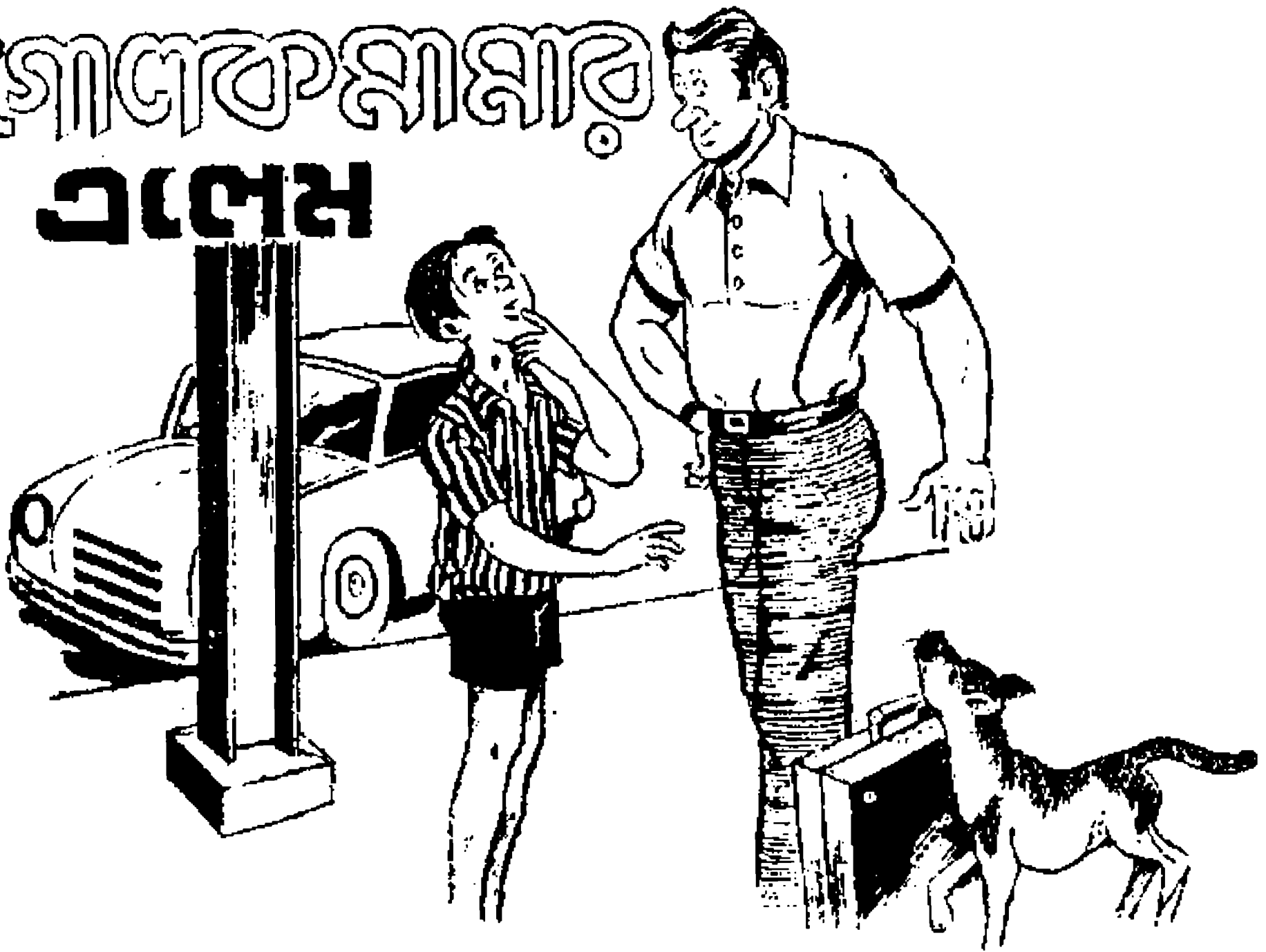
—শক্তিপদ রাজগুরু

গোলকমামা আমাকে আপাদমস্তক দেখে বলে।

—এ যে নেংটি ইন্দুরের মত হয়েছিস রে! খেলাধুলো করবি কি করে? আগে চাই শরীর।

নিজের বলিষ্ঠ গোলাকার দেহ আর বাইসেপটা দেখিয়ে প্লাটফর্মে দাঁড়ানো মায়ের দিকে চেয়ে শুধোয়—কেমন আছিস ছোড়দি?

মা কি জবাব দিল বোঝা যায় না। আমিও মিইয়ে গেছি। খুশীর বেলুন একেবারে চুপসে গেছে। ক'দিন ধরে ছোটমামা আসার কথায় খুশী হয়েছিলাম। পরীক্ষা চুকে গেছে, কিছুদিন কলকাতায় যাবো গোলকমামার সঙ্গে, বিরাট নামী লোক গোলকমামা। গান-সাংস্কৃতিক জগতে আর খেলাধুলোর জগতে গোলকমামার নাকি খুব নাম ডাক। নিজেও নাকি কলকাতার জাঁকসাইটে কালোয়াতগানের সমঝদার। দিল্লী বোম্বাই থেকে বড় বড় গাইয়েরা এলে সেই আসরে গোলকমামার ডাক পড়ে। এমন রসিকশ্রোতা আর নেই! ফিল্ম-থিয়েটারের মহলেও গোলকমামার সমান প্রতিষ্ঠা। সত্যজিৎবাবু, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটকের বন্ধুই বলা চলে। ভবানীপুরের বাসিন্দা ওরা। তাই এত পরিচয়।

আর খেলার জগতে গোলকমামাও বিশেষ জন। মায়ের মুখেই শুনেছি ও নাকি পি-কে, চুনি গোস্বামীর বিশিষ্ট বন্ধু। কোন ক্লাবের কর্মকর্তাদের একজন। আমার খুশীর কারণ ওইটাই। মফঃস্বল

শহরে মানুষ। এখানের ক্লাবে খেলাধুলো করি, একটু নাম-ডাকও আছে খেলোয়াড় হিসেবে এখানে। কিন্তু কলকাতার গড়ের মাঠে যদি একটু খেলার সুযোগ পাই, আর পি-কে, চুনি গোঁসাই-এর মত লোকের কাছে তালিম পাই তাহলে রাতারাতি দাম বেড়ে যাবে। এই স্বপ্ন সার্থক করতে পারে গোলকমামা।

তাই ওর সঙ্গে কলকাতায় মামার বাড়িতে যেতে চাই। পরীক্ষায় পাস করার পরই কলকাতায় পড়ার ব্যবস্থাও করতে চান বাবা। তাই স্বপ্ন দেখি কলকাতার গড়ের মাঠের কোন ডিভিসনের টিমে খেলছি। রেডিওতে রিলে হচ্ছে, আমাদের শহরের হাজারো মানুষ শুনবে আমার নাম।

ইতিমধ্যে ইয়ং বুলেটস্ ক্লাবের বন্ধুরাও শহরে ঘোষণা করেছে সমী কলকাতায় পি-কে.র ট্রেনিং নিয়ে কোন ডিভিসনে খেলতে চলেছে, সেই সঙ্গে গোলকমামার নামটারও প্রচার হয়েছে।

সেই আশার স্তম্ভস্বরূপ গোলকমামাকে ট্রেন থেকে নেমেই ওই বচন দিতে একটু ঘাবড়ে গেছি। গোলকমামা সেটা বুঝে বলে।

—ওসব ঠিক হয়ে যাবে। দিনকতক ভবানীপুরে মল্লিকদার আখড়ায় ডনবৈঠকি দিয়ে মাঠে যাবি।

মায়ের মুখে গোলকদার নাম শুনেছি বারবার। শহরের সব অনুষ্ঠান থিয়েটারের বাবা পেট্রন, মাও যায়। মা বলে—

—গোলকের ডিরেকশান অনেক ভালো।

আমিও গোলকমামার মুখে পি-কে.র ছাত্র হবার কথা শুনে মামাটিকে নিদারুণ ভাবে শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছি।

স্টেশনের বাইরে বাবা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন, মালপত্র উঠে গেছে।

গোলকমামা বাবাকে প্রণাম করে গাড়িখানা দেখে বলে—

—একটা ইমপোর্টেড গাড়ি কেনো মানিকদা, কি অ্যামবাসাডারে চড়ছো! দাও একটু চালাই!

গোলকমামা নাকি মোটর রেসেও যোগ দেয়। বাবা একটু ঘাবড়ে গেছেন ওর গাড়ি চালানোর কথায়। উকিলমানুষ, বুদ্ধি একটু প্রখর। তাই শুধোন—

—লাইসেন্স এনেছো? তাহলে থাক বাপু!

গোলকমামার মোটর রেস দেখার সৌভাগ্য হল না। বাবাই গাড়ি চালিয়ে বাড়িতে এলেন।

গোলকমামার শহরে পদার্পণের খবর এর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই শহরের অন্যতম নাটকের ক্লাব তরুণ সঙ্ঘের পক্ষ থেকে ডিরেক্টার পাঁচুদা এসে আমাকেই ধরেন—গোলকমামাকে বল, আমাদের রিহার্সেলে একটু যাবেন। যদি দু'একদিন দেখিয়ে দেন গোলকমামা।

গোলকমামা গম্ভীরভাবে জানান—দেখি। সময় পেলে যাবো।

পাঁচুদার অন্য সময় কি তর্জনগর্জন। নাটকের রাত্রে ওর শাহানশাহী মেজাজ দেখেছি, গ্রীনরুমের ধারে কাছে যেতে দেয় না। আজ সেই পাঁচুদা কেঁচো হয়ে বলে—নাটকের অভিনয়ের রাত্রে কলকাতার

কোন আর্টিস্ট, নাহয় ডিরেক্টারকে যদি একটু নিয়ে আসেন গোলকমামা, ধরুন মৃণালবাবু সত্যজিৎবাবু ওরা তো সব আপনার বন্ধু! ওঁদের কাউকে যদি পাওয়া যায়—একটু দেখুন না?

গোলকমামা জানান—দেখবো বলে কয়ে।

—তাহলে আজ আসছেন? পাঁচুদা আমাকেই মুরুব্বী পাকড়ায়—তুই নিয়ে যাবি সমী, আমরাও কেউ আসবো।

ওরা চলে যাবার পর এসে জুটেছে আমাদের ইয়ং বুলেটস্ ক্লাবের ছেলেরা—একটা এগ্‌জিবিশন ম্যাচ হবে, সমীও খেলবে। আপনাকে চিফ গেস্ট হতে হবে?

গোলকমামা জানান—সমী খেলবে নাকি? ওই তো চেহারা। কলকাতায় চলুক পি-কে.র ওখানে, তবে তো তৈরী হয়ে আসবে। ফর্মে আসবে।

ছেলেরাও তবু জেদ করে—আজ চলুন স্যার।

গোলকমামার কাছে তারপর এসেছে শহরের 'গীতালি' সংগীত প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার মুরলীবাবু। শীর্ণ আঁকাবাঁকা চেহারা। ভদ্রলোকের কালোয়াতি গান শুনেছি। একবার গাইতে বসলে তুম তুম্ করে বিবাক লোক তাড়িয়ে আসর সাফ্ করে ওঠেন। হাততালি—সিটি বাজালেও ওঠেন না। সেবার তো আধলা ইঁটই পড়েছিল ঘাড়ে, নেহাৎ বাবরীচুলের জন্য ইঁটটা কাবু করতে পারেনি ওকে।

মুরলীবাবুর ইচ্ছে গোলকমামাকে গান শোনান। তিনি বলেন—

—আপনি তো সদারং, ন্যাশন্যাল সংগীত কনফারেন্সের লোক, একটু শুনুন স্যার। বহুদিনের ইচ্ছে একবার কলকাতার আসরে গেয়ে আসি। তাই একটু স্বকর্ণে শুনুন আমার গান।

ঘাবড়ে গেছি। গোলকমামা যেন নিমরাজী হয়েছেন। তাহলে দফা শেষ, এমন সময় গিরিধারী মণ্ডল এসে যেন উদ্ধার করলো আমাকে ওই মুরলীবাবুর গান শোনার যন্ত্রণা থেকে। গিরিধারী আমাদের দেশের বাড়ির সরকার। জমিজারাত দেখাশোনা করে।

বাবার কাছে ছুটে এসেছে গিরিধারী, ওখানে নাকি বনশুয়োরের খুব উৎপাত বেড়েছে। দুটো মজুরকেও দাঁত দিয়ে ফেঁড়ে আহত করেছে, আর এত বড় আখ খেত সব তছনছ করছে, আলুর খেত চষে ফেলছে। গোলকমামা যে এতবড় শিকারী আর সাহসী ব্যক্তি তা জানা ছিল না। বাবাও ভাবনায় পড়েন—তাইতো, কি করা যায়। এত ক্ষতি করছে ওরা। গোলকমামাই বলে—এতো ভাবার কি আছে মানিকদা। কাল সকালেই ঘুরে আসি তোমাদের গ্রাম থেকে, তোমার তো বন্দুক আছে। দু চারটে বনশুয়োরকে মারলেই ওরা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

বাবাও মনে মনে খুশী হন, তবু শুধোন—পারবে?

গোলকমামা বলেন, তা গোটা সাতেক ম্যানিইটার বাঘ, তিনটে রোগ বাইসন, একটা হাতি তো মারলাম। সুন্দরবন—তরাই—বিহারের ফরেস্টেও শিকার করেছি। চলো তোমাদের সরবনই

দেখে আসি এবার। কিরে সমী, ভয় করবে না তো? আরে ভয়ের কি আছে? আমি তো রয়েছি।

গোলকমামা বিচিত্র সাজে সেজে গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠের দিকে চলেছে। পরনে ব্রিচেস, ইয়া জুতো, মাথায় একটা বারান্দাওয়ালা, টুপি পরা, গোল বদনের ওপর মালার মত কার্তুজের বেল্টটা ঝোলানো। টুপির ওপর ফুলটা হাওয়ায় নড়ছে। গলায় ঝুলছে বাইনাকুলার, এদিকে ওয়াটার বটল।

পিছনে আমার কাঁধে দশসেরী বন্দুক, গোলকমামা আলের উপর দিয়ে মিলিটারী কায়দায় মার্চ করে চলেছেন বনশুয়োরের সন্ধানে। ওপাশে একটু জলামত। দুচারটে হিজল গাছ রয়েছে, আশপাশে উলুঘাসের বন। হঠাৎ ওই উলুবনের ভিতরে একটা সরসর শব্দ ওঠে, কাঁপছে বনের দিকটা। কালোমত কি সরে গেল বন কাঁপিয়ে। গোলকমামা চিৎকার করে—সমী, বন্দুক! কুইক! সামনে ওয়াইল্ড বোর—বনশুয়োর হুঁশিয়ার!

বনশুয়োরের হিংস্রতা সাংঘাতিক, দাঁতাল বনশুয়োরগুলো তেড়ে এসে ধারাল দাঁত দিয়ে মানুষকে ফালা ফালা করে দিতে পারে। আমিও ওই বনশুয়োরের খবর পেয়ে বন্দুক ফেলে দিয়ে সোজা দৌড় দিইছি—আর গোলকমামা সামনে হিজল গাছের ডালটাই লাফ দিয়ে ধরে ঝুলতে ঝুলতে চিৎকার করে—হুঁশিয়ার! হুঁশি....

হঠাৎ একটা বিরাট শব্দে দূরের আলের মাথা থেকে চাইলাম—মামা তখন ডাল ধরে ঝুলছে জলার উপরে, আর সরবনে তখনও কোন জন্তুগুলো দৌড়াদৌড়ি করছে ওই চিৎকারে, আর হিজলের পলকা ডালটা গোলকমামার গুরুভার সহ্য করতে না পেরে মড়াৎ করে ভেঙে পড়েছে, আর গোলকমামার ভারী শরীর ওই ধড়াচূড়া সমেত কাদাজলে আছড়ে পড়েছে সশব্দে।

আমিও ঘাবড়ে গেছি। জঙ্গল থেকে সেই জানোয়ার দু-একটা বের হয়ে এসেছে। গোলকমামা কাদাজলে হাবুডুবু খাচ্ছে। আর বনে চরছিল কয়েকটা ছাগল, তারা বের হয়ে এসে গোলকমামার কাদামাখা অবস্থা দেখে নিজেদের মধ্যে দাড়ি নেড়ে বিজাতীয় ভাষায় যেন ব্যঙ্গ করে—ব্যা—ব্‌ ব্যা!

গোলকমামা তখনও চিৎকার করছে—হুঁশিয়ার, ওয়াইল্ড বোর সমী! ফায়ার!

ওই ধমকে ছাগলগুলো ঘাবড়ে গিয়ে দৌড় লাগাতে আমি এগিয়ে গিয়ে গোলকমামাকে ডাকতে থাকি। কাদার পুলটিসে দেহ ঢেকে গেছে, সেও ছাগলগুলোকে দেখে বলে—দেখলি, কেমন পালালো, ওদের আর মারবো কি? চল।

কথাটা আমিও শহরে ফিরে জানাই না। শুধু খবর রটে গেল বনশুয়োরের দল গোলকমামার গায়ের বারুদের গন্ধে নাকি ওই এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে।

বাবা তবু শুধোন—কটা বন্য বরাহ মারলে গোলক?

মা-ই ওর হয়ে জবাব দেয়—থাকলে তো মারবে। বনের জানোয়ারও বুঝতে পারে কে কেমন শিকারী। তাই ভয়েই দেশান্তরী হয়ে গেছে তারা।

আমারও গোলকমামাকে খুশী রাখা দরকার, তাই বলি—

—তাই সত্যি মা। কোথায় বনশুয়োর! সব পালিয়েছে।

বাবা জবাব দিলেন না।

মা-ই কথাটা বৈকালে বাবা কোর্ট থেকে ফিরে এলে জানায়—

—সমী দিনকতক কলকাতায় যাক্। পরীক্ষা হয়ে গেছে যদি কলকাতাতে পড়তে হয় তবে শহরটাকে চেনা দরকার। গোলকের সঙ্গে যাক।

—ওর সঙ্গে যাবে? বাবা যেন ঠিক ভরসা করতে পারেন না।

মা বলে—বড়দা, মণ্টু, মিঠু-মা ওরা আছে। ওদের সঙ্গেই বেড়াবে।

বাবা বলেন—তবু শিবুকে চিঠি দিয়ে দিই।

অর্থাৎ বড়মামাকেই আমার ভার দিতে চান তিনি। গোলক-মামাকে ভরসা করতে চান না।

গোলকমামা সামনে হিজল গাছের ডালটাই লাফ দিয়ে ধরে... [পৃ. ২৬

আমি অবশ্য যেতে পারলেই খুশী। তাছাড়া গোলকমামার সাহায্য দরকার হবে। তাই জানাই—

—গোলকমামার সঙ্গে যাচ্ছি, কোন অসুবিধে হবে না।

ইয়ং বুলেটস্ ক্লাবেও কথাটা রটে গেছে। গোবরা—মণিলাল অন্যান্য বন্ধুরাও এসেছে। গোবরা বলে—

—এবার পি-কে, চুনির কাছে ট্রেনিং নিয়ে তৈরী হয়ে আয়, তারপরা দেখা যাবে এবার ইয়ং বুলেটস্‌কে হারায় কোন ব্যাটা। শিল্ড নিতেই হবে।

গোলকমামাও ভরসা দেন কিছুদিন কোচিং নিলে ফর্ম একেবারে বদলে যাবে।

কলকাতা আমাকে নোতুন করে গড়ে দেবে। যেন কোন তীর্থে চলেছি। আমার কাছে কলকাতা স্বপ্নরাজ্য, ময়দানের মধ্যে ফুটবল খেলছি। বন্ধুদের কথায় জানাই—

—কিছু নিয়ে ফিরবো।

গোলকমামাই আমার তীর্থগুরু। গোলকমামার সঙ্গেই ট্রেনে উঠলাম। মা দই-এর ফোঁটা দিয়ে আশীর্বাদ করেন। বাবা বলেন—

—সাবধানে থাকবি!

গোলকমামা বলে—তোমাদের বড্ড ভয় মানিকদা। কবিগুরু বলেছেন—দাও সবে গৃহছাড়া—লক্ষ্মীছাড়া করে। ওকে মানুষ করে দোব দেখবে।

মানুষ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গোলকমামা কলকাতায় এনেছে। অনেকদিন পর মামার বাড়িতে এসেছি। দিদিমা-বড়মামা-মাসীমা-মাসতুতো ভাই মণ্টু, ছোটবোন মিঠুও এগিয়ে আসে। মামীমা বলেন—ওমা, কতো বড় হয়েছিস রে সমী। এইটুকু দেখলাম তখন—

আমি আরও বড় হবার জন্য এসেছি মামীমা এটা জানে না। মণ্টু মিঠুদের ঘরে ক্যারাম-ব্যাগাটলি-লুডো রয়েছে। আমার ওসব ভালো লাগে না। আমার মন পড়ে আছে ময়দানের দিকে। পি-কে, চুনি, মেওয়ালাল—এরা সবাই খেলার কোচিং দেন, ওদের কাছে যেতে হবে।

এর মধ্যে মণ্টুকে ভেলপুরী ফুচকা খাইয়ে দু একদিন ময়দানের খোলা গ্যালারি ঘেরা খেলার মাঠগুলো দেখে এসেছি, সেদিন অবাক হই। মাঠে হাজার হাজার লোক কি খেলা চলেছে। ওদের চিৎকার শোনা যায়, নিপুণ গতিতে বলটাকে নিয়ে চলেছে, কলরব ওঠে।

আমাকে ভাগ্যবান বলেই ভাবি, রেডিওতে এই খবর শুনি। আজ সেখানে নিজেই হাজির হয়েছি। দু'চোখ মিলে খুঁজছি চুনি পি-কে. ওদের।

মণ্টু বলে—এবার চল, কেটে পড়ি, ইঁট পড়বে।

মাঠে ততক্ষণে দর্শকদের দু'চারজন প্লেয়ারদের তাড়া করেছে। নিজেদের মধ্যেই মারপিট বেঁধে গেছে। কোনরকমে বের হয়ে এলাম। তবু খেলার নেশাটা মুছে যায়নি।

প্রতিদিনই ভাবি আজ গোলকমামা হয়তো খবর আনবে, চুনির কাছে যেতে হবে। কিন্তু তার লক্ষণও দেখিনি।

তাই গোলকমামার ঘরেই সেদিন গিয়ে হাজির হই। দরজার বাইরে থেকে কি একটা উত্তেজিত কণ্ঠে আলোচনা শুনে দাঁড়ালাম। একটা তানপুরা নামানো রয়েছে। একটা সিটকে লম্বা চুলওয়ালা লোক তবলায় টুং টাং চাঁটি মারছে আর গোলকমামা চোখ বুজে বমি করার মত অনর্গল ওয়াক্ ওয়াক্ গল গল্ল—রকমারি আওয়াজ তুলে চলেছে।

গোলকমামা যে এমনি বিকট কাণ্ডও করে তা জানা ছিল না। আমাদের শহরের মুরলীবাবুর মতই বমি করে তা জানা ছিল না। তাই দিদিমা কাল গজগজ করছিল বড় মামার সামনে।

—কি করে কে জানে? গোল্‌কা দিনরাত ওই গাঁক্ গাঁক্ করছে আর ওস্তাদের পেছনে ঘুরছে। তুই ওকে দোকানে যেতে বল। ওই সবই অকাজ করবে শুধু?

বড়মামা বিরক্ত হয়ে বলেন—ওই গোলককে আমি কি বলবো। যা হয় তুমিই বল মা? দায়িত্ব বলে কিছু নেই ওর।

গোলকমামা আমাকে দেখে বলে—

—কি রে? এখানে কেন?

এ যেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। আমি ওর উপর ভরসা করে কলকাতায় এসেছি, গোলকমামা আমাকে মানুষ করে দেবে, খেলার জগতে চান্স পাবো। তা মামা স্রেফ ভুলেই মেরেছে। তাই বলি—কদিন কেটে গেল, চুনি-পি-কের কাছে ট্রেনিং নেবার ব্যবস্থা করে দেবেন বলেছিলেন।

আমার কথায় গোলকমামা যেন আকাশ থেকে পড়েন।

—মানে, ওই খেলার ব্যাপার! ইঁট পাটকেল খাওয়ার ব্যাপারে কি বলেছিলাম? হঠাৎ খেয়াল হতেই শুধরে নিয়ে বলেন—ও চুনি-র কাছে নিয়ে যাবার কথা, না? ক'দিন ওস্তাদজীর প্রোগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি। তবু! ঠিক আছে। কালই সকালে চল, গতিলালকে বলে ওর কাছে পাঠিয়ে দোব, পি-কে.র কাছে নিয়ে যাবো। কালই সকালে।

আমি লাফাতে লাফাতে বের হয়ে এলাম, কাল সকালেই তাহলে এত দিনের প্রতীক্ষা সফল হবে। গোলকমামার উপর শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। মণ্টু বলে—এত খুশি! কি ব্যাপার রে?

আমার চোখের সামনে তখন ছবিটা ভেসে ওঠে। ময়দানের ঘেরা ম্যাঠে আমি ড্রেস করে প্র্যাকটিস করছি। চুনি-পি-কে আরও কতো তাবড় প্লেয়ারের সামনে। ওদের পা থেকে বল কেড়ে নিয়ে চলেছি গোলের দিকে। হাততালির শব্দ ওঠে।

শহরে ফিরে গিয়ে ইয়ং বুলেটস্ রাইট ইন সমীর খেলা দেখে শহরের লোক অবাক্ হয়ে যাবে।

মণ্টুকে ও কথাটা জানায় না। এসব সাধনার ব্যাপারে ফট্ করে কোন কথা কাউকে জানাতে নেই।

রাত কেটে যায় স্বপ্নের ঘোরে। আমি মণ্টু এক খাটে শুই। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কখন জানি না। আমি ফিরে গেছি মাঠে, পায়ে বলটা এসে পড়েছে, আমিও 'ডজ' করে কাটিয়ে বল নিয়ে চলেছি—চিৎকার—কলরব উঠছে, একজন ব্যাক এগিয়ে আসছে, সামনে গোলপোস্ট, তার আগেই কিক্ করেছি, বলটা নেটে লেগেছে।

—এ্যাই। সমী! লাথি মারছিস কেন?

চোখ মেলে দেখি মণ্টু উঠে পড়েছে আমার লাথির চোটে। আমারও খেয়াল হয়। স্বপ্নই দেখছিলাম। রাত ভোর যেন স্বপ্নই দেখছি।

তবু সকালে উঠে কাউকে কিছু না বলে কিডব্যাগ নিয়ে বের হই, মাঠে দরকার হলে ড্রেস করে ট্রেনিং নিতে নামতে পারবো। বাড়ির অনেকে বেলা অবধি ঘুমায়। মণ্টু মিঠু উপরে পড়ছে। বড়মামা বাইরের ঘরে কাগজ নিয়ে ব্যস্ত। ব্যবসার কাজে ওঁকে ডুবে থাকতে হয়।

আমি এই ফাঁকে সটান বের হয়ে পার্কের ধারে এসে হাজির হয়েছি, গোলকমামা ভোরে পার্কে এসে ডন বৈঠকি দেয় আখড়ায়। গোলকমামা অবশ্য আজ কথাটা ভোলেনি। তাই আমাকে দেখে এগিয়ে এসে বলে—

—এসে গেছিস? চল।

সেই তবলচী লোকটাও ছিল ওর সঙ্গে। গোলকমামাকে সেইই বলে—

সকাল ন'টাতে কিন্তু। আজ তোড়ী গাইবেন উনি।

গোলকমামা কথাটা শুনে ঘাড় নেড়ে আমাকে নিয়ে এগোলো ট্রাম রাস্তার দিকে।

আমার চোখে তখন এতদিনের দেখা স্বপ্ন সার্থক হবার ছবি ফুটে ওঠে। সবুজ ঘাস-ঢাকা মাঠে ফুটবল এসেছে আমার পায়ে, সাঁ সাঁ করে দৌড়চ্ছি।

আমি নই, খেয়াল হয় ট্রামটা দৌড়চ্ছে, গোলকমামা বলে—এটুকু নামতে হবে এখানে। চুনির লোক আসবে—পি-কে কেও খবর দেব আজ যাচ্ছি বলে। নাহলে ওদের পাওয়া যাবে না, খুব বিজি কিনা।

পূর্ণ সিনেমার কাছাকাছি নেমে পড়ে গোলকমামার সঙ্গে চলেছি। একটা চা খাবাবের দোকানে এসে গোলকমামা চেয়ারে বসে বলে—

—একটু গরম কচুরি খেয়ে নিই, ততক্ষণে পানু এসে পড়বে। পানুকে চিনিস না? মোহনবাগানের সেক্রেটারীর ভাইপো। ভাবলাম—চুনির ট্রেনিং নে, তবে মোহনবাগানের ক্লাবের কর্মকর্তাদের সঙ্গেও জানপচান্ করিয়ে দিই। তারাও তোর খেলা দেখুক, যদি চোখে লাগে এই সিজিনেই হয়তো চান্স মিলে যাবে।

আমি তো গ্যাস ভরতি বেলুনের মত উড়ছি হাওয়ায়। ততক্ষণে বড় প্লেটে করে গরম কচুরি তরকারি এসে গেছে, হিংএর সুঘ্রাণ উঠছে। গোলকমামার দশাসই শরীর, মেজাজটাও তেমনি শরিফ্। তাই ওই কচুরির পর এল গরম অমৃতি। গোলকমামা বলে—

—রাজভোগ, কমলাভোগ এদের স্পেশালিটি। তোদের শহরের জিনিসের তুলনায় এদের জিনিস অনেক ভালো। কই হে, দাও দুটো করে রাজভোগ, দুটো করে কমলাভোগ—

আমি বাধা দেবার চেষ্টা করি—এত খেতে পারবো না।

গোলকমামা ধমকে ওঠে—খেলতে গেলে খেতে হবে, ক্যালরি চাই—বাড়তি ক্যালরি। নে—

ততক্ষণ বড় প্লেটে ওই বাহারি সাইজের রাজভোগ কমলাভোগ এসে গেছে। গোলকমামা গবাগব্ মুখে পুরে হঠাৎ ঘড়ির দিকে চেয়ে একটু ব্যস্ত হয়ে বলে—ইস্, সাড়ে নটা বাজে, আমি এখুনি আসছি সমী, পানু এখনও এল না। দেখি—ধরেই আনি ওকে। তুই বস। ওহে বয়—

বয়টা এসে গেছে। গোলকমামা বলে—

—একে দুটো টোস্ট সন্দেশ আর এক ভাঁড় দই দাও, ফ্রিজ থেকে বের করে দিও। সমী, তুই ধীরে সুস্থে খা, আমি এলাম বলে।

গোলকমামা আমাকে দোকানে রেখে বের হয়ে গেল কোন্ পানুবাবুর সন্ধানে।

আর আমিও কাসাব্লাঙ্কার মত সেই জ্বলন্ত জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আছি গোলকমামার পথ চেয়ে। ঘড়িটা কিন্তু বসে নেই। সে একটার পর একটা ঘর টপ্‌কে চলেছে। গোলকমামা বেপাত্তা। হঠাৎ কার খ্যানখেনে গলার শব্দে চাইলাম। মোটা গোলমত দেহ, বার্নিশ করা কালো রং, লোকটার গোল পিপের মত পেটের উপর টিকটিক করছে ফতুয়া, ভুঁড়ি ঢেকেছে মাত্র আধখানা। বাকী আধখানা বের হয়ে চলেছে আগে আগে। ওইই দোকানের মালিক বোধ হয়। ফাটা কাঁসরের মত গলার বাদ্যিতে ঝংকার তুলে বলে—দিনভোর বসে থাকবে নাকি হে ছোকরা? দামটা দাও—ষোল টাকা আট আনা।

বেলা বারোটা বাজে প্রায়। আমি চমকে উঠি—গোলকমামা দেয়নি?

লোকটা ফ্যাঁচ করে ওঠে—এ্যাঁ। এ যে মামা ভাগ্নের কারবার দেখছি। মামা তো পগারপার। বের করো টাকা—তখন তো এন্তার সেঁটেছো। এ্যাই মতি—

আমি জানাই—টাকা তো সঙ্গে নেই। মামার বাড়ি থেকে এনে দিচ্ছি।

উঠে বের হতে যাবো, সেই মোটা লোকটাই আমার হাতটা খপ্ করে ধরে একটানে পাকসাট খাইয়ে সামনে দাঁড় করিয়ে বল্লে—

—সটকাবার তাল। ঢের দেখা আছে—চোর কোথাকার।

আমি এভাবে অপমানিত হবো ভাবিনি। তাই গর্জে উঠি—গায়ে হাত দেবেন না? চুরি করিনি। হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা করতেই—

—ফের চোপা। লোকটা হাত ছাড়িয়ে সোজা মুখেই একটা থাবড়া বসিয়েছে আমার, আর আমিও বেতালা ছন্দে ছিটকে গিয়ে দোকানের ওপাশে রাখা একটা রসগোল্লার কড়াই-এ পড়েছি। হাতে লেগে একটা দই এর হাড়ি ভেঙ্গে গিয়ে মাথায় চোখে মুখে পুলটিশের মত জমে গেছে। দই রসগোল্লা রাজভোগ খেতে মিষ্টি, কিন্তু তার কড়াই-এ পড়ে যে কোমর টনটনিয়ে ওঠে, চোখে লাগলে জ্বালা করে—এসব জানা ছিল না। লোকটা আর সেই বয় দোকানের এত বড় ক্ষতি দেখে তখন আমাকে সেই অবস্থাতেই তুলোধোনা শুরু করেছে। চোখ চাইবার সাধ্য নেই, হাঁড়ির আধখানা মাথায় চেপে বসেছে, আর সর্বাঙ্গ রসগোল্লার রস মাখানো অবস্থায় বেধড়ক ঠেঙ্গিয়ে নাক কপাল ফাটিয়ে রক্তারক্তি করে তুলেছে। লোকজনের ভিড় জমে গেছে।

কে বলে—পুলিসে দ্যান ওগো।

অবশ্য তার আগেই দোকানদার সেই ব্যবস্থাই করেছে, পুলিসে দেবার আগে আমাকে তৈরী করেই দেবে আর কি। পালাবার পথ নেই—বয় আর মালিক তখন আমায় নিয়ে লোফালুফি করছে। এমন সময় পুলিস ভ্যানটা এসে গেছে।

সমারোহ করে আমাকে ওই বিচিত্র অবস্থায় তোলা হচ্ছে, হাঁটার কায়দা নেই। কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠি, হঠাৎ কার ডাক শুনে চমকে উঠি। বিশ্বাস করতে পারি না যে বড়মামা এখানে এই সময় এসে পড়বেন। গাড়ি নিয়ে দোকানে চলেছেন তিনি বড়বাজারে, পথের ধারে ভিড় আর আমাকে ওই দই সন্দেশ মাখা হাঁড়ি মাথায় বিচিত্র অবস্থায় দেখে এগিয়ে এসেছেন।

—দিনভোর বসে থাকবে নাকি হে ছোকরা? [পৃ. ৩১

—কি ব্যাপার হে সূদন?

দোকানদার মামাকে চেনে। তাই বলে— দেখুন বড়বাবু, খেয়ে দেয়ে ষোল টাকা মেরে পালাবার তালে ছিল। কি ক্ষতি করেছে দেখুন স্বচক্ষে।

বড়ামামা কিছু বলার আগে কান্নাভেজা স্বরে জানাই—

—গোলকমামা এনে খাইয়ে দাইয়ে কোথায় চলে গেল, আর আমাকে ধরে দোকানদার এইভাবে মেরেছে।

বড়মামা বলে ওঠেন—সে কি! তুই আমার নামও করিসনি?

—সময় দিলে কই? ধরেই শুরু করলো ঠ্যাঙ্গাতে। ওরাই তো ছিটকে ফেললো আমাকে ওই কড়াই-এ।

লোকজন এইবার অন্য কথা বলে— দোকানদারগুলোই এমনি...এইভাবে খোঁজখবর না নিয়ে মারধোর করবে?

কে বলে—ধরাকে সরা দেখছে। এইটুকুন সন্দেশ আটআনায় বেচে এন্তার পয়সা করেছে, তারই গরম!

বড়মামা পুলিস অফিসারকে বলে ব্যাপারটার ফয়সাল্লা করে, আমাকে কলের জলে রসমুক্ত করে ভিজে অবস্থায় গাড়িতে তুলে বাড়ি আনতে দিদিমা—মামীমা অবাক হয়—ওমা। এ কি হাল হয়েছে রে? হাঁটুটা কেটে গেছে, হাতগুলো রক্তাক্ত, কপালের কাটা দিয়ে রক্ত ঝরছে।

ডাক্তারবাবু এসে এ-টি-এস ইনজেকশন আরও ওষুধ দিয়ে এখান ওখানে ব্যাণ্ডেজ করে বলেন— সাত দিন কমপ্লিট রেস্ট নিতে হবে।

দুপুর গড়াতে ফিরছে গোলকমামা। ওর তুম তুম্ রেওয়াজের শব্দ ওঠে। হাত ঘুরিয়ে গোলকমামা তখন কি সুর ভাঁজছে। দিদিমাকে দেখে বলে ওঠে—

—সরফরাজ খাঁ একটা জবরদস্ত গাইয়ে মা। টপ ফর্মে—ধৈবত থেকে পঞ্চমে গলা তুলে বিস্তার করছে, আর চক্রধর যা করলো না?

দিদিমা গর্জে ওঠে—পরের ছেলেটাকে খুন করাতিস আজ তুই মুখপোড়া? ছি ছি, কি লজ্জা। মানিক লতুর কাছে এখন কি বলবো আমি? কলকাতায় পাঠালো আর তুই কিনা—

গোলকমামার এতক্ষণে খেয়াল হয় আমার কথা। এতক্ষণ কোন ওস্তাদের গানের রাজ্যে গিয়ে ডুব দিয়েছিল। গোলকমামা জানলা দিয়ে ওই ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় আমাকে কাৎরাতে দেখে চমকে ওঠে—তাই তো! বড্ড ভুল হয়ে গেছল। তা এই ফর্মে এনেছে তোকে মাঠে?

মামীমা বলেন—দোকানদার মেরেছে। মিষ্টির দোকানদারকে দাম দিয়ে যাওনি।

গোলকমামার এবার মনে পড়ে কথাটা। কিন্তু পরক্ষণই বলে ওঠে—

—ওসব ম্যানেজ হয়ে যাবে সমী, ঘাবড়াসনে। শহীদ বানিয়ে দেব তোকে।

দিদিমা গজগজ করেন—তুই থাম তো। আর ম্যানেজ করতে হবে না তোকে। ছিঃ ছিঃ!

অবশ্য গোলকমামা ম্যানেজ করেছে কিছুটা। কলকাতা থেকে তৈরী হয়েই ফিরছি, তখনও পায়ে ব্যাণ্ডেজ, হাতটা কাঁধের সঙ্গে ঝোলানো। কপালে পট্টি। স্টেশনে দেখি ইয়ং বুলেটস্ ক্লাবের গোবরা, মতিলাল, নন্দ—শহরের আরও অনেকে রয়েছে ফুল-মালা নিয়ে। আমাকে অভ্যর্থনা জানায় ওরা।

গোবরা বলে—সাবাস। খেলতে গেলে কলকাতায়—এমন ইটপাটকেল দুচারখান খেতেই হবে। তবে গোল দিছস ব্যস। কাম ফতে।

কে চিৎকার করে—সমী বোস—জিন্দাবাদ।

এরা জানে আমি নাকি কদিন ট্রেনিং নিয়ে ময়দানে একটা টিমের হয়ে খেলতে নেমে বিপক্ষ দলকে গোলের পর গোল দিয়েছি। তারপর সেই দলের সাপোর্টাররা আমাকে ধরে মেরামত করে ছেড়েছে রাগে। খবরটা গোলকমামাই এখানে রটিয়ে আমাকে বীরের সম্মান দিয়ে পাঠিয়েছে।

গোবরা বলে—একটু 'ফিট্ হই' ল। তারপর দেখবো ওগোর, চুনি পি-কের ট্রেনিং দিয়া একখান বাঘের বাচ্চারে কলকাতা থনে আনছি।

ওরা গাঁদা ফুলের মালা চড়িয়ে কাঁধে করে জয়ধ্বনি দিয়ে শহরের বীর সন্তানকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। বলবারও কিছু নেই।

এর পর থেকে গোলকমামার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধই রাখিনি।

—রাজকুমার মৈত্র

এক

চল, চল, চল—
ঊর্ধ্বগগনে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরণীতল—
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চলরে চলরে চল—

বেরমো রেল স্টেশন মুখর হয়ে ওঠে আমাদের নবরত্নের সম্মিলিত সতেজ কণ্ঠস্বরে।

সহকারী স্টেশনমাস্টার অমূল্য চক্রবর্তী বরাবরের অম্বলের রুগী, খিটখিটে মেজাজের। আমাদের কণ্ঠস্বর কানে যেতেই বিরক্তিতে তাঁর তোবড়ানো মুখখানা আরও তুবড়ে গেল। চোঁয়া ঢেকুর তুলে ঢলঢলে কালো কোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে তিনি আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

আমাদের কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ। একটানা ছুটি কাটাতে আমরা নজন বন্ধু যে যার স্কুল বোর্ডিং ছেড়ে একই তারিখে এসে পৌঁচেছি গোমো স্টেশনে। ওটাই ছিল আমাদের 'মিলন ক্ষেত্র'। আমি আর কেবু যেতাম কলকাতা থেকে। অরুণ আসত আসানসোল থেকে। নাড়ু, ঝাণ্টু, ফণি আসত উখরা থেকে। ধনু, ত্রিদিব আর সাধন বাঁকুড়া থেকে আসত।

মোট কথা ছুটি শুরু হবার অনেক আগে থেকে আমরা চিঠি মারফত ঠিক করে নিতাম কবে কখন কোথায় আমরা মিলিত হবো। বলা বাহুল্য, গোমো স্টেশন ছিল আমাদের একমাত্র 'মিলন ক্ষেত্র'। তখন তো আজকের মত 'বাসরুট' ছিল না যে, ধানবাদে নেমে বাসে চেপে চাষঘুরে দিনে দিনে কারগলি কোলিয়ারিতে পৌঁছে যাব। তখন ঐ একটিমাত্র পথেই আমাদের যাতায়াত করতে হতো। সুতরাং—

যাক, এবার সেদিনের ঘটনায় আসা যাক।

আমাদের কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ ছিল না। কুলীর মাথায় বাক্স-বেডিং চাপিয়ে আমরা নজনে গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে প্ল্যাটফর্ম ধরে এগিয়ে চলেছিলাম।

গেটের মুখে পথ আগলে দাঁড়ালেন অমূল্য চক্রবর্তী।

—টিকিট—

আমরা গান বন্ধ করলাম।

ত্রিদিব বললে,—কি কইলেন অমূল্য কত্তা, আবার কন—

অমূল্য চক্রবর্তী মুখ বেঁকিয়ে চড়াসুরে বললেন,—শুনতে পাচ্ছ না। টিকিট চাই টিকিট—

ত্রিদিব আকাশ থেকে পড়ল যেন,—টিকিট, টিকিট কি বস্তু। অ হাবু, আরে অমূল্যদা কয় কি।

আমি বললাম,—আমাদের আবার টিকিট কিসের। আমরা পাস-এ যাতায়াত করি।

অমূল্য চক্রবর্তী ভ্রূকুটি করে বললেন,—পাস দেখাও। গাড়ি থেকে নেমে গান গাইতে গাইতে যাওয়া চলবে না। কাউণ্টার সাইন করাতে হবে—

বলেই তিনি চোঁয়া ঢেকুর ওগড়ালেন।

ত্রিদিব বললে,—বুঝছি, কাল রাত্রের 'মেনু' হজম হয় নাই।

অমূল্য চক্রবর্তী ধমকে উঠলেন,—কি বললে?

ত্রিদিব ঢেকুর তুলে বললে,—বদহজম হইসে—

—হ্যাঁ হয়েছে, তাতে তোমার কি হে ফাজিল ছোকরা?

অরুণ ফুট কাটল,—ডেঁপো ডেঁপো—

নাড়ু বললে,—ফক্কাগিরি হচ্ছে। চোঁয়া ঢেকুর নিয়ে ফক্কুরি। দেখছিস না, চোঁয়া ঢেকুর তুলে তুলে অমূল্য কত্তার চেহারা কেমন তুবড়ে গেছে!

অমূল্য চক্রবর্তী কি যেন বলতে গিয়ে আবার ঢেকুর তুললেন।

ধনু নাক টিপে বললে,—গন্ধ। নিন দাদা, পাসগুলো তাড়াতাড়ি সই করে দিন। চোঁয়া ঢেকুরের গন্ধ আমার সহ্য হয় না।

অমূল্য চক্রবর্তী রাঙ্গা হয়ে উঠলেন। মনে মনে বুঝি লজ্জাও পেলেন। চটপট পাসগুলো সই করে বললেন,—তোমরা প্রত্যেকবার আইন অমান্য করো। নিয়ম হচ্ছে 'ডেস্‌টিনেশনে' পৌঁছে পাস কাউন্টারে সই করানো, বুঝেছ—?

ত্রিদিব বললে,—অহন বুঝ্ছি শুধু চোঁয়া ঢেকুর নয়, আপনের প্যাটের অবস্থাও খারাপ। লিকুইড বারাইত্যাছে তো—?

অমূল্য চক্রবর্তী খাপ্পা,—দেখ হে ছোকরা দ্বিতীয়বার যদি আজে বাজে কথা বলেছ—

—থামেন থামেন কত্তা। রাগ করবেন না। অহন মহাযুদ্ধ চলত্যাছে। রাগ করলেই মুণ্ডপাত অনিবার্য।

রাগে অমূল্য চক্রবর্তী কাঁপতে কাঁপতে বললেন,—নাচ্ছাড়, পাজী হতচ্ছাড়া তুমি আমাকে মুণ্ডপাতের ভয় দেখাচ্ছ?

কথাটা বলেই তিনি ঢেকুর তুললেন—হেউ-উ-উ—

নাড়ু সঙ্গে সঙ্গে বললে,—এটা ঢেকুর নয়, উদ্গার।

অরুণ বললে,—ব্যামো—ব্যামো। সোডি বাই-কার্ব, দিনে চারবার—

সাধন বললে,—সেই সঙ্গে গাঁদাল পাতার রস—

কেবু বিরক্ত হয়ে সকলকে থামিয়ে দিয়ে বললে,—কি হচ্ছে কি। তোদের ডাক্তারী করতে কে বলেছে। সব জায়গায় ফাজলামি ভাল লাগে না। চলে আয়—

নাড়ু চোখ টিপে ইশারা করতে আমরা আটজনে একসাথে ঢেকুর তুললাম।

ব্যাস আর যাবে কোথায় অমূল্য চক্রবর্তী রাগে ফেটে পড়লেন,—তবে রে ছুঁচোর দল, আমার সঙ্গে ফিচলেমী। আজ তোদের সবকটাকে খুন করবো—

বলেই তিনি ধাঁ করে কোটের পকেট থেকে পেনসিল কাটা ছুরি বের করে বাগিয়ে ধরলেন। তালপাতার সেপাইয়ের মত চেহারা হলে কি হবে তাঁর কোটরগত চক্ষুজোড়া তখন ভাঁটার মত জ্বলছিল। হয়তো সেদিন একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটে যেত, কিন্তু তার আগেই আমরা শুনতে পেলাম বজ্রকণ্ঠের হুঙ্কারধ্বনি, অথবা নিনাদ বলা যেতেও পারে,—ওয়া গুরুজীকী ফতে—

আমরা সবাই চমকে উঠেছিলাম! এমন কি অমূল্য চক্রবর্তীও কেমন যেন দমে গিয়েছিলেন।

মুহূর্তের ঘটনা।

কোথা থেকে কি হয়ে গেল! দেখলাম বেঁটেখাটো গোলগাল ফুটবলের মত চেহারার একটা মানুষ বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটে এসেই অমূল্য চক্রবর্তীর হাত থেকে ছোঁ মেরে পেনসিল কাটা ছুরিটা ছিনিয়ে নিল।

আমরা হতভম্ব।

তারপরেই দেখলাম, আগন্তুক আর কেউ নয়, আমাদের চিরপরিচিত বগলামামা দি গ্রেট।

আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিলাম,—বগলামামা আপনি?

অরুণ—আইরে বাপ!

নাড়ু—কি টাইমিং জ্ঞান মাইরী—

ত্রিদিব—হালায় এতক্ষণ কৈ আছিল?

ধনু—গট্ আপ নয় তো—

ফণি—নাটক নাটক—

কেবু—বাঁচাল—

সাধন—ব্যপস—

ঝাণ্টু—কি ব্যাপার বলতো বগলামামা, এখনও পোজ মেরে দাঁড়িয়ে রইল কেন? হাততালি না দিলে নড়বে না নাকি রে?

ঝাণ্টু মিথ্যে বলেনি। পেনসিল কাটা ছুরিটা ছিনিয়ে নিয়ে বগলামামা পোজ মেরে স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে রইল। একচুল নড়েনি। কেবল অমূল্য চক্রবর্তীর দিকে তাকিয়ে কয়েকবার ভ্রূ নাচালেন মাত্র। আমরা নজনের মন্তব্যেও কোন ফল হল না। অগত্যা আমরা একযোগে হাততালি দিতে বগলামামা দম ছেড়ে সেই অতি পরিচিত হাড় জ্বালানে সবজান্তার ওস্তাদি হাসিটা হেসে অমূল্য চক্রবর্তীকে বললেন—বুঝেছ চক্রবর্তীর পো, আমি চিল নই, তবু অনায়াসে চিলের মতই ছোঁ মারতে পারি। আমি খুনে নই, কিন্তু ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে তোমার পরাণ পাখির খাঁচাটা পুট করে ফুটো করে দিতে পারি। তুমি সাংঘাতিক অপরাধ করতে যাচ্ছিলে—
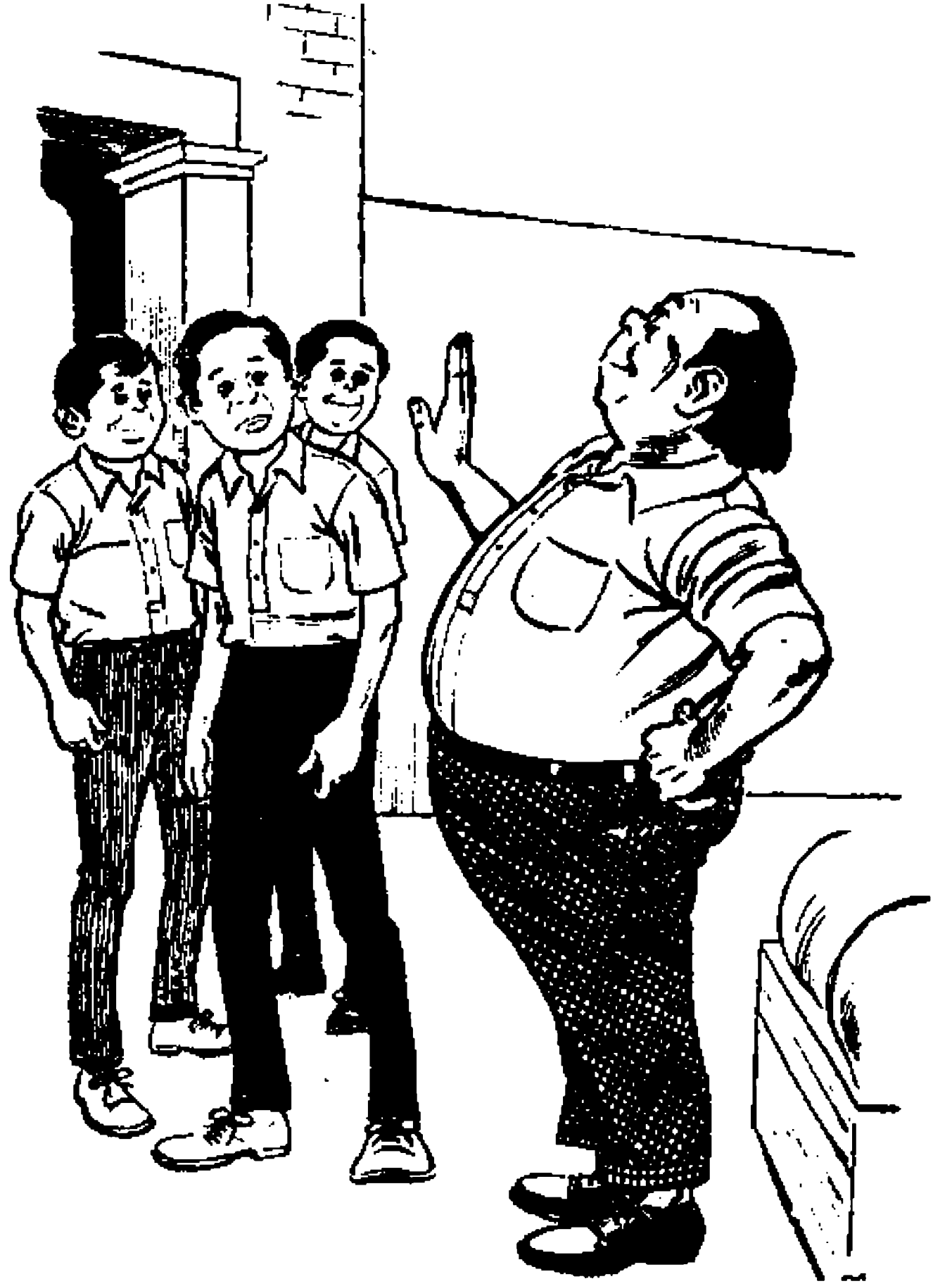
সেটা তোরা সহ্য করতে পারতিস্ না। [পৃ. ৩৮

অমূল্য চক্রবর্তী বললেন,—আপনি আমাকেই অপরাধী করলেন। অথচ এরা—।

আবার ঢেকুর তুলে মুখ বিকৃত করলেন তিনি। বগলামামা গম্ভীর হয়ে বললেন,—অমূল্য তুমি ছুটি নিয়ে কিছুকাল লাইম বেল্ট-এ কাটিয়ে এসো। নইলে ঢেকুর আটকে স্রেফ ফানুস হয়ে উড়ে যাবে। এই তোরা চলে আয়—জায়গাটা নিরাপদ নয়—

বগলামামা আমাদের নিয়ে স্টেশনের বাইরে এলেন। কুলীরা আমাদের মালপত্তর ততক্ষণে দুটো টাঙ্গাতে ভাগাভাগি করে তুলে দিয়েছে।

বগলামামার মুখের দিকে তাকাতে দেখলাম তিনি অস্বাভাবিক গম্ভীর। নাড়ু আমাকে খোঁচা মেরে ফিসফিস করে বললে,—শুরু কর। নইলে নিভে যাবে।

ফণী হাসল।

ধনু চোখ মারল।

ত্রিদিব বললে,—অ হাবু, বাতাস কুন দিকে বইতেসে দেখতো। দক্ষিণ-পশ্চিম নাকি পূর্ব-উত্তর—

আমি আর চুপ করে না থেকে হেসে বগলামামাকে বললাম,—আজ আপনি দেখালেন বটে। কি সাংঘাতিক টাইমিং জ্ঞান। কি গতি। মনে হচ্ছিল আমরা যেন রোনাল্ড কোলম্যানের ছবি দেখছি—

বগলামামা ভ্রূকুটি করলেন। বুঝি আড়চোখে আমাদের একবার দেখে নিলেন। তারপর ওস্তাদি হাসি হেসে সগর্বে বললেন,—এ তো কিছুই নয়। বিশেষণ বাদ দিয়ে স্রেফ তোদের গতি দেখালাম।

অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করি, বিশেষণ বাদ দিয়ে স্রেফ গতি?

—হ্যাঁ।

—বিশেষণ লাগালে কি হতো?

—বিদ্যুৎগতি। ইংরিজিতে যাকে বলে লাইট্‌নিং স্পিড। সেটা তোরা সহ্য করতে পারতিস না। সেবার বুয়োর যুদ্ধের সময়—

নাড়ু কাশল।

বগলামামা চুপ।

—নাড়ু— ?

—কি বগলামামা?

—কাশলি কেন?

—আলটাগ্‌রা সুরসুর করে উঠল।

—নুনজল কুলি করিস। সেরে যাবে।

ত্রিদিব বললে,—ডাক্তারী ঠিক হইল না মামু। বুয়োর যুদ্ধের নাম শুইন্যা নাড়ু কাশত্যাসে।

—নাড়ু, কথাটা সত্যি।

নাড়ু ঘাড় চুলকে বললে,—ওটা আমার বদ অভ্যাস হয়ে গেছে। বদলে ফেলতে হবে।

কেবু বিরক্ত হয়ে বললে,—রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফাজলামী ফক্কুরি আর ভাল লাগছে না। সবাই টাঙ্গায় ওঠো। অনেকখানি পথ যেতে হবে।

কেবুর কথায় বগলামামা সজাগ হয়ে বললেন,—কেবু ঠিকই বলেছে। সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। হাতে অনেক কাজ। ম্যাপ রিডিং, থট্ রিডিং, তারপর যেতে হবে মধ্যপ্রদেশের গহন অরণ্যে—উঃ ভাবলে সারা দেহমন শিউরে শিউরে উঠছে। গুপ্তধন, গুপ্তধন—

বগলামামা সহসা রহস্যময় হয়ে উঠলেন।

বিড়বিড় করে আরও কি যেন বলতে লাগলেন আমরা বুঝতে পারলাম না।

টাঙ্গায় উঠতে উঠতে ত্রিদিব প্রশ্ন করলে,—কিসের ধন কইলেন মামু?

বগলামামা মুখে আঙ্গুল তুলে ধমকালেন ত্রিদিবকে—চুপ কর স্টুপিড কোথাকার। টাঙ্গাওয়ালা যে আমাদের শত্রুপক্ষের স্পাই নয় তার ঠিক কি। বেফাঁস কিছু বললেই লাইফ ইন ডেনজার। মুখ বুজে ক্লাবে চল তারপর তোদের সব বলবো। ভেরী ভেরী কন্‌ফিডেন্সিয়াল ব্যাপার।

আমরা বেকুবের মত মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকি।

বাড়ি পৌঁছে, মালপত্তর নামিয়ে মা বাবা ভাইবোনদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে বগলামামার বাড়ি না পৌঁছান পর্যন্ত মনে এক ফোঁটা স্বস্তি ছিল না কারও। হঠাৎ যকের ধনের নাম উচ্চারণ করল কেন বগলামামা। এর মধ্যে কতটুকু সত্য আছে।

দারুণ অস্বস্তি নিয়ে আমরা দুভাই ছুটে গেলাম বগলামামার বাড়ি। দেখি আমাদের আগেই অন্যেরা পৌঁছে গেছে।

বগলামামা বেতের মোড়ায় বসে যেন ধ্যানস্থ।

আর নাড়ু, ফণি, ত্রিদিব, অরুণ, ধনু, সাধন আর ঝাণ্টু ওকে ঘিরে মেঝেতে বসে আছে।

আমি আর কেবু ঘরে ঢুকতে বগলামামা চমকে তাকালে। তারপরে ছোট্ট নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন,—এসেছিস। তোদের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

আমি আর কেবু ত্রিদিবের পাশে গিয়ে বসতে সে বললে,—দারুণ সাসপেন্স চলত্যাসে। মামু এইবার কন্, কিসের ধন পাইসেন। আর কেমন কইর‍্যা পাইলেন—

—মুখ্যু।

—কি কইলেন?

—তুই একটা গণ্ড মুখ্যু। সেই তখন থেকে কিসের ধন, কিসের ধন করে মরছিস কেন। আস্তে কথা বলতে পারিস না। কেউ শুনে ফেললে সব গুবলেট হয়ে যাবে।

অরুণ বললে,—বগলামামা ওমলেট বানাবো। গরম গরম পরটা আর ওমলেট—দারুণ জমবে কিন্তু—

—হোপলেস। কোথায় গুপ্তধন আর কোথায় ওমলেট। চুপ কর!

আমি অরুণকে থাবড়া মেরে বসিয়ে দিয়ে বগলামামাকে উসকে দিলাম,—এইবার বলুন বগলামামা। উই আর ভেরী ভেরী সীরিয়াস—

—হ্যাঁ। সীরিয়াস না হয়ে উপায় নেই। সারা দুনিয়ায় আপাততঃ নটা গুপ্তধন পাওয়া গেছে। দশ নম্বর গুপ্তধন বোধহয় আমার কপালেই নাচছে।

—সেকি!—আমি চমকালাম।

—আইরে বাপ!—অরুণ ফুট কাটল।

—কপালের ভিতরে না বাইরে, কুনখানে নাচত্যাসে মামু?—ত্রিদিব প্রশ্ন করল।

—ত্রিদিব, ফক্কিরি করিস না। উই আর ভেরী ভেরী সীরিয়াস।—নাড়ু ত্রিদিবকে ধমকে বগলামামার দিকে ফিরে প্রশ্ন করল,—আপনি গুপ্তধনের সন্ধান পেলেন কি করে?

বগলামামা বললেন,—এক সন্ন্যাসীর কাছে। ওয়া গুরুজীকী ফতে। ঘাবড়ে যাস না তোরা। ইদানিং আমি মাঝেমাঝেই হুংকার দিচ্ছি। ওটা গুরুদেবের নির্দেশ। যক্ষ পিশাচ অথবা দত্যিদানা আমার আশে পাশে আসতে সাহস করবে না।

কেবু বললে,—দয়া করে ব্যাপারটা আরও একটু খোলসা করে বলুন বগলামামা।

বগলামামা একটু হেসে বললেন,—বলছি রে বলছি। এত ব্যস্ত হোসনে। আমার ভেতরটা তোলপাড় করছে অথচ বাইরে কোন প্রকাশ নেই।

—প্রকাশ পাইলেই যে গুবলেট হইয়া যাইবো।

—ঠিক। এতক্ষণে তোর বুদ্ধি খুলেছে দেখছি। শোন তবে,—প্রায় দিন সাতেক আগে, ঠিক সন্ধ্যা নাগাদ আমি হঠাৎ কেন জানি না দামোদর নদের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। এলোমেলোভাবে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় শ্মশানের কাছে যেতেই দেখতে পেলাম এক সন্ন্যাসী ধুনুচি জ্বেলে বসে আছেন। মনে খটকা লাগল। পা টিপে টিপে কাছে যেতেই সন্ন্যাসী গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন,—বেটা হাম তুমারা লিয়ে বৈঠা হ্যায়। আও, সামনে বৈঠ।—এ কথা শুনে অবাক্ না হয়ে পারলাম না। ভয়ে ভয়ে সন্ন্যাসীর সামনে বসে পড়লাম। সন্ন্যাসী ঠাকুর মুচকি হেসে বললেন,—বেটা ইয়ে জনমকা পহলে তুম্ ছত্রপতি শিবাজীকা নম্বরী দোস্ত থে। উন্‌কা লুঠ কিয়া হুয়া সম্পত্তিকা দেখভাল্ করতে থে। উস্‌সময় তুম বহুৎ সম্পত্তি মধ্যপ্রদেশকা জঙ্গলমে ছুপাকে রাক্ষাথা। আউর হামকো বোলাথা দেখভাল্ করনেকে লিয়ে। বেটা, হাম্‌কা ওয়াখ্‌ৎ আ-গ্যয়া। হামারা বহুৎ উমর হো গ্যয়া। ইসিওয়াস্তে তুমহারা সম্পত্তিকা পাত্তা তুম্‌কো দেকর হাম্ হিমালয় যা কর দেহ্ রক্ষা করনে মাংতা। ইয়ে লো, ওহি সম্পত্তিকা ঠিকানা। ইয়ে কাগজমে হাম সব কুছ লিখকে রাক্ষা হ্যায়। যাও, তুমহারা সম্পত্তি লে আও আউর মজেসে ভোগ কর। নেহিতো তুম্‌হারা মুক্তি নেহি হোগা। ওয়া গুরুজীকী ফতে—

হুংকার ছেড়ে দ্বিতীয় কথা না বলে সন্ন্যাসী চলে গেলেন। প্রায় পনের মিনিট পরে হুঁশ আসতে দেখলাম আমি একা। কেউ কোথাও নেই। চারদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। কি করি। সোজা বাড়ি গিয়ে সন্ন্যাসী ঠাকুরের দেওয়া কাগজটা খুলে দেখি সেটা হচ্ছে একটা ম্যাপ। ম্যাপটা পাঠোদ্ধার করতে আমাকে মোটেই বেগ পেতে হয়নি। পরিষ্কার বাংলা হরফে লেখা আছে আমাকে কোথায় কোন্ জঙ্গলে যেতে হবে। কটা পাহাড় কটা পর্বত ডিঙ্গিয়ে নদীনালা পেরিয়ে কোন্ গুহায় গিয়ে হাজির হলেই গুপ্তধন বা যকের ধন আমার মুঠোয় আসবে। ব্যাস, তারপর দেখা যাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থামাতে পারি কিনা।

ত্রিদিব বললে,—কি কইলেন মামু, মহাযুদ্ধ থামাইবেন। যকের ধনে কয় টাকা পাইবেন শুনি—

বগলামামা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন,—টাকা নয় রে টাকা নয়, সোনা জহরত মণিমাণিক্য। যার দাম কোটি কোটি টাকা। এই যে মহাযুদ্ধ চলছে, স্রেফ টাকার জোরে। সুতরাং আমি যদি ধনকুবের হতে পারি তবে টাকার জোরেই যুদ্ধ থামিয়ে দেবো। যাকগে যাক্, তোদের সঙ্গে তর্ক করে অযথা সময় নষ্ট করবো না। হাতে এখন অনেক কাজ। বুঝলি, অনেক আয়োজন করতে হচ্ছে। মধ্যপ্রদেশের জঙ্গল, যে সে জঙ্গল নয়। সুতরাং আমার বন্দুক রাইফেল রিভলবার সবই যোগাড় করতে হচ্ছে। দু হাতে থাকবে বন্দুক আর রাইফেল, কোমরে ঝুলবে রিভলবার। বলা যায় না তো, গুপ্তধনের লোভে কত রকমের মানুষ পিছু নেবে। কত বিপদের সঙ্গে মুখোমুখি পাঞ্জা লড়তে হবে। বুঝলি, হাতের মুঠোর মধ্যে প্রাণ নিয়ে যাওয়া।...ইতিমধ্যেই কত রকমের খেলা

শুরু হয়ে গেছে। পরশু রাত্রে নাইট ডিউটিতে গিয়েছিলাম। সকাল ছ'টায় বাড়ি ফিরে দেখি—আমার অনুপস্থিতিতে কে বা কারা যেন ঘরে ঢুকে বাক্স-প্যাঁটরা তছনছ করে গেছে। চোর হলে নিশ্চয় টাকা পয়সা গ্যাঁড়া মারতো। কিন্তু কিছুতে হাত দেয়নি কেবল হাঁটকেছে। অর্থাৎ আমার দৃঢ় বিশ্বাস চোর এসেছিল গুপ্তধনের ম্যাপ-টা চুরি করতে—

আমরা রুদ্ধশ্বাসে শুনছিলাম।

বগলামামা থামতে প্রশ্ন করলাম,—চোর জানল কি করে যে আপনাকে এক সন্ন্যাসী গুপ্তধনের ম্যাপ দিয়ে গেছে?

বগলামামা বললেন,—তা তো জানি না। তবে মনে হচ্ছে কোন চোর অথবা একদল লোক সন্ন্যাসীর পিছু নিয়েছিল। ওরা হয়তো এককালে সন্ন্যাসীর চেলা অর্থাৎ কিনা শিষ্য ছিল। সেই সুযোগেই হয়তো সন্ন্যাসীর কাছে গুপ্তধনের কথা শুনে থাকবে। যাই হোক, চোর হোক বা ডাকাত হোক, আমাকে সাবধান থাকতেই হবে।

ফণি বললে,—ব্যাপার খুবই গুরুচরণ। বগলমামা, আমার মনে হয়, আপনার উচিত পুলিসে খবর দেওয়া। কারণ—

ফণিকে থামিয়ে দিয়ে বগলামামা বললেন,—এর মধ্যে কোন কারণ নেই ফণিবাবু। পুলিস যদি জানতে পারে আমার কাছে গুপ্তধনের ম্যাপ আছে, তাহলে আমার মাথায় চাঁটি মেরে ম্যাপ কেড়ে নেবে—

নাড়ু বললে,—অত সস্তা নয় বগলামামা। আপনার হকের ধন কেড়ে নিলেই হল। দেশে আইন নেই। কোর্ট কাছারি নেই—

বগলামামা হেসে বললেন,—তোরা ছেলেমানুষ, একটু বেঁকিয়ে বললে বুঝতে পারিস না। আরে পুলিস মানেই ইংরেজ। এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইংরেজ কোথায় না প্যাঁদানি খাচ্ছে। জার্মানী তো ইংলণ্ডে বোমা ফেলে ফেলে গোটা দেশটা ঝাঁজরা করে দিয়েছে। এদিকে নেতাজী সৈন্যসামন্ত নিয়ে একেবারে দোরগোড়ায় এসে রাম প্যাঁদানি দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। সুতরাং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হতে আর দেরি নেই। এই সময় যদি ওরা আমার গুপ্তধনের কথা জানতে পারে তবে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে? আর এ গুপ্তধন যে সে গুপ্তধন নয়—ছত্রপতি শিবাজীর লুঠ করা মাল—অর্থাৎ কিনা আওরঙ্গজেবের আমলের মাল। পৃথিবীর সেরা জিনিস। উঃ ভাবলেই আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে। এক একটা হীরে বোধহয় এক একটা আধলা ইঁটের মত। নারকোলের সাইজের চুনিপান্না, কিংবা হয়তো দেখবো দু হাজার সোনার তৈরী হাতি—উঃ না ভাববো না। শোন—আমি তোদের দুটো কারণে গুপ্তধনের কথা বলেছি। প্রথম কারণ হচ্ছে—আমার অনুপস্থিতিতে তোরা প্রচার করবি যে আমি দেশে গেছি বিয়ে করতে। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে—যদি কোন সন্ন্যাসী অথবা অন্য কোন লোক এ বাড়িতে আসে তবে তাকে ধরে রামধোলাই দিয়ে বলবি, সে যেন কস্মিনকালেও আর কোলিয়ারীতে পা না দেয়। ব্যাস এইটুকু উপকার তোরা করবি। তাহলেই আমি নিরাপদে গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারবো—

আমি প্রতিবাদের ঝড় তুললাম,—না না কখনই না। আমরা নজন বন্ধু থাকতে আপনাকে কখনই একা গুপ্তধন উদ্ধার করতে পাঠাতে পারবো না। এতে আপনি রাগই করুন আর নাই করুন। আমরাও আপনার সঙ্গে যাবো—

ত্রিদিব বললে,—হাবু ঠিকই কইসে। আপনার লগে আমরাও যামু। হালায়, কপালে দুঃখ থাকলে আমরাও দুঃখ পাইবো।

—ত্রিদিব।

—কি হইল—

—তুই ইতিমধ্যে দুবার বিশেষণ ব্যবহার করেছিস।

—হালায় আমাগো ভাষাটাই যে বিশেষণে ভরতি। যাউক, ক্ষমা কইর‍্যা দেন, আর কমু না হালায়—

নাড়ু বললে,—তাহলে কি ঠিক করলেন বগলামামা। আমরাও যাচ্ছি তো—

ফণি বললে,—একশোবার যাচ্ছি। নইলে আমাদের যা পেট আলগা হয়তো করবেট সাহেবের সামনেই বলে ফেলবো গুপ্তধনের কথা।

বগলামামা লাফিয়ে উঠলেন সে কথা শুনে,—তাহলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। করবেট হচ্ছে জাতে স্কটিশ—ওরে বাবা ওরা দারুণ লোভী আর কঞ্জুস হয়।

উত্তেজিত হয়ে বগলামামা উঠে দাঁড়াতেই অরুণ বেতের মোড়াটা সরিয়ে নিয়েছিল। ধনু সেটা লক্ষ্য করে বেশ গম্ভীর হয়ে বগলামামাকে বললে,—আপনি অযথা কেন উত্তেজিত হচ্ছেন বগলামামা। ফণি ঠিকই বলেছে। আমাদের পেলে আপনি একা কোলিয়ারীর বাইরে গেলেই সমস্ত গুপ্তকথা ফাঁস হয়ে পড়বে। তারচেয়ে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলুন। আমরা তো প্রায়ই আপনার সঙ্গে এদিক সেদিক বেড়াতে যাই। এবারও লোকে ভাববে হয়তো বগলা ভট্টাচার্য্যির সঙ্গে ছোঁড়াগুলো কোথাও গেছে। কোলিয়ারীর কিছু লোক হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে—কি, ঠিক বলিনি?

ধনুর কথায় বগলামামার মুখে প্রশান্ত হাসি দেখা দিল।

বললেন,—ঠিকই বলেছ বৎস। এদিকটা আমি একদম ভাবিনি। আর একা কদিক ভাববো। একদিকে কোলিয়ারী আর একদিকে যুদ্ধ। তার ওপর এলো গুপ্তধন—

বগলামামা সহসা থেমে আমাদের সকলের মুখের দিকে কিছুক্ষণ জুলজুল করে তাকিয়ে থেকে মুচকি হেসে বললে,—আমি গুপ্তধন পেলে তোদেরও বড়লোক করে দেবো।

আমি বললাম,—আমাদের সকলকে একটা সোনার হাতি দিলেই হবে।

খুশীতে বগলামামা সহসা অট্টহাসি হাসতে হাসতে মোড়ায় বসতে গিয়ে পপাত ধরণীতলে। অরুণ মোড়াটা যে সরিয়ে নিয়েছিল তা তিনি জানতেন না। সুতরাং গোলগাল নাদুসনুদুস চেহারা নিয়ে মেঝেতে ধপাস করে পড়লেন।

সঙ্গে সঙ্গে কাতর আর্তনাদ,—উঃ গেছি গেছি, নিতম্বের হাড় বোধহয় ভেঙে গেছে রে। ওরে তোরা কে কোথায় আছিস বাঁচা—

বেদম হাসি পেলেও সেই মুহূর্তে আমরা কেউ হাসিনি। তাড়াতাড়ি বগলামামাকে তুলে খাটে শুইয়ে দিলাম। কেবু বললে,—শীগ্গির আর্নিকা একডোজ খাইয়ে দে—

ফণি বললে, তার আগে প্যান্ট খুলে বরফ মালিশ করতে হবে। নাড়ু শীগ্গির বরফ নিয়ে আয়—

বগলামামা তাড়াতাড়ি তাঁর পরনের হাফপ্যান্ট দুহাতে চেপে ধরে আর্তস্বরে বলতে লাগলেন,—ওরে তোরা আমার প্যান্ট খুলে নিস না। তলায় আণ্ডারওয়্যার নেই রে। তোদের সেবা চাই না। বরফ আনতে হবে না। আমার ব্যথা কমে এসেছে। তোরা বাইরে গিয়ে বোস।

আমি বললাম, সেই ভাল। বগলামামাকে কিছুক্ষণ একা থাকতে দে। চল, আমরা ততক্ষণ বাইরের বারান্দায় গিয়ে বসে পরবর্তী 'এ্যাকশন' সম্বন্ধে আলোচনা করি।

অরুণ বললে,—সেই ভাল। তোমরা আলোচনা কর। আমি ততক্ষণে গরম গরম মোগলাই পরটা আর চা তৈরি করে ফেলি।

অত যন্ত্রণার মধ্যেও বগলামামা অরুণকে বললেন,—অরুণ, বাবাজী, মোগলাই পরটা তৈরি করার মত ডিম নেই। যদি ডাঃ তাহের হোসেনের মুরগীর ঘর থেকে খান আষ্টেক ডিম গ্যাঁড়া মারতে পারিস তবে—আমার জন্যে গোটা দুই রেখে মোগলাই তৈরি করিস বাবা। অনেককাল টাটকা ডিম খাইনি।

আমরা হাসতে হাসতে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এলাম।

অরুণ, ঝাণ্টু আর সাধন ডিম আনতে গেল।

আর আমি, কেবু, ফণি, নাড়ু, ধনু আর ত্রিদিব বগলামামার গুপ্তধনের ব্যাপারটা আলোচনা করতে বসলাম।

আমি বললাম,—আমার ধারণা, সমস্ত ব্যাপারটাই চালাকি। হয়তো কোলিয়ারির কোন লোক সন্ন্যাসী সেজে বগলামামাকে বাক্সে ম্যাপ দিয়ে গেছে। গুপ্তধন আবিষ্কার করতে গিয়ে দেখা যাবে সবটাই ফার্স।

কেবু বললে,—আমি তোর মত এক কথায় ফার্স বলতে পারছি না। কে এমন লোক আছে কোলিয়ারীতে যে সন্ন্যাসী সেজে শ্মশানে বসে থাকবে বগলামামার সঙ্গে ফার্স করার জন্যে। বগলামামা বললেন, তিনি সেদিন হঠাৎ গিয়েছিলেন। কেউ তাঁকে যেতে বলেনি—

ত্রিদিব বললে,—ঠিক কইছস। কিন্তু সন্ন্যাসী হালায় বাইছ্যা বাইছ্যা বগলামামুরে গুপ্তধনের হদিস দিল ক্যান। দুনিয়ায় কি মানুষের অভাব হইসে। আবার কয়কি, বগলামামু নাকি গতজন্মে ছত্রপতি শিবাজীর পয়লা নম্বরের অনুচর আছিল। হালায়, একথাটা বিশ্বাস করতে মন চাইত্যাসে না। নারে, আমার মনে হয় বগলামামা গুল মারত্যাসে।

ফণি বললে,—না, বগলমামা এ ধরনের গুল আগে কখন মারেনি। আমার মনে হচ্ছে হাবু ঠিকই বলেছে। কোন লোক বগলামামার সঙ্গে চালাকি করেছে। দাঁড়া আজ একবার ধর্মদাসকে

নারে, আমার মনে হয় বগলামামা
গুল মারত্যাসে— [পৃ. ৪৩

জিজ্ঞাসা করবো। হয়তো ও কিছু বলতে পারবে।

ধর্মদাস ঠাকুর মহা ফিচেল টাইপের ছেলে।

তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল তখন সে কিছুক্ষণ ভেবে বললে,—কারগলিতে সন্ন্যাসী এসেছিল বলে তো শুনিনি।

আমি বললাম,—কারগলিতে নয়, শ্মশানে?

ধর্মদাস অবাক্,—শ্মশানে। না ভাই আমি শ্মশানের দিক্‌টা পারতপক্ষে যাই না। সন্ন্যাসী যদি এসেও থাকে তবে বলতে পারবো না। কিন্তু সন্ন্যাসীর খোঁজ করছ কেন তোমরা।

ফণি বললে,—না না তেমন কোন কারণ নেই। গোমো স্টেশনে এক ভদ্রলোক বলছিলেন কে এক সন্ন্যাসী কারগলিতে এসেছেন। তিনি নাকি গত জন্মের কথা বলে দিতে পারেন।

ধর্মদাস হাসতে লাগল।

—আরে তোমাদের ভদ্রলোক গুল মেরেছে। গত জন্মের কথা এ জন্মের লোক বলতে পারে নাকি। যাকগে যাক, বল এবার তোমাদের বগলামামার সঙ্গে কোথাও যাচ্ছ নাকি?

আমি বললাম,—শুনলাম বগলামামা নাকি কিছুদিনের ছুটি নিয়ে ওঁর দিদির কাছে যাবেন।

ধর্মদাস লাফিয়ে উঠল,—আবার ড্রাকুলা দেখা দিয়েছে নাকি?

বললাম,—না রে না ড্রাকুলা নয়। এবার বগলামামা সত্যি সত্যি বিয়ে করবেন।

ধর্মদাস হাসতে লাগল।

আমরা ওকে আর ঘাঁটালাম না। চলে এলাম। ফেরার পথে কেবু বললে, ধর্মদাসের চোখ দেখে মনে হচ্ছিল অনেক কথাই সে গোপন করে গেছে।

বললাম,—যদি সেটা পরে ফাঁস হয় তবে ওকে আমরা চাঁদা তুলে ধোলাই দেবো।

দুই

যাত্রার আয়োজন পূর্ণ হল।

আমরা যে যার বাড়িতে বললাম বগলামামার সঙ্গে তাঁর দেশের বাড়িতে যাচ্ছি, দিন দশ পনের পরেই ফিরে আসবো। সুতরাং বাড়ির কেউ বড় একটা আপত্তি করলেন না। সবাই ধরে নিয়েছিল ছেলেরা বগলা ভট্টাচার্যির সঙ্গে থেকে কিছুদিন হই-হল্লোড় করে ফিরে আসবে।

কিন্তু তাঁরা যদি জানতেন যে আমরা গুপ্তধন উদ্ধারে যাচ্ছি তাহলে হয়তো বাড়ি থেকে একলা বেরোতে দিতেন না।

যাত্রার দিন যতই এগিয়ে আসে আমরা ততই মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠি। উত্তেজনার কারণ যথেষ্ট ছিল।

আমাদের এক বন্ধু ছিল। তার নাম মণ্টু। পদবী মুখার্জি। মণ্টুর বাবা ছিলেন স্থানীয় কন্ট্রাক্টর রামবিলাস সিং-এর ম্যানেজার। তাঁর ছিল দুটো বন্দুক। আর একটা রিভলবার। বগলামামা মণ্টুকে সঙ্গে নিলেন বন্দুক দুটো আর রিভলবারের জন্যে। গুলি কার্তুজ সবই যোগাড় করল মণ্টু। এ তো গেল অস্ত্রের কথা। এ ছাড়াও বগলামামা যোগাড় করলেন আট দশটা গাঁইতি কুড়ুল হাতুড়ি পেরেক র‍্যাঁদা করাত—এলাহি ব্যাপার। বড় বড় চারটে ট্রাঙ্কে মালপত্তর বোঝাই করে বগলামামা প্রস্তুত হয়ে বললেন,—বন্ধুগণ আমরা কাল রওনা হবো। হাবু তোদের জন্যে থাকবে একটা ট্রাঙ্ক। তার মধ্যে থাকবে স্রেফ বন্দুকগুলো। ওটা সব সময় কাছাকাছি রাখবি। মনে রাখিস, হাতিয়ারগুলো ঠিক থাকলে প্রাণের আশঙ্কা থাকবে না। মধ্যপ্রদেশের জঙ্গল যে সে জঙ্গল নয়। আমাকে একবার জিম করবেট বলেছিল—

নাড়ু কাশল।

বগলামামা চুপ করে গেলেন।

—নাড়ু—

—বলুন মামা।

—তোর কি আলটাগরা সুরসুর করছে?

—না মামা।

—তবে কাশলি কেন?

—না, মানে, বলছিলাম কি, মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলের কথা আপনাকে জিম করবেট বলেনি। বলেছিল ক্যানেথ অ্যাণ্ডারসন—

—নাড়ু ফাজলামি করিস না। ক্যানেথ সারাজীবনে মেরেছে মাত্র নটা বাঘ। সে আমাকে উপদেশ দেবে মধ্যপ্রদেশের জঙ্গল সম্বন্ধে। তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে। জিম হচ্ছে আমার বন্ধু—আমরা একসাথে কুমায়ুনের জঙ্গলে জঙ্গলে যখন ঘুরে বেড়াতাম—

ফণি বললে,—আচ্ছা বগলামামা, কুমায়ুনের জঙ্গলে নানান জাতের ফড়িং পাওয়া যায়। তাই না?

ত্রিদিব বললে,—যাঃ চলে, তগো কারবারটা কি। হালায়, বাঘ ছাইর‍্যা ফড়িং-এ আয়া পড়লি ক্যান। মামু, অরা ঠিক করসে আপনারে গুল মারতে দিবো না।

বগলামামা খাপ্পা হয়ে উঠলেন,—কী বললি। আমি গুল মারছি!

বগলামামাকে শান্ত করার জন্যে তাড়াতাড়ি বললুম,—কাদের সঙ্গে তর্ক করছেন বগলামামা। ওরা হচ্ছে দুগ্ধপোষ্য শিশু। ওরা আপনার সম্বন্ধে কতটুকু জানে। আগে গুপ্তধন হাতে আসুক তারপর বুঝবে আপনি আসলে কে?

সাধন বললে,—আসলে বগলামামা হচ্ছেন ছত্রপতি শিবাজীর শাগরেদ। গতজন্মে তিনি মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন স্রেফ 'ধন' লুকিয়ে রাখার জন্যে।

বগলামামার রাগ পড়ে গেল।

খুশীতে ওঁর সারা মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন,—গত জন্মের কথা কিছু মনে নেই। তবে আমার বিশ্বাস মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে পৌঁছে হয়তো বা কিছু মনে পড়ে গেলেও যেতে পারে।

ত্রিদিব ফুট কাটল,—কাম সারছে।

বগলামামা তাকালেন—ত্রিদিব, কিছু বললি?

ত্রিদিব ঘাড় চুলকে বললেন,—না মামু। অহন আর কিছু কমু না। আগে জঙ্গলে পৌঁছাইয়া লই।

পরের দিন রাত্রের গাড়িতে আমরা রওনা হলাম।

প্রথমে গোমো। তারপর সেখান থেকে দেরাদুন এক্সপ্রেসে চড়ে সোজা হাওড়া। পথে এমনি কোন ঝঞ্ঝাট হয়নি। কেবল বগলামামার চার চারটে ট্রাঙ্ক নিয়ে একটু মুশকিল হয়েছিল।

অত বড় ট্রাঙ্ক তুলতে দেবে না। অগত্যা লাগেজ ভ্যানে তুলতে হলো গার্ড সাহেবকে বলে। গার্ড সাহেব বললেন,—ট্রাঙ্কের মধ্যে কি আছে। এত ভারী কেন? বগলামামা হেসে বললেন,—থিয়েটার পার্টির ড্রেস, ঝুটা তলোয়ার, বন্দুক আছে। আমরা নাগপুরে থিয়েটার করতে যাচ্ছি কিনা তাই ওগুলো সঙ্গে নিয়ে যেতে হচ্ছে।

গার্ড সাহেব বললেন,—ঠিক আছে। কিন্তু ট্রাঙ্কে লেবেল লাগাননি কেন? এখনই লাগান। আপনাদের থিয়েটার পার্টির নাম কি?

ত্রিদিব ফস করে বলে বসল,—বি. সি. ভট্ট কোম্পানি।

বগলামামা কটমট করে তাকালেন ত্রিদিবের দিকে।

ত্রিদিব নির্বিকার।

কিন্তু তখন কি জানতাম ত্রিদিবের জন্যে আমাদের মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে পৌঁছে দারুণ অসুবিধের মধ্যে পড়তে হবে।

নট্ট কোম্পানি নামে একটা যাত্রাপার্টির মালপত্তর একই লাগেজ ভ্যানে রানীগঞ্জ যাচ্ছিল তা আমরা জানি না।

আমরা যাচ্ছি হাওড়া। আর যাত্রাপার্টি যাচ্ছে রানীগঞ্জ।

ব্যাস রানীগঞ্জে পৌঁছে ওরা কুলীর সাহায্যে ওদের ছটা ট্রাঙ্ক নামিয়ে নিয়ে গেছে। ভট্ট আর নট্ট পাশাপাশি ছিল। কুলীর ভুলেই আমাদের চারটে ট্রাঙ্ক ওদের সঙ্গে চলে গেছে।

হাওড়ায় পৌঁছে আমরা ভুল ধরতে পারিনি। ভুল ধরা পড়ল মধ্যপ্রদেশের গভীর জঙ্গলে পৌঁছে।

আমরা প্রথমে গেলাম বিলাসপুর তারপর গেলাম অনুপ্পুর হয়ে মণীন্দ্রগড়। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে এগোলাম ম্যাপ দেখে দেখে। প্রথম দিন আমরা সারাদিন হাঁটলাম বারো মাইল। সঙ্গে ছিল আটজন কুলী। চারটে বগলামামার ট্রাঙ্ক একটা আমাদের গুলিবারুদের ট্রাঙ্ক। আর ছিল মাঝারি আকারের একটা তাঁবু আর চাল তেল নুন আনাজপাতি, চা, বিস্কুট, মাখন—ইত্যাদি। সে এক এলাহি ব্যাপার।

বগলামামাকে নিয়ে আমরা গুনতিতে ছিলাম এগারজন।

প্রথমটা দারুণ আনন্দ উত্তেজনা। তারপর একটানা বারো মাইল হেঁটে আমরা যখন একটা অজানা ঝরনার ধারে গিয়ে পৌঁছুলাম তখন আনন্দ উপে গেছে।

এইখানে রাত কাটাতে হবে নাকি?

কুলীগুলো বললে, হ্যাঁ সাহেব। এইখানে রাত কাটানো ভাল। জলের সুবিধে আছে। আর কোথাও এত সুবিধে পাবেন না।

বগলামামা বললেন,—আরে ভয় কি, আমাদের সঙ্গে দু দুটো বন্দুক আছে, একটা রিভলবার আছে। বাঘ ভাল্লুক এলেই দ্যুম। কোন কথা নয়। এক গুলিতেই সাবাড়। থাকগে, দিনের আলো থাকতে থাকতে তাঁবু খাটিয়ে রান্নাবান্না সেরে ফেলতে হবে। কি বলিস হাবু?

বললাম,—তা তো নিশ্চয়। কিন্তু তাঁবু খাটাবে কে?

বগলামামা বললেন,—কেন কুলীগুলো খাটাবে। আরে এরা হচ্ছে সুরগুজা স্টেটের লোক। এরা দারুণ কর্মঠ। বারো মাইল ওদের কাছে কিছুই নয়। তবে ওরা একটু তালকানা। ওদের একটু বুঝিয়ে দিতে পারলেই জার্মান সোলজারের মত কাজ করবে। সেবার আমি যখন বুয়োর যুদ্ধে ছিলাম—

নাড়ু বললে,—আর কাশতে পারছি না মামা। বিনা বাধায় চালিয়ে যেতে পারেন।

বগলামামা চুপ করে গেলেন।

অরুণ বললে,—বগলামামা ঝরনায় স্নান করবো। কুমির-টুমির নেই তো—

ঝণ্টু বললে,—কুমির নেই, হাঙ্গর আছে।

ধনু বললে,—যাঃ ও দুটোর একটাও নেই। তবে তিমি মাছ থাকতে পারে।

কেবু রেগে গেল।

—ইয়ারকি হচ্ছে। পাহাড়ী ঝরনার জল পড়ে এক হাঁটু কি এক কোমর জল জমেছে। এর মধ্যে কুমির, হাঙ্গর, তিমি মাছের খোঁজ করতে তোদের লজ্জা করছে না।

আমরা হাসতে লাগলাম।

কেবু তাড়া দিয়ে বললে,—আগে তাঁবু খাটিয়ে জ্বালানী কাঠ যোগাড় করে তারপর আমরা স্নান করতে যাবো। বগলামামা, ট্রাঙ্ক খুলে শাবল আর কুড়ুল বের করুন।

বগলামামা কাজে লেগে পড়লেন।

কিন্তু ট্রাঙ্কের তালা দেখে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। এ যে অন্য তালা। এর চাবি তাঁর কাছে নেই।

বগলামামা চেঁচামেচি করতে আমরা ছুটে গেলাম। ব্যাপারটা জেনে আমরাও বেকুব।

বগলামামা বললেন,—তালা পালটাল কি করে? তাজ্জব ব্যাপার—

কেবু বললে,—তালা নয়, ট্রাঙ্ক।

—য়্যাঁ।

—হ্যাঁ। ট্রাঙ্ক বদল হয়েছে। ঐ দেখুন ট্রাঙ্কের গায়ে লেখা নট্ট কোম্পানি। নট্ট আর ভট্টতে ট্রাঙ্ক বদল হয়েছে।

—সর্বনাশ। তাহলে কি হবে?

—তালা ভাঙতে হবে।

আমরা সবাই মিলে চার চারটে ট্রাঙ্কের তালা পাথর ঠুকে ঠুকে ভেঙে ফেললাম। তারপর আর একচোট বিস্ময়। দেখি তার মধ্যে রয়েছে যাত্রাপার্টির পোশাক-আশাক, দাড়ি, গোঁপ, গাম, আর নানান ধরনের পেন্ট।

দেখে শুনে বগলামামা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। হায় রে যদি পাথর সরাতে হয়, যদি মাটি কাটতে হয় তখন কি করে কেমন করে কাজ হাসিল হবে। বগলামামা যতক্ষণ হাহুতাশ করছিলেন আমরা দশজন ততক্ষণে যাত্রাপার্টির পোশাক-আশাক বের করে গায়ে চড়িয়ে পার্ট মুখস্থ বলে যেতে লাগলাম। এই করতে গিয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তাঁবু খাটানো গেল না। কোনরকম করে কিছু কাঠ যোগাড় করে আগুন জ্বালিয়ে রান্নার ব্যবস্থা হলো। আর খোলা আকাশের নীচেই আমরা রাত কাটাবো ঠিক হলো।

খাওয়াদাওয়ার পর সকলের একটাই মাত্র ভাবনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল আর সেটা হচ্ছে, কে পাহারা দেবে আর কে কে ঘুমোবে। রাত জাগতে কেউ রাজী নয়। সবাই সমান ক্লান্ত। সবাই ঘুমোতে চায়।

ত্রিদিব বললে,—মামু আমি কই কি, হালায় ভগবানের মর্জির উপর ছাইরা আমরা সবাই ঘুমাই! কেবল চারিদিকে আগুন ধরাইয়া দেন। বাঘ ভাল্লুক আইলে আগুন দেখ্‌ক্যা পালাইবো। কি কন?

বগলামামা রেগে গিয়ে বললেন,—তোর কোন কথা শুনবো না। কেন তুই বি. সি. ভট্ট কোম্পানির নাম উচ্চারণ করলি। সেই জন্যেই তো ট্রাঙ্ক বদল হলো। এখন কি দিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি করবো বলতে পারিস?

স্প্রিংয়ের মত শূন্যে লাফ মারল গর্জন করতে করতে।

• স্ট্যাচুর মতই আমার চোখের পাতা স্থির হয়ে গেল। •

ত্রিদিব বললে,—ভুল যখন হইসে তখন চলেন মণীন্দ্রগড় ফিইর‍্যা গিয়া দুটো শাবল আর গাঁইতি স্টেশনমাস্টারের কাছ থিকা চাইয়া আনি।

নাড়ু বললে,—তা হয় না। আমরা পিছিয়ে আর যাব না। শাবল আর গাঁইতি ছাড়াই আমরা 'সিক্রেট ধন' আবিষ্কার করবো।

—নাড়ু?

—কি বগলামামা?

—তুই কি ইংরিজি বললি?

—সবটা বলিনি। একটু ইং একটু বাং। মানে ইংবাং ভাষাটা হচ্ছে এক ধরনের কোড ল্যাঙ্গুয়েজ। আমি যখন পলাশীর যুদ্ধে গিয়েছিলাম তখন মোহনলালজী আমাকে ভাষাটা শিখিয়েছিলেন।

বগলামামা বললেন,—আমার সঙ্গে ইয়ারকি হচ্ছে। পলাশী যুদ্ধ কবে হয়েছিল জানিস।

নির্বিকার কণ্ঠে নাড়ু বললে,—রাগ করবেন না বগলামামা আমি গত জন্মের কথা বলছি।

বগলামামা চুপ।

তাঁবু পেতে ততক্ষণে অন্যেরা শুয়ে পড়েছে। সাধন, ঝাণ্টু, অরুপ আর ধনুর নাক ডাকতে শুরু করেছে। কেবু, ফণি, মণ্টু অন্ধকারে টর্চ জ্বেলে এদিকওদিক ঘুরে দেখছিল। আর আমরা ক'জন তর্কে মত্ত।

কিছুক্ষণ পরে কেবু, মণ্টু আর ফণি ফিরে এসে বললে,—ঝরনার এত কাছে আমাদের রাত কাটানো ঠিক হচ্ছে না। কারণ রাত্রে জন্তুজানোয়ারেরা জল খেতে আসবে। এই আসার পথে যদি আমাদের দেখতে পায় তবেই চিত্তির।

বগলামামার মুখ শুকিয়ে গেল।

কুলীগুলো অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তাদের ভয়টয় বলে কিছু নেই যেন।

বগলামামা বললেন, গাছে রাত কাটালে কেমন হয়?

বললাম,—যা ঘুম সব। যদি ঘুমের ঘোরে পড়ে যায় তবে গুপ্তধন মাথায় উঠবে। তার চেয়ে আজকের রাতটা কোনরকমে কাটিয়ে দেওয়াই ভাল। কাল থেকে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

আমার কথা মেনে নিয়ে সবাই শুয়ে পড়ল।

বন্দুক দুটোয় গুলি ভরে বগলামামা নিজের কাছেই রেখেছিলেন। ঠিক হলো বগলামামা প্রথম ঘণ্টা জাগবেন তারপর আমাকে ডেকে দেবেন। এমনি করে চার পাঁচটা ঘণ্টা কাটালেই ভোর হয়ে যাবে।

আমরা শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আর কোন হুঁশ ছিল না।

মাঝরাতে ঘুম ভাঙ্গল আমারই।

কেন ঘুম ভাঙ্গলো আন্দাজ করতেই ধড়মড় করে উঠে বসলাম। মনে হল কারা যেন হাঁড়িকড়া নিয়ে খেলা করছে। অন্ধকারে কিছু ঠাওর করতে পারছিলাম না। টর্চ আমার কাছে ছিল না। তাই যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি হামাগুড়ি দিয়ে কেবুর কাছে গিয়ে তাকে ধাক্কা মেরে তুলে ফিসফিস

মামু প্যান্টটা পালটাইয়া ফ্যালেন। হালায় মুত্ মুত্ গন্ধ বারাইত্যাছে। [পৃ. ৫১

করে ব্যাপারটা বলতে সে টর্চ জ্বালল।

টর্চের আলোয় যা দেখলাম তাতে আমাদের চক্ষুস্থির। দেখি গোটা আটদশ ভাল্লুকের বাচ্চা এঁটো হাঁড়িকড়া নিয়ে খেলা শুরু করেছে। আর পাশেই একটা মহুয়া গাছে চড়ে মহুয়া খাচ্ছে ধাড়ি ভাল্লুকগুলো।

টর্চ নিভিয়ে কেবু আর আমি অন্য সকলকে ধাক্কা দিয়ে তুললাম।

কিন্তু বগলামামা কোথায়।

বন্দুক দুটো যেমনকার তেমনি পড়ে আছে। কেবল আসল লোকটা হাওয়া।

এদিকে আমাদের সাড়া পেয়ে ভাল্লুকের বাচ্চাগুলো চেঁচামেচি করতে করতে পালাল।

মণ্টু তড়াক করে লাফিয়ে বন্দুক তুলেই আকাশের বুকে গুলি ছুড়লো। গুড়ুম।

নিস্তব্ধ রাতে গুলির আওয়াজ বড় বিকট শোনাল।

আশ্চর্য কুলীগুলো তখনও ঘুমোচ্ছে। ধেড়ে ভাল্লুকগুলো গাছ থেকে নেমে চিৎকার চেঁচামেচি করতে করতে পালাল।

কিন্তু বগলামামা কোথায়—?

আমি চিৎকার করে ডাকলাম—বগলামামা, বগলামামা—

আবার ডাকতে যাচ্ছি হঠাৎ ত্রিদিব বাধা দিয়ে বললে,—হাবু চুপ যা। দেখ তো তাঁবুর নীচে ওখানটায় কি যেন লড়ত্যাসে—

আরে তাই তো। এতক্ষণ আমরা লক্ষ্য করিনি। তাঁবুর একটা কোণে যেখানে ট্রাঙ্কগুলো সাজানো ছিল সেখানটা কবরের মত উঁচু হয়ে আছে। আমার ডাকাডাকিতে উঁচু জায়গাটা নড়াচড়া করতে সকলের নজর পড়ল।

একটু পরেই বগলামামা তাঁবুর তলা থেকে বেরিয়ে এলেন।

—একি, বগলামামা, আপনি তাঁবুর তলায় ঢুকেছেন কেন?

বগলামামার পরনে ছিল খাকি হাফ প্যান্ট আর স্যাণ্ডো গেঞ্জি। সেগুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বগলামামা বললেন,—হঠাৎ ঠাণ্ডা হাওয়ায় কেমন যেন শীত করতে লাগল। তাই নিরুপায় হয়ে তাঁবুর নীচে গিয়ে শুয়েছিলাম। তা ব্যাপারটা কি। তোরা হঠাৎ চেঁচামেচি শুরু করলি কেন?

ভাল্লুকের ছানা আর ধেড়েগুলোর কথা বলতে বগলামামা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন,—সত্যি তোদের নিয়ে আসাটাই আমার ভুল হয়েছে। আরে ভাল্লুকের বাচ্চাগুলো অনেকটা বেড়ালছানার মত খেলতে ভালবাসে। ওদের দেখে ভয় পাবার কি আছে। ওরা মানুষের কোন ক্ষতি করে না।

নাড়ু বললে,—বগলামামা আপনার প্যাণ্ট ভিজে কেন?

বগলামামা চট করে বললেন,—ঘাম ঘাম। তাঁবু চাপা দিয়ে শুলে কি গরম লাগে জানিস। আমি যখন বুয়োর যুদ্ধে আফ্রিকায় ছিলাম—

ত্রিদিব বললে,—মামু প্যাণ্টটা পালটাইয়া ফ্যালেন। হালায় মুত্ মুত্ গন্ধ বারাইত্যাছে।

আমরা হো হো করে হেসে উঠলাম।

যাত্রা শুরু করলাম পরের দিন সকাল ছটা নাগাদ।

ওঃ সে কি কষ্টকর পদযাত্রা।

চড়াই-উৎরাই। কখনও বা সমান্তরাল। কোথাও জঙ্গল এত গভীর যে সূর্যের আলো ঢোকে না।

দিনের আলোয় বগলামামা 'শের'।

সবার আগে চলেছেন কাঁধে বন্দুক নিয়ে। মাঝে মাঝে ম্যাপ দেখছেন। কখন বা পকেট থেকে ছোট্ট সারভে কম্পাসটা বের করে দিক নির্ণয় করছেন।

—বৎসগণ, শোন আমরা ঠিক চলেছি। সামনে আর মাত্র তিনটে পর্বত ডিঙোতে হবে। তারপরই সেই বিখ্যাত গুহা। যেখানে ছত্রপতি বিশ্রাম নিতেন।

বললাম,—বগলামামা, এই জঙ্গল-টঙ্গল দেখে গতজন্মের কথা আপনার কিছু মনে পড়ছে না?

—পড়ছে পড়ছে। কেবলই মনে হচ্ছে এ পথ আমার অচেনা নয়। কবে কখন যেন এ পথ দিয়ে আমি একা যাতায়াত করেছি।

—একা? অরুণ প্রশ্ন করল।—এটা কি বললেন মামা। আরও ভাল করে ভাবুন। আমার মনে হচ্ছে—সঙ্গে আমিও ছিলাম।

হঠাৎ ঝান্টু চেঁচিয়ে উঠল,—বগলামামা সাপ—

বগলামামা এক লাফে পিছিয়ে এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন।

—কৈ কৈ?

—এই তো। পথ জুড়ে বসে শুয়ে আছে।

বান্টু মিথ্যে বলেনি। এক বিরাট পাহাড়ী ময়াল শুয়ে আছে। তার পেটটা কাঠের গুঁড়ির মত মোটা। ল্যাজ আর মুণ্ড কোথায় আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না।

বগলামামা ভয়ে কাঠ।

কুলী সর্দার বললে, বাবু তাড়াতাড়ি পা চালান। সাপটা মনে হচ্ছে কাল রাত্রে আস্ত বনগাই গিলেছে। বিরক্ত করলে আমাদেরও গিলে ফেলতে পারে।

বগলামামা আঁতকে উঠলেন।

আমি বললাম,—সাপের পেটে গুলি করলে কি হয়।

বগলামামা সভয়ে বললেন,—না না ও কাজ করিস না। তার চেয়ে এখান থেকে পালানই ভাল।

অনেক তর্কবিতর্কের পর সাপটাকে ক্ষমা করা সাব্যস্ত হলো।

আমরা এগোলাম।

বেলা দশটা নাগাদ অরুণ বললে,—মামা খাবো। জলখাবার হজম হয়ে গেছে।

কেবু বললে,—এখন খেতে গেলে বেলা গড়িয়ে যাবে। তার চেয়ে বেলা চারটে পর্যন্ত হাঁটাই ভাল।

নাড়ু বললে,—সঙ্গে কিছুটা মুড়ি আনলে ভাল হতো। সেবার আমি যখন সাইবেরিয়াতে গিয়েছিলাম—

বগলামামা তাকালেন।

নাড়ু চুপ করে গেল।

বগলামামা মুচকি হেসে বললেন,—ভূগোল জ্ঞান না থাকলে গুল মারতে নেই। সাইবেরিয়া নয় বল বোলপুর থেকে যখন শান্তিনিকেতনে যাচ্ছিলি।

সাধন বললে,—বোলপুর আর শান্তিনিকেতনের দূরত্ব কতটুকু বগলামামা?

বগলামামা গম্ভীর হয়ে বললেন,—দশ পনের মাইল হবে।

অরুণ ফুট কাটল,—মাভৈঃ।

ফণি বললে,—কি চমৎকার জ্ঞান।

নাড়ু বললে,—বিদ্যা মহাসাগর।

মণ্টু বললে,—এমন জানলে বন্দুক সঙ্গে নিতাম না। বগলামামার জ্ঞান দিয়েই বাঘ ভালুক মারা যেত।

ত্রিদিব বললে,—হালায় গতজন্মে রামছাগল আছিল।

—ত্রিদিব!

—কি মামু!

—তুই রামছাগল কাকে বললি?

—বোলপুরের স্টেশনমাস্টারকে?

—কেন?

—হালায় যদি বোলপুরের নাম শান্তিনিকেতন কইর‍্যা দিত, তাহলে আপনের ভূগোল জ্ঞান লইয়া অহন এত মন্তব্য শুনতে হইতো না।

আমাদের কথা বন্ধ হলো।

সামনেই একটা পাহাড় সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

ফণি বললে,—ও বগলামামা, এত বড় পাহাড় ডিঙোবে কেমন করে।

কেবু বললে,—ম্যাপ দেখুন পাশে কোন পথ আছে কিনা—

সেকথা শুনে বগলামামা তাড়াতাড়ি ম্যাপ খুলে বসলেন। আমরাও ঝুঁকে পড়লাম। বগলামামা ম্যাপের ওপর আঙুল চালাতে চালাতে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন,

—এই অনুপ্পুর—এইখান থেকে আমরা এসেছি। এই যে ঝরনা...তারপর এই রাস্তা ধরে পূর্বদিকে হাঁটছি হাঁটছি—এই যে এখানে বিরাট পাহাড়। এই দেখ লেখা আছে। পাহাড় না ডিঙ্গিয়ে উপায় নেই। সোজা পাহাড় ডিঙ্গিয়ে হাঁটতে হবে। এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। সুতরাং—

কেবু বললে,—তবে আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। আজ যেমন করে হোক আমাদের পাহাড়ের ওপর উঠতেই হবে। চলে আসুন বগলামামা—

কেবুর মুখের ওপর কথা বলার সাহস আমাদের কারও ছিল না।

শুধু ত্রিদিব বললে,—মামু, একটা কইর‍্যা সোনার হাতিতে কিছু হইবো না। আমাগো দুইট্যা কইর‍্যা হাতি দিতে হইবো। কি রাজী আছেন। কন দেহি—

বগলামামা গম্ভীর হয়ে বললেন,—তুই কি চাপ দিয়ে আদায় করবি।

ত্রিদিব বললে,—চাপ-ফাপ বুঝি না। হালায় এত্তো বড় পাহাড় ডিঙ্গাইতে হইলে দুইট্যা হাতি চাই।

বাঙ্গালের গোঁ বড় সাংঘাতিক। সুতরাং কথা না বাড়িয়ে বগলামামা বললেন—ঠিক আছে তাই হবে। এখন দয়া করে কেবু যা বলছে শোনো।

শুরু হলো পাহাড়ে চড়া পর্ব। পাহাড়টা যদিও খাড়াই তবু মানুষের পক্ষে চড়া অসম্ভব নয়। কিন্তু পাঁচটা ট্রাঙ্ক নিয়ে কুলীগুলোর যা অবস্থা হলো তা সত্যি অকল্পনীয়।

বগলামামা দুবার পা ফসকে গড়িয়ে গেলেন। তাঁর হাত পা হাঁটুর নুনছাল উঠে গেল। তবু লোকটার উৎসাহের অন্ত নেই। আধমরা অবস্থায় পাহাড়ের চূড়ায় উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন,—ছেলেবেলায় হিমালয়ে বেড়াতে যেতাম কি সাধ করে। কতবার যে এভারেস্টে উঠেছি।

—মামু—

—কি ভাগ্নে?

—গুল মাইরেন না। ব্যথা পাইবেন।

—হাবু!

—কি বগলামামা?

—ত্রিদিবকে বলে দে ভবিষ্যতে সে যদি আমাকে অযথা অপমান করার চেষ্টা করে তবে সোনার হাতি কেন—একটা সোনার গুবরে পোকাও দেবো না। আমার নাম বগলাচরণ ভট্টাচার্যি। আমি এক কথার মানুষ।

ফণি বললে,—ঠিক বলেছেন বগলামামা। গুলকে গুল বলা চলবে না। আপনি যা বলবেন আমাদের সকলকে তা মুখ বুজে হজম করতে হবে। কিরে ত্রিদিব, রাজী আছিস?

—হ। অহন বুঝছি। হালায় আমাগো গুল হজম করতেই হইবো।

ব্যাস মিটে গেল ঝগড়াঝাঁটি।

অরুণ বললে,—বগলামামা খাবো।

বগলামামা তখন হাঁটুতে মারকিউরোক্রোম লাগাচ্ছেন। বললেন,—বেশ বাবা খাও। আজকের মত আমরা পাহাড়ের চূড়াতেই বিশ্রাম নেব। কি বল কেবু।

কেবু বললে,—না। এখানে জল নেই। জল ছাড়া রান্নাবান্না হবে না। সঙ্গে দুটো জলের ফ্লাস্ক্ ছিল, দুটোই ভেঙে গেছে।

সেকথা শুনে আমরা সবাই একসাথে আঁতকে উঠেছিলাম।

সুতরাং জলের খোঁজে পাহাড় থেকে নেমে আরও মাইল চারেক জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে হল। মাইল চারেক পরে একটা শীর্ণ জলধারা পেলাম গভীর নালার মধ্যে। তখন বেলা চারটে।

কেবু বললে,—নালা থেকে জল তুলে আমাদের একটু দূরে গিয়ে তাঁবু ফেলতে হবে। কারণ এই ধরনের নালার মধ্যেই বাঘের আস্তানা হয়।

বগলামামা খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তবু বাঘের নাম শুনে বললেন,

—না একটু দূরে নয়, বেশ কিছু দূরে যাওয়াই ভাল। আর তাঁবুতে কেন গাছে মাচান বেঁধে শুলেই তো হয়।

—মাচান বাঁধতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তার চেয়ে তাঁবু খাটানোই ভাল। ভয় নেই বগলামামা, এদেশের বাঘ বোধহয় মানুষখেকো নয়।

বগলামামা হেসে বললেন,—তাকি আমি জানি না রে। সেবার আমি আর জিম করবেট যখন এদেশে এসেছিলাম—

নাড়ু কাশল।

বগলামামা চুপ।

—নাড়ু।

—কি বগলামামা?

—এবারও কি আলটাগ্‌রা সুরসুর করছে।

—না মামা।

—তবে?

—এটা শুকনো কাশি। বোধহয় পেট খালি থাকার জন্যেই—

—আর বলতে হবে না। বুঝেছি। ও বাবা কুলীমশাইরা, তাড়াতাড়ি এক হাঁড়ি ভাত চাপিয়ে দাও। আমরা ততক্ষণ তাঁবুটা খাটিয়ে ফেলি।

কিন্তু তাঁবু খাটানো কি চাড্ডিখানি কথা। দু ঘণ্টা চেষ্টার পরে অনেক কষ্টে তাঁবু খাটানো হলো। তাঁবুর চারপাশে শুকনো কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থাও হলো। দেখে শুনে বগলামামা ভারী খুশী। যাক্, অন্ততঃ একটা রাত ভালভাবে ঘুমোন যাবে।

নির্বিঘ্নে খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম। কেবল তাঁবুর মধ্যে জ্বলতে লাগল বগলামামার ছোট্ট লণ্ঠনটা। সবে ঘুম এসেছে এমন সময় কাছে পিঠে কোথাও শোনা গেল কোন প্রাণীর বিকট আর্তনাদ। তারপরই শুনতে পেলাম বাঘের বুক কাঁপানো হুংকার।

ঘুম মাথায় উঠলো! উপর্যুপরি হুংকার আর চিৎকারে মনে হচ্ছিল যেন হাজারটা আহত দানব মারামারি শুরু করেছে। বগলামামা ভয়ে কাঁপছেন থরথর করে।

আমাদের অবস্থাও তথৈবচ।

তখন আমাদের কি কর্তব্য বুঝে উঠতে পারছিলাম না। হঠাৎ দেখি তাঁবুতে আগুন লেগেছে। তাঁবুর চতুর্দিকে বগলামামা আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই আগুনের ফুলকি হাওয়ায় উড়ে এসে পড়েছিল তাঁবুতে। তাতেই এই বিপত্তি।

যাই হোক, তখন আমাদের তাঁবু ছেড়ে বাইরে না বেরিয়ে উপায় ছিল না। আমরা এগারজন যে যার প্রাণ বাঁচাতে হুড়মুড় করে বাইরে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমাদের রক্ত জল হয়ে গেল।

আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। তার আলোয় দেখতে পেলাম প্রায় একশো গজ দূরে ঠিক নালার ধারে একটা বাঘ আর একটা প্রকাণ্ড ভাল্লুকের মধ্যে মরণবাঁচন যুদ্ধ চলেছে। এমনটা কখনও আশা করিনি। কি নিয়ে যুদ্ধ বাধলো জানি না। তবে পরে ভেবে দেখেছিলাম হয়তো বাঘটা আমাদের তাঁবুর দিকে এগোচ্ছিল শিকারের লোভে আর সেই সময় ভাল্লুকটা এসে পড়ে। বাঘকে এগোতে দেখে সে ভাবল বুঝি বাঘটা তার শিকারের ওপর ভাগ বসাতে এসেছে। এই ভেবেই সে প্রথম আক্রমণ করে।

যতক্ষণ যুদ্ধ চলছে ততক্ষণই আমরা নিরাপদ মনে করে সকলেই গাছে উঠে পড়লাম। কিন্তু বগলামামা আর গাছে চড়তে পারলেন না। কে তাঁকে তুলবে গাছে। যত বার গাছে উঠতে যান তত বার আছড়ে পড়েন। তখন তাঁর সে কি চিৎকার সে কি কাকুতিমিনতি—ওরে তোরা আমাকে গাছে তোল। তোদের সকলকে একশোটা করে সোনার হাতি দেব। ও হাবু তোর দুটি পায়ে পড়ি—

বগলামামার কান্নাকাটি শোনার মত কারও মনের অবস্থা ছিল না। সবাই তখন ভয়ে জড়সড়।

অগত্যা আমি গাছ থেকে নেমে বন্দুক হাতে দাঁড়ালাম বগলামামার পাশে। বললাম,—বগলামামা

চিৎকার করবেন না। চুপ করে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকুন। বাঘ ভাল্লুকের লড়াই চলছে। এখন ওদের নজরে পড়বো না।

বগলামামা কাঁপতে কাঁপতে বললেন,—দাঁড়িয়ে না থেকে পালালে কেমন হয়।

—কোথায় পালাবেন। জঙ্গলে আরও জন্তু-জানোয়ার আছে। তারা আমাদের ছেড়ে দেবে নাকি—

ওদিকে যুদ্ধটা হঠাৎ থেমে গেল।

কি হল। ব্যাপারটা জানতে গিয়ে বাঘ ভাল্লুকের মধ্যে একজনকেও দেখতে পেলাম না। ওরা কি নালার মধ্যে পড়ে গেল নাকি!

গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে আমরা দুজনে দাঁড়িয়ে আছি। আমার হাতে উদ্যত বন্দুক। গাছের ওপর থেকে কেবু বারবার টর্চ ফেলছে চারদিকে।

একসময় কেবু বললে, হাবু বগলামামাকে গাছে তুলতে পারবি।

বললাম,—সম্ভব। মন্টুর কাছ থেকে বন্দুক নিয়ে তুইও নেমে আয়। রিভলবারটা কার কাছে?

বগলামামা বললেন,—আমার কাছেই ছিল। ছোটাছুটিতে পড়ে গেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—গুলির ট্রাঙ্কটা কোথায়?

—তাঁবুতে।

—সর্বনাশ। তাঁবু পুড়ে গেছে। এখন উপায়।

—জানি না। কি কুক্ষণে যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম।

—চুপ।

মনে হলো শুকনো পাতার ওপর নরম পায়ের আওয়াজ হলো। আমি সজাগ হয়ে উঠলাম। নিশ্চয় কোনো জানোয়ার আসছে।

এক দুই তিন—পর পর তিনটে মিনিট কেটে গেল। তারপরই দেখলাম জ্বলন্ত তাঁবুর কাছে সেই আহত বাঘ। দূরত্ব বোধহয় একশো গজ। আমি জানতাম বন্দুকে বুলেট পুরে রেখেছিল মন্টু।

সুতরাং এমন একটা সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলাম না। টর্চ জ্বেলে বন্দুকের নিশানা করলাম বাঘের বুক বরাবর। এমন একটা বাঘকে এক গুলিতে মারতে হলে হৃৎপিণ্ডটা চুরমার করা একান্ত প্রয়োজন।

নিশানা ঠিক রেখে ট্রিগার টানলাম। সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ হলো। আর বাঘটা স্প্রিংয়েব মত শূন্যে লাফ মারল গর্জন করতে করতে। তারপরেই দেখলাম সে আছড়ে পড়ল মাটিতে—

বোধহয় পাঁচ মিনিট আমরা কেউ কথা বলিনি। এক সময় আমরা শুনতে পেলাম জীপ গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ। কি আশ্চর্য, এই জঙ্গলে জীপ এলো কোত্থেকে। কেমন করে এলো। কাছে পিঠে জীপ চলার মত পথ আছে নাকি।

ভাবতে ভাবতে জীপ এসে পড়ল আগুনের আলো দেখে। জীপটা এসে দাঁড়াল জ্বলন্ত তাঁবুর কাছে। আমরা দেখতে পেলাম জীপ থেকে নামলেন দুজন যুবক।

যুবকদ্বয়কে দেখেই চিনতে পেরেছিলাম।

আনন্দে দিশেহারা হয়ে তাড়াতাড়ি বন্দুকটা বগলামামার হাতে দিয়ে ছুটে গেলাম।

ওঁরা আমায় দেখে অবাক্।

—কিরে হাবু তুই এখানে?

—শুধু আমি একা নই প্রমোদদা-প্রশান্তদা আমরা এগারোজন—

—এগারোজন। কি করতে এসেছিলি?

—পিকনিক করতে।

—পিকনিক করতে। তোরা পাগল নাকি। আর আমরা দুভাই আজ এক মাস ধরে একটা মানুষখেকো বাঘের পেছনে ছুটছি। মানুষখেকোটার উৎপাতে জঙ্গলে মানুষের পা দেবার উপায় নেই। আর তোরা—

প্রশান্তদা জিজ্ঞাসা করলেন,—কে গুলি করল?

আমি হেসে বললাম,—বগলামামা।

প্রমোদদা জিজ্ঞাসা করলেন,—কাকে গুলি করল?

বললাম,—মানুষখেকো বাঘটাকে। ঐ দেখো মানুষখেকোটা এক গুলিতেই সাবাড়।

প্রশান্ত ও প্রমোদ লাহিড়ী ছুটে গেলেন মরা বাঘের কাছে। তারা পরীক্ষা করে দেখলেন ওটা মানুষখেকো কিনা। পরীক্ষা শেষে তাঁরা বগলামামার পিঠ চাপড়ে বললেন,—আপনার পুরো নামটা ঠিক জানি না। তবু আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা আজ দু বছর চেষ্টা করেও বাঘটাকে মারতে পারিনি আর পিকনিক করতে এসে আপনি খেলার ছলে বাঘটাকে মেরে ফেললেন। আশ্চর্য আপনার হাতের নিশানা।

ইতিমধ্যে আমার অন্যান্য বন্ধুরা গাছ থেকে নেমে এসেছে। তারা জানতো না, কে গুলি করল কার হাতে বন্দুক ছিল। সুতরাং বগলামামা বাঘটাকে গুলি করে মেরেছে শুনে তারা তো অবাক্।

প্রশান্তদা বললেন,—আপনার পুরো নামটা কি মশাই?

বগলামামা বললেন,—শ্রীবগলাচরণ ভট্টাচার্যি।

—আপনি কোথায় চাকরি করেন?

—কারগালি কোলিয়ারীতে—

—আগে কখনও শিকার টিকার করেছেন?

—অনেক অনেক—। জিম করবেট যখন কুমায়ুনে ছিল—

নাড়ু কাশল।

বগলামামা চুপ।

—নাড়ু—

—কি বগলামামা।

—তোর আলটাগরাটা কি এখনও সুরসুর করছে?

—এই শেষবার, আর বোধ হয় চুলকোবে না।

আমরা সবাই হেসে ফেললাম।

প্রমোদ-দা হাসতে হাসতে বললেন,—শুনুন মশাই, এই মানুষখেকোটাকে যে মারতে পারবে ইংরেজ সরকার তাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন বলেছিলেন। সুতরাং আপনাকে আমাদের সঙ্গে বিলাসপুর যেতে হবে। আপনার কোন আপত্তি নেই তো?

বগলামামা বললেন,—না। কোন আপত্তি নেই। আমি এখুনি যেতে রাজী আছি।

নাড়ু বললে,—কিন্তু বগলামামা 'সিক্রেট ধনের' কি হবে?

বগলামামা কটমট করে নাড়ুর দিকে তাকিয়ে বললেন,—ম্যাপটা পুড়ে গেছে। সুতরাং ওটা আপাততঃ সিক্রেট থাক।

সেকথা শুনে আমরা সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

কেবল ত্রিদিব বললে,—হালায় সোনার হাতিতে চইড়্যা বাড়ি ফিরুম মনে কইর‍্যাছিলাম তা আর হইলো না। হালায় মামুটাই ডোবাইল।

ফেরার পথে বগলামামা আমাকে শুধু বললেন,—তোর কথা জীবনে কখনো ভুলবো না।

আমি হেসেছিলাম মাত্র।

● ফার্স্ট এল লাস্ট হল—
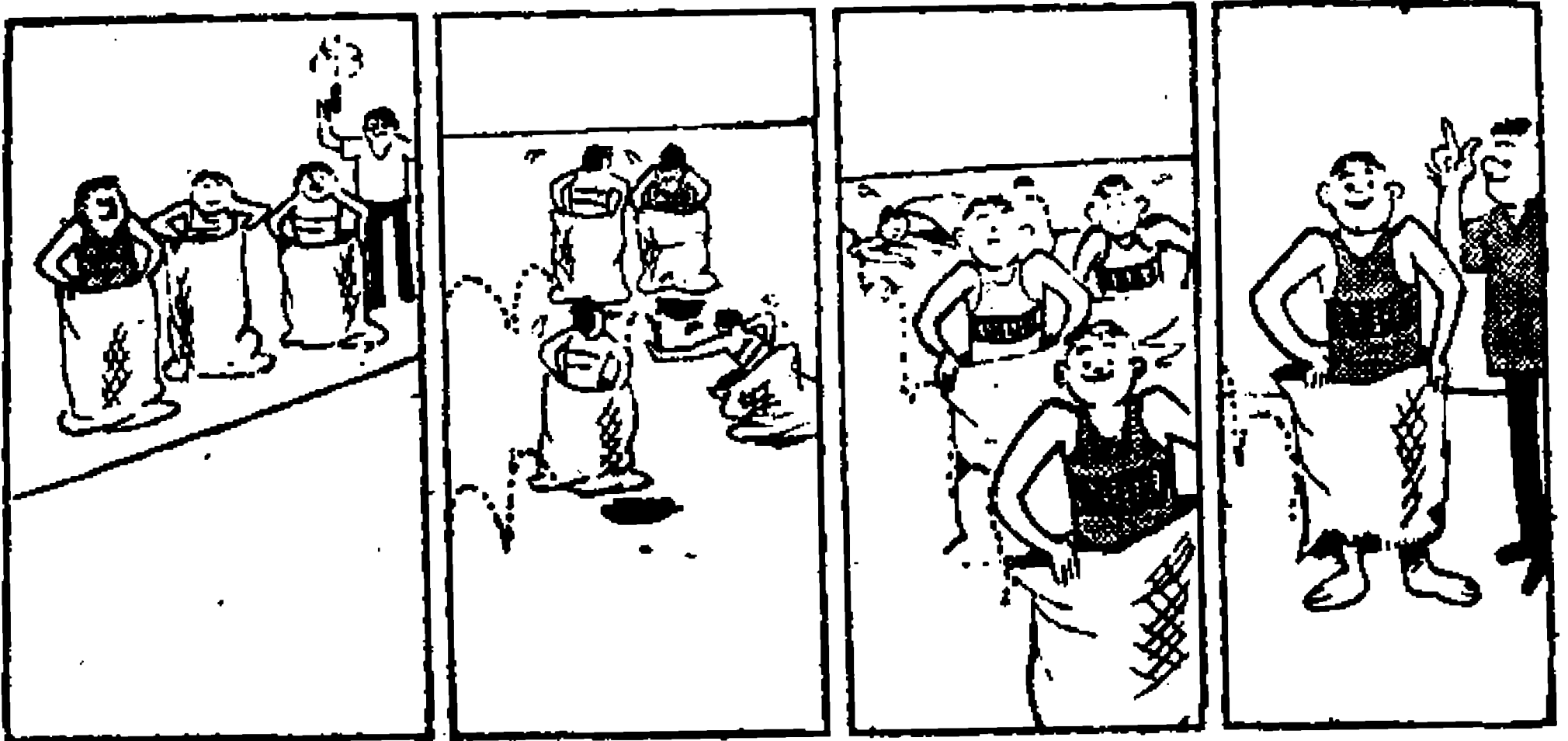
(সত্য কাহিনী অবলম্বনে)

—বন্দে আলি মিয়া

জগৎ জুড়িয়া এত হানাহানি এত যে হিংসা দ্বেষ
মানুষে মানুষে বৈরিতা এত—আজো হলো নাকো শেষ,
নিত্য নূতন মারণ অস্ত্র করে সে আবিষ্কার—
ধ্বংসের নেশা—শোণিতের তৃষ্ণা চোখে লাগিয়াছে তার।
বাতাসে বাতাসে তাই হাহাকার—ক্রন্দন রোল তাই
মানব হয়েছে দানব আজিকে—দুশমন তার ভাই।
তবু এরি মাঝে জনক তাহার সন্তানে করে প্রীতি
পরের লাগিয়া কত মহাজন সহে কত দুখ নিতি।

ডাক্তারবাবু সুধীর লাহিড়ী—হাত যশ খুব তাঁর
সকাল হইতে রোগীর ভিড়েতে অবসর নাহি তাঁর।
গরিব রোগীর ভরসা তিনিই—দর্শনী নাহি লন
ওষুধ পথ্য কিনে দেন তারে যদি হয় প্রয়োজন।
বড়ো ডাক্তার বড়ো মন তাঁর—সজ্জন অতিশয়
তাঁহার নিকটে আসিলে রোগীর যন্ত্রণা দূর হয়;—

হিঁদু মুসলিম সবাকার সেবা করেন নিষ্ঠা সহ
ধনী নির্ধন সকলে তাঁহার সমান আজ্ঞাবহ।

কলিকাতায় তাঁর ছেলে মেয়ে থাকে—পেলেন তাদের 'তার'
সেথায় তাঁহাকে দিন দুই তরে যেতে হবে একবার।
'তার' পাইয়াই ইষ্টিশানেতে চলিলেন তাড়াতাড়ি—
মাঠ পার হয়ে গ্রাম পিছু ফেলে বেগে ধায় রেলগাড়ি।

যাত্রীরা সবে বসেছে আরামে—কেহ বিড়ি পান খায়
রাত্রি গভীর—ঝিমায় কেহ বা—কেহ শুয়ে ঘুম যায়।
আঁধার আকাশ—চারিধার তার—ঢাকিয়াছে কালো মেঘ
ঈশান হইতে চমকে বিজুলী—বাড়ে বাতাসের বেগ।
হঠাৎ সবার টুটিলো তন্দ্রা—চেয়ে সবে বাকহারা
দস্যুর দল ঢুকেছে গাড়িতে বুঝিতে পারেনি তারা।
তাদের দেখিয়া ভয়ে জড়ো সড়ো ভাবিয়া আকুল সবে
করিবে কী হায়! শিকল টানিবে !! উপায় কেমনে হবে !!!
মারোয়ারী নারী—দেহেতে তাহার জড়োয়া অলংকার
দস্যুর দল ছিনায়ে লইল তাহার মুক্তা হার।

পুরুষেরা সবে বাধা দিতে তায় সাহস নাহিক পায়
ডাক্তারবাবু ঝাঁপায়ে পড়িল ক্ষিপ্ত সিংহ প্রায়।

তাঁহার সুমুখে নারীর পীড়ন—জীবন থাকিতে নয়
ডাকাতের দল পাইল তাঁহার শক্তির পরিচয়।
যাত্রী ও ডাকাতের মাঝে শুরু হলো মারামারি
কোলের শিশুরা নিদারুণ ভয়ে কেঁদে ওঠে ডাক ছাড়ি।
হুটোপুটি আর জাপ্‌টাজাপ্‌টি কোলাহল চিৎকার
দস্যুর ছোরা সুধীরবাবুর বুক করে দিলো পার।
ডাক্তারবাবু লুটায়ে পড়িলো—খুনে ভেসে গেল দেহ
ডাকাতের দল গেল পলাইয়া—রহিল না আর কেহ।
পরের কারণে একটি জীবন নিঃশেষ হলো হায়
তাঁহার মহান্ স্মৃতিরে আজিকে স্মরি অতি বেদনায়!

এক ঘোড়া ভূতের গল্প

[টেড হিউজিস্-এর "দ্য রেইন-হর্স" অবলম্বনে]

—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

[লেখক-পরিচিতি : টেড হিউজিস্-এর জন্ম হয় ইংল্যাণ্ডের ইয়র্কশায়ারে, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে। মুখ্যতঃ তিনি কবি, বিংশ শতাব্দীর ইংরেজ কবিগণের মধ্যে অন্যতম অগ্রগণ্য ব্যক্তি। কিন্তু ছোট গল্পও তিনি কিছু লিখেছেন, প্রায় সবগুলিই জন্তুজানোয়ার নিয়ে। "দ্য রেইন-হর্স" গল্পে অবশ্য মানুষ ও জন্তু উভয়েই প্রাধান্য পেয়েছে। জন্তু? না জন্তুর ভূত? শেষ পর্যন্ত অনিবার্যভাবেই ধারণা জন্মে যে ঘোড়াটা অশরীরী, রক্তমাংসের দেহধারী জীব নয়।]

বিষ্টিটা যেন পাহাড়ের এ-পিঠে ওৎ পেতে ছিল। চূড়াটা পেরিয়ে যেই রেমণ্ড দুই পা নেমেছে এধারে, ঝিরঝির বারিধারে মুখ মাথা ভিজিয়ে দিল তার। কোটের কলারটা উঁচু করে তুলে দিয়ে রেমণ্ড দাঁড়িয়ে পড়ল অমনি, তাকাল সমুখ পানে। থাকে থাকে নেমে গিয়েছে পাহাড়, প্রতি থাকে অগুন্তি খরগোশের গর্ত। উপত্যকা পর্যন্ত তাকে নামতে হয় যদি, পা ফেলতে হবে অত্যন্ত সাবধানে। নইলে? নইলে গর্তে পড়ে পা ভাঙ্গবে, এই আর কি।

বড়্ডোই বেশী দূর এসে পড়েছে রেমণ্ড। হাঁটতে হাঁটতে কখন যে শহরতলির পীচ-ঢালা

গলি ছেড়ে, এ-খামারের গেট আর সে-আবাদের বেড়ার ফাঁক দিয়ে দিয়ে, একেবারে চষা ক্ষেতের মুলুকে হাজির হয়েছে সে, খেয়ালই ছিল না এতক্ষণ। এখন মনটা তিতো, কারণ জুতোয় কাদা লেগেছে, পেন্টুলানেরও হাঁটু পর্যন্ত ছোট ছোট কাদার ছোপ। তার চেয়েও বড় কথা, হাওয়ায় একটা ভিজে ভিজে মিইয়ে পড়া আমেজ টের পাওয়া যাচ্ছে, যার মানে হল এই যে যে-কোন মুহূর্তে শুরু হয়ে যেতে পারে একটা মুষলধার বর্ষণ। গা সিরসির করে উঠল হঠাৎ। সতর্ক হতে হল, ঠাণ্ডা লেগে না যায়।

তবে এটা ঠিক যে এই জায়গাটার উপরে তার তাক রয়েছে ঢের দিন থেকে। ছবি আঁকে সে। ছেলেবেলায় এদিকটাতেই থাকত। প্রতি ইঞ্চি জায়গাই চেনা এখানকার। এই পাহাড়চূড়া থেকে নীচের ঐ উপত্যকার ছবিটা তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলতে পারলে দেখবার মত জিনিসই হবে একখানা। মতলবটা অনেকদিনের, তা বলে আজই চলে আসবে এখানে, একথা বেড়াতে বেরুবার আগে সে মোটেই ভাবে নি। বর্ষা হামেশাই হচ্ছে, ঋতুটা না-পালটানো পর্যন্ত এখানে এসে ছবি আঁকা ত সম্ভবই নয়।

হ্যাঁ, দৈবাৎই এসে পড়েছে, বলা যেতে পারে। ঐ ত সেই সুপরিচিত দৃশ্য। গভীর উপত্যকা। জনপ্রাণী কোথাও নেই, মাঠগুলো রিক্ত, মাটি ভিজে, যেন প্রাচীন একটা শুকিয়ে-যাওয়া হ্রদের তলায় বৃষ্টি পড়েছে এক পশলা।

কোথাও কিছু না। অবশ্য কোন কিছুর প্রত্যাশা নিয়ে সে আসেও নি। তবু, এসে যখন পড়েছে, যে-ছবি সে আঁকবে, তার প্রেরণা বাবদ যা-হোক-কিছু অনুভূতি ত প্রাণে আসা উচিত! কী রকম অনুভূতি? তা অবশ্য সে বলতে পারে না। ওটা ফর্মাইশ দিয়ে বানাবার বস্তু ত নয়!

তাহলে অপেক্ষা করে দেখতে হয়! নীচের ঐ বেড়াগুলো, ওদের প্রতি বাঁক, প্রত্যেক মোড় রেমণ্ডের চেনা। ঐ দূরবর্তী খামারবাড়িটাতে সদর গেট পাথরের তৈরী, লোহার দরোজা বসানো তাতে। এই খরগোশের গর্তে আকীর্ণ পাথুরে তাকটা, যার উপরে এই মুহূর্তে সে দাঁড়িয়ে আছে, এটার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা কুড়ি বছরের পুরোনো। এ-সবের কোন কিছুই কি কোন সাড়া আজ জাগাবে না তার প্রাণে?

নাঃ। কোন সাড়াই জাগে না। কুড়ি বছর আগের রেমণ্ড, আর আজকের এই রেমণ্ড। এদের ভিতর পার্থক্য অনেকখানি। এ-মুলুক আর চিনতে পারছে না তাকে। পুরোনো আলাপী বলে স্বীকার করছে না মোটেই। না, এ দেশ ওকে আপন বলে গ্রহণ করতে রাজী নয়। তেমনি আবার রেমণ্ডও বুঝি রাজী নয়—

না, নিজের মনের দিকে তাকিয়ে রেমণ্ডও এ দেশকে ঠিক আপন বলে মেনে নিতে পারে না। নাড়ীর যোগ নেই। এ যেন তিন পুরুষের ছেড়ে আসা মুলুকে ফের একবার বেড়াতে আসা। জমিজায়গা যদি এখনো কিছু বজায় থেকে থাকে, তাই বেচেকিনে দু-পয়সা পকেটস্থ করার একটা চেষ্টা করা। নাঃ দরদ নেই। আছে বিরক্তি। আছে ধূমায়মান অসন্তোষ। জুতোর কাদা, পেন্টুলানের

সমুখের চষা-ক্ষেতের উপর দিয়ে পাহাড়ের দিকে দৌড়ে আসছে একটা ঘোড়া। [পৃ. ৬৫

হাঁটু পর্যন্ত কাদার ছোপ, বিষ্টি নামছে তীরের ফলার মত গায়ে বিঁধে যাওয়ার জন্য, আকাশ ঘোলাটে, পথ কাদায় ভরতি, বড় রাস্তা পাক্কা দুই মাইল এখান থেকে, এক হাঁটু কাদা না ভেঙে কোন দিক দিয়েই সেই বড় রাস্তায় পৌঁছোনোর উপায় নেই। কারণ আছে বইকি অসন্তোষের!

ফিরে যাবে রেমণ্ড? যে পথে এসেছে সেই পথ দিয়ে? অথবা এগুতেই থাকবে সমুখ পানে? এগিয়ে গেলে, ঐ যে খামারবাড়িটার পাথুরে গেট আর লোহার দরোজা এখান থেকেই চোখে পড়ছে, ঐ বাড়িতে সে পৌঁছে যেতে পারে, এক মাইল বা সোয়া মাইল হাঁটলে। আর বড় রাস্তাটাও ঠিক ঐ বাড়িরই ওপাশটাতে। মোড় খেতে খেতে প্রায় বৃত্তাকারেই রাস্তাটা ঘুরে এসেছে কিনা! যার ফলে, এই মুহূর্তে রেমণ্ড এমন একটা স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখান থেকে সমুখে হাঁটলেও সে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়তে পারে, পিছনে হাঁটলেও তাই।

কিন্তু সমুখে এগুনোর অসুবিধে আছে একটা। আগের দিনে ঐ খামারের মালিক পরিবারে রেমণ্ড ছিল অতি অন্তরঙ্গ লোক। এখন, এত বৎসর পরে, এই রকম কাদার ভূত সেজে যদি সে হঠাৎ গিয়ে দেখা দেয় সেখানে, অনেক কৈফিয়ত আর জবাবদিহির দায়ে সে ঠেকে যাবে। অন্য একটা সম্ভাবনাও না আছে, তা নয়। বহু বৎসর ওখানকার কোন খবর রেমণ্ড রাখে না। এমনও ত হতে পারে যে ইতিমধ্যে হাতবদল করেছে খামারটা! তাহলে ত পড়ন্ত বেলায় রেমণ্ড ওখানে গিয়ে অপরিচিত লোকের ভিতরেই পড়ে যাবে। তারা হয়ত খারাপ লোকও হতে পারে। রেমণ্ডকে অনধিকার প্রবেশের দায়ে ফেলে অপমানও করতে পারে, পুলিসেও দিতে পারে।

উঃ, দূরদিগন্ত থেকে বৃষ্টিটা সাঁ সাঁ করে ছুটে আসছে দেখ! ভাঙ্গা ভাঙ্গা ধোঁয়াটে-সাদা স্তম্ভের মাথায় মাথায় একটা চলমান জলপ্রপাত যেন। গাছ-গাছালি খামারবাড়ি সবই ঝাপসা দেখাচ্ছে তার আড়ালে পড়ে।

এমন রাগ হচ্ছে নিজের উপরে! এই কাদার ফাঁদে পা দেওয়া চরম মূর্খতা হয়েছে তার। রাগ হচ্ছে এই অপয়া জায়গাটার উপরেও, যেখানে এসে পড়ার দরুনই তার মত একটা করিৎকর্মা লোককে এমন কাদার সং সাজতে হয়েছে। কী করে বেরুনো যায় এ-ফাঁদ থেকে এখন? কী

করে? কী করে? উপায় খুঁজবার জন্যই সে ঘুরপাক খেতে লাগল চারদিকে। হঠাৎ একটা দিকে কী যেন কী ধরা পড়ে গেল তার চোখের কোণে। অমনি পঞ্চেন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল তার। ঘুরপাক বন্ধ করে রেমণ্ড সেই বিশেষ দিকটাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

সমুখের চষা-ক্ষেতের উপর দিয়ে পাহাড়ের দিকে দৌড়ে আসছে একটা ঘোড়া। পাতলা চেহারার একটা কালো ঘোড়া। মাথা নীচু করে ঘাড় লম্বা করে। রেমণ্ডের চট্ করে মনে হল কী, জান? মনে হল, শীকার ধরবার জন্য বেড়াল বা শেয়াল একটা, বুড়ো আঙ্গুলে ভর দিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে ছুটে আসছে যেন।

রেমণ্ড দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু অংশটাতে। তার ডাইনে বাঁয়ে দুই দিকেই গিরিশিরা ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে খানিকটা। কিন্তু ডাইনের দিকে আন্দাজ শো তিনেক গজ দূরে চূড়া দেখা যায় আরও একটা, তার উপরে আবার বেশ কিছু গাছ-গাছালিও আছে বড় বড়। রেমণ্ডের চোখের সামনেই ঘোড়াটা দৌড়ে গিয়ে সেই চূড়াতে উঠে পড়ল, দাঁড়াল একটা ফাঁকা জায়গায়, কালো আকাশের ঠিক নীচে সেই কালো ঘোড়া। দুইয়ের মাঝে ব্যবধান শুধু ধূসর বর্ষার নিশ্ছিদ্র দীর্ঘ ধারা।

দাঁড়াল—কতক্ষণ? কয়েক পলকের জন্যই দাঁড়াল। দুঃস্বপ্নে দেখা হিংস্র বাঘের মতই সেই মুহূর্তে ভয়াল দেখাল তাকে। তারপরই আর এক দৌড়ে সে অন্যদিক দিয়ে নেমে গেল পাহাড়ের গা বেয়ে। রেমণ্ড বেশ সহজভাবে নিতে পারছে না ঘোড়াটাকে। কয়েক সেকেণ্ড সে চক্রবালরেখার দিকে তাকিয়ে রইল প্রত্যাশীর দৃষ্টি দিয়ে। কেমন যেন তার মনে হচ্ছে এবারে ঘোড়াটাকে সে আকাশের মাঠেই ধাবমান দেখতে পাবে। কিন্তু ঘোড়ার চিন্তা ছেড়ে নিজের মাথা বাঁচাবার চিন্তা এবারে পেয়ে বসল তাকে, মাথায় জল যা পড়ছে এবারে, তা দস্তুরমত বরফজল। দূরে আর দৃষ্টি চলে না। নীরেট ধূসর দেয়ালের মত চারদিকে তাকে ঘিরে রেখেছে ঐ বৃষ্টি।

হাত দিয়ে গলাবন্ধ চেপে ধরেছে রেমণ্ড, মুখখানাকে তারই ভাঁজের ভিতরে যথাসম্ভব নামিয়ে দিয়ে সে দৌড়োতে লাগল। পাহাড়-চূড়ার পিছন দিকটা, অর্থাৎ শহরের দিকটায় মুখ করে সে ছুটল যথাসম্ভব জোরকদমে। কিন্তু জুতোর ভিতর পচপচ করছে জল, পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে জল ছিটকে উঠছে মাথা পর্যন্ত, সাধ্য কি যে বেশী জোরে দৌড়োবে?

পাহাড়টা ঢেউখেলানো। পিঠটা ধীরে ধীরে চাগিয়ে উঠেছে কুঁজের আকারে, মাঠগুলোর মাথার উপরে ঝুঁকে ঝুলে রয়েছে সুপ্ত শিশুর মুখের উপরে স্নেহাতুরা জননীর মত। ঐ মাঠগুলোর ওপাশে নদী, সেই নদীর পুল পেরুলেই শহর।

কিন্তু শহর, সে ত ঢের দূর, তার চিন্তা করা নিরর্থক এখন। মাথা গুঁজবার ঠাঁই একটাই চোখে পড়ছে এখন। পাহাড়ের ঐ কুঁজের নীচে থেকে দুই দিকে দুটো বন বিস্তৃত রয়েছে নীচের মাঠ পর্যন্ত। একটা অবিচ্ছিন্ন বন নয়, কারণ মাঝখানে ছেদ রচনা করেছে বেশ বৃহৎ একখণ্ড অনাবাদী ভূমি।

দুটো বন, তাদের মধ্যে নিকটে যেটা, সেখানে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করা স্রেফ্ বোকামি হবে।

কারণ, দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে, বনটা নিছক ছোট ছোট আগাছা আর কাঁটাঝোপে ভরতি। ফাঁকা জায়গা যতগুলো নজরে পড়ছে, সব শেয়ালের গর্তে এবড়ো-খেবড়ো। তার চেয়ে ঐ ওধারের বনটা—খুব বড় গাছ না থাকলেও গাছ আছে ওখানে। বস্তুতঃ হাতে-বসানো ক্ষুদে-ওকের একটা আবাদই ওটা। হোক ক্ষুদে, একা রেমণ্ডের ছয় ফুট মাত্র দেহটাকে লুকিয়ে রাখার জায়গা ওরা দিতে পারবে নিশ্চয়ই। সেই দিকেই পা চালিয়ে দিল রেমণ্ড।

প্রথম বনের মাথার উপর দিয়ে দৌড়ে গিয়ে সে পাহাড়ের মাথা থেকে নীচে নামল। আঃ, কতকটা রক্ষা। বৃষ্টির হাত থেকে না হোক, বাতাসের হাত থেকে ও বেঁচেছে। ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের গা এখানে, সেই ঘাসের ভিতর দিয়ে পথ করে করে ওকে যেতে হচ্ছে। গতি কাজেই তত দ্রুত নেই আর। ওকের আবাদে কাঁটা গাছের বেড়া আবার, সেটা পেরুতে গিয়ে দুই হাতে রক্তপাতই হল খানিক। অবশেষে ওক গাছের প্রথম সারি। ছোট গাছ সব, ডালপালা কম। তবু, বৃষ্টিটা আবার চেপে আসতেই সে নিকটতম গাছটার তলায় ঢুকে পড়ল। ডালপাতা তেমন নেই কিন্তু গাছের কাণ্ডটা হেলানো। রেমণ্ড গিয়ে বসে পড়ল সেই হেলানো জায়গাটার তলায়।

দৌড়োদৌড়ি অনেক হয়েছে, রেমণ্ড হাঁপাচ্ছে তখন। উবু হয়ে সে বসেছে দুই হাঁটুর উপরে থুতনি রেখে আর চোখের দৃষ্টি বৃষ্টিধারার উপরে নিবদ্ধ রেখে। অবিরাম বৃষ্টি, যাকে বলে বেড়াল কুকুর বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টির মত ধূসর তার রং, তির্যক্ রেখায় ডাল-পালা ভেদ করে অদূরের কাঁটাঝোপগুলোর ভিতরে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। এতক্ষণে রেমণ্ডের মনে হল, বিপদটা কেটেছে তার। চারিদিকে শুধু বৃষ্টিরই শব্দ, ঝমঝম, টপটপ, কুলকুল, কত রকম। সেই বহুবিচিত্র শব্দগুলো এক হয়ে মিশে যাচ্ছে, যেমন করে ইট, চুন, সুরকি, সিমেন্ট এক হয়ে মিশে যায় দুর্ভেদ্য দেয়ালে। সেই দেয়ালের আবেষ্টনে রেমণ্ড এখন—হ্যাঁ, আশ্চর্য লাগে শুনতে, রেমণ্ডের মনে হচ্ছে সে এখন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। আশ্চর্য! গায়ের জামা এতক্ষণ লাগছিল বরফের মত ঠাণ্ডা, এখন ধীরে ধীরে তারাই যেন একটু একটু করে গরম হয়ে উঠছে। বেশ একধরনের আরাম লাগছে রেমণ্ডের, অবশ্য ভেবে দেখবার মত শক্তি তখন ওর মগজে থাকলে ও বুঝতে পারত যে ঐ আরাম-বোধটাই হল অসাড় হয়ে যাওয়ার পূর্বলক্ষণ।

গুঁড়ির নীচে রেমণ্ড, গুঁড়ির উপরে ডালগুলো নেমে এসেছে নানা পরিমাপের স্থূল বা সূক্ষ্ম কোণ রচনা করে। ডালগুলোকে দেখাচ্ছে চকচকে কালো, পালিশ-করা লোহার মত। তাদের ডগা থেকে, তাদের প্রত্যেকটা ভাঁজ আর বাঁক থেকে জল ঝরছে ঝরঝর, গুঁড়ির ছালের উপরে স্বচ্ছ সাদা শত শত খাত রচনা করে করে। ডালের ফাঁকে ফাঁকে কদাচিৎ কখনো বহুদূরের শহরের আংশিক একটা চেহারা হয়ত চোখে পড়ছে ক্ষণিকের তরে, তারপরই মিলিয়ে যাচ্ছে আবার, একটানা বৃষ্টির দোলায়মান বিবর্ণ যবনিকার অন্তরালে।

রেমণ্ড ভাবে—চলে যদি এই বৃষ্টি অনন্তকাল, দোষ কী? যতক্ষণ চলবে এই ধারাবর্ষণ, কোন কিছুই করবার নেই তার, বেওজর ছুটি একদম। দৈনন্দিন জীবনধারা থেকে ততক্ষণ সে বিচ্ছিন্ন,

কালপ্রবাহের কোন ঢেউ তাকে স্পর্শ করবে না। বৃষ্টি থামলেই ত ছেঁড়া সুতো জোড়া লাগিয়ে আবার তাকে হাঁটুসমান কাদা ঠেলে পথ চলতে হবে।

জুতোর ভিতর জল করবে পচপচ আর নতুন দামী পোশাকটার বারোটা-বেজে-যাওয়ার দুঃখে মন করবে খচখচ?

হঠাৎ তার গা সিবসির করে উঠল। হাঁটু দুটো আরও টেনে নিয়ে এল রেমণ্ড বুকের ভিতর, তাতে যদি শীতের ভাবটা কাটে। হঠাৎ ঘোড়াটার কথা মনে পড়ে যায় কেন তার? ঘাড়ের চুল কয়েকটা কি খাড়া হয়ে উঠছে নাকি? ভয়? ভয় পাচ্ছে নাকি রেমণ্ড? কী রকম তড়তড় করে ঘোড়াটা পাহাড়চূড়ায় উঠে পড়েছিল, আর অবারিত আকাশের নীচে বাঘের মত হিংস্র দেখাচ্ছিল তাকে, সব মনে পড়ে যাচ্ছে কেন?

নাঃ, মোটেই আর ভাববে না ওকথা রেমণ্ড। ঘোড়া-টোড়া ত আকছারই মাঠে গোঠে ছুটে বেড়ায়! এতে আর অস্বাভাবিক কী আছে?

নেই? আছে বোধহয়। ঘোড়ারা খামোকা বাদলা দিনে পাহাড়ের চূড়ায় চড়ে বসে না, মানুষের দিকে আগুন চোখে তাকায়ও না। কোন্ পথে উঠল, এ্যাঁ? এই যে বনটাতে বসে আছে রেমণ্ড, এবং মাথার উপরে ঐ যে কুঁজো পাহাড়, ঐ পথেই ত? কী জানি কেন, ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের বাঁদিকে গাছের ফাঁকে ফাঁকে দৃষ্টি চালিয়ে দিল রেমণ্ড।

বনের শেষে, পিছন থেকে সাদাটে পাংশু আলোর ফালি একটা এসে পড়ছে যেখানে, কালো ঘোড়াটা ওকে গাছের তলায় ঠিক দাঁড়িয়ে আছে, মাথা উঁচু আর কান খাড়া করে, হিংস্র দৃষ্টি ঠিক রেমণ্ডের উপরেই নিবদ্ধ করে।

ঘোড়া যখন নিরুপায় হয়ে বৃষ্টিতে ভেজে, সে যেন হুঁশপবন হারিয়েই বসে থাকে আধাআধি, পিছনের এক পা উঁচু করে তোলে, মাথা নীচুপানে নামিয়ে দেয়, চোখ থাকে আধবোজা। এইভাবেই সে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে, বৃষ্টি না থামে যতক্ষণ। এ-ঘোড়া ত মোটেই তেমন নয়। একাগ্র মনোযোগ দিয়ে এটা দেখছে রেমণ্ডকে, দাঁড়িয়ে আছে টান-টান হয়ে, ঠিক যেমন বাঘ দাঁড়ায় শিকারের উপরে লাফ মারবার আগে।

রেমণ্ডের শিরার ভিতরে রক্ত যেন জমে যেতে চাইছে। কী করে সে এখন? ওটাকে তাড়াবার চেষ্টা? পাগল আর কি! বন থেকে বেরিয়ে ছুট মারা, তাই বা কী ক'রে করে সে? বৃষ্টি যে ঝমঝম ঝরছেই! ঘোড়াটা—ধুত্তোর, ওর কথা আর মোটেই ভাববে না রেমণ্ড। বনটায় ত জায়গা ঢের, ঘোড়ার আর তার দুজনার জায়গা ত অনায়াসেই হতে পারে এখানে! থাকুক না ও!

হঠাৎ মাটি কেঁপে উঠল! ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে ঘোড়া। গাছের ডালে ডালে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে প্রকাণ্ড জানোয়ারটা ধেয়ে আসছে ঠিক এদিক পানেই। গাছের গুঁড়ির তলা থেকে সাঁ করে উঠে দাঁড়াল রেমণ্ড, ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, একেবারে তার উপরেই এসে পড়েছে দানো-ঘোড়াটা। গলা লম্বা করে বাড়িয়ে দেওয়া, কামড়াবার জন্যে বড় বড় দাঁত বার করা। বড় বড় হলদে

রেমণ্ড তীরবেগে ছুটতে লাগল পাহাড়ের উপরপানে।

হলদে দাঁত। আর ওর চোখ? যেন রক্ত বেরুতে চাইছে ওর দুচোখ ফেটে। রেমণ্ড তীরবেগে ঘুরে গিয়ে গাছের পিছনে দাঁড়াল। তারপর তীরবেগে ছুটতে লাগল পাহাড়ের উপরপানে।

পাহাড়ের উপরপানে, মানে শহরের উলটো দিকে। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে রেমণ্ড ছুটল। এক একবার পিছন ফিরে তাকায় যখন, ঘোড়াটাকে দেখতে পায়ই। জানোয়ারটাও ছুটছে সমানভাবে, তেমনি রক্তচক্ষুতে আগুন ঝরিয়ে, তেমনি হলদে দাঁত বার করে। পাথর কুড়িয়ে কুড়িয়ে এক একবার সে ঢিলও মারছে ওটাকে, সে-ঢিল লাগছেও ওর গায়ে, কিন্তু গা থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ছে কই? সব ঢিল যেন সেঁধিয়ে যাচ্ছে ওর গায়ের ভিতরে, যেমন করে বুলেট ঢোকে রক্তমাংসের দেহে। কিন্তু বুলেট ঢোকা, আর পাথর ঢোকা কি এক কথা হল? তাছাড়া বুলেটের ক্ষত দিয়ে রক্ত ঝরে, পাথর যেখান দিয়ে ঢুকছে, সেখানে রক্ত কই?

ছুটছে রেমণ্ড, ছুটছে আর পিছন ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। কতবার হোঁচট খেলো, কতবার পড়তে পড়তে বেঁচে গেল, কতবার পড়ে গিয়েও উঠল আবার, তার হিসেব কে রাখে? কতক্ষণ যে সে এমনি ভাবে ছুটেছিল, তার হুঁশ নেই রেমণ্ডের। হুঁশ হল, যখন এক যুগ আগের পরিচিত সেই খামারবাড়ির পাথুরে গেটের ভিতরে গিয়ে সে আছাড় খেয়ে পড়ল। সূর্য তখন ডোবে-ডোবে।

পুরোনো লোকেরাই আছে খামারবাড়িতে। তারা চিনল বই কি রেমণ্ডকে। চিনল, ঘরে নিয়ে তুলল, পোশাক বদলে দিল। আর বলল—"বড় বেঁচে গিয়েছ আজ। বছর পাঁচেক আগে এক ঘোড়সওয়ার পথিক এমনি এক বাদলা দিনে বজ্রাঘাতে মারা যায় ঐ উপত্যকায়। পথিকটা ভূত হয়েছে কিনা, জানিনে, তাকে দেখে নি কেউ এযাবৎ। কিন্তু ঘোড়াটা যে হয়েছে ভূত, তা ত চোখেই দেখলে। এমনি বাদলা দিনে ওর ছুটোছুটির অন্ত থাকে না। তখন যাকে দেখতে পায়, তাকেই তাড়া করে। দুই একজন মারাও গিয়েছে, পালাবার সময় পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে।"

● দামুর বড়াই কে ধরবে—
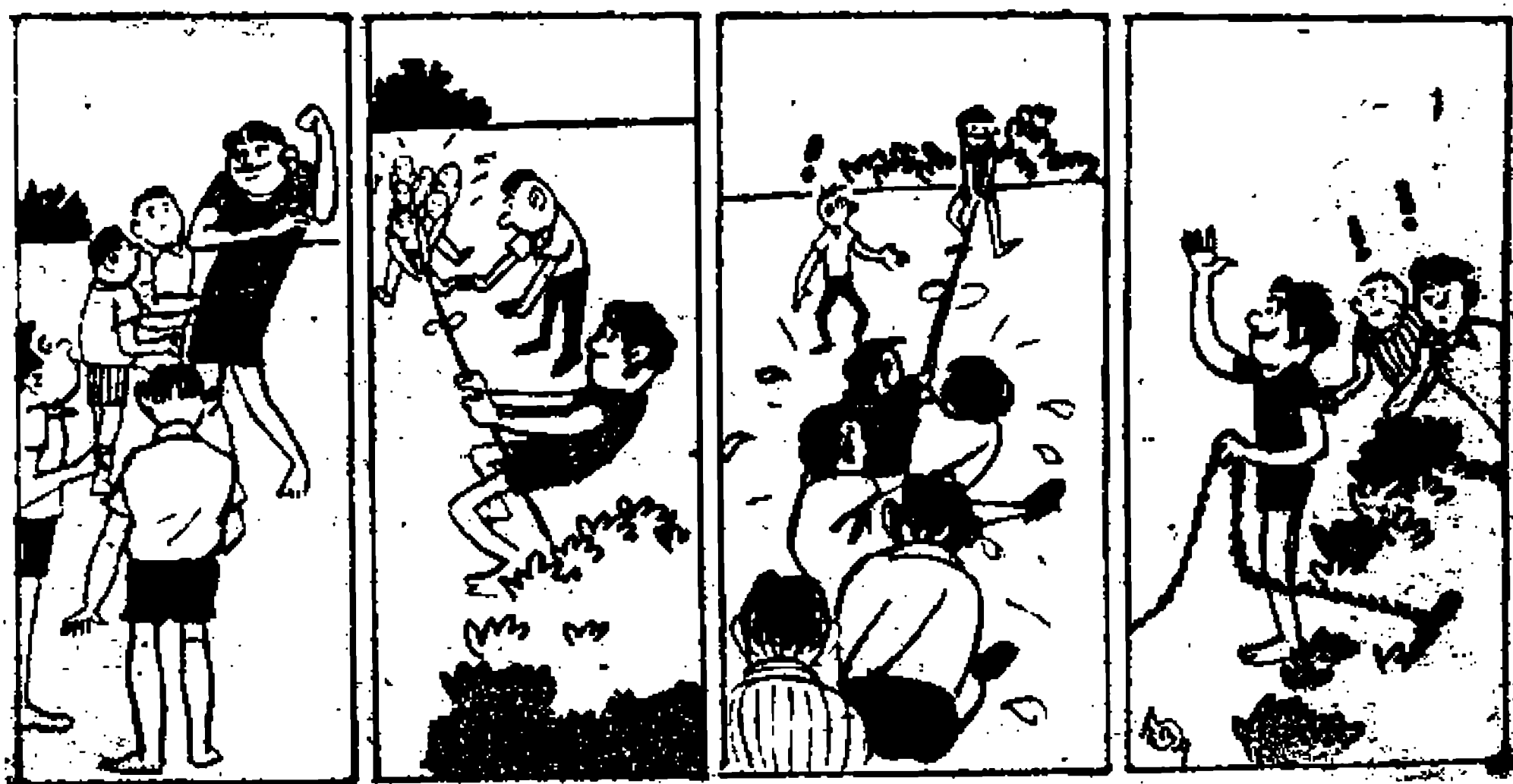
(অলৌকিক কাহিনী)

—স্বপনবুড়ো

পল্লী অঞ্চলে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাড়ি। চক-মেলানো দোমহলা, তেমহলা দালান নয়। উঁচু-উঁচু শক্ত ছনের ঘর।

চারদিকে ঘোরানো মাটির বারান্দা। গোবর লেপে লেপে তাকে সানের মতো চকচকে করে তোলা হয়েছে। একটুখানি সিন্দুর পড়লেও আলগোছে তুলে নেয়া যায়।

বাড়ির চারদিকে নারকেল, তাল আর সুপুরি গাছ। পুকুরই আছে গোটা কয়েক। প্রত্যেকটি পুকুরেই প্রচুর মাছ কিলবিল করছে।

টানা লম্বা গোয়ালঘর রয়েছে সারি সারি। তাতে অনেক দুধোলো গাই।

বাড়ির প্রয়োজনে যা দরকার হয়—তা নিয়ে বাড়তি ঘি আর দুধ বাজারে বিক্রি করা হয়।

বাড়-বাড়ন্ত সংসার। একটু দূরেই বেশ কয়েক শ' বিঘে ধানী জমি।

বাড়ির মাঝে মাঝে বড় বড় উঠোন। এইখানে ধান সেদ্ধ আর ধান শুকোনো হয়। নবান্নের সময় বহু মুনিষ খাটে। 'আসুন জন' বসুন জনের অভাব নেই।

তাদের জন্যে আলাদা অতিথশালা আছে। এ ছাড়া বাড়িতে এক এক বেলায় দেড়শ পাত পড়ে। বাড়ির জোয়ান ছেলেরা কাজ ছাড়া থাকতে পারে না। বাড়ির কর্তা এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। তাই সারা বাড়ি তদারক করে ফেরেন, আর গাছতলায় বসে গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানেন।

বাড়ির উঠোনগুলিতে নানা ধরনের কাজ চলে। কোথায়ও নারকেলের কাঁদি পেড়ে গুনে নেয়া হচ্ছে—কোথায়ও সুপুরিগুলো থলেতে ভরতি করা হচ্ছে—, কোনো উঠোনে বড় বড় কড়াইতে

গুড় জ্বাল দেয়া চলছে, আবার কোথায়ও বা বাড়ির বৌ-ঝিরা ঢেঁকিতে ধান কুটছে। কোনো উঠোনে সেদ্ধ ধান শুকুতে দেয়া হয়েছে। কোথায়ও রাশিরাশি আক এনে পাঁজা করে রাখা হচ্ছে।

এই বাড়ির বৌ-ঝি-ছেলে-বুড়ো সবাই সব সময় হাতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

অতি ভোরবেলা প্রতিটি উঠোনে গোবরজল ছড়া পড়ে। তারপর গোয়ালঘরে গিয়ে বৌ-ঝিরা গাই দুইয়ে নিয়ে আসে।

এই ভাবেই সারাদিনের কাজ শুরু হয়ে যায়। কাজ নিয়েই এদের দিনের আরম্ভ, আবার কাজ করতে করতেই এরা ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে।

সেদিন সকাল বেলাতেই বৌ-ঝিদের কলরব কান্নাকাটি আর চিৎকার।

যারা গোয়ালঘরে দুধ দুইতে গিয়েছিল—তাদের কাছ থেকেই কলরবটা ভেসে আসছে।

আবার দুচার জন পুরুষকণ্ঠের হাঁকডাক শুনতে পাওয়া গেল—

—কী সর্বনেশে কথা! গরুর বাঁট থেকে দস্যিটা দুধ চুরি করে খাচ্ছে।

অনেক লোক জমে গেল গোয়ালঘরের সামনে।

একদল হাততালি দিতে লাগল।

আর একদল লাঠি-সোটা আনতে ছুটল।

বাড়ির ঠাকুমা-দিদিমা-পিসীমারা বলল,—ওরে—তোরা লাঠি আনিসনি। ওর মাথার ওপর কি লাঠি তুলতে আছে? ও যে আমাদের বাস্তুর জ্যান্ত দ্যাব্‌তা—

অবশেষে আসল ব্যাপারটা জানতে পারা গেল। একটা সাপ একটা গাইয়ের পেছনের দুটো পা পেঁচিয়ে ধরে বাঁট থেকে চুক্ চুক্ করে দুধ চুরি করে খাচ্ছিল।

ঠাকুমা-দিদিমার দল কইলে, ওরে, তোরা ওর পেছনে কখনো লাগিস্ নি। ও যে আমাদের বাস্তু সাপ। বাস্তু সাপের পূজো দিতে হয়। আমরা ত' ঠিক মতো পূজো দিতে পারিনে। তাই আমাদের বাস্তু সাপ কৃপা করে গোয়াল থেকে গাইয়ের দুধ খেয়ে গেল। এ ত আমাদের সাত জন্মের পুণ্যির ফল।

এই বাড়ির একমাত্র খুড়ো—তার নাম অশান্ত। দেখতেও অশান্ত—কাজেও অশান্ত। ডাকাবুকে দজ্জাল ছেলে। সব কাজে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায়। ঠাকুর-দেবতা ভূত-প্রেত-দত্যি-দানো—কিছু মানতে চায় না।

বুক ঠুকে বললে,—আমি দেখবো, কি করে সাপ এসে গরুর বাঁট থেকে দুধ খেয়ে যায়। আমার চোখে পড়লে—শয়তান ব্যাটার মাথাটা একেবারে থেঁতলে দেবো। পালিয়ে যাবার আর ফুরসত পাবে না। বাস্তু সাপ না হাতি।

বাস্তু সাপ ততক্ষণে দুধ খেয়ে পালিয়ে গেছে। তাই আর তাকে দেখতে পাওয়া গেল না।

বাড়ির বুড়ীর দল কিন্তু শিউরে উঠল।

—ওরে অশান্ত, অমন করে বলতে নেই। বাস্তু সাপ আমাদের সব বিপদ-আপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখে। দুর্দিনে আমাদের রক্ষা করে।

অশান্ত কিন্তু কিছুতেই শান্ত হয় না। বলে, বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করার নমুনা ত বেশ দেখছি। মাঝখান থেকে এইভাবে গরুর দুধ চুরি যাচ্ছে। এরপর ছেলেপেলেদের কখন কোথায় সুযোগ পেয়ে কামড়ে দেবে, আগে কোনো হদিসই পাওয়া যাবে না। তখন মাথা থাবড়ে মরা-কান্না শুরু করলে কী হবে? ওই যে কথায় বলে না, আগুনের শেষ, শত্রুর শেষ আর রোগের শেষ রাখতে নেই। বিপদ একটা মাথার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে—তখন কি আর সামাল দিতে পারা যাবে?

ঠাকুমা-দিদিমারা কিন্তু সেকথা শুনতে রাজী নয়। বলে, ওরে দস্যি ছেলে, সব সাপ কি বিষ ঢালে? এ যে আমাদের বাস্তু সাপ। এর মাথার ওপর লাঠি তুললে—একেবারে নির্বংশ হয়ে যাবি রে হতভাগা—

অশান্ত কিন্তু অবিশ্বাসের হাসি হাসতে থাকে। চোখ নাচিয়ে আর হাত দুলিয়ে বলে, আমাদের নির্বংশ যদি কেউ করতে পারে—তবে এই বাস্তু সাপই সে কাজ বেশ নিরিবিলি সমাধা করতে পারবে। প্রথমে দুধ চুরি দিয়ে শুরু করেছে। তারপর এই বাড়ির আণ্ডা-বাচ্চাগুলোকে কামড়ে দেবে। জোয়ান ছেলেদের ধরবে তারপর। সব শেষে বুড়ীদের গলা পেঁচিয়ে মেরে ফেলবে। আপদ একেবারে চুকে যাবে। অশান্তর কথা শুনে সবাই ভয় পায়, শিউরে ওঠে। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করতে চায় না।

এ যে চিরকালের কথা। বাস্তু সাপ কি কখনো গেরস্তের অকল্যাণ করে? একটু গাইয়ের দুধ খেয়েছে, তাতে আর কি হয়েছে? বাড়ির সবাইকার অকল্যাণ দূর করে,—ওর ত একটা দাবি আছে এই বাড়ির ওপর। দুধ না খেলে ওই বা বাঁচে কি করে?

সেই দিন থেকে বাস্তু সাপের জন্যে বরাদ্দ হয়ে গেল, রোজ এক বাটি দুধের।

বাড়ির ঠাকুমা-দিদিমারাই এই ব্যবস্থা করে দিলে।

অশান্ত যতই কেন না তড়পাক্,—বুড়ীদের চিরকালের বিশ্বাসের কাছে তাকে হার মানতেই হল।

কিছুদিন বেশ শান্তিতে দিন কাটতে লাগল। সবাই যার্ যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

দুধোলো গাই দুধ দেয়, গিন্নীরা সংসার দেখে, বৌ-ঝিরা ঢেঁকিতে ধান কোটে; জোয়ানের দল ক্ষেত খামারের কাজে গায়ের ঘাম ঝরায়; আর মুনিষেরা বাগান সাফ করে, কলা গাছের কাঁদি কেটে আনে, নারকেল গাছের জঞ্জাল সাফ করে, ডাবগুলি পেড়ে এনে হাটে বাজারে পাঠাবার ব্যবস্থা করে।

তা ছাড়া ঠাকুমা-দিদিমারা মুড়ি ভাজে, চিড়ে ভাজে, গুড় দিয়ে নানা রকম মোয়া তৈরি করে।

এইভাবে বিরাট এই চাষীবাড়ির ক্ষেত-খামারের শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। যজ্ঞি বাড়ির উনুন নেভে না।

হঠাৎ একদিন সকালবেলা আবার বাড়িতে শোরগোল শোনা গেল।

উঁচু চালের ওপর সারি সারি পায়রার খোপ। যে লোকটা রোজ ভোরে ঘুম থেকে উঠে পায়রাদের খোপগুলি খুলে দেয়—সে চালের ওপর থেকেই চিল-চিৎকার শুরু করে দিলে।

খোপের ভেতর পায়রাদের রাশি রাশি পালক শুধু পড়ে আছে। সেখানে একটি পায়রাও নেই।

উঠোনে বাড়িসুদ্ধ লোক এসে জড় হল।

—কে পায়রাগুলোকে এমন করে খেয়ে গেল? একজন বল্‌লে, এ নিশ্চয়ই বেজির কাজ—

আর একজন মন্তব্য করলে—হুলো বেড়ালটা এই কাণ্ড করেনি ত?

কেউ কেউ শেয়ালের নামে দোষ দিতে যাচ্ছিল? কিন্তু শেয়াল অত উঁচু চালে উঠতে সাহস পাবে না।

সবাই মাথা নেড়ে বললে, ঠিক—ঠিক। তখন সকলে দোষ দিতে লাগল সেই লোকটিকে, যে রোজ পায়রার খোপ বন্ধ করে।

সবাইকার কাছে গালাগালি শুনে সে বললে, আমি নিজে হাতে সব খোপের দরজা বন্ধ করেছি। কাজেই আমার দিক দিয়ে কোনো গলতি হয়নি।

অশান্ত কিন্তু একেবারে রেগে খাপ্পা। কেন না, পায়রার শখ ওরই সব চাইতে বেশী। তাই রাগে গরগর করতে করতে সে নিজেই একেবারে চালের ওপর উঠে গেল।

চারদিকে বেশ করে তাকাতাকি করে হুংকার ছাড়ল একেবারে মেঘনাদের মতো—

—এই ত আসল আসামীর সন্ধান পাওয়া গেছে।

তখন নীচে থেকে সবাই চিৎকার করে উঠল, কে আসল আসামী শুনি?

অশান্ত চালের ওপর দাঁড়িয়ে দুটো হাত আকাশের দিকে তুলে মেঘের ডাকের মতো করে কইলে, প্রমাণ আমি পেয়ে গেছি—কে আসল আসামী—

এই বলে সে নীচু হয়ে পায়রার খোপগুলির পেছন থেকে একটা সাপের খোলস তুলে সবাইকে দেখালে।

চিৎকার করে কইলে, যে আমাদের সব সময় মঙ্গল কামনা করে—সেই তোমাদের আদরের দুধ কলা দিয়ে পোষা, বাস্তু সাপ গো।

—আমি বুঝতে পেরেছি এ সেই শয়তানটার কীর্তি। আমি শহরে বাজারে ঘুরে এত টাকা খরচ করে এমন দামী দামী সব পায়রা নিয়ে এলাম—আর সব ওই রাক্ষুসে সাপের পেটে গেল? আমি তোমাদের সবাইকে বলে দিচ্ছি, আমার হাত থেকে ওর আর নিস্তার নেই—

ঠাকুমা-দিদিমারাও সব থ' বনে গেল। রোজ আলাদা করে দুধ-কলা খাওয়ানো হচ্ছে, তবু বাস্তু সাপটা আমাদের মুখে চুন-কালি মাখিয়ে দিল!

এখন যদি দস্যি অশান্তটা লাঠি নিয়ে ধাওয়া করে তাহলে ওকে বাধা দেবে কে?

অশান্তর সত্যি একটা দস্যিদল ছিল। অশান্ত একবার ওদের ডাকলেই, সবাই একেবারে লাঠি নিয়ে এসে হাজির।

তারপর শুরু হল, ঝোপ-জঙ্গল, বন-বাদাড় খোঁজা।

অশান্ত রাগের মাথায় দলের সবাইকার কাছে খবর পাঠিয়ে দিল। তারা লাঠি হাতে সব তক্কে তক্কে রইল। প্রথমে গোটা বাড়ির আনাচে-কানাচে খুঁজে বেড়ালো। সেখানে কোথায়ও তাকে দেখা গেল না। তারপর শুরু হল ঝোপ-জঙ্গল, বন-বাদাড় খোঁজা। ঝিলের ধারে, বাঁশবনের আশে-পাশে, আমবাগানে, শাক-সবজির ক্ষেতে—কোথাও তার লেজের ডগাটি অবধি দেখা গেল না।

পুকুরগুলোর ধারে ধারে যে সব কলা বাগান আছে—সেখানে আঁতিপাঁতি করে দেখা হল। নাঃ, কোথাও সে দুশমন সাপ নেই।

কেউ কেউ বললে, সাপ খোলস বদলাবার পর কয়েকদিন গর্তের ভেতর ঝিম মেরে পড়ে থাকে। বাড়ির উঠোনে, আশেপাশে ঢেঁকিঘরে, ধানের গোলায় সব জায়গায় দেখা হল। কোনোখানে তেমন কোনো গর্ত খুঁজে পাওয়া গেল না।

এমন কি উৎসাহী অশান্ত ঠাকুমা-দিদিমাদের খাটের তলায় অবধি খুঁজে দেখল। কোথায়ও ত সাপের গর্ত নেই।

তবে ওই দানবটা পালালো কোথায়? একবার অশান্ত ভাবলে, নিশ্চয়ই সাপটা কুকীর্তি করে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে।

যাক্, তাহলে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

আর বেটা জ্বালাতে আসবে না।

অশান্ত আবার শহরে-গঞ্জে গিয়ে নতুন নতুন সুন্দর পায়রা কিনে আনবে কিনা সেই কথা ভাবতে লাগল। বন্ধুদের নিয়ে এই ব্যাপারে আলাপও করল।

এজন্যে অশান্ত একটা নৌকো ভাড়া করল। খাল দিয়ে নদীপথে যাবে—গঞ্জে।

তারপর পছন্দমত পায়রা কিনে নৌকোয় করে খাঁচাগুলো নিয়ে আসতে কোনো অসুবিধে হবে না।

সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেল।

বন্ধু-বান্ধবদেরও খবর দিয়ে রাখা হয়েছে। ওরাও সরাসরি এসে নৌকোয় উঠবে।

অশান্তর শখ অনেক সময় নৌকোয় উঠে নিজেই দাঁড় টানে। সে সেইজন্যে একটি শখের দাঁড় তৈরি করে রেখেছে! সে দাঁড়টি রাখা আছে ঠাকুমার ঘরের চালের বাতার সঙ্গে বাঁধা।

নৌকোয় ওঠবার আগে অশান্ত গেল সেই শখের দাঁড়টি খুলে নিয়ে আসবার জন্য।

দরজাটা খুলতেই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘরটা একটু অন্ধকার।

কিন্তু পুব দিকের জানলাটা খোলা।

সেই জানলা দিয়ে মেঝের ওপর যে আলো এসে পড়েছে—তাতে দেখা গেল, সেই দুশমন সাপটা খাটের তলায় রাখা একবাটি দুধ চুকচুক করে খাচ্ছে।

নিশ্চয়ই ঠাকুমার গোপন ব্যবস্থা।

নইলে যে সাপটাকে কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যায়নি, সে দিব্যি নিরিবিলি ঠাকুমার ঘরের খাটের তলায় বসে মনের আনন্দে একবাটি দুধ সাবাড় করছে!

অশান্ত পা টিপে টিপে বাইরে গেল। দাওয়াতে রাখা ছিল তার তেল-পাকানো পাকা বাঁশের লাঠি। সেইটে নিয়ে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল।

দূর থেকে দেখেই আপন মনে বিড়বিড় করে অশান্ত কইলে, হ্যাঁ, আমি তোমায় চিনতে পেরেছি রতনলাল। তুমি আমার চোখকে কিছুতেই ফাঁকি দিতে পারনি। তারপর দু'পা এগিয়ে গিয়েই হাতের সেই পাকা বাঁশের লাঠি সাপটির মাথায় মেরে চিৎকার করে কইলে, এইবার রতনলাল, দেখি কে তোমায় বাঁচায়!!

সঙ্গে সঙ্গে হাতের লাঠি দমাদ্দম সাপটার মাথায় পড়তে লাগল।

অশান্ত উন্মাদের মতো চিৎকার করতে লাগল, শয়তান রতনলাল, দেখি এইবার কে তোকে বাঁচায়!

অশান্তর ওই দারুণ চিৎকার শুনে বাড়িসুদ্ধ লোক এসে ঠাকুমার দরজার সামনে ভিড় করেছে। ততক্ষণে সাপটার মাথা লাঠির ঘায়ে একেবারে থেঁতলে গেছে।

তবুও অশান্তর আক্রোশ মেটেনি। সে ক্রমাগত চিৎকার করে চলেছে, এইবার শয়তান রতনলাল, দেখি কে তোকে বাঁচায়!

প্রথমে ঠাকুমাই বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠলেন।

—ওরে অশান্ত, তুই কী সর্বনাশ করলি রে! বাস্তু সাপকে মেরে ফেললি। এখন গোষ্ঠীসুদ্ধু লোক যে মারা পড়বি। তখন কে তোদের রক্ষা করবে?

অশান্ত কিন্তু 'রতনলাল' 'রতনলাল' বলে কেবলি চিৎকার করতে করতে মেঝের ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

অশান্তকে সবাই ধরাধরি করে ঠাকুমার বিছানাতেই শুইয়ে দিলে।

অনেকক্ষণ কেটে গেল, তবু অশান্তর জ্ঞান ফিরে এলো না।

ঠাকুমা তখন মরাকান্না শুরু করে দিলেন—ওরে আমার ভরা সংসারে এ কী সর্বনাশ হল

রে! বাস্তু সাপের মাথায় কেউ কখনো লাঠি মারে? বাস্তু সাপ হচ্ছেন দেবতা। সংসারের কল্যাণ সাধন করেন। সেই বাস্তু সাপকে লাঠি পেটা করে মেরে ফেললে। এর চাইতে অলক্ষুণে কাণ্ড আর কি হতে পারে? আমরা এখন সবংশে নির্বংশ হতে চলেছি রে।

ঠাকুমার এই মরাকান্না শুনে বাড়ির বৌ-ঝিরাও ঠাকুমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করে দিলে।

সবাই যদি গলা ছেড়ে কাঁদে—তাহলে কে কাকে সান্ত্বনা দেয়?

বাড়ির ব্যাটাছেলেরা বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল। তারা যে ঠিক কি করবে, বুঝে উঠতে পারছিল না।

সবাই অসহায়ের মতো এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। কী যে এখন করা দরকার—বুঝে উঠতে পারছে না।

প্রথমটা—সাপটাকে বন-বাদাড়ে ফেলে দিয়ে আসতে হয়। তারপর অশান্তর জ্ঞান ফিরে আসছে না, সেজন্যে কবিরাজমশাইকে ডাকা দরকার। বাড়িতে এইরকম একটা কাণ্ড হয়ে গেল, সেজন্য শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করতে হবে কিনা—সেকথা ঠাকুমাই ভালো বলতে পারেন।

বাড়ির একজন কর্তাব্যক্তি ঠাকুমার কানে-কানে গিয়ে কি যেন জিজ্ঞেস করলে।

ঠাকুমা অমনি শিউরে উঠে বললেন, অমন অলক্ষুণে কথা মুখেও আনবি নে। বাস্তু সাপ হচ্ছেন দেবতা। তাকে কি জলে-জঙ্গলে ফেলে দেয়া চলে? তার যথারীতি সৎকার করতে হবে। তোরা আগে চন্দন কাঠের ব্যবস্থা কর। নতুন বস্ত্র, নতুন গামছা আনতে হবে। চন্দন বেটে সারা দেহে লেপে দিতে হবে! ফুল আর মালা দিয়ে সাজিয়ে দিতে হবে দেহ। তারপর তোদের সবাইকে খাটে তুলে কাঁধে নিয়ে দাহ করবার জন্য শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে। কোনো কাজে যেন কোনো ত্রুটি না হয়।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঠাকুমা অশান্তর দিকে তাকিয়ে বললেন, অশান্ত ত আমার বংশধর। যত পাপই সে করে থাকুক না কেন—ওর জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে হবে। ওরে, তোরা কোবরেজমশাইকে খবর দে।

অশান্ত আগে সুস্থ হয়ে উঠুক, তারপর ওর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করতে হবে। কোনো কাজে যেন কোনো ত্রুটি না হয়। এ ব্যাপারে আমাদের কুলপুরোহিতের সঙ্গেও পরামর্শ করতে হবে। তাঁকেও তোরা একটা খবর দে।

সঙ্গে সঙ্গে নানাদিকে লোক ছুটে গেল বাস্তু সাপের সৎকার করার আয়োজন উদ্যোগ করতে।

আর লোক গেল কবিরাজমশাইকে আর কুলপুরোহিতকে ডেকে আনতে।

অনেক ছুটোছুটি, বহু ধরাধরির পর কবিরাজমশাই এলেন অশান্তকে দেখতে।

তিনি বেশ মনোযোগ দিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করে বললেন, মনে একটা দারুণ উত্তেজনা হতেই শ্রীমান অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমি উত্তম ঔষধ দিয়ে যাচ্ছি। এখুনি জ্ঞান ফিরে আসবে।

সত্যি, ওষুধ খাইয়ে দেবার কিছু পরেই অশান্তর জ্ঞান ফিরে এলো।

সে প্রথমে চারদিকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকাতাকি করলে। তারপর অস্ফুটকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, এইবার রতনলালের উপযুক্ত সাজা হয়েছে। ওর মুখটা আমি থেঁতলে দিয়েছি। শয়তানটা ঠিক মারা গেছে ত?

অশান্তর মুখে এই জাতীয় কথা শুনে বাড়ির লোকে মনে করলে, বাস্তু সাপটাকে মেরে সত্যি সত্যিই অশান্তর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

যাই হোক তার যে জ্ঞান ফিরে এসেছে, এতেই বাড়ির সবাই নিশ্চিন্ত হল।

ধীরে ধীরে ঘন কুয়াশার একটা আবরণ অশান্তর চোখের ওপর থেকে উঠে গেল।

প্রাচীনকালের সপ্তগ্রাম।

বাঙলাদেশের এক বর্ধিষ্ণু বাণিজ্য-নগরী। অশান্ত এই নগরীতে এক খ্যাতিমান তরুণ শিল্পী। মূর্তিনির্মাণে আর চিত্র-অঙ্কনে যশোপালের যশ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তি, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, ছাত্রসমাজ...সকলেই যশোপালের মূর্তির আর চিত্রের বিশেষ অনুরাগী। শ্রেষ্ঠীগণ যশোপালের নির্মিত মূর্তি দিয়ে নিজেদের সুরম্য অট্টালিকা সজ্জিত করে থাকেন। ছাত্রদল সর্বদা যশোপালের নির্মিত সরস্বতী মূর্তি তাদের পাঠগৃহে সযত্নে রক্ষা করে থাকে।

বিদেশী সওদাগরগণ সপ্তগ্রামে এসে সর্বপ্রথম যশোপালের তৈরী মূর্তি ক্রয় করতে তার গৃহে সমবেত হন।

যশোপালের মূর্তির প্রশংসা যে শুধু সপ্তগ্রামে তাই নয়, অন্যান্য দেশেও তার সুন্দর সুন্দর মূর্তির চাহিদা আছে। যশোপাল দিন রাত্রি পরিশ্রম করে নতুন নতুন পরিকল্পনায় মূর্তি নির্মাণ করে থাকে। সপ্তগ্রামের অন্য কোনো শিল্পীর সে পরিকল্পনা নেই। হাতের কাজও তেমন সূক্ষ্ম নয়। তাই যশোপালের শিল্পকুশলতার কাছে সকলের সৃষ্টিই ম্লান হয়ে যায়।

যশোপালের এক ছোট বোন আছে। তার নাম যশোমতী। এই যশোমতী তার দাদার কাছে অতি চমৎকার মূর্তি নির্মাণ করতে শিখেছে। যশোমতীর হাতের মূর্তিগুলি বেশ লাবণ্যময়ী হয়। দাদার সূক্ষ্ম কারুকৌশল যশোমতী অতি অল্প দিনের মধ্যেই আয়ত্ত করে নিয়েছে। যশোমতী খুব কম কথা বলে। দেখতেও তার শিল্প-নৈপুণ্যের মতোই সুন্দরী। তার অপরূপ চোখ দুটি অতি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। অনেক সময় যশোপাল কৌতুক করে বলে থাকে,—দ্যাখ যশোমতী, তোর চোখ দুটির নমুনা দেখেই আমি রাজকন্যা, অপ্সরা আর কিন্নরীদের চক্ষু তৈরি করে থাকি।

দাদার মুখে এই কথা শুনে যশোমতী লজ্জা পায়। কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করে না। শুধু মাথা নত করে মুখ টিপে মৃদু মৃদু হাসে।

একদিন যশোপালের সঙ্গে এক বিচিত্র ব্যবসায়ী দেখা করতে এলো। একেবারে দীর্ঘ শীর্ণদেহ, চোখ দুটি কুঁতকুতে—সাপের মতো জ্বলছে। পরিধানে বিচিত্র বেশ। মনে হয় যেন সাপের খোলস পরে এসেছে।

এই ব্যবসায়ী এক অদ্ভুত প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। সপ্তগ্রামে সব শিল্পীদের তৈরী শিল্পসম্ভার সে দাদন দিয়ে অগ্রিম ক্রয় করে নেবে। তারপর বছর শেষে বিক্রির সব পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দেবে। এই প্রস্তাবে সপ্তগ্রামের সব শিল্পীই সম্মতি জানিয়েছে। সারা বছর ধরে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আর দর-দস্তুর করতে হবে না। বিক্রীত জিনিসের মূল্যের জন্যও নিশ্চিন্ত থাকবে। বছর শেষে যার যা প্রাপ্য রতনলাল মিটিয়ে দেবে।

কথাবার্তা আর হাবভাব দেখে মনে হল—রতনলালের অনেক অর্থ আছে। আর এইভাবে সে ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে। রতনলাল আরো জানালে যে, তার কয়েকটি বাণিজ্য-পোত আছে। সেই সব বাণিজ্য-পোত পূর্ণ করে সে দেশ-বিদেশে নানাজাতীয় শিল্প-সম্ভার প্রেরণ করে থাকে। প্রথম দর্শনেই রতনলালকে দেখে যশোপালের আদৌ ভালো লাগল না। মনে হল—ওকে দেখতে যেমন সাপের মতো,—ওর মনেও তেমনি শয়তানি বুদ্ধি খেলা করে বেড়াচ্ছে।

তাছাড়া যশোপালের কাজের ধারা সম্পূর্ণ পৃথক্। বহু শ্রেষ্ঠী ও ব্যবসায়ী তার শিল্পকর্ম উচ্চ মূল্যে ক্রয় করে নিয়ে যায়। বহু সময় চাহিদা অনুযায়ী সে তার মূর্তি সরবরাহ করতে পারে না। দিন-রাত পরিশ্রম করেও লোকের আগ্রহ সে মেটাতে পারে না। সুতরাং রতনলালের প্রস্তাবে যশোপাল সম্মত হবে কেন? তারা ভাই-বোনে মিলে প্রচুর উপার্জন করে। তাই তাদের সংসারে কোনো অভাব নেই।

রতনলালের প্রস্তাবে যশোপাল রাজী না হওয়াতে—সে ভারি চটে গেল। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা হবে—এই কথা বলে সে তাড়াতাড়ি যশোপালের গৃহ থেকে চলে গেল।

যশোপাল মনে মনে ভাবলে, আপদ বিদায় হয়েছে, এইবার শান্তিতে কাজ করা যাবে।

কিন্তু যশোপাল বেশী দিন নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারল না।

একদিন সকাল বেলা মূর্তিমান শয়তানের মতো রতনলাল এসে তার বাড়িতে উপস্থিত হল।

এবার তার প্রস্তাব সম্পূর্ণ পৃথক্। রতনলাল যশোপালের বোন যশোমতীকে বিয়ে করতে চায়। এজন্যে সে সম্মতির জন্যে এসেছে। রতনলাল সেই সঙ্গে একথাও জানিয়েছিল যে, এই সপ্তগ্রামে তার অনেকগুলি প্রাসাদতুল্য বাড়ি আছে। একটি গৃহ সে তার নব-বিবাহিত পত্নীর নামে লিখে দেবে। তাছাড়া সে বাণিজ্য-পোতের সংখ্যা সম্প্রতি অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। অগাধ অর্থের সে মালিক। কাজেই যশোমতী যে তার কাছে সুখেই থাকবে—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

রতনলালের এই প্রস্তাব শুনে যশোপাল ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। সে সামনের পথটা দেখিয়ে বললে, এই মুহূর্তে তুমি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও। আমার বোন তোমার গৃহে পা ধুতেও যাবে না।

সঙ্গে সঙ্গে রতনলালের চোখ দুটি সাপের চোখের মতো জ্বলে উঠল। সে ফোঁস-ফোঁস করে উত্তর দিলে, তোমার এই অহংকার আমি ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবো—তবে আমার নাম রতনলাল।

এক শ্রেষ্ঠীপুত্রের সঙ্গে যশোমতীর বিয়ে ঠিক হয়েছিল। বোধ হয় শীঘ্রই তাদের শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়ে যেতো।

কিন্তু রতনলালের শয়তানি বুদ্ধিতে পাত্রপক্ষ দিন কয়েক পরে এসে যশোপালকে জানিয়ে গেল যে, পাত্রপক্ষ অন্য জায়গায় তাদের ছেলের বিয়ে স্থির করেছে। যশোমতীর সম্পর্কে নানা কথা শোনা যাচ্ছে। তাই তারা এই ঘরের মেয়েকে বউ করে নিতে রাজী নয়।

যশোপাল তাতে বিন্দুমাত্র দুঃখিত হল না। যারা পরের কথা শুনে নাচে, সে বাড়িতে তার বোনের বিয়ে না হয়েছে—সেটা ভালই হয়েছে বলতে হবে।

নিশ্চিন্ত মনে যশোপাল আর যশোমতী মূর্তি নির্মাণে আত্মনিয়োগ করল।

এক শ্রেষ্ঠী তার ভবনকে সজ্জিত করবার জন্য অনেকগুলি মূর্তির বায়না দিয়েছিল। কথা ছিল—তাঁর গৃহ-প্রবেশের পূর্বেই মূর্তিগুলি নির্মাণ করে দিতে হবে।

ভাই-বোনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে দিবারাত্র খেটে সেই মূর্তি নির্মাণকার্য সমাধা করেছিল। কথা ছিল, পরের দিন সকালবেলা শ্রেষ্ঠীর লোক এসে শকটে করে মূর্তিগুলি নিয়ে যাবে।

রতনলালের চোখ দুটি সাপের মত জ্বলে উঠল। [পৃ. ৭৮

সেই দিন সন্ধ্যার পর যশোপাল গৃহে ফিরে তার শিল্পালয়ে গিয়ে প্রদীপ জ্বালালো। মনে মনে ভাবল,—শিল্পকর্মের ওপর তার শেষ হস্ত প্রলেপ করে সকল কর্ম রাত্রের মধ্যেই সমাধা করে রাখবে।

কিন্তু মৃদু প্রদীপের আলোতে আতঙ্কিত হয়ে দেখল, তার এতদিনের সাধনার ফল—সেই মূর্তিগুলির নাসিকা কে যেন নির্মম ভাবে ভগ্ন করে রেখে গেছে।

যশোপাল চিৎকার করে ডাকল, যশোমতী—

যশোমতী এসে জিজ্ঞেস করল, ডাকছ কেন দাদা?

যশোপাল কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, মূর্তিগুলির এ দশা কে করল শুনি? কে এসেছিল এই ঘরে?

যশোমতীও বিস্মিত হয়ে সেই দিকে তাকিয়ে ছিল। তারপর বললে, কেউ ত তোমার কাছে আসেনি দাদা!

যশোপাল উত্তেজিত হয়ে আবার প্রশ্ন করল,—তাহলে আমার মূর্তিগুলির এ দশা কে করল?

যশোমতী অনেক চিন্তা করে উত্তর দিলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে দাদা। অন্ধকারে ঠিক সাপের মতো একটা লোক এই ঘরে এসে একবার ঢুকেছিল। তারপর আর তাকে দেখতে পাইনি।

যশোপাল আর্তনাদ করে উঠে বললে, বুঝতে পেরেছি। আমার জীবনের সাক্ষাৎ শনি রতনলাল এসে আমার সর্বনাশ করে গেছে। এখন আমি শ্রেষ্ঠীর কাছে মুখ দেখাবো কি করে?

রাত্রি প্রভাত হল।

আর শ্রেষ্ঠীর প্রেরিত লোক এসেও হাজির হল।

যশোপাল তার কাছে সব কিছু জানিয়ে শ্রেষ্ঠীর নামে এক পত্রে ক্ষমা প্রার্থনা করল। আর শীঘ্রই তার কাজ সমাধা করে দেবে বলে জানাল।

শ্রেষ্ঠীর দূত ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে গেল।

এদিকে যশোপালের বিপদ কিন্তু কিছুতেই কাটল না।

আরো কয়েক সপ্তাহ পরে সপ্তগ্রামের শাসনকর্তার কাছ থেকে এক রাজদূত এসে উপস্থিত। যশোপালের বৃদ্ধ পিতা বহুকাল পূর্বে রতনলালের পিতার কাছ থেকে পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সে ঋণ আর শোধ করা হয়নি।

রতনলাল ধর্মাধিকরণে অভিযোগ উত্থাপন করেছে এবং দলিল প্রদর্শন করেছে। তাই যশোপালের পিতাকে দুই দিনের মধ্যে তার গৃহ ছেড়ে চলে যেতে হবে।

যশোপাল বেশ বুঝতে পারলে, শয়তান রতনলাল মিথ্যা দলিল দেখিয়ে তাদের গৃহহারা করছে।

পথে এসে দাঁড়ানো ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। নির্ধারিত দিনে যশোপাল বৃদ্ধ পিতামাতা আর ভগ্নী যশোমতীকে নিয়ে সত্যই গৃহ ছেড়ে পথে এসে দাঁড়ালো।

শয়তান রতনলাল ওদের দুর্দশা দেখতে পথের একপাশে এসে দাঁড়িয়েছিল।

যশোপাল ওকে দেখে একেবারে আগুনের মতো জ্বলে উঠল, বললে, তোমার এই শয়তানীর প্রতিশোধ আমি নেবো। এজন্মে না পারি পরের কোনো জন্মে প্রতিহিংসা আমি চরিতার্থ করবোই।

একটুখানি এগিয়ে এসে শয়তানী হাসি হেসে রতনলাল উত্তর দিলে, আমিও তোমার পেছন কখনো ছাড়বো না। বাস্তু সাপ হয়ে তোমার পেছনে লেগে থাকবো—দেখে নিও!!!

পুঁটিরামের নারকেল
আমার জারে রাখার জন্যে রাস্তার ধারের নালাটা থেকে মাছ ধরে আনি।
নারায়ণ দেবনাথ
ফৎনা ডুবেছে এবারে হ্যাঁচকা টান মারি!
ভোঁক! ভোঁক!
হেইয়ো!
ইয়াপ্পি! মাছের বদলে নারকোল ধরেছি!
এবারে এটাকে ভাঙতে হবে!
বাবার এই হাতুড়িটা দিয়ে আগে এটা ফাটাই!

মরেচে! হাতল থেকে হাতুড়ি যে ছিটকে বেরিয়ে গেলো।

আরপ্স!
হুইইই!
ঝটাক!

আরো ক্ষতি করার আগে এটা আমি নিয়ে নি

আমাদের বাগানের রোলারটা দিয়ে নারকোলটা ভাঙবো। প্রথমে কাঠের গোঁজাটা সরিয়ে নি।

খেয়েচে! এযে বাগানের দিকে গড়িয়ে চললো!

উররফ্স!

ওঃ, পা টা গেছে! এখুনি ডাক্তারের কাছে যেতে হবে!

একটা রাস্তার রোলার দেখেছি! ঠিক যে জিনিসটা আমার নারকোলটাকে ভাঙতে পারবে!

থামিয়ে দি! খাবার সময় হয়েছে!

রোলারটা বড্ড তাড়াতাড়ি থেমে গেলো। কিন্তু এবার কি করতে হবে আমার জানা আছে!

এই বড় বাড়িটার একেবারে ছাদে উঠে যাবো!

এবার আমি এখান থেকে এটা শুধু ফেলে দেবো। তাহলে নির্ঘাত এটা ফাটবে!

ঠকাং!
ওয়াফ!

হুঁস হবার আগেই নারকোল নিয়ে সরে পড়ি!

নিরাপদে বাড়ি ফিরে এসেছি--- আহ্‌প্স!
খটাক!

আমার নারকোলটা গড়িয়ে টুলের নীচে গেছে। আমি এখুনি টুলটা সরিয়ে দিচ্ছি!
ফড়াৎ! ফোঁররকস!

ক্যু!
ইয়াঁওফ্!

আঁউক্সস! ওওফ! হতচ্ছাড়াটাকে যদি একবার হাতে পেতাম!
এতোক্ষণে নারকোল ভেঙেছে! এবার খাওয়া যাক!

—শ্রীপুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

পুপুন পিসির জামাই
পর পর পর পঁচিশটা দিন
করলো অফিস কামাই।
কেউ বললো—ওঁরই ন' ভাই
ওঁরই পকেট করেন জবাই
অথচ চুরুট ফুঁকে বলেন হেঁকে
আমিও ভালোই কামাই।
আহা রে সেই দুঃখেই ঘর ছেড়েছেন
পুপুন পিসির জামাই!

কেউ বললো—তা নয় ঠিক
আসছে দাদার বিয়ের তারিখ
ও দাদা সারা গায়ে ঘষছেন তাই
সাবান তো নয় ঝামা-ই।
বলছেন অফিস টফিস ভাববো পরে
ঝামা আগে থামাই!

কেউ বললো—বাগমারিতে
সেদিন দেখা বাস গাড়িতে
ও দাদার ঠোঁটেতে সেই পান-দোক্তাই
পরনে পাজামা-ই।
তা দেখেই স্টপেজ আমার
পেরিয়ে গেলো
হলো না আর নামা-ই।

কেউ বললো—ভাগ্নেকে তাঁর
বায়না দিলেন হামা দেবার
ভাগ্নে ডিগবাজি খায়
মন ভরে না
চান যে তিনি হামা-ই।
দাদু কি মেসোমশাই
ন'ন তো তিনি
মামা তিনি মামা-ই।

কেউ বললো—গুল গপ্প
দাদার মাথায় চুল অল্প
ও দাদা তাই বলেছেন ঘরে বসে
ক'দিন মাথা কামাই,
তারপর চুল গজালে দেখবে কেমন
কাজের মাথা ঘামাই!

বললো দাদা—তাও নয় ঠিক
বৌটা আমার বেশ বেরসিক
বেশী কী করছি বলো
সাধছি ক'দিন
শুধুই 'সা রে গা মা-ই'?
ও তাতেই বাপের বাড়ি,
তাইতো আমার
হচ্ছে অফিস কামাই!

পুপুন পিসির জামাই
গলা ছেড়ে আরো ক'দিন
সাধুন 'সা রে গা মা-ই'!
কেউ যেন না শুনে ফেলে
একবার তা কানে গেলে
তালে তার তাল যে তাঁকে দিতেই হবে
ধরুন যতই ধামা-ই!
নির্ঘাত অফিস-কলেজ স্কুল-আদালত
হবে যে তাঁর কামাই!!

উত্তরপূর্বপূবের উত্তর
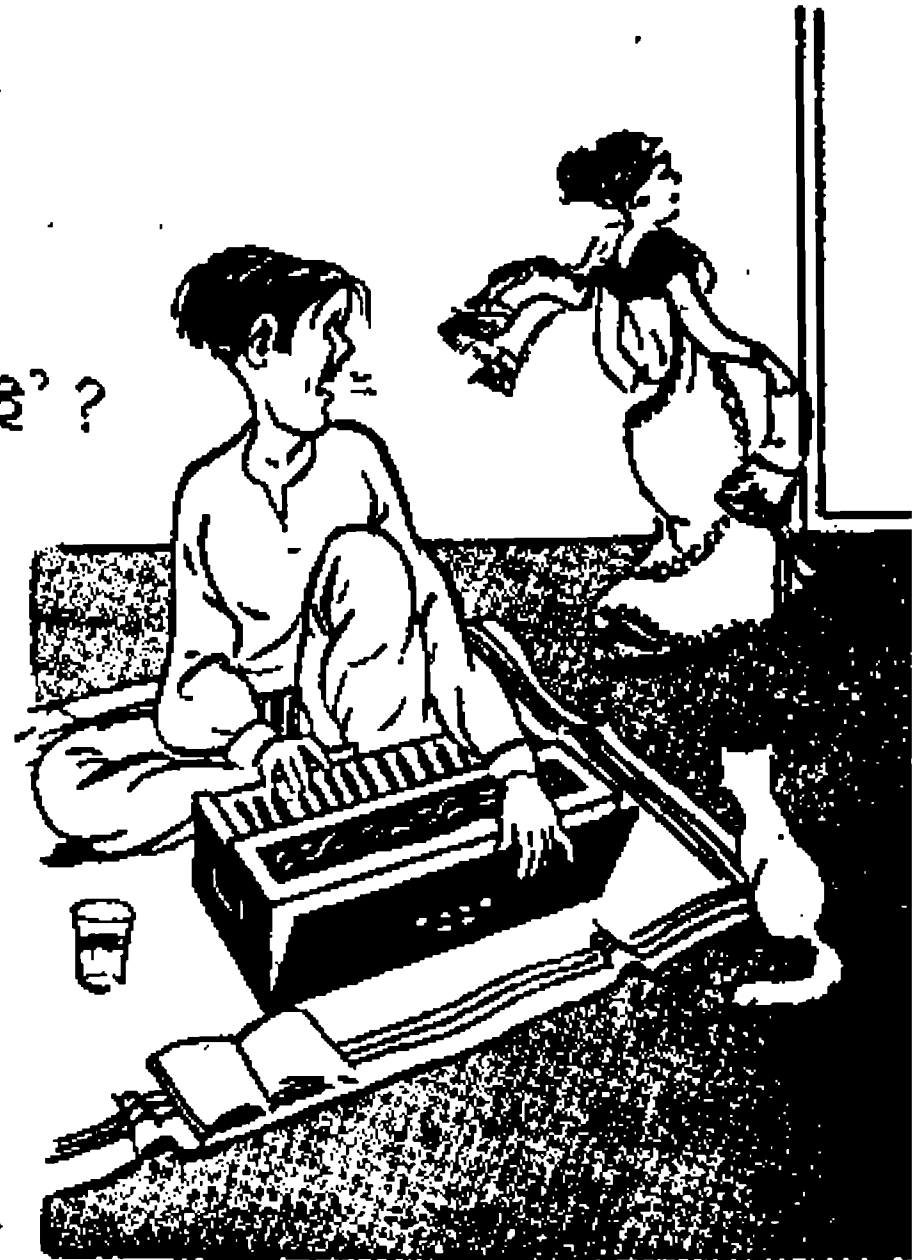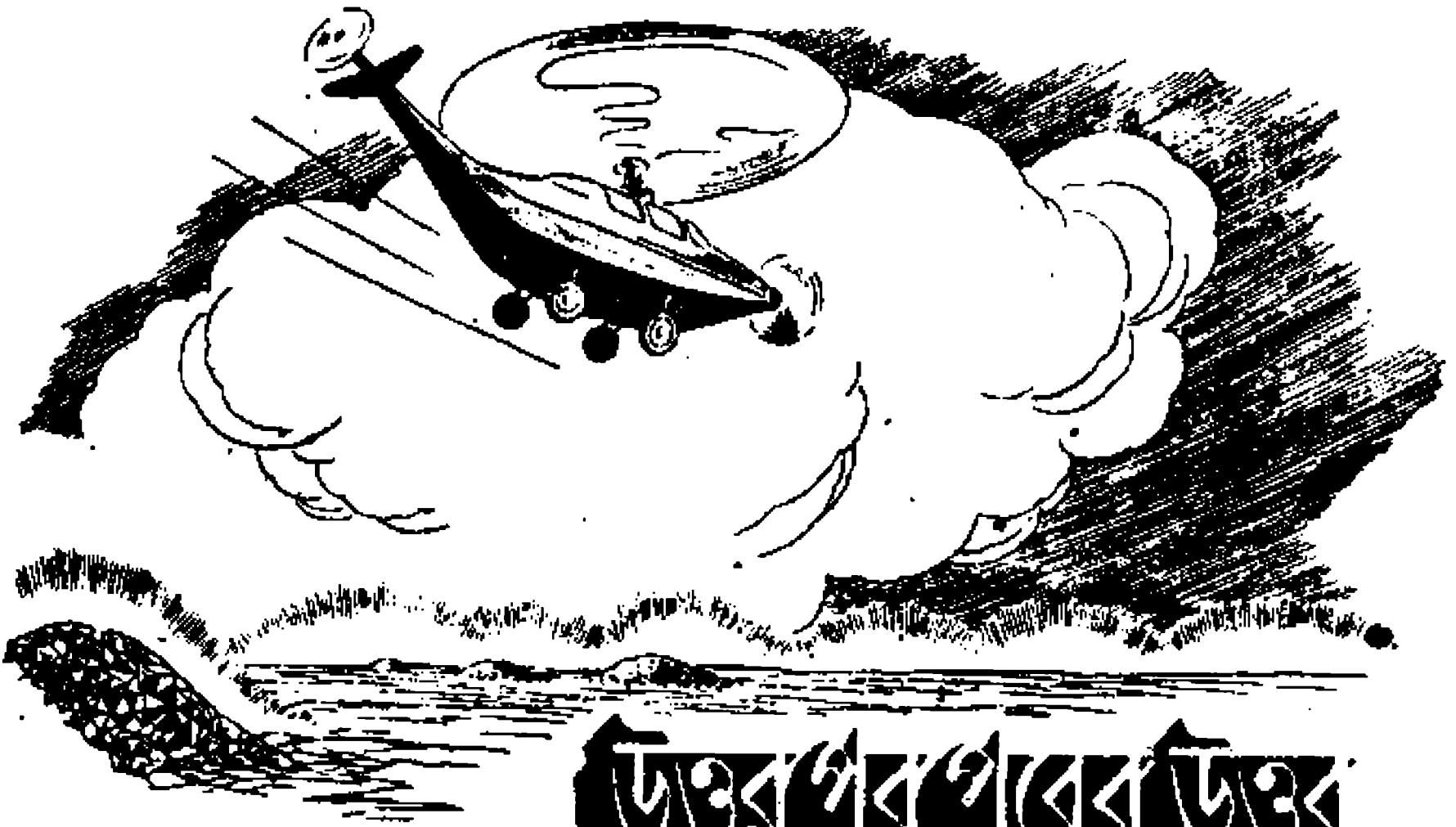
—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

আমাদের বুচকুণ্ডি গল্পের বই পড়তে ভীষণ ভালবাসে। তার বাবা তাকে একখানা ঠাকুমার ঝুলি কিনে দিয়েছেন। স্কুল থেকে ফিরে এসে জামাজুতো খুলবারও আর তর সয় না তার। তক্ষুণি বইটা নিয়ে বসা চাই।

সেদিনও অমনিধারা বসেছে। সিঁড়িতে কার জুতোর আওয়াজ শুনে ওর ভাইবোনেরা চেঁচিয়ে উঠল—'জুড়ানমামা এসেছে, জুড়ানমামা!'

জুড়ানমামা আসলে বুচকুণ্ডির বাবার সম্পর্কে মামা, অর্থাৎ সেই সম্পর্কে ওদের দাদু। কিন্তু এক একজন লোক এমন থাকেন যাঁদেরকে বলা হয় 'ইউনিভার্সাল' অর্থাৎ কিনা সার্বজনীন মামা কিংবা কাকা কিংবা দাদা। জুড়ানমামাও তাই। জুড়ানমামাকে শুধু ওদের বাবা-কাকা-পিসী-মাসীরাই মামা বলেন না, ওরাও বলে। এমন কি পাড়ার লোকেও তাই বলে। সবাই ওঁকে পছন্দ করে, কারণ—?

কারণ—অমন গল্প বলায় ওস্তাদ আর নেই। আর, তার চেয়েও বড় কথা, সে গল্পগুলি নাকি সবই সত্যি। বেশির ভাগই ওঁর নিজের জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা।

জুড়ানমামা এসেছেন শুনে বাড়িতে হইহই পড়ে গেল। টফি, নয়না, কঙ্কা, জিজো এমন কি রঙ্কুলালও ছুটে এল খেলা ফেলে। বুচকুণ্ডিও তার ঠাকুমার ঝুলিখানি মুড়ে গুটি গুটি হাজির হল আসরে। গিয়ে দেখে ঘর ততক্ষণে প্রায় ভরতি হয়ে গেছে। বাবা, মা, কাকা, কাকীমা, দিদা—সব্বাই এসে জুটেছেন গল্প শোনার লোভে।

জুড়ানমামার নজর কিন্তু প্রথমেই পড়ল বুচকুণ্ডির দিকে। ঠাকুমার ঝুলির মোড়া পাতাটা খুলে বললেন, 'ভারী চমৎকার বই! কোন্ গল্পটা পড়ছিলি? এইটে?'—বলেই পড়তে শুরু করে দিলেন—

"উত্তর পূব পূবের উত্তর মায়া পাহাড় আছে,
নিত্য ফলে সোনার ফল সত্যি হীরার গাছে।"

বুচকুণ্ডি এবার একটু মুখ টিপে হাসল।—'সত্যি, তাই হয় বুঝি কখনও?'

কঙ্কা টিপ্পনী কাটল, 'আর উত্তর পূব পূবের উত্তরটাই বা কোন্ দিক্?'

জুড়ানমামা খানিকক্ষণ ঠোঁটটা টিপে একটা মুচকি হাসি চেপে রাখলেন, তারপর বললেন, 'দিক্টা ঠিক বোঝাতে পারব না—কিন্তু প্রায় ঐ ধরনের একটা জায়গায় যাবার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। শোন্ তবে সেই গল্প।'

এখানে জুড়ানমামার সামান্য একটু পরিচয় দিয়ে দেওয়া দরকার। জুড়ান নামটা, বলা বাহুল্য, ওঁর ডাকনাম। ওঁর ঠাকুমার দেওয়া। নাতি হওয়ায় তাঁর প্রাণটা নাকি জুড়িয়ে গিয়েছিল, তাই নাম রাখলেন জুড়ান।—পুরো নাম হল জুড়ানজীবন রায়। কিন্তু, সত্যি কথা বলতে, ঐ অতদিন আগে হরিপদ-কালীচরণ-সতীশ-উপেন-রাম-শ্যাম-যদু-মধুর যুগেও জুড়ান নামটা খুব লোভনীয় নাম ছিল না। সেজন্য জুড়ানমামা একটু বড় হয়েই নিজের নামটা সংক্ষেপ করে নিয়ে বলতেন জে. জে. রায়।

তারপর সেই জুড়ানমামাই একদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে এক মাল-টানা জাহাজে চাকরি নিয়ে নানা দেশ ঘুরে হাজির হলেন আমেরিকায়। সেখানে পড়াশোনা শুরু করলেন নতুন করে। মাথা ছিল খুব, বুদ্ধিও তুখোড়। চটপট অনেক কিছু শিখে ফেললেন এবং অবশেষে একদিন দেখা গেল তাঁর নামের আগে ডক্টর এবং শেষে অনেকগুলো ডিগ্রী বসে গেছে। একটা নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূবিজ্ঞান অর্থাৎ জিওলজীর অধ্যাপক পদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন তিনি।

বিয়েথা করার আর ফুরসত হয়নি। তা না হোক, দিব্যি আছেন। চাকরির সময়ে মাঝে মাঝে ২/১ বার দেশে ঘুরে যেতেন। এখন রিটায়ার করে দেশেই চলে এসেছেন বরাবরকার জন্য। পয়সাকড়ি জমিয়েছেন ভালই। দিব্যি চলে যায়। গল্পগুজব ভালবাসেন আর তাই করেই এখন সময় কাটান। অঢেল তাঁর গল্পের ঝুলি।

'হীরের গাছে মুক্তোর ফুল, নাকি সোনার ফল। সত্যি?'—শুধু ছোটরা নয়, বড়রাও দস্তুরমত অবাক্ হয়ে গেছে শুনে।

'না, ঠিক তা নয়; তবে অনেকটা ঐ রকমই।'—জুড়ানমামা গল্প শুরু করলেন ঃ

'প্রথম মহাযুদ্ধ তার অনেক আগেই শেষ হয়েছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তখনও কোনও সম্ভাবনা নেই। সালটা বোধহয় ১৯৩০ কি ১৯৩১ এই রকম হবে। আমি ছুটি কাটাবার জন্য এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ চিঠি এল হোমানের কাছ থেকে।—এদিকে যখন এসেছ তখন আমাদের এখানটা একবার ঘুরে যাও।

'ভিল্ হোমান্ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আরিজোনা আর ক্যালিফোর্নিয়ার সীমান্তে যেখানে

কোলোরাডো নদীতে এসে মিশেছে আর একটা নদী গিলা, তারই পাশে ইয়ুমা শহর। সেখানেই ওদের বাড়ি। কয়েক পুরুষ আগে জার্মানী থেকে এসে ওরা ঐখানে আস্তানা গেড়েছে। অবস্থা বেশ ভাল। প্রচুর খামার জমি আর কাঠের ব্যবসা ওদের। কোলোরাডো এখানে বেশ চওড়া, আর একটু নেমেই সেটা ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগরে পড়েছে কিনা! জায়গাটা নাকি দেখতেও ভারী মনোরম। ভাবলাম যাই ২/১ দিন বেড়িয়ে। ইংরেজদের তুলনায় সাধারণ জার্মানরা অনেক মিশুক। আমেরিকান হয়ে গেলেও ওদের সেই জার্মান স্বভাবটা এখনও যায় নি।

'ভিল্ হোমানের বাবা বুড়ো অ্যালবার্ট হোমান্ ভারী অমায়িক। বললেন, এসেছ যখন তখন দিনকয়েক থেকেই যাও না। আশেপাশে অনেক কিছু দেখবার আছে। তাছাড়া মাছ এখানে যেমন প্রচুর তেমনি সস্তা। আর তোমরা, ইণ্ডিয়ান বেঙ্গলীরা তো শুনেছি মাছের ভীষণ ভক্ত।

'কথাটা সত্যি। সাধারণ বাঙ্গালীর মত আমিও বরাবরই মাছ খেতে খুব ভালবাসি। বোধহয় একটু বেশীই ভালবাসি। ভিল্ হোমান্ তা জানত।

'রয়ে গেলাম। সকালে ব্রেকফাস্টের পরই দু'বন্ধু গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম। বাস্তবিক জায়গাটা খুবই বৈচিত্র্যময়। বৈচিত্র্য ওর প্রাকৃতিক পরিবেশে। দু'দুটো নদী যেখানে মিশেছে সেখানটা স্বভাবতঃই খুব উর্বর হবার কথা। হয়েছেও তাই। নানা জাতের গাছপালায় ঘন জঙ্গলের মত হয়ে আছে ওর আশপাশটা। বার্চ, ফার, ওক থেকে শুরু করে অতিকায় রেডউড গাছেরও অভাব নেই। হোমান্‌দের কাঠের কারবার কেন এত রমারম তা বোঝা গেল। কিন্তু জঙ্গল ছাড়ালেই একেবারে অন্য দৃশ্য। কয়েকটা টিলা পার হয়ে গাছপালা ক্রমেই কমে এসেছে এবং একটু নীচের দিকে নামলেই মনে হবে যেন মরুভূমির রাজ্যে প্রবেশ করছি। হোমান্ বলল আর ম্যাপেও দেখলাম, ঐখানেই রয়েছে গিলা ডেজার্ট—ঐ অঞ্চলের নামকরা মরুভূমি।

'দিন দুই এদিক-ওদিক ঘোরার পর একদিন প্রস্তাব করলাম—ঐ টিলাগুলো পার হয়ে ওদিকটা একবার ঘুরে দেখা যায় না? সত্যিকার মরুভূমি দেখি নি কখনও, একটা অভিজ্ঞতা হয়ে যাক না!

'হোমান্ বলল, কিন্তু ওদিকে তো কোন রাস্তা নেই, বড় জোর ২/৩টে টিলা পর্যন্ত পার হওয়া যেতে পারে। তাও কাঁচা রাস্তায়।

'তাই সই। পরদিনই রওনা হবার আয়োজন করা হল। সঙ্গে খাবারদাবার নেওয়া হল টিফিন ক্যারিয়ার ভরতি করে। কখন ফিরব ঠিক নেই তো।

'নতুন জায়গায় যাচ্ছি শুনে হোমানের বোন হান্না এসে বলল, আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে।

'ব্যস্! তোমায় নিয়ে শেষে কোন্ বিপদে পড়ি আর কি!—বলল হোমান্। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, তোমাদের স্যান্স্ক্রিটে একটা কথা আছে শুনেছি "পঠি নাড়ড়ী ভিভর্জিটা"।

'কার কাছে শুনেছে যেন কথাটা, মুখস্থ করে রেখেছে; যদিও উচ্চারণটা কিচ্ছু হয় নি। তবু বেশ মজা লাগল। হান্নাকে ডেকে বললাম, শুনলে তো? পথি নারী বিবর্জিতা। পথে চলতে হলে মেয়েদের সব সময়ে বাদ দিতে হবে।
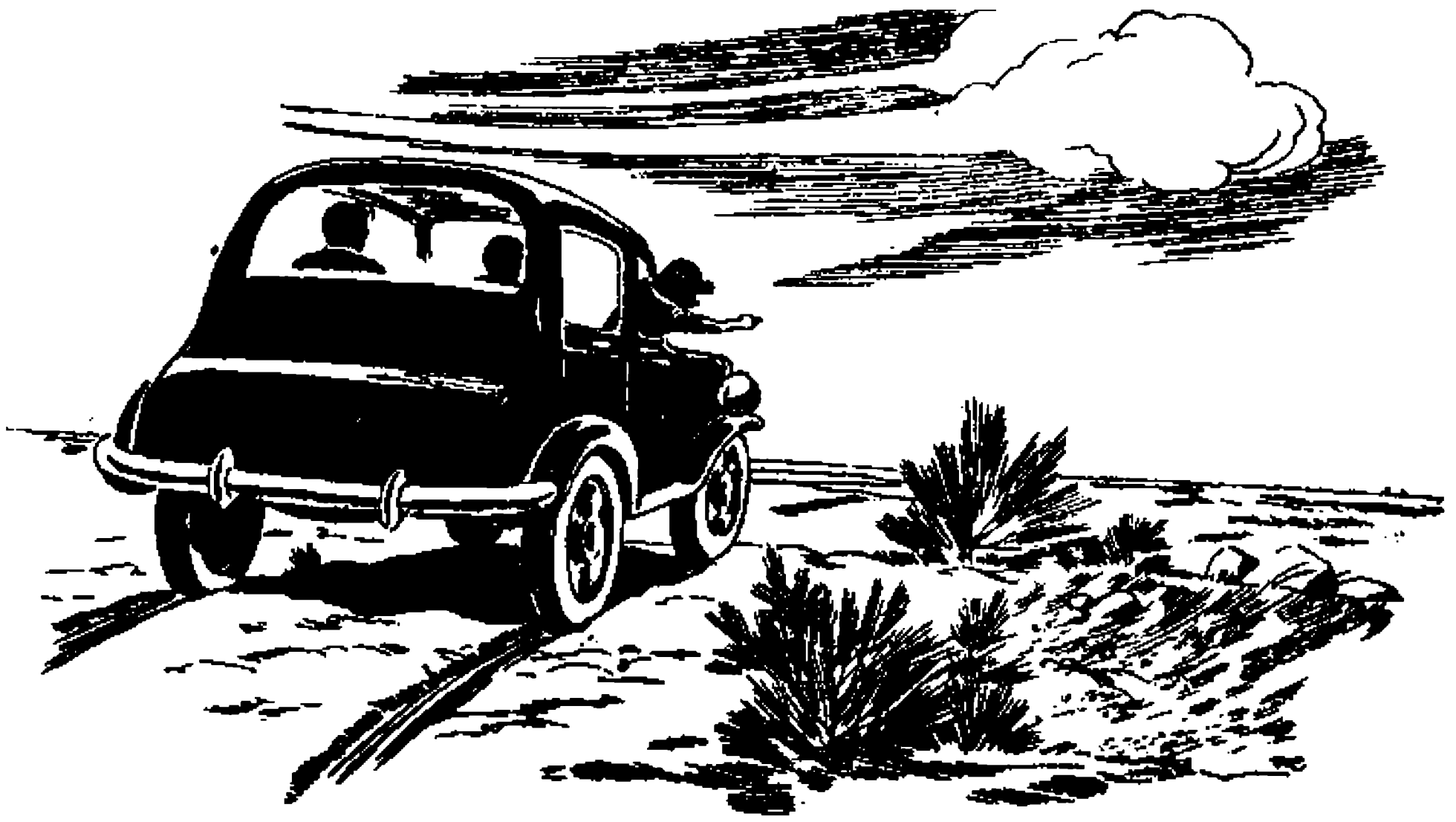
ঐ দূরে একটা কাঠের বাড়ি রয়েছে মনে হচ্ছে।

'উত্তরে হান্না কলা দেখিয়ে বলল, ও তোমাদের আদ্যিকালের শাস্ত্র,—ও শাস্ত্র আমরা, একালের মেয়েরা মানি না।—বলেই লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

'ভাবলাম সত্যি চলে গেল বুঝি। কিন্তু না, আমাদের আগেভাগেই যে ও গিয়ে মোটরে বসে আছে তা কি জানতাম? দিব্যি পুরুষের মত খাকি প্যাণ্ট শার্ট পরে নিয়েছে। কাঁধে ঝোলা, ক্যামেরা। একেবারে টিপ্‌টপ্ ট্যুরিস্ট।

'টিলার পর টিলা পার হয়ে চলেছি। হোমানের হাতে স্টিয়ারিং। কাঁচা রাস্তায় ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগোচ্ছি। হঠাৎ পথ শেষ হয়ে গেল। সামনে বালিয়াড়ি। ওর ওদিকে, মনে হল, ধুধু করছে বালি। আর কিছু না।

'এবার? বেলা বেশ গড়িয়েছে। একটা আস্তানা পেলে কিছু খেয়ে নেওয়া যেত। খাবার সঙ্গে থাকলেও তাড়াতাড়িতে চা, কফি, এমন কি ওয়াটার বটলটাও সঙ্গে আনা হয় নি। এখন জলতেষ্টাই হয়ে দাঁড়িয়েছে সবচেয়ে কষ্টকর।

'হঠাৎ হান্না ঝোলা থেকে বার করল একটা বাইনকুলার। চোখে লাগিয়ে, চারদিক দেখতে দেখতে চেঁচিয়ে উঠল,—ঐ দূরে একটা কাঠের বাড়ি রয়েছে মনে হচ্ছে। চল ওদিকে।

'সত্যিই তো! বাইনকুলার চোখে লাগিয়ে দু'জনেই একে একে দেখলাম। হ্যাঁ, দূরে একটা ছোট কুটীরের মত দেখা যাচ্ছে বটে!

'কুটীরের কাছে গাড়ি থামতেই শব্দ শুনে এক বুড়ী এগিয়ে এল।—কে গা তোমরা?

'বললাম, ট্যুরিস্ট। একটু বিশ্রামের আশায় এসেছি। খাবারদাবার আমাদের সঙ্গেই আছে। একটু যদি জল—

'বুড়ী দেখলাম বেশ অতিথিবৎসলা। বলল, বস বস, ছেলেমানুষ তোমরা, এই রোদে কেউ বেরোয়?

'দাওয়ায় একখানা বেঞ্চি পাতা ছিল, সেইখানে গ্যাঁট হয়ে বসা গেল।

'ইতিমধ্যে বুড়ীর স্বামী জ্যাক্ও এসে পড়েছে। সবাই ভাগাভাগি করে খাওয়াদাওয়া হল। বুড়ী কফি বানিয়ে নিয়ে এল। কফি খেয়ে ঐ গরমেও শরীরটা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। তার পর কথায় কথায় আলাপ হল। বুড়ো জ্যাক্ বলল, সারা জীবন হইচই-এর মধ্যে কাটিয়ে আর লোকালয় ভাল লাগে না, তাই শেষ জীবনটা এই লোকালয়ের বাইরে জায়গাটা কিনে নিয়ে, ঘর বেঁধে, বুড়োবুড়ী বাস করছি। এখান থেকে লিম্টন খুব দূর নয়। ঠিক শহর না হলেও কতকটা শহরের মতই। ছোট একটা পুরোনো গাড়ি আছে। সপ্তাহে একদিন সেখান থেকে দরকারী জিনিসপত্র কিনে আনি, বেশ আছি। ইচ্ছামত বেড়িয়ে বেড়াই। একেবারে পুরোপুরি অবসর জীবন আমাদের।

'আচ্ছা, তা হলে তো ভালই হল আপনাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে। আমরা এদিক্টা কখনও দেখি নি। মরুভূমিও না। ওদিক্টায় কখনও গেছেন?

'খানিকটা গেছি। কিন্তু বেশী দূর নয়। আর দেখবই বা কি, শুধু তো মরুর রাজ্য! তবে হ্যাঁ, এখানে একটা গল্প প্রচলিত আছে যে ঐ মরুভূমির ওপারে নাকি একটা আশ্চর্য দেশ আছে যাকে বলা হয় আগুনের দেশ। সর্বক্ষণ আগুন জ্বলছে সেখানে,—মাইলের পর মাইল জুড়ে—বছরের পর বছর—কতদিন ধরে কেউ জানে না। অবশ্য অমন দেশ আবিষ্কার করতে যাবে এমন বুকের পাটা কারো নেই। আর যাবার কোনও পথও নেই। মাঝে মাঝে মনে হয় যাব নাকি একবার ওর কাছাকাছি, সত্যি-মিথ্যে যাচাই করে আসব। কিন্তু এই বয়সে অমন অ্যাড্ভেঞ্চার তো আর করা যায় না! তা ছাড়া মনে হয় গল্পটা একেবারেই আজগুবি। কোন রেড ইণ্ডিয়ান রূপকথাকার ওটা বানিয়েছিল, আর তাই লোকের মুখে মুখে গল্প হয়ে চলে আসছে।

'বুড়ো জ্যাক্ আর তার স্ত্রীর সঙ্গে আরও খানিকক্ষণ গল্পগুজব করে সেদিনের মত ফিরে এলাম।

'ফিরে এলাম বটে কিন্তু মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন রয়েই গেল। এমন একটা অদ্ভুত জায়গা, জ্যাকের ভাষায় আগুনের দেশ—সত্যি কাছাকাছি আছে কিনা, নাকি রেড ইণ্ডিয়ানদের মুখে মুখে ছড়ানো কল্পনার দেশ সেটা—তা এতদিনেও পরীক্ষা করে দেখবার জন্য কেউই এগিয়ে আসেনি এটা খুবই আশ্চর্য নয় কি? মানছি জায়গাটা দুর্গম। কিন্তু এরোপ্লেনের আবিষ্কার তো তার কত আগেই হয়েছে! তাতে উঠেও তো ওপর থেকে একটা চক্কর দিয়ে দেখা যেতে পারত। অবশ্য সেই তিরিশের যুগে কথায় কথায় এত এরোপ্লেন ব্যবহারের কথা কেউ ভাবতে পারত না। এখানেও তো দেখেছি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেও লোকে বিলতে যেতে হলে জাহাজে চেপেই যেত। প্লেনে যাবার কথা সাধারণ লোকে ভাবতেও পারত না। তবুও—!

'সেই কথা নিয়েই হোম্যানের সঙ্গে আলোচনা করছিলাম, হঠাৎ দরজায় ঠুকঠুক আওয়াজ হল।

'কে? ভেতরে এস।

'তড়বড় করে ভেতরে ঢুকল হান্না। তারও কৌতূহল কিছুমাত্র কম নয়। বলল, চলুন না, আমরাই একবার চেষ্টা করে দেখি রহস্যটা বার করা যায় কিনা!

'আমরা, মানে তুমিও?—হেসে বললাম, যাবে কিসে? এরোপ্লেন যোগাড় করলেও, শুনলে তো, ওখানে নামবার উপায় নেই। এরোপ্লেন নামাতে হলে দস্তুরমত একটা ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ড চাই। অন্ততঃপক্ষে বেশ লম্বা সমতল একটা শক্ত মাঠ চাই।

'হান্না বাধা দিয়ে বলল, কিন্তু আপনি জানেন না, আজকাল একরকম নতুন ধরনের প্লেন বেরিয়েছে যার নাম অটোগাইরো। তাতে ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ড দরকার হয় না। সোজা ওপরে উঠতে পারে, আবার সোজা নীচে নেমে আসতে পারে। একফালি ছাদের ওপরেও ওঠানামা তার পক্ষে অসাধ্য নয়। এই প্লেনের ডানা নেই, মাথার ওপর আছে একটা মস্ত বড় চাকা—যেন কেউ একটা উইণ্ড মিল এনে ওপরে বসিয়ে দিয়েছে। ওকে বলে রোটার। সামনে অবশ্য প্রপেলারও আছে। রোটার ঘুরিয়ে এই অটোগাইরোকে ওপরে তোলা যায়, নীচে নামানো যায়, এমন কি শূন্যে নিশ্চলভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা যায়। আবার দরকার মত রোটার মুড়ে নিয়ে মোটর গাড়ির মত মাটিতেও চালানো যায় এই গাড়ি।

'অটোগাইরো? হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি বটে। স্পেন না জার্মানীর কোন্ এক ভদ্রলোক নাকি বার করেছেন! কিন্তু সে গাড়ি এখানে পাবে কোথায়?

'হ্যাঁ গো মশাই, এখানেও কয়েকখানা এসেছে। আমারই এক বন্ধুর দাদা একখানা এনেছেন। তিনি নিজেও মস্ত বড় এরো-এঞ্জিনীয়ার কিনা!

'তাই নাকি? কে সেই বন্ধু? কোথায় থাকে?

'ক্লারা। আমার সঙ্গে কলেজে পড়ে। ওরা থাকে ফিনিক্স শহরে। এখান থেকে শ' দেড়েক মাইলও হবে না। টেলিফোনেই কথা বলা যায়। বাজিয়ে দেখব? আপনারা যেতে রাজী তো?

'হ্যাঁ,—তা ওরকম একটা বাহন পাওয়া গেলে—

'হান্না আর অপেক্ষা করল না, যেমন তড়বড় করে এসেছিল তেমনি তড়বড় করে বেরিয়ে গেল।

'পরদিন ভোর না হতেই হান্নার সাড়া পাওয়া গেল।—ওদের রাজী করিয়েছি। অবশ্য ক্লারাকেও সঙ্গে নিতে হবে। ওর দাদারও খুব উৎসাহ। তা ছাড়া ওদের অটোগাইরোটা বেশ বড়সড়, ৪/৫ জন বেশ আরামেই বসতে পারবে।

'পরদিন সকালেই রওনা হওয়া গেল। অটোগাইরোর এখন আর চলন নেই। ওটাই একটু বদলেটদলে হয়েছে হেলিকপ্টার। কিন্তু সে আমলে ওটাই ছিল এক অদ্ভুত বাহন।'—জুড়ানমামা একটু থেমে আবার শুরু করলেন।

'আমরা চারজন—আমি, হোমান্, হান্না আর ক্লারা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছি। ক্লারার দাদা হেক্টর চালাচ্ছেন। হু-হু করে শূন্যপথে ছুটে চলেছে অটোগাইরো। মাথার ওপর বনবন করে রোটার ঘুরছে। সে এক নতুন অভিজ্ঞতা।

'দেখতে দেখতে ছোটখাট কয়েকটা টিলা পার হয়ে আমরা মরুভূমির এলাকায় চলে এলাম।

নীচে বিখ্যাত গিলা মরুভূমি। ভাল করে দেখবার জন্য আমরা একটু নীচে নেমে এলাম। কিন্তু নাঃ, কেবল বালি আর বালি। বালি ছাড়া কিছু আছে বলে মনে হল না। প্রখর রোদে সেগুলি চকচক করছে। তবে হ্যাঁ, মাঝে মাঝে দু'-একটা কাঁটাঝোপ, ক্যাক্‌টাস্‌ জাতীয় গাছ চোখে পড়তে লাগল। এ যেন সাহারা গোবিরই আর একটা ছোটখাট সংস্করণ।

'কোথায় তোমার আগুনের দেশ?—হেক্টর হাসতে হাসতে বলল হান্নাকে লক্ষ্য করে। রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে কতরকম আজগুবি গালগল্প চালু আছে তাই শুনে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছ!

'ক্লারা বাধা দিয়ে বলল, যা রটে তার কিছুটা সত্যি হয়ও। গালগল্পের মধ্যেও অনেক সময় তাই দেখা যায়। চল না আর একটু। গ্যাসোলিন তো যথেষ্ট আছে সঙ্গে।

'বেশ।

'আরও মিনিট কয়েক ঐ একই দৃশ্য। তারপর—

'তারপরই হঠাৎ হান্না কপালে বাইনকুলার ঠেসে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, ঐ—ঐ! আগুনের মত কি একটা দেখা যাচ্ছে না?—ঐ যে দূরে।

'হেক্টর অটোগাইরো দ্রুতবেগে চালিয়ে দিল এবং দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছে গেলাম সত্যি সত্যি এক আশ্চর্য রাজ্যে।

'পায়ের নীচে কয়েক মাইল জুড়ে যেন বিরাট একটা মাঠ, আর সেই সমস্ত মাঠটা ধিকিধিকি করে জ্বলছে। সে আগুনের কোন শিখা নেই। কাঠকয়লা জ্বালালে যেমন একটা গনগনে আগুনের আঁচ দেখা যায় অনেকটা সেই রকম।

'এবার অটোগাইরো বেশ একটু নীচে নামিয়ে আনা হল, তারপর খানিকটা শূন্যে নিশ্চলভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা হল সেটাকে। এবার মনে হল, না, বোধ হয় ওটা আগুন নয়, সারা জায়গাটা জুড়ে যেন ছড়িয়ে আছে অসংখ্য আলোর কুচি। কি ব্যাপার?

'হোমান্‌ বলল, বোধ হয় ওখানে সমস্ত জায়গাটা জুড়ে এমন কোনও স্বচ্ছ জিনিস ছড়ানো আছে যা সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করছে আর দূর থেকে তাকেই আগুন বলে মনে হচ্ছে। আগুন হলে, আমরা যেখানটায় রয়েছি সেখানটায়ও ওর গরম ভাপ লাগত। কিন্তু তা তো লাগছে না!

'তাহলে আর একটু নামা যাক।—হেক্টর এবার তার অটোগাইরোটাকে মাটি থেকে মাত্র ১০/১৫ ফুট ওপরে নিয়ে এল।

'হ্যাঁ, সত্যি হোমান্‌ যা অনুমান করেছিল ঠিক তাই। সমস্ত মাঠটা জুড়ে একটা ঘষা কাচের মত পদার্থ ছড়িয়ে রয়েছে। সেটা জ্বলছে না, তার ওপর রোদ পড়ে সে রোদ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে তাই আলোর কুচি বলে মনে হচ্ছে। হয়তো সামান্য একটু গরম হয়ে আছে—বেশীক্ষণ রোদ খেলে পাথরটাথর যেমন হয় সেই রকম আর কি! তা হলে অটোগাইরো ওখানে নির্ভয়ে নামানোও যেতে পারে।

'ধীরে ধীরে, গাছের ডাল থেকে ঝরে-পড়া শুকনো পাতার মত অটোগাইরো এসে নামল মাটিতে। রবারের চাকা, তলায় খাঁজকাটা থাকলেও নেমেই প্রথমটা কয়েক ফুট পিছলে গড়িয়ে

চলে গেল। হেক্টর তাড়াতাড়ি ব্রেক কষল। আমরা একে একে নেমে পড়লাম দরজা খুলে।

'সমস্ত জায়গাটা জুড়ে একটা প্রায় সমতল আস্তরণ বিছানো রয়েছে। পাথুরে কিন্তু অনেকটা ঘষা কাচের মত—ঠিক পুরোপুরি স্বচ্ছও নয়, আবার অস্বচ্ছও নয়। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে আজকাল বলা হয়, ঈষদচ্ছ বা ট্রান্‌স্লুসেন্ট্। প্রায় সমতল বলছি এইজন্য যে জায়গাটা ঠিক কাচের মত মসৃণ নয়। যেন অসংখ্য ছোট ছোট কুচো কাচ কেউ ওখানটায় ছড়িয়ে দিয়ে দুরমুজ দিয়ে পিটিয়ে দিয়েছে আর ওপরে তারই একটা পাতলা আস্তর দিয়ে দিয়েছে ঠিক যেমন করে রাস্তা বাঁধাবার সময় স্টোন্ চিপ্‌স্ বা খোয়ার কুচি পিটিয়ে তার ওপর পিচ ঢেলে দেওয়া হয়।

বেশ খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিল।

'হোমানের একটা স্বভাব, যেখানে যাবে কাঁধে একটা ঝোলা ঝোলাবেই, আর সেই ঝোলার মধ্যে থাকবে টুকিটাকি কয়েকটা যন্ত্রপাতি—হাতুড়ি, বাটালি, লেন্স ইত্যাদি, যা জিওলজিস্টরা বাইরে গেলেই ব্যবহার করে। সে আর দেরি না করে চটপট বাটালি আর হাতুড়ির সাহায্যে সেই ঘষা কাচের মত জিনিসটা থেকে খানিকটা খুবলে বার করে নিল। তারপর লেন্সের নীচে ফেলে, বেশ খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে, লেন্স সমেত সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিল।

'আরে, এ যে নিখুঁত কোয়ার্ট্‌জ্। আমার অভিজ্ঞ চোখে চিনতে কোনও কষ্ট হল না। সাদা, ঝকঝকে আর একেবারে নির্ভেজাল। তা ছাড়া, মনে হল, এগুলো একসময় একদম গলে গিয়েছিল, আবার ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধেছে, তাই সবটা মিলে ঘষা কাচের মত মনে হচ্ছে। কিন্তু কোয়ার্ট্‌জ্ গালাতে হলে তো প্রচণ্ড তাপের দরকার।'

জুড়ানমামা একটু দম নেবার জন্য থামলেন, টফি প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, এই কোয়ার্ট্‌জ্‌কেই তো স্ফটিক বলে?'

'হ্যাঁ। আজকাল যে কোন কৃস্ট্যালকেও কেউ কেউ বাংলায় কেলাস না বলে বলেন স্ফটিক। কিন্তু আসল স্ফটিক হচ্ছে কাচেরই মত স্বচ্ছ কোয়ার্ট্‌জ্। সাধারণ কোয়ার্ট্‌জ্ যে কোন পাহাড়ী অঞ্চলে প্রায় দেখা যায় কিন্তু ও-জিনিস অত সহজ-প্রাপ্য নয়। তাই স্ফটিকের অত নাম এবং

অত দাম। মহাভারতে পড়িস নি—ময়দানবের তৈরি স্ফটিকের উঠোন দেখে দুর্যোধন সেটাকে জল ভেবে কাপড় গুটোতে গিয়েছিল?'

'যাক সে কথা।' জুড়ানমামা আবার শুরু করলেন।

'আমরা পায়ে পায়ে আরও এগিয়ে চললাম। হঠাৎ সামনে উঁচুমত একটা ঢিবি দেখে থমকে দাঁড়াতে হল। এটি কিন্তু কোয়ার্টজ্ দিয়ে তৈরি নয়,—কেমন যেন রঙিন রঙিন চেহারা। জায়গায় জায়গায় আবার সবুজ ছোপ। হোমানের বাটালি সেগুলি থেকেও খানিকটা খুবলে নিতে দেরি করল না।'

'এবার কিন্তু ঢিবির সংখ্যা বাড়তে লাগল। কোন কোনটা নীচু, কিন্তু কোন কোনটা আবার বেশ উঁচু আর লম্বাও। তাদেরও ভেতর ভেতর রঙের ছোপ আর সে রঙের বাহার যেন আরও বেশী। কোনটা লাল, কোনটা বেগুনী, কোনটা আবার ময়ূরপঙ্খী রঙের। তারই মধ্যে ২/১টি ছোপ আবার অত্যন্ত স্বচ্ছ। এত স্বচ্ছ আর ঝকঝকে যে মনে হচ্ছিল তার ভেতর থেকেই যেন আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে।

'যতই দেখছি ততই অভিভূত হয়ে পড়ছি। এদিকে হোমানের বাটালি-হাতুড়ি কিন্তু সমানে চলছে আর ঝোলাও ধীরে ধীরে ভরতি হয়ে উঠছে।

'আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছিল। তবে কি—তবে কি— ? নাঃ, সে যে অসম্ভব।

'প্রায় তিন ঘণ্টা লাগল জায়গাটা চষে বেড়াতে। তারপর আবার যখন শুরু হল বালির রাজ্য তখন ফিরবার কথা মনে পড়ল।

'রোটার ঘুরিয়ে প্রপেলার চালিয়ে আবার উঠলাম আকাশে।'

জুড়ানমামা আবার থামলেন। সবাই তখন অধৈর্য হয়ে পড়েছে।—'তারপর কি হল বল। ঐ রঙিন জিনিসগুলো কি?'

'সেইটেই তো এবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে। হোমান্‌কে নিয়ে আমরা দু'জনে চলে এলাম ইউনিভার্সিটিতে। তারপর সেই যে ল্যাবরেটরীতে ঢুকলাম, মনে আছে, তিন দিন তিন রাত্রি আর বেরুবার কথা কারোই মনে পড়েনি। একদিন কিছু খাইনি শুধু কয়েক কাপ কফি ছাড়া। খাবার কথা মনেই ছিল না।

'কি দেখলাম? রঙিন ছোপ বলে যেগুলিকে মনে হয়েছিল সেগুলি সবই রঙিন পাথরের কুচি—জমাট বেঁধে রয়েছে একসঙ্গে। সবুজগুলি খাঁটী পান্না, লালগুলো চুণী, বেগুনীগুলি অ্যামেথিস্ট, ময়ূরপঙ্খীগুলি ল্যাপিজল্যাজুলি। এ ছাড়া অ্যাগেট, গার্নেট, টোপাজ্, জেড সব রকম পাথরই ছিল ওর মধ্যে। যেগুলিকে আমরা বলি আসল জহরত। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার জহরত। আর—আর ঐ স্বচ্ছ চকচকে পাথরগুলি হচ্ছে হীরের কুচি। ঠিক সেই ঠাকুমার ঝুলির "উত্তর পূব পুবের উত্তর মায়া পাহাড়ের" মত। যেখানে—"নিত্য ফলে সোনার ফল সত্যি হীরের গাছে।" সোনার বদলে এখানে পেলাম আরও মূল্যবান্ হীরা জহরত। অবশ্য হীরের গাছ পেলাম না, কিন্তু হীরে পেলাম ঠিকই।'

'কিন্তু এ কি করে সম্ভব? সব এক জায়গায়—এতগুলো একত্রে!'—রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করল সবাই, প্রায় সমস্বরে।

'সেইটে বার করতে আর একবার যেতে হয়েছিল সেই আগুনের দেশে। এবার শুধু হোমানকে নিয়ে। আর হেক্টরও অবশ্য ছিল, নইলে অটোগাইরো চালিয়ে নেবে কে? তা ছাড়া যন্ত্রপাতিও নিয়ে গিয়েছিলাম বেশ কিছু। ইলেক্‌ট্রিক গাঁইতি, কম্‌প্রেস্‌ট্ এয়ারে চালানো তুরপুন ইত্যাদি। ঐ কোয়ার্ট্‌জ্‌-এর স্তর খুঁড়ে নীচেকার পাথর পরীক্ষা করতে হয়েছিল, পরীক্ষা করতে হয়েছিল ঢিবিগুলো কি দিয়ে তৈরি তাও। শেষ পর্যন্ত আমাদের সিদ্ধান্ত হ'ল : প্রাগৈতিহাসিক যুগে ওখানে একটা ফিশার ইরাপ্‌শন্ হয়েছিল। অনেকটা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত, কিন্তু তিন-কোনা পাহাড়ের আকারে নয়, মাটি ফুঁড়ে সোজা বেরিয়ে এসেছিল ভেতরকার তরল পাথুরে মালমসলা। মনে হয়, ওখানে ওপর দিকে বালির আস্তরণ এত বেশী পুরু ছিল যে একদম ওপরে উঠে আসতে পারে নি, ওপরদিক্‌কার বালির নীচে পর্যন্ত এসেছিল হয় তো। বালির বস্তা দিয়ে আমরা কামানের গোলা বা বোমার বিস্ফোরণ ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করি আজকাল। ওখানকার বালিও নিশ্চয় সেই ভূমিকাই নিয়ে থাকবে। বালির ঐ স্তরের নীচেই কিন্তু আমরা আগ্নেয়শিলা পেয়েছি প্রচুর—যা নাকি ঐ রকম বিস্ফোরণ বা উদ্গিরণের প্রমাণ। ওপরে না উঠলেও সেই উদ্গিরণের প্রচণ্ড চাপে ও তাপে ওখানকার সমস্ত বালি জমাট বেঁধে কোয়ার্ট্‌জ্‌-এ রূপান্তরিত হয়ে গেছে। বালি আর কোয়ার্ট্‌জের উপাদান তো আসলে একই, শুধু দানাদার চেহারা এলে তখনই তা হয়ে যায় কোয়ার্ট্‌জ্ বা স্ফটিক।'

'আর দামী জহরতগুলো?'

'সেগুলোও তো বালিরই রূপান্তর। বালির আসল উপাদান হচ্ছে সিলিকন। অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক মিলনে তাই হয় বালি—সিলিকন ডাই অক্সাইড। আবার ঐ সিলিকনই অক্সিজেনের সহযোগে যেমন তেমন পরিবেশে বিভিন্ন মণি-জহরতেও পরিবর্তিত হতে পারে। ওর মধ্যে অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে অন্য মৌলিক পদার্থ মিশে গিয়ে নানা রঙের রঙিন জহরতও তৈরি হতে পারে। যেমন অ্যালুমিনিয়াম মিশলে হয় চুনী, ম্যাঙ্গানীজ মিশলে হয় অ্যামেথিস্ট, অ্যালুমিনিয়াম, সোডিয়াম আর কিছুটা গন্ধক মিশলে হয় ল্যাপিজ ল্যাজুলি ইত্যাদি। সামান্য ক্রোমিয়াম থাকলে পাথরের রং হয় সবুজ, টিন ডাই অক্সাইড থাকলে দুধের মত সাদা, কোবাল্ট থাকলে হয় নীল। অবশ্য এরকম পরিবর্তন অতি কদাচিৎই ঘটে আর সেইজন্যই এই সব দুষ্প্রাপ্য দেখতে-সুন্দর পাথরগুলিকে আমরা বলি মণি-মাণিক্য। ঠিক যে ভাবে বালিগুলো কোয়ার্ট্‌জ্‌-এ রূপান্তরিত হয়েছিল ঠিক সেইভাবেই হয়তো ওখানকার কাঁটাঝোপ আর গাছগুলোও ফসিল হয়ে গিয়েছিল এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা নিয়ে ঐ মহামূল্য পাথরগুলো—যাদের আমরা হীরা-জহরত বা মণি-মাণিক্য নাম দিয়েছি—তারও কিছু কিছু তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কোন কোন গাছের মধ্যে ঐসব মৌলিক পদার্থ থাকে বলে আমরা জানি। ভ্যানাডিয়াম, মলিব্‌ডেনাম্ প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য ধাতু, এমন কি খোদ সোনা পর্যন্ত পাওয়া গেছে এমন গাছের কথাও তো আমরা জানি। অবশ্য অতি সূক্ষ্ম তার পরিমাণ। কিন্তু এই সব পাথর তৈরি করতেও তো ঐরকম সূক্ষ্ম কণারই দরকার।

'আর হীরে? মাটির তলায় প্রচণ্ড চাপে আর তাপে কয়লা,—যার উপাদান হচ্ছে অঙ্গার বা কার্বন,—কি করে হীরে হয়ে যায় তা তো আমরা সকলেই জানি। মোয়াজাঁ নামে এক ফরাসী বিজ্ঞানী এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে সত্যিকার হীরে তৈরি করেও দেখিয়েছেন, যদিও তা খুবই ছোট হীরে,—এত ছোট যে ওতে খরচে পোষায় নি। কিন্তু ঐ একই ভাবে এই সব ফসিল্ গাছের ভেতর দু'-চারটে হীরের কণাও তৈরি হয়ে যাবে এ আর বিচিত্র কি? গাছের মধ্যে কার্বনের অভাব নেই তো!'

জুড়ানমামা থামলেন। সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ। হঠাৎ কঙ্কা বলে উঠল, 'তারপর কি হল?'

'তারপর? তারপর ও নিয়ে আর আমরা মাথা ঘামাই নি। প্রকৃতির একটা তাজ্জব খেয়াল বলেই ওটাকে ঐ ভাবে ছেড়ে দিয়ে এসেছি। আমরা বিজ্ঞানী, আমরা তো আর জহুরীও নই, ব্যবসায়ীও নই! আমিও না, হোমান্ও না, হেক্টরও না। কি হবে ওসব ঝক্কি মাথায় নিয়ে? কিছু করবার হলে সরকার নিজে থেকেই করবে!'—বলে জুড়ানমামা আবার মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

● যেমন কর্ম তেমনি ফল—

—আশাপূর্ণা দেবী

নমিতা আর ননীগোপাল নতুন বাড়ি করে পর্যন্ত আমায় প্রায় প্রায়ই বলেছে, একবার ওদের বাড়িটি দেখতে যেতে। কিন্তু নতুন বাড়ি পুরনো হতে চললো আমার আর যাওয়া হয়ে ওঠে না। বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে শহরতলিতে বাড়ি বানিয়েছে, অনেকটা সময় হাতে না করে তো আর যাওয়া হয় না।

যাক চেষ্টা যত্ন করে সময় বার করে আজ এসে হাজির হলাম।

তা বাইরে থেকে বাড়িটি সত্যি ছবির মত দেখাচ্ছে, আপনার জনকে ডেকে দেখাতে ইচ্ছে করে। খুশী খুশী মুখে দরজার বেল টিপলাম।

সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ননীগোপালের চাপা গলার একটুকরো কথা শোনা গেল, আঃ এই ছুটির দুপুরে কে আবার জ্বালাতে এল?

কিন্তু একথাটা নিশ্চয়ই আমার উদ্দেশে নয়; এই ভেবেই বুকে সাহস নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, মিনিট খানেক পরেই দরজা খুলে যায়। খুলে দেয় নমিতা, আর আমাকে দেখেই শোরগোল করে আহ্লাদ প্রকাশ করে ওঠে, ওমা! পিসীমা। এতদিনে সময় হল তাহলে? নতুন বাড়ির দেয়ালে তো শ্যাওলা ধরে গেল!

আমি হেসে বলি, বাজে কথা বলিস না, একেবারে ছবির মতন বাড়ি। বোগেনভেলিয়া গাছটার কী দারুণ বাড়-বৃদ্ধি হয়েছে রে! এত সুন্দর লাগছে!

না, ননীগোপালের সেই চাপাগলার কথাটুকু আমি মনে রাখিনি। কেনই বা রাখব? ও তো ইতিমধ্যে একগাল হেসে পায়ের ধুলো নিয়ে বলে উঠেছে, আমরা তো আপনার আসার ব্যাপারে হাল ছেড়েই দিয়েছিলাম। আসুন আসুন, ভেতরে আসুন, এই প্যাসেজে দাঁড়িয়েই কথা হবে না কি?

নমিতাও বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ চল বাবা পাখার তলায়।

আমি ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বলি, কুটুস পুটুসকে দেখছি না যে?

ওরা? ওরা আজ ভারী ব্যস্ত।—নমিতা হিহি করে হেসে ননীগোপালের দিকে তাকিয়ে বলে, জানো তো? ওরা আজ লেটুসের জন্মদিনের ঘটার উয্যুগ আয়োজন করছে।

লেটুস!

আমি তো শুনে থতমত খেয়ে যাই। লেটুস আবার কে? কুটুস পুটুসদের কোনো ভাইবোন হওয়ার খবর তো শুনিনি কোনদিন। তাছাড়া এই তো কিছুদিন আগেও ওরা আমাদের পাড়াতেই ছিল। তা'হলে জানতে পারতাম না? জন্মদিন পালন করতে তো অন্ততঃ একটা পুরো বছরের দরকার।

অবাক্ হয়ে বলি—লেটুস কে?

নমিতা কৌতুকের হাসি হেসে বলে, কে? ও আপনি বুঝি জানেন না? সে আমাদের আর একটি পুত্তুর সন্তান। আচ্ছা ডাকছি—

ননীগোপালই হাঁক পাড়ল, বলল, কুটুস পুটুস চটপট নেমে আয়! দেখ কে এসেছেন।

সঙ্গে সঙ্গেই দুড়দুড়িয়ে নীচে নেমে এল ওরা, আমি তখন ওদের ভিতরের দালানে পা ফেলছি।...না, পা ফেলিনি, ফেলতে যাচ্ছিলাম, ফেলা হল না, দাঁড়িয়ে পড়লাম।...স্রেফ স্ট্যাচুর মতো।

হ্যাঁ স্ট্যাচুর মতই যে আমার চোখের পাতা স্থির হয়ে গেল, সারা শরীরের অবস্থা হল নট নড়ন চড়ন নট কিচ্ছু, সেটাই শুধু অনুভব করতে পারলাম।

আর বুঝতে পারলাম এই লেটুস।

এই সময় কুটুস পুটুস দুই ভাই বোনের সম্মিলিত অভয়বাণী শুনতে পেলাম, কিছু করবে না, কিছু করবে না, চলে এসো না।

আমার চোখের পলক পড়ছে না বটে, চক্ষুস্থিরই হয়ে গেছে, তবু ওদের দুজনার মুখের ছবি দেখতে পাচ্ছি, সে মুখে কী দিব্য জ্যোতি! যেন আশ্বাস আর বিশ্বাসের মূর্ত প্রতীক।

আমি কিন্তু লোক সুবিধের নই, তাই আশ্বাসও পাই না বিশ্বাসও করি না। কেন করব?...এ ভাষা কি আমার কাছে নতুন? জীবনে এই প্রথম শুনলাম?

চিরটি কাল শুনে আসছি না, এই আহ্লাদে-গলা সুরের আশ্বাস বাণী।

'কিছু করবে না, কিছু করে না।'

আশ্চয্যি, কেউ আর দ্বিতীয় রকম কিছু বলে না, ওই এক ভাষা। ছেলে বুড়ো, মহিলা পুরুষ,

দেখুন, দর্শকবৃন্দ! কী অত্যাচার হচ্ছে আমার ওপর।

স্যার আমার কুড়ি দিনের মাইনাটা মিটিয়ে দিন—
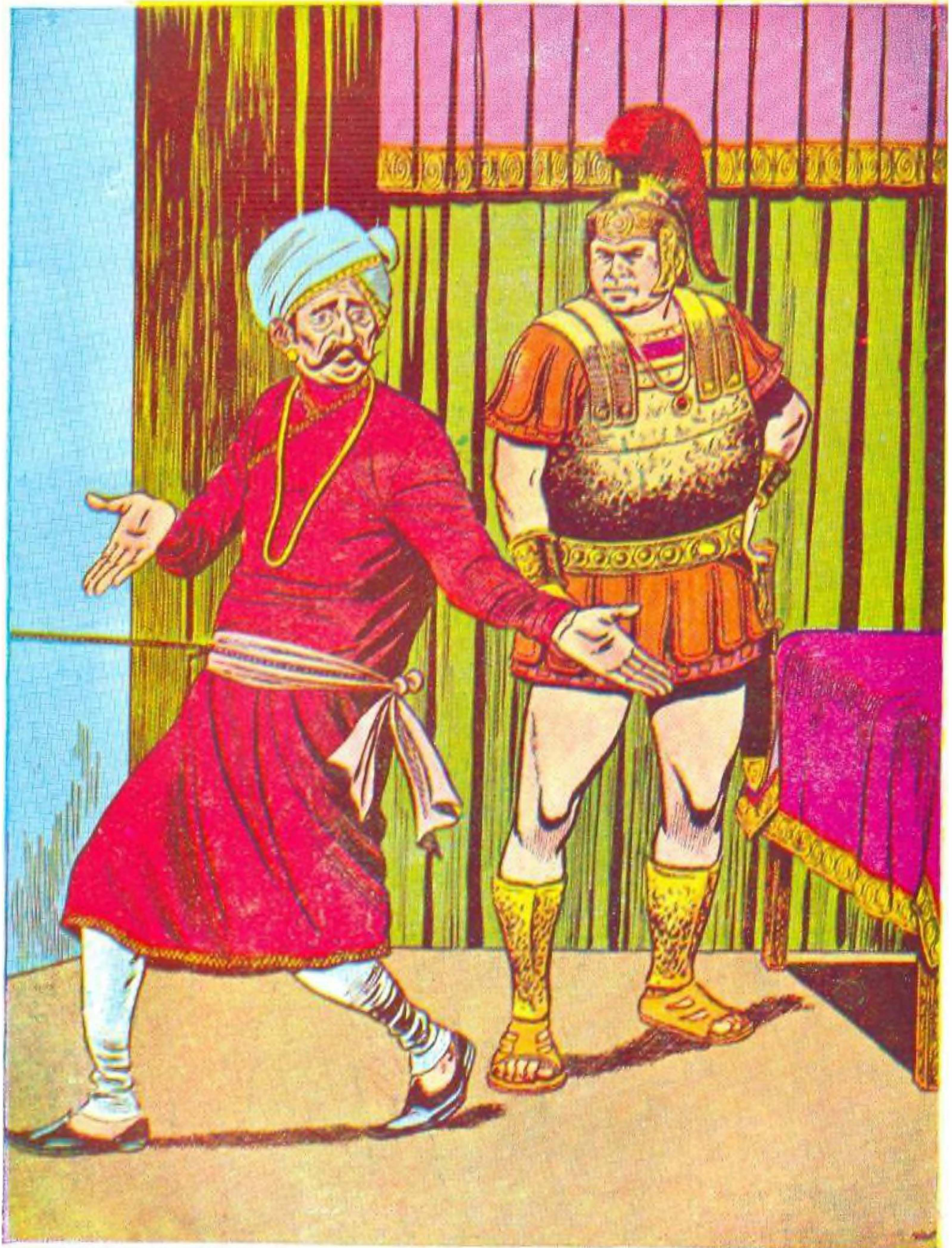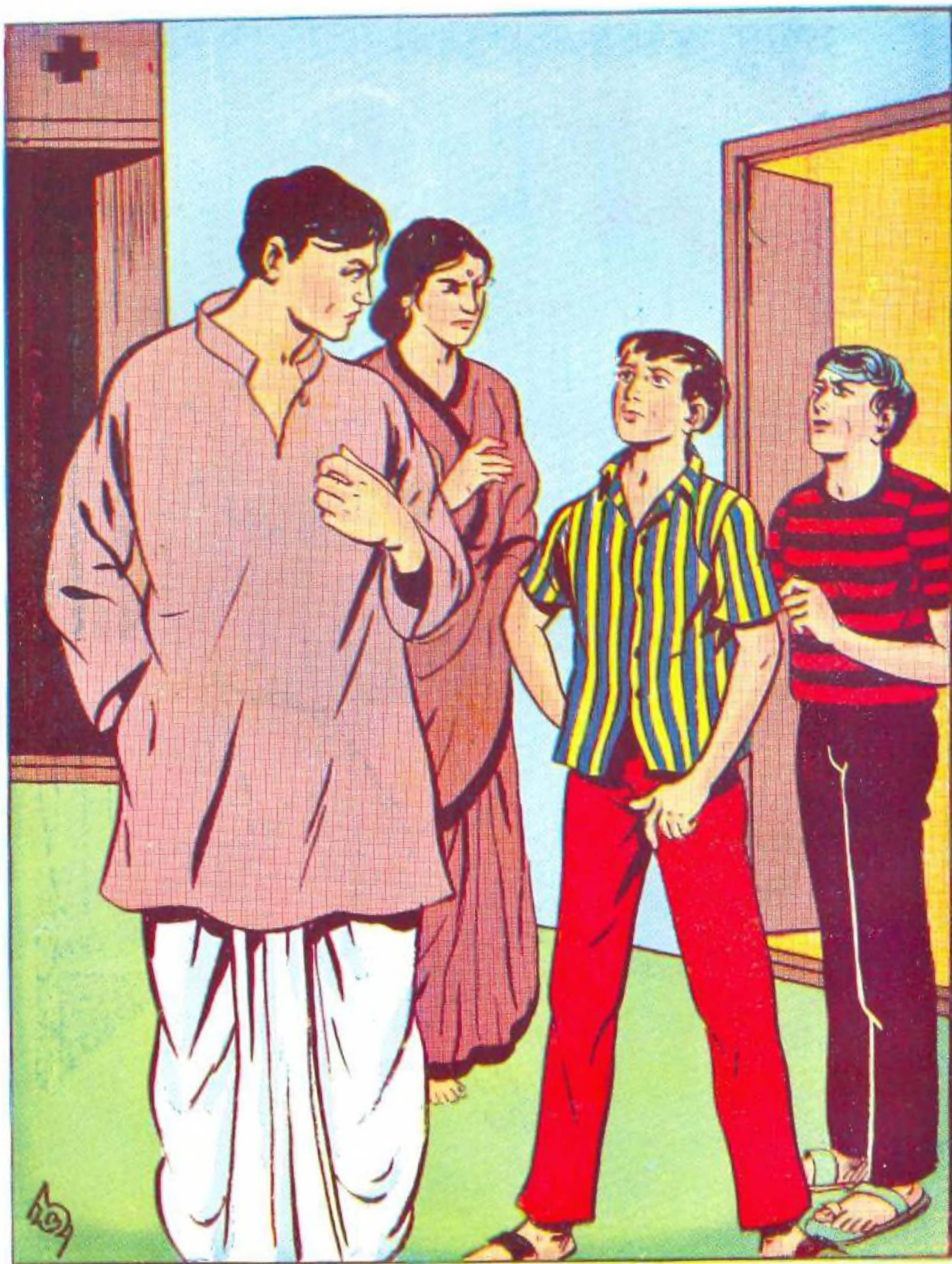
সেকেলে একেলে, ফ্যাসানি অফ্যাসানি, বড়লোক গরিবলোক, মানে বাঘা অ্যালসেশিয়ানের মালিক অথবা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা দেশী কুকুরের মালিক যেই হোক সবাই অবিকল এই একই ভঙ্গীতে অমায়িক হাসি হেসে বিশ্বাসে বিগলিত গলায় আশ্বাস দেবে, কিছু করবে না, কিছু করে না। অতএব সে তার কুকুরটিকে ভীতত্রস্ত কুকুরাতঙ্কিত আগন্তুকের সামনে থেকে এক ইঞ্চিও নড়াবে না।

দেখে দেখে হাড় হদ্দ হয়ে গেছে আমার।

কিন্তু কিছু করবে কি করবে না সে পরীক্ষায় বসতে যাচ্ছে কে? আমি তো জীবনেও নয়। ওই 'কিছু না করা নিরীহ' প্রাণীটিকে দেখলেই তো আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে, চোখের পাতা স্থির হয়ে যায়, আর হার্টের ওপর হাতুড়ির ঘা পড়তে থাকে।...মনে হয় ওই বুঝি ছুটে এসে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়ল আমারই ওপর।

তার পরের দৃশ্যের কথা আর ভাবতে সাহস হয় না। শুধু মনশ্চক্ষে একটা ছিন্নভিন্ন বিদীর্ণ দেহের ছায়া দেখতে পাই।

তবে? এই ধারণা নিয়ে কে যেতে যাবে সেই সব বাড়িতে! যে বাড়িতে ওই মূর্তিমান বিভীষিকার কোনো একখানি নমুনা আহ্লাদে গোপালের মত চেনছাড়া হয়ে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়ায়! না বাবা, জেনে শুনে আমি কখনো কুকুরওলা বাড়িতে বেড়াতে যাই না, ছায়া মাড়াতেও না।

আর নেহাতই যদি দায়ে পড়ে, কি কারে পড়ে, বাধ্য হয়ে যেতেই হয়, তা'হলে গাড়ি থেকে নামবার আগেই বলি, আপনাদের কুকুর বাঁধুন মশাই!...এবং অজানা বাড়িতে যাবার দরকার হলে আগে জিগ্যেস করে নিই বাড়িতে কুকুর-টুকুর নেই তো?

যদিও জানি কুকুরবৎসল প্রভুরা তাঁদের কুকুরকে 'কুকুর' বললে দারুণ আহত হন, সময় সময় বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধও। আর যে লোক ওই গাঁইয়া শব্দটা ব্যবহার করে তাকে খুব নিষ্ঠুর আর অমার্জিত ভাবেন।

কিন্তু আমি তো ভেবে পাই না কুকুরকে কুকুর ছাড়া আর কি বলব? কি বলা যায়? তাই আজও একটু পরে আমার স্ট্যাচুত্ব ভঙ্গ করে বলে উঠি, কি সর্বনাশ! তোরা আবার কুকুর পুষছিস কবে থেকে রে নমিতা? বাঁধ বাবা শীগগির বাঁধ!

নমিতা সেই বাঘের মতন ভয়ংকর মূর্তি অ্যালসেশিয়ানটার পিঠে আদরের হাত বুলিয়ে বলে, কিছু করবে না পিসীমা, নির্ভয়ে চলে এসো।

আর ননীগোপালও দোয়ার দেয়, আসুন চলে আসুন, এ ব্যাটা একেবারে নিরীহ। দু'মাস বয়েস থেকে আমার কাছে আছে। এত দিনে এর বারো মাস বয়েস হলো।

শুনে তো আরোই স্থির হয়ে যাই আমি। এই বয়সেই যে-প্রাণী এমন বাঘা হয়ে উঠতে পারে, তাকে কখনো বিশ্বাস করতে আছে? অতএব সমস্ত লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়ে বলি, তা' হোক বাপু, বাঁধো তুমি। জানোই তো চিরকাল আমার কুকুরাতঙ্ক। তাছাড়া ও যেভাবে আমার দিকে তাকিয়ে 'গরর গরর' করছে—

কুটুস পুটুস হেসে উঠে বলে, এ মা কী ভয়! ও তো আহ্লাদ হলে ওরকম করে। দেখছ না ল্যাজ নাড়ছে। বাড়িতে কেউ বেড়াতে-টেড়াতে এলে লেটুস খুব খুশী হয়। না রে লেটু লেটুস? লেটাই বাবু! তুমি আমাদের সোনা ছেলে লক্ষ্মীসোনা, তাই না?

বলে, কুকুরটাকে এক ইঞ্চি মাত্রও না নড়িয়ে!...সে এদিকে সমানে গরর্ গরর্ করে চলেছে।

কাজেই আমি নির্লজ্জের মতই বলি, বুঝতে পারছি তোদের কুকুর তোদের মতই লক্ষ্মী, তবু ভরসা পাচ্ছি না, বাঁধ ওকে।

বাঁধা তো দূরের কথা—

কুটুস হঠাৎ জ্বলন্ত গলায় বলে ওঠে, ই—স! তুমি আমাদের লেটুসকে কুকুর বললে?

বলে তার গায়ে একটু আদরের চাপড় মারে।...এতে ও যেন আরো গরগরিয়ে ওঠে, আরো ল্যাজ নাড়ে।...ধরে নিতে হবে এটি ওর আনন্দের অভিব্যক্তি। কিন্তু বলা বাহুল্য তাতে আমি আনন্দের কিছু পাই না।

তাছাড়া এ দুটো সম্পর্কে নাতি নাতনি, আর নিতান্তই বালক বালিকা। তাই ভদ্দরলোকদের যা বলতে পারি না সেটা বলে ফেলি। তা' কুকুরকে কুকুর বলবো না তো কি হাতি বলবো? না কি বাঘ, ভালুক, সিংহী, হরিণ? তবে হ্যাঁ, বাঘ বললেও বলা যায়। যেভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে কী করে বসে বলা যায় না। না বাঁধিস তো পালাই বাবা!

এতক্ষণ ননীগোপাল হাসিহাসি মুখে দাঁড়িয়ে লেটুসের মাথায় হাত বোলাচ্ছিল, আর নমিতা মজা দেখা মুখে ছেলেমেয়ের বাক্‌চাতুরী দেখছিল, এখন একজন অবাকের গলায় বলে উঠল, কী মুশকিল! আচ্ছা নার্ভাস তো আপনি!

আর অন্যজন বলে ওঠে, সত্যি পিসীমা, তুমি যে কী? চিরকাল একরকম রইলে। আমি বলছি চলে এসো, কিছু করবে না। এটা একেবারে আমার কুটুস পুটুসেরই একজন! ঠিক ছেলেপুলের মতন ইচ্ছে সুখে ঘুরে বেড়ায়, বাঁধার অভ্যেসই হয়নি। দেখছ না, না আছে বগলস, না আছে চেন। ওসবের পাটই নেই।

শুনে রাগে হাড় জ্বলে গেল। চিরকালই জেনে আসছি, কুকুর থাকলেই তার গলায় বগলস থাকে, তাতে চেন থাকে, ইনি একেবারে কী সত্যপীর, যে ওসবের পাটই নেই?

ইচ্ছে হচ্ছিল অ্যাবাউট টার্ন দিয়ে সোজা গাড়িতে গিয়ে উঠি। দেখছিস এতক্ষণ নট নড়নচড়ন হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি, ঢুকতে পারছি না, তবু ওটাকে একটু সরাচ্ছিস না! কুকুর তোদের এত মান্যের? মহারাজা, না গুরুদেব?

কিন্তু এসব তো আর বলা যায় না, আর সত্যি চলে যাওয়াও যায় না, তাই সব দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে বলি, তা জানিসই তো বাপু আমি চিরকালই—

কথা শেষ করতে হল না, হঠাৎ কুটুস পুটুসের সাধের ছোট ভাই লেটুস তেড়ে সামনে এগিয়ে এসে ঊর্ধ্বপানে মুখ করে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল, 'ভৌ ভৌ ভৌ!' অবিরাম একটানা।

হ্যাঁ, বরাবর দেখেছি, দামী কুকুররা 'ভৌ ভৌ'ই করে, সস্তা মার্কারা করে ঘেউ ঘেউ!

ওই গর্জনের ধাক্কায় আমি একেবারে পিছোতে পিছোতে আবার বাড়ির বাইরের দিকের প্যাসেজে। আঁতকেও উঠে থাকবো।

কি করবো? অকারণ আজকের দিনটিকেই আমার জীবনের শেষদিন করে তুলবো, এমন ইচ্ছে হবেই বা কেন?

ননীগোপাল কোম্পানি কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও বিচলিত হয় না, বরং সমবেত হাস্যরোলের মধ্যে এই বাক্যাংশগুলি ছিটকে ছিটকে আমার কানে আসে।

এ মা! দিদা কী দারুণ ভীতু! একদম হাইজাম্প দিয়ে—হি হি হি!

ও পিসীমা, ভয় খাবার কিছু নেই, ও তোমায় স্বাগত জানাচ্ছে। বাড়িতে কেউ বেড়াতে এলে ও ওই রকম করে অভ্যর্থনা জানায়।

আর ননীগোপালের মধুঢালা কণ্ঠস্বর কানে আসে, ছি ছি ছোট মহারাজ, অমন করতে নেই, দেখছো তো উনি তোমার ভাষা বুঝতে পারছেন না। ভাবছেন তুমি বোধহয় খুব দুষ্টু ছেলে। চুপ করো, চুপ করো। ইস্ তোকেও লোকে ভয় খায়।

কিন্তু চুপ করতে ওর দায় পড়েছে।

ওই প্রচণ্ড হুংকার কি আর অমন হোমিওপ্যাথি ডোজে যাবার? ওদের স্নেহ-স্পর্শ ছাড়িয়ে লেটুস হঠাৎ তেড়ে এগিয়ে এসে আমার কাছে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়।

এতক্ষণে বোধহয় ননীগোপালের কিঞ্চিৎ লজ্জা হয়, তাই বলে ওঠে, ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে। দেখছি আজ তোমার মুড নেই। চলো তবে তোমায় ঘরে বন্ধ করে রাখিগে।

বলে কষ্টে টেনে নিয়ে যায় তাকে।

লজ্জা আমিও পাই, বলি, দেখো কাণ্ড দুপুর বেলা এসে তোমাদের বিপদে ফেলা। তা হ্যাঁরে নমিতা, ঘরে বন্ধ কেন? বাঁধবার চেন রাখিস না কেন?

চেন!

নমিতা বেজার মুখে কষ্টে হাসি টেনে এনে বলে, না পিসীমা! চেন রাখিনি। আমার কুটুস পুটুসকে কি আমি গলায় চেন বেঁধে রাখি? আসলে তুমি ঠিক ওর ইয়েটা ধরতে পারনি। ও তোমাকে—

আমি সভয়ে বলি, কিন্তু ও যা করে তেড়ে এল—

এখন কুটুস পুটুসের তীব্র অভিযোগ উথলে উঠলো, তা' আসতেই পারে। তুমি ওকে সন্দেহ করেছ, ওকে 'কুকুর' বলেছ, ওর বুঝি মান অপমান জ্ঞান নেই?

হতাশ হয়ে বলি, তা' হ্যাঁরে, মানুষকে মানুষ বললে তো কই তার অপমান হয় না?

কুটুস বলে, ওরা মানুষের থেকে অনেক বুদ্ধিমান জাত।

নমিতা ছেলের কথায় একটা শেষাংশ জুড়ে দেয়, আর দারুণ অভিমানী।

পুটুসও গাল ফুলিয়ে বলে, হুঁ! দেখো না, ঘরে বন্ধ করলে কী ভীষণ রেগে যায়। মা, সেই যেদিন ছোটমামী এসেছিল, ছোটমামীও তো তেমনি ভীতু, তাই ওকে একটুক্ষণ বাথরুমে

বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। উরে ব্যস। সে কী কাণ্ড! দু'মিনিট পরেই বোমা পড়ার মতন শব্দ। গিয়ে না হি হি, দেখা গেল হি হি, বাথরুমের আয়না ভেঙেছে, বেসিন ভেঙেছে, তেলের শিশি ভেঙেছে, আর যত সাবান মাজন বুরুশ আর মগ বালতি নিয়ে ডাংগুলি খেলেছে। আর তারপরে মা? বাপী যেই দরজা খুলে দিয়েছে? রাগে দুঃখে বাপীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাপীর নতুন শার্টটা না, হি হি, ফালি ফালি করে দিল।

শিউরে উঠে স্তম্ভিত হয়ে বলি, বলিস কি? তাহলে তো খুব রাগী আছে।

পুটুস চোখ গোল করে বলে, ও বাবা, দারুণ রাগী। একদিন আমাদের বিস্কিট দেওয়া হয়েছিল, আর ছিল না বলে ওকে দেওয়া হয়নি, মাকে কী করেছিল, মনে আছে মা?

নমিতা বিরক্ত গলায় বলে, আচ্ছা হয়েছে। তোমার রাগ হলে মাকে দুমদাম বসিয়ে দাও না? যাক্ চলো পিসীমা ঘরে বসবে। এতক্ষণ এসেছ দাঁড়িয়েই আছো। তোমার কুকুরাতঙ্ক একটা দ্রষ্টব্য বাবা।

না বলে পারি না, তা' আতঙ্ক তো তোরও ছিল নমিতা। হঠাৎ এমন পরিবর্তন?

নমিতা গম্ভীর ভাবে বলে, অজানা অচেনা পাড়ায় অন্য ভয় ভাঙ্গাতেই কুকুরের ভয় ত্যাগ করতে হয়েছে মাসীমা! কে আমাদের রক্ষা করতে আসতো বলো? ওই ছোট্ট বাচ্চাটাই তো আমাদের রক্ষা করে আসছে। মানুষের থেকে ভাল ওরা!

কুটুস বলে ওঠে, হ্যাঁ, বাড়ির জিনিসে যা টান। বাড়ি থেকে কেউ কিছু নিয়ে যাক দিকি? একবার বুলা কাকীমা মার একটা উলের প্যাটার্নের বই চেয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, আরে ব্যস! বুলা কাকীমাকে না একেবারে—উঃ! সাধে কি আর বলে কুকুর অতি প্রভুভক্ত জীব।

কিন্তু সেই প্রভুভক্ত জীবের ভীম গর্জন শোনা যাচ্ছিল তখনো কোনো অলক্ষিত জগৎ থেকে। তবু ঘরে বন্ধ আছে জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে এদের বসবার ঘরে এসে বসি।

তারপর নমিতার নতুন বাড়ির খুব সুখ্যাতি করি, ননীগোপালের বাড়ি সাজানোর অনেক প্রশংসা করি। কুটুস পুটুস যে আগের থেকে কালো হয়ে গেছে (মানে আগে আরো অনেক ফরসা ছিল, এটা প্রমাণ করতে) এ কথা বলি, ওদের কোন্ ক্লাস হলো, এ নিয়ে প্রশ্ন করি (যেন জেনে আমার স্বর্গলাভ হবে। বাড়ি ফেরার আগেই তো ভুলে যাব)। মানে আত্মীয় বাড়ি বেড়াতে গেলে যা যা করতে হয়, এবং বলতে হয় তার সবই করি আর বলি।

ননীগোপাল এখন ধাতস্থ হয়ে বলে, কই পিসীমাকে চা খাওয়াচ্ছ না?

নমিতা ঠোঁট উলটে বলে, আহা সে আর তোমায় শেখাতে হবে না, হচ্ছে। কমলা আনছে।

পরিস্থিতিটা শান্ত হয়ে আসে, অদৃশ্য জগতের সেই তীব্র গর্জনও হঠাৎ ঠাণ্ডা মেরে যায়। কিন্তু কেন যায়, তা যদি জানতাম!

জানলাম।

যখন নমিতার আধুনিকা রাঁধুনী কমলা সুন্দর ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে নিয়ে ভিতর

থেকে এসে ড্রইং রুমে ঢুকল।

কমলার পিছনে একটি গভীর ছায়া।

আর কমলার পিছনে একটি 'গরর গরর' ধ্বনি।...কমলা বলে ওঠে, মেসোমশাইয়ের যা কাণ্ড! একে রেখেছেন ঘরে বন্ধ করে! খুলে দিতে পথ পাই না।

আমি আবার স্ট্যাচু বনে যাচ্ছি...আমার নাড়ীর স্পন্দন হারিয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।

তবে তখনও শুনতে পাচ্ছি কিছু কিছু।

নমিতার উল্লসিত কণ্ঠ শুনতে পেলাম, কি? আর বন্দী থাকতে রাজী হল না বুঝি?

কমলার অমোঘ কণ্ঠ শুনতে পেলাম, রাজী হবার ছেলে নাকি? আপনার বেডকভারের একটা কোণ তো এর মধ্যেই চিবিয়ে ঝুরো করে ফেলেছে।

নমিতার কণ্ঠ, ওমা! হ্যাঁ গো তুমি ওকে বেডরুমে আটকে রেখেছিলে?

তোমার সঙ্গে ভাব জমাতে এসেছে। [পৃ. ১০৬

নবীগোপালের কণ্ঠ, আর কোথায় রাখব? কিচেনে ঢুকলে তো রক্ষে রাখবে না, বাথরুমের হিস্ট্রী তো মনেই আছে। ওখানেই কিছু নেই ভেবে—

পুটুসের কণ্ঠ, দিদা এত ভয় না পেলে বেচারীকে বাঁধা পড়তে হত না।

কুটুসের কণ্ঠ, ওরা ঠিক বুঝতে পারে কে ওদের পছন্দ করছে, আর কে করছে না। ওদের দারুণ ঘ্রাণশক্তি আছে।

হ্যাঁ, প্রথমটা এসব শুনতে পেয়েছিলাম আমি।

কারণ তখনো ওই ঘ্রাণশক্তিসম্পন্ন জীবটি আমার ঘ্রাণ নিতে আসেনি।...তখনো কমলার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে তার হাতের ট্রেতে রক্ষিত বিস্কিটের ঘ্রাণ নিচ্ছিল।

তারপর?

তারপর নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আমার দিকে এগিয়ে এসেছে।

একেবারে আমার পায়ের কাছে!

হ্যাঁ একেবারে ঘনিষ্ঠ হয়ে।

আমি বোধহয় একবার কোনো কিছু বলে আর্তনাদ করে উঠেছিলাম, কিন্তু নমিতা নিঃশব্দে নিজের ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে আমায় চুপ থাকতে অনুরোধ করলো।

নমিতার মুখে মৃদু হাসি।

কৌতুকের, করুণার।

খুব আস্তে বললো, তোমার সঙ্গে ভাব জমাতে এসেছে। বুঝেছে তুমি আমাদের আপনজন।...

ননীগোপাল আরো আস্তে, মুডটা খুব ভাল দেখছি।...

তারপর আর কিছু শুনতে পাইনি আমি। কিছু দেখতেও পাইনি। আমি আর পাথরও নই, ক্রমশঃ কাঠ হয়ে যাচ্ছি।...লেটুস আমার পা শুঁকছে।...শুঁকেই চলেছে।

আমার গলার মধ্যে মরুভূমি, চোখের মধ্যে বালি, কানের মধ্যে ঘুরঘুরে পোকা, সর্বাঙ্গে আরশোলা।...আমার মাথাটা যে ঘাড়ের ওপর আছে, তা' টের পাচ্ছি না, মনে হচ্ছে ঝুলে সোফার ও পিঠে পড়ে যাচ্ছে, আর আমার পায়ের তলায় মাটি নেই বলেই পা তলিয়ে যাচ্ছে, কোন্ গভীর গহ্বরে কে জানে।

শুধু নিথর পাথর বালি ভরতি চোখের একটু ছায়া থেকে দেখতে পাচ্ছি, এদের চার জনের মুখেই একটি অলৌকিক হাসি। আহ্লাদের, কৌতুকের, আত্মপ্রসাদের, করুণার।

মৃত্যুকালে এই মুখগুলিই দেখে যেতে হবে আমাকে?

চকিতে আমার বাড়ির লোকেদের মুখগুলি মনে পড়ে গেল, তারা যখন খবর পেয়ে ছুটে আসবে, আমার কী চেহারা দেখবে।...আর পরদিন খবরের কাগজে কী খবর বেরোবে!

তা খবরের কাগজে বেরোবে বৈকি। এতকাল কলম নিয়ে কারবার করে মরছি।

সারি সারি অনেকগুলো নাম জানা খবরের কাগজের পৃষ্ঠা দেখতে পেলাম।

তার ওপরে ঝুঁকে পড়েছে অনেক অনেক মাথা।

ও মাথা কাদের?

চেনা অচেনা কত কতদের কে জানে।

শুধু দেখতে পাচ্ছি তাদের চোখ গোলগোল, মুখে কাতর অভিব্যক্তি।

কারণ—তারা পড়ছে—'প্রবীণা লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর জীবনাবসান। একটি ক্রুদ্ধ কুক্কুরের নৃশংস দংশনে শোচনীয় ভাবে নিহত।'

ছি ছি, কী লজ্জা!

কী বিচ্ছিরি!

বুঝছি যেন আমাকে আর তখন নরলোকে মুখ দেখাতে হবে না, কিন্তু মরার পরেও কি

'মুখ দেখানোর' একটা দায়িত্ব নেই? থাকে না? চিরকাল ঠিক করে রেখেছি 'হৃদ্রোগে আকস্মিক মৃত্যু'—আর সেই জায়গায় কিনা এই!!

নাঃ! 'মরীয়া' বলে একটা কথা আছে না?...

লেটুস যখন আমার গাল চাটবার বাসনায় তার লম্বা লকলকে জিভটা বার করে গলার কাছে একটু ছুঁইয়েছে, তখন আমার মধ্যে সেই মরীয়া শব্দটা কাজ করল।

আমি শরীরের সব শক্তি প্রয়োগ করে ওকে দুহাতে ঠেলে দিলাম।...না ঠিক দিলাম নয়, দিতে গেলাম।...তারপর? তারপর আর জানি না, শুধু মহাপ্রলয়ের পূর্বমুহূর্তে সমস্ত পৃথিবী থেকে যে ভীম গর্জন ওঠে, সেই গর্জনটা আমার ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান আচ্ছন্ন করে কোথায় যেন ধ্বনিত হতে লাগল।

আমি যমদূতের করস্পর্শ পেলাম।

আমি বৈতরণী নদীর কূলে গিয়ে পড়লাম।

কিন্তু না, তবু খবরের কাগজে খবরটা ওঠেনি। খবর পেয়ে বাড়ির লোকেও ছুটে আসেনি। ননীগোপাল কোম্পানির আপ্রাণ চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত লেটুস বাংলা ভাষার একজন প্রবীণা লেখিকাকে নিহত করে উঠতে পারেনি।...ওই কোম্পানিতে অবশ্য আরো দুই ব্যক্তি যোগ দিয়েছিল।...ওদের চাকর নটবর, আর মালী ঝগড়ু!

যখন আবার আমি আমাকে দেখতে পেলাম, তখন দেখলাম, আমার শাড়ি ছিঁড়েছে, চশমা ভেঙেছে, চটির পাটিরা উধাও হয়ে গেছে, চুল খুলে উড়ছে, আর আমার বুকের মধ্যে হাপর চলছে।

চোখ মুখের চেহারা কি হয়েছে জানি না।

ভাগ্যিস সামনে একখানা লম্বা আরশি ঝোলানো নেই!

নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু ননীগোপাল কোম্পানির মুখ তো দেখতে পাচ্ছি। সারি সারি চারখানি।...সে মুখে কি লজ্জার কালিমা? অপরাধের বেদনা? দুঃখের মালিন্য?

নাঃ! মোটে না। মা বাবা ছেলেমেয়ে চার জনের মুখেই ধিক্কার আর ভর্ৎসনার, ক্ষোভ আর অপমানের ভাব।...যেন আমার সঙ্গে কথা কইতেও বাসনা নেই। তবু কইলো কথা। প্রথমে ননীগোপালই কইলো, কি আশ্চর্য! আপনি ওরকম করলেন কেন? ও তো কিছুই করেনি।

আমার বুকের মধ্যে তখনো হাপর চলছে। আমি চুলগুলোকে টেনে বাঁধবার চেষ্টা করছি, কথা বলতে পেরে উঠছি না। ইত্যবসরে নমিতা ক্ষুব্ধ রুষ্ট গলায় বললো, সত্যি, কী যে করলে তুমি পিসীমা! ও বেচারী কত ভালবেসে তোমার সঙ্গে ভাব জমাতে এসেছিল। বাড়িতে কেউ বেড়াতে এলে, ওর তাকে পছন্দ হলে ও ওইভাবে আপ্যায়ন করে। প্রথমে শুঁকে শুঁকে দেখে নেয়, তারপর কোলে ওঠে। তুমি এমন লম্ফঝম্প করে ওকে ধাক্কা দিলে, বেচারী ক্ষেপে গেল।...তোমার কাণ্ড দেখে ঝগড়ু আর নটবরটা তো ওদিকে গিয়ে হেসেই অস্থির।

হেসেই অস্থির!

সত্যি, কী যে করলে তুমি পিসীমা! ও বেচারী কত ভালবেসে তোমার সঙ্গে ভাব জমাতে এসেছিল। [পৃ. ১০৭

আমার অবস্থা দেখে!

হায় ভগবান! কেন আমার হাতে আইন নেই, আর আমার এক্তারে একটাও ফাঁসি কাঠ নেই!...যাক নেই বলেই ওই শিম্পাঞ্জি দুটো এযাত্রা পৃথিবীতে রয়ে গেল।

মনের মধ্যে অনেক কথার ঝড় বইতে থাকে, আগুনের শিখার মত, লোহার গোলার মত, ধারালো ছুরির মত, ছুঁচলো বর্শার মত, কিন্তু একটি কথাকেও ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে দিই না। শুধু চশমার কণিকাগুলো শাড়ি থেকে ঝেড়ে ঝেড়ে ফেলে মাটিতে জড়ো করতে থাকি। এর ফাঁকে কুটুস পুটুসের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাই, তার সঙ্গে জ্বালাভরা কণ্ঠস্বর, ক্ষেপে আর যাবে না! তুমি এসে পর্যন্ত ওর সঙ্গে যা ব্যাভার করলে! যার জন্যে ওকে আটকা পড়তে হয়, ও তার ওপর দারুণ রেগে থাকে।...তাও তো তবুও ভাব করতে যাচ্ছিল। উঃ তুমি এমন ঠ্যালা মারলে, যেন রাস্তার কুকুর! আজ পর্যন্ত কেউ ওকে এরকম করেনি। ও না সব 'ভাব' বুঝতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে নমিতাও সায় দিয়ে বলে ওঠে, সত্যি পিসীমা আমি তো ওকে কুটুস পুটুসের থেকে আলাদা ভাবি না। লোককে বলি আমার তিনটি ছেলেমেয়ে! আমাদের সঙ্গে টেবিলে ভিন্ন খাবে না। কাউকে কিছু করে না। নিজের খাবার ছাড়া অন্য খাবার খেতে ইচ্ছে হলে, শুধু মুখ বাড়িয়ে দেখিয়ে দেয়, মোটেই মুখ দেয় না। আমাদের তো মনেই পড়ে না ও আমাদের একজন নয়। আপন মনে খেলে বেড়াচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তাহলে? এত সব অকাট্য দৃষ্টান্তের পরও না হাসলে মানায়! তাই ভিতরের সেই সব আগুন লোহা ছুরি বর্শাদের হাসির রসে গলিয়ে ফেলে বলি, তাহলে বোধহয় ওর সঙ্গে আমার পূর্বজন্মের শত্রুতা ছিল! না হলে যে কক্ষণো কিছুই করে না—

কুটুস পুটুস ভারী মুখে বলে, তোমাকেই বা কি করেছে বলো? কামড়েছে? আঁচড়েছে? রক্ত বার করে দিয়েছে?

না, ওসব যে করেনি, এটা স্বীকার করতেই হয়। গায়ে কোথায় কোথায় যেন চিনচিন করছে, তা সে নেহাত অলক্ষ্যে। ফিরে গিয়ে কতক্ষণে ডাক্তারের লক্ষ্যগোচর করবো, তাই ভাবছি।

বলি,—তা সত্যি, আসলে দোষটা আমারই।

ওদের দেখে ভয় পাওয়াটাই খারাপ—ননীগোপাল আত্মস্থ গলায় বলে, তাতেই ওদের মনে সন্দেহ আসে।...কি হল? চলেই যাচ্ছেন? চা টাও তো খাওয়া হল না। আর একটু করে দিক।

ঘরের মেজেয় চায়ের ঢেউয়ের উপর তচনচিয়ে ভেঙে পড়া চায়ের কাপ ডিস কেটলির টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে আমি অমায়িক গলায় বলি, থাক থাক আজ তোমরা সবাই ব্যস্ত। আর একদিন হবে, ওর আর কি? এই নমিতা, ঘরের মেজেয় অনেক কাঁচ ভাঙা ছড়িয়ে আছে সাবধান!

নমিতা ডিঙিয়ে এগিয়ে এসে ক্ষুব্ধ গলায় বলে, আবার যেদিন আসবে, এতো ভয় কোরো না বাপু!...দেখো কিছু করবে না।...সত্যি আসলে কিছুই করে না বেচারা। হঠাৎই আজ—

● বাজিমাৎ—
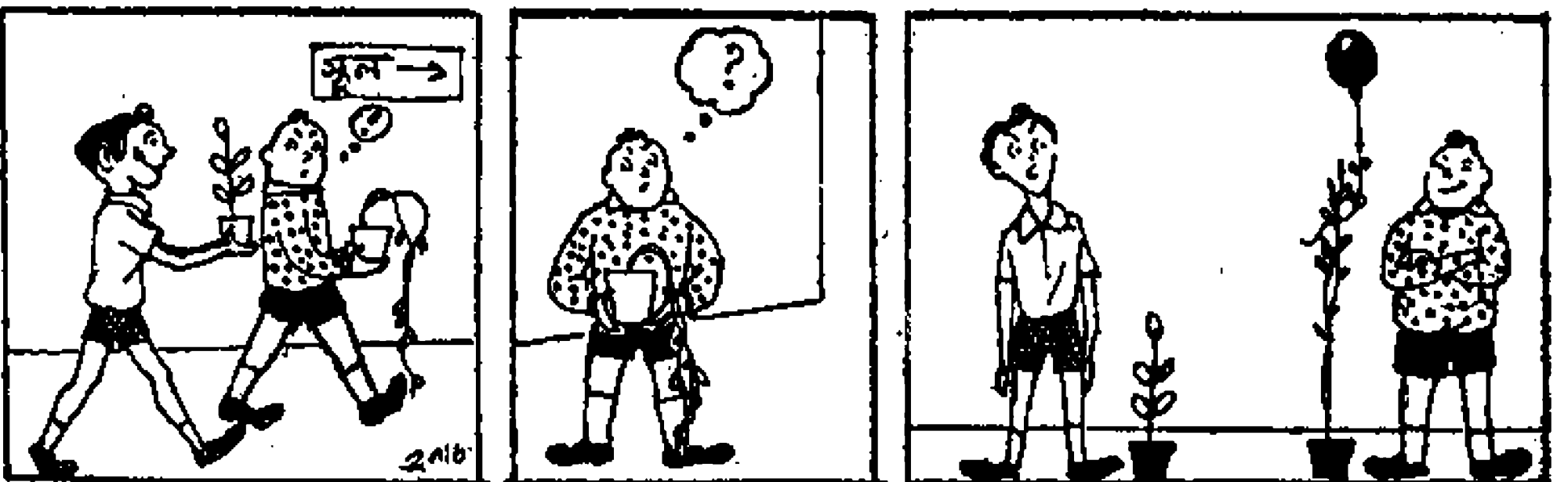
বাংলা দেশে অমরেশ

—বিধায়ক ভট্টাচার্য

প্রথম দৃশ্য

[অনেকদিন ধরেই বাংলাদেশ থেকে অমরেশের কাছে অনুরোধ আসছিল,—ওখানে গিয়ে একটা নাটক করার। নাটক করা মানে ওখানকার ছেলেমেয়েদের শিখিয়ে পড়িয়ে—তাদের দিয়েই অভিনয় করানো। তাদের ইচ্ছা—দ্বিজেন্দ্রলালের ''চন্দ্রগুপ্ত''টাই হোক। অনুরোধকারীদের মধ্যে ছিল বিকাশ, অমিয়র সহপাঠী এবং প্রিয়বন্ধু। বিকাশরা আসলে পশ্চিম বাংলারই মানুষ। কিন্তু বছর কয়েক হল ওর বাবা ঢাকায় ট্রান্সফার হয়ে গেছেন, ফলে ফ্যামিলীও চলে গেছে সেই সঙ্গে।

বিকাশের অনুরোধে অমরেশ গেছে ঢাকায়। সঙ্গে যথারীতি পতিত, অমিয় আর ভুবন। কথা আছে এরা তিনজনেই পার্ট করবে,—বাকী ওখানকার ছেলেমেয়ে—অর্থাৎ বিকাশ এবং তার বন্ধু-বান্ধবীরা। এছাড়া অমরেশ নিজে তো আছেই। হইহই করে ছেলেমেয়েরা বাড়িতে নিয়ে গেল অমরেশ, অমিয়, পতিত আর ভুবনকে। সেদিন খালি গল্পগুজবেই কাটলো,—রিহারস্যাল পরদিন। তার দুদিন পরে প্লে।]

পরদিন সন্ধ্যে থেকেই রিহারস্যাল। অমরেশ বললো—একবারে পাঁচটা থেকে রিহারস্যাল শুরু হওয়া চাই, নইলে রাত্তিরের খাওয়া দাওয়া করতে রাত একটা বাজবে। কাজেই কেউ যেন বাইরে না থাকে।

অমরেশ। কীরে বিকাশ? এখানে মেয়ে সাজবার মেয়ে কি পাওয়া যাবে, না ছেলেদের সাজতে হবে?

বিকাশ। আমার মনে হয় মামা,—আমাদের ছেলেদেরই কয়েকজনের তৈরী হয়ে থাকা উচিত। অবিশ্যি আমি মেয়েদের—মানে যারা এখানে প্লে

ট্রে করে তাদের খবর পাঠিয়েছি। কিন্তু ইন্ কেস্ তারা যদি না আসে, তাহলে তো ভুগতে হবে।

অমরেশ। ঠিক আছে। তাহলে একটু দেখতে ভাল, এমন কয়েকটা ছেলেকে ধরে আন্। একটু বাজিয়ে দেখি। যদি দেখি কাজ চলে যাবে, তাহলে তো কেল্লা মার্ দিয়া। আর যদি না চলে তবে মেয়েদেরই হাতে পায়ে ধরে নামাতে হবে।

বিকাশ। ঠিক আছে মামা। তাই হবে।

অমরেশ। তাহলে ওদের সব্বাইকে সন্ধ্যের পরে এই ঘরে আসতে বল। রিহারস্যাল দিয়ে দেখি কী হয়।

বিকাশ। বেশ আমি তাহলে যাই এখন? রাখাল!

অমরেশ। রাখালটা আবার কে?

বিকাশ। ও হল এখানকার ছেলেদের পাণ্ডা। ওকে শুধু বলে দিলেই হবে, আমাদের কী কী চাই। সন্ধ্যের পরেই ও সবাইকে এনে হাজির করবে। হয়তো আনতে শুরুও করেছে।

অমরেশ। ভেরি গুড়! তাহলে তো কাজের ছেলে। ডাক্—একবার দেখি জিনিসটিকে।

বিকাশ। রাখাল!

নেপথ্যে রাখাল। হ। যাইতে আছি দাদা!

অমরেশ (প্রায় নিজের মনে) খেয়েছে!

[বলতে বলতেই রাখালের প্রবেশ। কালো রোগা লম্বা চেহারা। একটু থতমত খেয়ে জবাব দেয়। বড় বড় চুল মাথায়। ফলে উদ্ভট দেখাচ্ছে।]

রাখাল। কী হইছে বিকাশ দাদা? ডাকতে লাগছেন ক্যান্?

বিকাশ। ডাকছি পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য। এই হল আমাদের মামা। অমরেশ মামা। নাম শুনেছিস তো?

রাখাল। হ। নামতো মায়ের প্যাটে বইস্যাই শুনছি। অখন কাম দ্যাখনের লাইগ্যা খাড়া হইয়া রইছি।

বিকাশ। ভাল। তাও দেখতে পাবি। এখন যা দিকিনি সবাইকে ডেকে নিয়ে আয়। বলবি—রিহারস্যাল আরম্ভ হবে। আর দেরি করলে চলবে না।

রাখাল। আইচ্ছা।

বিকাশ। আর যাদের আসবার কথা ছিল—

রাখাল। হ। তাগোও আনছি। আজ দুইগা মাইয়্যা পাইছি দাদা! আবার কাইল দেখুম।

(অমিয়ের প্রবেশ)

অমিয়। কী ব্যাপার মামা? বাইরের ঘরে কি চাকরির ইনটারভিউয়ের লোকজন জড়ো হয়েছে?

অমরেশ। না। অভিনয়ের।

অমিয়। সাবাস্।

অমরেশ। কেন? সাবাসের কী করলাম?

অমিয়। তোমার সাহসকে বলিহারি দিচ্ছি।

[অমরেশ একটুকাল অমিয়ের দিকে চেয়ে থেকে—]

অমরেশ। তা-দে। আপত্তি করবো না। এবার এক কাজ কর। বইখানা আমাকে দে, আর ওদেরকে একজন-দুজন করে আসতে বল্! হ্যাঁরে, সবাইকে বলে দিয়েছিস তো যে এটা ডি. এল. রায়ের সেই পুরোনো—চন্দ্রগুপ্ত নয়। নতুন করে লেখা—আমার চন্দ্রগুপ্ত?

অমিয়। হ্যাঁ, সে কথাও বলেছি। তাতেই আরো বেশী নার্ভাস হয়েছে সবাই।

[বলে অমিয় চলে গেল। অমরেশ যেন একটু উত্ত্যক্ত, একটু অধীর হয়ে উঠলো। সে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলো,

আর মাঝে মাঝে মুখে 'উঃ'-'আঃ' শব্দ করতে লাগলো।]

(অমিয় ঢুকলো একটি সুন্দরী তরুণীকে সঙ্গে নিয়ে।)

অমিয়। মামা, এই যে! এর নাম অলকানন্দা। খুব স্মার্ট। বি-এ পাস করেছে। একে দিয়ে তোমার হেলেন খুব ভাল হবে।

অমরেশ। (একটুকাল চেয়ে থেকে) হ্যাঁ, চেহারা দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। এখন—! কী? পারবে তো মা?

অলকা। হ্‌।

অমরেশ। হ্‌ নয়, বলো হ্যাঁ।

অলকা। হ্যা।

অমরেশ। হ্যাঁ। বলো হ্যাঁ।

অলকা। হ্যা।

অমরেশ। ওই চন্দ্রবিন্দুটা ছাড়লে চলবে না মা। ওটাকে ধরে রাখতে হবে। আচ্ছা—তুমি এসো মা। সন্ধ্যেবেলায় এসো রিহারস্যালে। দেখবো চেষ্টা করে। কেমন?

অলকা। আইচ্ছা।

[অলকা অমরেশকে প্রণাম করে চলে গেল।]

অমরেশ। মেয়েদের একজনকে তো দেখলাম। এ যা ছব্বা,—যাকগে—এবার ছেলেদের একজনকে পাঠিয়ে দে দিকিনি। সেদিকের অবস্থাটা একটু দেখে নিই।

[অমিয় চলে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার ঢুকলো, একটি ভারী সুন্দর চেহারার যুবককে নিয়ে। সে এসে অমরেশকে প্রণাম করলো।]

অমরেশ। কী নাম তোমার?

যুবক। আমার নাম?

অমরেশ। হ্যাঁ।

যুবক। আমার নাম পচ্‌চানন গগ্‌গোপাধ্যায়।

অমরেশ। (একটু চেয়ে থেকে) ও! তোমার নাম পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়?

যুবক। না-না। আমার নাম পচ্‌চানন গগ্‌গোপাধ্যায়।

অমরেশ। ও! আচ্ছা, তুমি রিহারস্যালে থেকো। কখন কী দরকার লাগে বলা তো যায় না।

যুবক। আগ্‌গে-হ্যা। সে তো ঠিক কথাই। তাইলে এখন যাই?

অমরেশ। এস।

[যুবক ভক্তিভরে নমস্কার করে বেরিয়ে গেল। অমরেশ হতাশভাবে চারদিকে চাইল। সে কী করবে—যেন ভেবে পাচ্ছে না।]

অমরেশ। অমিয়!

(অমিয় ঢুকলো)

অমিয়। কী মামা?

অমরেশ। সুটকেশ গুছিয়ে ফ্যাল্ বাবা! রাত্তিরে যদি গাড়ি না থাকে, তাহলে সকালের গাড়িতে আমরা রওনা হবো। রাত্তিরটা স্টেশনেই থাকবো।

অমিয়। সেকি! থিয়েটার?

অমরেশ। সবাই ভালটালো থাকলে—সামনের বছর দেখা যাবে।

অমিয়। ছি ছি, তাহলে ওরা যে খুব দুঃখ পাবে মামা।

অমরেশ। আমাদের দুঃখ পাওয়ার চেয়ে—ওদের দুঃখ পাওয়াটা উচিত। কারণ সেটা ওদের পাওনা। এই এক বছর ধরে ওরা বইটা রিহারস্যাল দিক। বৎসরান্তে এসে দেখবো—কত দূর এগিয়েছে ঘটনাটা।

অমিয়। কিন্তু এক বছর ধরে রিহারস্যাল দিলে ওদের এনার্জি নষ্ট হয়ে যাবে যে।

অমরেশ। সব কিছু নষ্ট হওয়ার চাইতে এনার্জি একটু নষ্ট হোক্ না। তাতে মঙ্গলই হবে।

অমিয়। বলছো?

অমরেশ। বলছি বৈকি!

অমিয়। ঠিক আছে। তাহলে খবর পাঠাই?

অমরেশ। পাঠা।

অমিয়। তুমি বসে বিশ্রাম করো। আমি আসছি।

অমরেশ। যা। এখন যাবিটা কোথায়?

অমিয়। এই একটু এখানে...ওখানে... সেখানে। অনেকদিন পরে দেশে এলাম। একটু সকলের খোঁজ খবর নিতে ইচ্ছে করছে।

অমরেশ। তা নিগে যা। তবে সমঝে সামলে।

[অমিয় চলে গেল। অমরেশ কী করবে বুঝে না পেয়ে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে পুরোনো খবরের কাগজের পাতা মেঝেয় গড়াগড়ি যাচ্ছে দেখে তুলে নিয়ে পড়তে লাগলো।

একজন প্রৌঢ় মানুষ ঢুকলেন। তিনি ঘরে ঢুকে কাগজ পাঠরত অমরেশের মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর একপা একপা করে এগিয়ে এসে পাশের টুলে বসে ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন তোলেন—]

লোক। কবে আসা হল?

অমরেশ। (চমকে উঠে) এ্যাঁ?

লোক। বলছি আসা হল কবে?

অমরেশ। আসা হল মানে—এখানে আসা?

লোক। হ্যাঁ।

অমরেশ। এসেছি পরশু।

লোক। থাকা হবে এখন?

অমরেশ। কেন বলুন তো?

লোক। এমনি। অকারণেরও তো একটা কারণ থাকে!

অমরেশ। ও! সেই কথা? তা ভাল। আপনি এখানকারই বাসিন্দা?

লোক। পাকে চক্রে হয়ে পড়েছি। সে যাক্। শুনলাম থিয়েটার করবেন।

অমরেশ। সেই রকম বাসনা। তবে সবটাই সুযোগ-সুবিধা আর যোগাযোগের ওপর নির্ভর করছে, কিন্তু কেন বলুন তো? আর ইউ ইন্টারেস্টেড।

লোক। না, ঠিক তা নয়। তবে থিয়েটারের রিহারস্যাল দেখলে তো—মন কেমন করে! করে না? বলুন!

অমরেশ। করে বুঝি?

লোক। করবে না? বলেন কি মশায়? সেই ছেলেবেলায় এক বছর বয়সের সময় একটা বোবা শিশুকে নিয়ে বাবা স্টেজে ঢুকেছিলেন। তারপর থেকেই—

অমরেশ। আপনার সেই বোবা শিশুর পার্ট ছিল বুঝি?

লোক। হ্যাঁ। যাকগে, কথায় কথায় অনেক কথাই বলে ফেললাম। দেখবেন খুঁজে পেতে, যদি থাকে কিছু দেবেন,—না থাকলে দরকার নেই। উঠি তাহলে, নমস্কার।

অমরেশ। নমস্কার! কিন্তু আপনার নামটা তো জানা হল না!

লোক। আমার নাম? আমার নাম ত্রিবিক্রম পতিতুণ্ডি।

অমরেশ। বাঃ! নামটাও বেশ আপনার। ঠিক আছে। মনে থাকবে। দাঁড়ান, দাঁড়ান। আর একবার জেনে নেই। এক বছর বয়সে বাপের কোলে চেপে একটি বোবা শিশুর পার্ট করেছিলেন?

ত্রিবিক্রম। হ্যাঁ।

অমরেশ। খুব ভাল কথা। তা এখন তো আর বোবা শিশুর পার্ট আপনাকে দিয়ে হবে না? মানে এখন করাতে গেলে আপনাকে দিতে হবে বোবা শিশুর বোবা বাবা।

ত্রিবিক্রম। খুব ভাল হবে। তাই দিন! ফাটাই আর একবার।

অমরেশ। না ফাটিয়ে কিছু করা যায় না?

—কবে আসা হল? [পৃ. ১১৩

রিহারস্যালে। কী আপনাকে দেওয়া যায়, দেখবো।

ত্রিবিক্রম। দেখবেন। তবে এটুকু আপনাকে বলে রাখছি, পার্ট আমাকে যাই দিন না কেন, সহ অভিনেতা অভিনেত্রীদের বলে রাখবেন, তারা যেন হুঁশিয়ার হয়ে পার্ট করে আমার সঙ্গে।

অমরেশ। তাই নাকি?

ত্রিবিক্রম। নাকি নয়, তাই। আমার সঙ্গে অভিনয় করতে করতে কত লোক যে অজ্ঞান হয়ে গেছে, তার ঠিক ঠিকানা নেই। কাজেই—

অমরেশ। বটেই তো! আচ্ছা আমি সবাইকে বলে দিচ্ছি। অমিয়!

(অমিয় ঢুকলো।)

অমিয়। কী মামা? ডাকছো কেন?

অমরেশ। শোন্! এই ত্রিবিক্রমবাবু আমাদের সঙ্গে পার্ট করবেন। অন্য পার্ট তো কিছু নেই। চন্দ্রগুপ্তের কাছে হেলেন

ত্রিবিক্রম। যাবে না কেন? খুবই করা যায়। তবে ব্যাপার কি জানেন? আমি জাত অভিনেতা তো? সেইখানেই হয় মুশকিল। কিছুতেই বাজে পার্ট করতে পারি না।

অমরেশ। তাই বুঝি?

ত্রিবিক্রম। বুঝি টুঝি নয়, তাই।

অমরেশ। বেশ। তাহলে আসবেন

যে দূত পাঠিয়েছিল, সেই পার্টটা খালি আছে, সেইটেই ওঁকে রিহারস্যাল দিইয়ে নিবি।

ত্রিবিক্রম। হ্যাঁ হ্যাঁ, দূত ফুৎ যা হয় একটা কিছু দেবেন। যা করবার আমি করে নেবো।

অমরেশ। তাহলে ওই কথা রইল। সন্ধ্যের পর রিহারস্যালে আসবেন।

ত্রিবিক্রম। আসবো। নিশ্চয় আসবো।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মঞ্চ বাঁধা হয়েছে। দর্শকের কোলাহল ভেসে আসছে। যবনিকা ফেলা। ঢুকলো অমরেশ। তার মেক আপ্ করা অবস্থা।]

অমরেশ। অমিয়!

(অমিয় ঢুকলো। সেও মেক আপ্ করা)

অমিয়। কী মামা? ডাকছো কেন?

অমরেশ। ফার্স্ট সিন রেডি?

অমিয়। হ্যাঁ।

(পতিত ঢুকলো ভুবনকে নিয়ে।)

পতিত। মামা! আমি কি একটা চন্দনের টিপ পরবো?

অমরেশ! চন্দনের টিপ,—তা টিপ একটা পরতে পারিস। তুই হিন্দু রাজা তো?

পতিত। হ্যাঁ।

অমরেশ। তাহলে পর্‌গে যা। (পতিত চলে গেল) ভুবনকে—তোর আবার কী?)

ভুবন। আমি ব-ব-বলছিলাম যে আমি কি তর্‌-তর্‌-তর্‌-ওয়াল নেবো?

অমরেশ। কিসের পার্ট যেন তোর?

ভুবন। হিন্‌-হিন্‌-হিন্দু রাজার।

অমরেশ। তাহলে তরোয়াল নিবি। কিন্তু মনে রাখবি তরোয়াল শুধু শোভার জন্য। নো মারামারি কাটাকাটি উইথ দ্যাট ওয়েপ্‌ন্‌। কী বুঝলি?

ভুবন। বুঝেছি। নো মার্‌-মার্‌-মার্‌-মার্‌—

অমরেশ। হ্যাঁ। যা এখন।

(ভুবন চলে গেল।)

অমরেশ। নাঃ, আজ আমাকে এরা ডোবাবে। বলি—ও ড্রেসার দাদা, দয়া করে এদিকে এসে আমার গো জন্মোটা খালাস করে দাও না ভাই।

ড্রেসার। এই যে—দিই দাদা।

অমরেশ। অমিয়!

অমিয়। (এগিয়ে এসে) কী মামা!

অমরেশ। কাছে আয়! জোরে বলার কথা নয়।

আমি ব-ব-বলছিলাম যে আমি কি তর্‌-তর্‌-তর্‌-ওয়াল নেবো?

(অমিয় মামার কাছে এগিয়ে এল।)

অমরেশ। ত্রিবিক্রমবাবুর ভাবগতিক খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না।

অমিয়। তাহলে?

অমরেশ। তাহলে আবার কী? শোন্‌! উনি যখন স্টেজে নামবেন, আগেই ড্রেসারকে বলে রাখবি যে খুব সরু আর শক্ত দেখে একগাছা

কালো দড়ি যেন ওঁর কোমরে বেঁধে দেয়।

অমিয়। তারপর?

অমরেশ। তারপর—উনি ঢুকে দূতের পার্টটুকু বলে যদি বেরিয়ে আসেন, অলরাইট্। নইলে যে মুহূর্তে এল্‌বেল্ বকতে আরম্ভ করেন, তাহলে দড়িতে টান দিতে হবে।

অমিয়। সে কি মামা! সে তো কেলেঙ্কারী হবে!

অমরেশ। একটু হবে। কিন্তু কোন উপায় নেই এ ছাড়া।

[অমিয় একটুকাল আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললো—]

অমিয়। ঠিক আছে। তাই হবে।

অমরেশ। চল্! মেক আপ্ কত দূর হল দেখি।

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য

[স্টেজের ওপর অভিনয় হচ্ছে। অভিনয় করছে অমরেশ। তার পরনে আলেকজাণ্ডারের পোশাক।]

আলেক। অপূর্ব দেশ এই ভারতবর্ষ। আর তার চেয়েও অপূর্ব এর অধিবাসী। এদের ইস্পাত-কঠিন দেহের মধ্যে শিশুর মত মন। আমি এদের কাছে মিত্র হয়ে আসতে পারলে বেশী আনন্দ পেতাম।

নেপথ্য কণ্ঠ। সম্রাট!

আলেক। কে?

নেপথ্য কণ্ঠ। আমি মগধের দূত সম্রাট।

আলেক। আসুন!

(ত্রিবিক্রমের দূত বেশে প্রবেশ।)

আলেক। বলুন! কী বার্তা এনেছেন?

দূত। সম্রাট! মগধরাজ বলে পাঠিয়েছেন যে আপনি যদি ভারতে এসে—

[এই অবধি বলে ত্রিবিক্রম দর্শকের দিকে মুখ করে ফিরে দাঁড়াল। তারপর শুরু করলো—]

ত্রিবিক্রম। এই নরদেহ জলে ভেসে যায়।
ছিঁড়ে খায় কুক্কুর শৃগাল—

[দড়িতে টান পড়লো। টানের চোটে দুপা এগিয়ে গেল উইংসের দিকে ত্রিবিক্রম।]

ত্রিবিক্রম। দেখুন, দর্শকবৃন্দ! কী অত্যাচার হচ্ছে আমার ওপর। আমাকে এরা পার্ট করতে দেবে না। কিন্তু আমি দমবো না।

এই নরদেহ জলে ভেসে যায়
ছিঁড়ে খায় কুক্কুর শৃগাল।
কিংবা চিতাভস্ম পবন উড়ায়।

[আবার দড়িতে টান পড়লো। দর্শকবৃন্দ হইহই করে উঠলো। ত্রিবিক্রম বলে চলেছে...]

এই নারী
এরও এই পরিণাম।
এ সংসারে তবে হায় প্রাণ দিচ্ছি কারে?

[হইহই চিৎকার। আবৃত্তি, দড়িতে টান...চিৎকার... গোলমাল...নেপথ্য থেকে দর্শকের চিৎকার...]

[এরই মাঝে সমাপ্তি যবনিকা নেমে এল।]

মানব ব্লাডহাউণ্ডের আশ্চর্য কাহিনী

(রোমাঞ্চকর সত্য ঘটনা)

—বীরু চট্টোপাধ্যায়

শুনলে তোমরাও আমার মত তাজ্জব মানবে। এও কি সম্ভব! হ্যাঁ সম্ভব। মানুষ আজ অনেক কিছু বিস্ময়কর কাজ করে চলেছে ঠিকই, তবে সে-সবই বিজ্ঞানের সৌজন্যে। কিন্তু বিজ্ঞানের তোয়াক্কা না করে, বিজ্ঞানকে হার মানিয়ে অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী কিছু লোক তাদের সহজাত অলৌকিক ক্ষমতাবলে অপরাধী সন্ধানে এমন সব কাজ করে চলেছে তা বুঝি বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তাই স্থানীয় পুলিস বিভাগ ওদের যথার্থ নামকরণই করেছে—'মানব-ব্লাডহাউণ্ড'।

এরা প্রকৃতই অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ। অপরে যা চর্মচক্ষে দেখতে পায় না, এরা সহজেই তা দেখতে পায়। অপরে যা বুঝতে পারে না বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে এরা তা সহজাত ক্ষমতাবলে ঝটিতি বুঝে ফেলে। আর এদের ঘ্রাণশক্তি বুঝি কুকুরের চেয়েও শতগুণে প্রবল।

এবার তাহলে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাবে এদের অবিশ্বাস্য ক্ষমতাসমূহের রূপ :

খাকী ইউনিফর্ম পরিহিত বিল্লি নামক কাঠকয়লার মত গায়ের রঙের কৃষ্ণাঙ্গ যুবকটি উবু হয়ে বসে তার মাকড়সাসম আঙুলগুলোকে প্রস্তরভূমির ওপর একবার এদিক একবার ওদিক করে বিলি কেটে যাচ্ছিল। পায়ের তলাকার পাথরের ওপর সে এমনভাবে হাত বোলাচ্ছিল যেন মনে হচ্ছিল কাউকে সে পরম স্নেহে আদর করে চলেছে।

কিছুক্ষণ এইভাবে করবার পর সহসা মুখ তুলে পাশে দাঁড়ানো শ্বেতাঙ্গ পুলিস ইন্সপেকটরকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো, স্যর, এই পথে, এই পাথরের রাস্তার ওপর দিয়ে ঘোড়ায় চেপে গেছে। লোকটা খুবই মোটাসোটা, খুব তাড়া ছিল তার। ঘোড়াটার পেছনের বাঁ দিকের পাটা কিছুটা খোঁড়া। লোকটা বেশী দূর যেতে পারে নি এখনো।

অতঃপর পশ্চিম দিক পানে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সে বললে, আমরা স্যর ঐদিকে গেলে এক কি দু মাইলের মধ্যেই লোকটাকে পেয়ে যাব।

শ্বেতাঙ্গ সাহেব পায়ের তলাকার প্রস্তরভূমির দিকে বারেক তাকালো। মসৃণ, নিরেট, কড়া রোদে উত্তপ্ত প্রস্তরভূমি। তাতে দৃশ্যতঃ কোন চিহ্ন বা ছাপ দৃষ্ট হল না।

কিন্তু সাহেব প্রকৃত হতবাক্ই হল যখন তারা পশ্চিম দিকে মাইল দেড়েক এগিয়ে গেল দ্রুত। সেখানে দেখা গেল বিশালকায় এবং বদমেজাজী জনৈক পশুপালক ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে চলেছে। সত্যি সত্যিই দেখা গেল সেই ঘোড়াটার পেছনের বাঁ পায়ের খুঁত থাকায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। অচিরেই ওরা পাকড়াও করে ফেললো পলাতক সেই পশুচোরকে।

সাহেব পরে বিল্লিকে প্রশ্ন করেছিল তুই কি করে ঐ মসৃণ চিহ্নহীন নিরেট একটা পাথরে এত কিছু দেখতে পেলি?

ধূমপান করা কালো এক সারি দাঁত বের করে সহাস্যে সে জবাব দিল, আমি দেখি না 'বস্', আমি অনুভব করি, বুঝতে পারি।

বিল্লির কোন উপাধি নেই। সে অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী এক উপজাতীয়দের ছেলে। যারা পদচিহ্ন দেখে পিছু নিতে সক্ষম, এক্ষেত্রে অপরাধীদের গতিপথ অনুসরণে পারঙ্গম, তাদের বলা হয় 'ট্র্যাকার'। বিল্লি অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চল রাজ্যের বিচ্ছিন্ন বিস্তৃত অঞ্চলে যে পুলিস বাহিনী টহল দিয়ে বেড়ায়, সেই বিভাগে কাজ করে। কৃষ্ণাঙ্গ ১৮ জন যুবক এই মানব ব্লাডহাউণ্ডের কাজ করে অফিসারদের সঙ্গে। আমাদের দেশে খুন হলে যেমন পুলিস কুকুর আনা হয়, তারা যেমন গন্ধ শুঁকে শুঁকে অপরাধীদের পাকড়াও করে। এরাও তেমনি তবে কুকুরদের চেয়ে আরও অনেক বেশী গুণে গুণান্বিত এরা।

বিল্লি যা করলো সাহেবের মনে হল তা যেন কোন জাদু বা ডাকিনী বিদ্যাবলে। আসলে কিন্তু তা নয়, এগুলো ওর এবং ওর সহকর্মী, কৃষ্ণাঙ্গ ভাইদের পক্ষে জলভাতের মত সহজ নিয়মমাফিক কর্তব্যকর্মমাত্র। বিজ্ঞানে যা পারে না ওরা ওদের অলৌকিক ক্ষমতাবলে তা অবলীলাক্রমে করে যাচ্ছে। পাথরের গায়ে কয়েকটি মাত্র অশ্বখুরের আঁচড় চিহ্ন দেখে এত বড় রহস্য উদ্ঘাটন যেন ওদের কাছে কোন কাজই নয়।

আজ ওদেশে হেলিকপ্টার ও স্পটার প্লেন দিয়ে অঞ্চলসমূহ টহল দেওয়া ও তদারকি করা হয় বলে, এই কৃষ্ণাঙ্গ 'ট্র্যাকার'দের সংখ্যা কমতে কমতে মাত্র ৯৪ জন-এ এসে ঠেকেছে। তবুও বিজ্ঞানের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে এই 'মানব ব্লাডহাউণ্ড'রা আজও উক্ত পুলিস বাহিনীতে অপরিহার্য বলেই গণ্য।

'প্রকৃত কোন জটিল ক্রিমিনাল সন্ধানে এতাবৎ আবিষ্কৃত যে কোন যন্ত্রের চেয়ে এই কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেরা হাজার গুণে কার্যকরী' একথা বলেছে অশ্বারোহী টেরিটোরি পুলিস বাহিনীর জনৈক জাঁদরেল অফিসার। তার মতে বিমান শুধুমাত্র লক্ষ্য করতে সক্ষম কিন্তু এই 'ট্র্যাকার'রা অনুমান করতেও পারে, সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। এদের সবচেয়ে বড় ক্ষমতা হল এরা স্মরণশক্তিতে হাতিকেও হার মানায়।

অপরাধী-সন্ধানে পথিমধ্যে ট্র্যাকার ও সাহেব চা করে খাচ্ছে।

শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশের প্রথম যুগ থেকেই পুলিস ও সামরিক বিভাগ এই সব আদিম অধিবাসী কৃষ্ণাঙ্গ স্কাউট (তখন এদের স্কাউট নামেই অভিহিত করা হত) নিযুক্ত করতে থাকে। প্রখ্যাত 'গ্রিফিন-কেস'-এর সময় থেকেই এই সব ক্ষীণাঙ্গ অঙ্গারবর্ণ, আজগুবী ধরনের চুল ও লোমওয়ালা আদিম অধিবাসীদের অকল্পনীয় প্রতিভার পরিচয় পেয়ে সাহেবরা বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে যায়।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কুইন্সল্যাণ্ড ম্যাকেঞ্জি নদীর ধারে দুজন পুলিস ট্রুপারের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে ক্লারমণ্ট খনির কর্মীদের মাহিনাবাবদ ১০,০০০ পাউণ্ডের স্বর্ণমুদ্রা খুনী অপহরণ করে নিয়ে গেছে।

পুলিস পার্টির তদন্তকার্যে নেতৃত্ব নেয় ইন্সপেক্টর গ্রিফিন। সঙ্গে যায় ১৯ বছর বয়স্ক এক কৃষ্ণাঙ্গ ট্র্যাকার।

মৃতদেহদ্বয়ের নিকটে পাওয়া কিছু পায়ের ছাপের প্রতি গভীর মনোযোগ সহকারে তাকিয়ে

রইল খানিক সেই কৃষ্ণাঙ্গ আদিম অধিবাসী ছেলেটি। তারপর তাকালো পুলিস অফিসারের পরিহিত বুটের দিকে। পরমুহূর্তে সে অভিযুক্ত আঙ্গুল তুললো স্বয়ং তদন্তকারী অফিসার ইন্সপেক্টর গ্রিফিনের পানে। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো, আপনি, ইন্সপেক্টর সাহেব আপনিই খুনী, এদের আপনিই খুন করেছেন।

সঙ্গে আসা অপরাপর পুলিস ট্রুপারদের নিরবিচ্ছিন্ন জেরার কবলে পড়ে একসময় গ্রিফিন ভেঙে পড়লো এবং সব কিছু স্বীকারোক্তিও করলো সবিস্তারে। উক্ত দুই কনস্টেবলকে গুলি করে মেরে সে-ই দশ হাজার পাউণ্ড স্বর্ণমুদ্রা হাতিয়ে নিয়েছে। জুয়ার দেনাভারে আকণ্ঠ ডুবে যাওয়া ইন্সপেকটর সাংঘাতিক অর্থের প্রয়োজনে নাকি এ কুকর্ম করতে বাধ্য হয়েছে, বলে জানায় সে।

ট্র্যাকার ছেলেটি গ্রিফিনের বুটকে তুলনামূলক ভাবে পরীক্ষা-নীরিক্ষা না করেই ওর পায়ের ছাপ চিনে ফেলেছিল। মাসখানেক বাদে 'গ্রিফিনের' ফাঁসি হয়ে যায়। এবং সেদিন থেকেই কৃষ্ণাঙ্গ ট্র্যাকাররা পুলিস বাহিনীতে অপরিহার্য কর্মিরূপে পরিগণিত হয়ে গেল। চিরন্তনভাবে প্রতিষ্ঠিতও হয়ে গেল।

বর্ণমালাসম পথরেখা পড়বার ক্ষমতা আদিম অধিবাসী প্রাচীন শিকারী উপজাতীয়দের মধ্যেই সর্বপ্রথম উন্মেষিত হয়। কেননা খাদ্যের প্রয়োজনে শিকার অনুসরণের এটাই ছিল শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। যে মহাদেশে তারা বাস করত তা সারা বিশ্বের মধ্যে শুষ্ক, তেমনি চরম অনুর্বর আর লালিত্যহীন। তাই অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এই ধরনের অপার্থিব ক্ষমতার বিকাশলাভ ঘটেছিল, আহার সন্ধানের প্রয়োজনে।

যেহেতু তাদের খাদ্য ছিল যে কোন বস্তু বা প্রাণী তাই সব কিছুরই গতিপথ অনুসরণে অভিজ্ঞ হয়ে উঠলো তারা। এমন কি প্রস্তরভূমিতে টিকটিকি, গিরগিটি বা সর্পকুলের চলাচলের চিহ্নও তারা ঠাহর করতে শিখলো।

জন্তু-জানোয়াররূপী শিকারকে অনুসরণ বা ধাওয়া করে অনেক সময় বিপুল পথাতিক্রম করতে হত এবং তা পায়ে হেঁটেই। তাই তারা কালক্রমে হাঁটার বা দৌড়নোর ব্যাপারে অকল্পনীয় গতিবেগ ও সহ্যশক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠলো। শোনা যায় এমন আদিম অধিবাসী নাকি আকচার রয়েছে যারা দীর্ঘ পা ফেলে, আধা দৌড়ের কদমে, এক একদিনে সুদীর্ঘ ৯০ মাইল পথও একনাগাড়ে অতিক্রম করতে পারে। আবার শ্বেতাঙ্গ মানুষের ২৪ ঘণ্টায় যে-আহার ও পানীয় লাগে, সেই একই পরিমাণ খাদ্যপানীয় খেয়ে সাত দিনেরও কম সময়ে টানা ৩০০ মাইল পথ পেরিয়ে যেতে পারে এই কৃষ্ণাঙ্গ মানুষেরা।

যে পথ অতিক্রম করে তার তাৎক্ষণিক অনুলিপি করতেও ওরা সমান ওস্তাদ। শ্বেতাঙ্গ সাহেব বিল্লিকে দেখেছে ধুলোমাটিতে হাতের চেটো ও আঙুলের দ্বারা দ্রুতগামী প্রাণীদের অবিকল পদচিহ্ন একই দ্রুততায় আঁকতে।

—এই দেখুন স্যার ক্যাঙারুর পায়ের দাগ, বলে বিদ্যুৎগতিতে সে কনুই, হাত ও বুড়ো আঙুল দিয়ে ধুলোপথের উপর থপ থপ লাফিয়ে এমন ক্যাঙারু সদৃশ পদচিহ্ন এঁকে দিল যা শ্বেতাঙ্গ মানুষের পক্ষে আসল বা নকল প্রভেদ করা অসম্ভব।

তারপর সে হাত দিয়ে সেই চিহ্নগুলোকে কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট করে, কিছুটা টেনে টেনে চলা চিহ্ন এঁকে, সহাস্যে সাহেবকে বললে—এবারে স্যর ক্লান্ত হয়ে পড়া ক্যাঙারুর পায়ের ছাপ এটা।

এই কৃষ্ণাঙ্গ ট্র্যাকারদের অকল্পনীয় সাহায্য ব্যতিরেকে লক্ষ লক্ষ বর্গমাইলের প্রস্তর মরুভূমি, রুক্ষধূসর প্রান্তর ও জলাভূমি অধ্যুষিত এলাকা টহল দিয়ে শাসনে রাখা ওদেশের পুলিস বাহিনীর পক্ষে প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব ছিল। বিশেষ করে নিরক্ষীয় পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া কুইন্সল্যাণ্ড এবং নর্দার্ন টেরিটরি।

ওদের নিয়ে একজন অশ্বারোহী শ্বেতাঙ্গ ট্রুপার যে কোন ইংলিশ কাউন্টির চেয়ে দশ বিশ গুণ বড় অঞ্চল অনায়াসে টহল দিয়ে ফেরে।

'ট্র্যাকার'' পাথুরে জমির ওপর সাপের চলাচলচিহ্নও ধরতে পারে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুই কি তিনজন অশ্বারোহী ট্র্যাকার থাকে একজন সাহেব পুলিসের সঙ্গে। তবে স্পেশাল কোন কোন কেস্-এ ট্র্যাকার অনেক সময় একা একাই কাজ করে যায়। এবং এইসব সময় তারা অপরাধী পাকড়াও করে নিয়ে আসবেই আসবে।

অপরাধী হয়ত সপ্তাখানেক পথ এগিয়ে চলে গেছে, সে যে জায়গায়ই লুক্কায়িত থাক না কেন, কালক্রমে অনুসরণকারী এই 'মানব ব্লাডহাউণ্ড' ঠিক তাকে গিয়ে ধরে ফেলবে। এক হয় তাকে হাতকড়ি আবদ্ধ অবস্থায় নিয়ে আসবে, নয়ত নিজে সে প্রাণ দেবে।

পুলিসের দ্বারা পেছুধাওয়া হয়ে অল্পসংখ্যক শ্বেতাঙ্গ অপরাধীই বনেজঙ্গলে ঝোপে-ঝাড়ে আশ্রয় নেয়। কেননা সেক্ষেত্রে তাদের বেশীদিন বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কিন্তু আদিম অধিবাসী

অপরাধীরা অনায়াসে এই ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশে লুকিয়ে থাকতে সক্ষম হয় বহুদিন। তখন এই স্বজাতীয় ক্রিমিনালদের ধরতে পারে একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ ট্র্যাকাররাই।

এই ধরনের এক কুখ্যাত গণহত্যাকারী কৃষ্ণাঙ্গকে যে কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেটি পাকড়াও করে ধর্মাধিকরণে হাজির করেছিল, তার তুলনা বুঝি বিরল। সে বুঝি সমস্ত ট্র্যাকারদের মধ্যে সেরা।

নরহত্যাকারী উক্ত লোকটা ছিল দাড়িগোঁফওয়ালা বিরাট এক কালো দৈত্য বিশেষ। নাম তার নেমারলুক। তার ডাকাতি ও নরহত্যার ইতিহাস সুদীর্ঘ। হত্যার মিছিলে তার শেষ কুকর্মটি হল উত্তরাঞ্চলস্থিত ট্রেচারী উপসাগরের উপকূলে তিনজন মুক্তাসন্ধানী জাপানী ধীবরকে নৃশংসভাবে হত্যাকাণ্ড।

এই দুর্দান্ত কালাপাহাড় দানবকে যে ধরতে গেল সে তার দেহের অর্ধেক সাইজের ক্ষীণাঙ্গ এক যুবক ট্র্যাকার। নাম তার বুলবুল।

এই দুজনের লুকোচুরি বা চোর-পুলিশ খেলা চললো রুক্ষ শুষ্ক প্রান্তর ও বিশাল জলাভূমি ও বনজঙ্গল ঘেরা পুরো একটি জেলার মত বড় ও বিস্তৃত স্থান জুড়ে। দিনের পর দিন মাসের পর মাস। তাকে পাকড়াও করতে সময় লেগেছিল পাক্কা আট মাস। এই সুদীর্ঘ সময় বুলবুল একা একাই বনে জঙ্গলে ঘুরেছিল।

নাছোড়বান্দা সেই অনুসরণপর্ব।

পলায়নরত নেমারলুক পথিমধ্যে ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে থেকে অনুসরণকারীকে বদলা নিয়ে খুন করবার চেষ্টা করেছে ডজনখানেক বার কিন্তু প্রতিবারেই সে বিফল হয়ে পালিয়েছে সামনের দিকে।

বুলবুল অবিরাম গতিতে অকল্পনীয় ধৈর্যসহকারে পেছু নিয়ে গেছে অপরাধীর। এ কথাও সে জানতো যদি তার শিকার প্রথমে তাকে দেখে ফেলে তো তার ইহলীলা তন্মুহূর্তে খতম হয়ে যাবে।

নেমারলুক এইভাবে অবিশ্বাস্য প্রায় ৪০০ মাইল পথ উন্মুক্ত প্রান্তর এড়িয়ে, ঝোপজঙ্গল বনপথে পায়ে হেঁটে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে। এবং এই পলায়নপথে সিগারেট ও দেশলাই ছিনতাই করবার প্রয়োজনে কমপক্ষে আরও দুজন মানুষকে সে খুন করে এগিয়ে গেছে।

অবশেষে বুলবুলের অকল্পনীয় অধ্যবসায়ের এবং ধৈর্যের শেষ হল। সে একদা ঘুমন্ত অবস্থায় দানবাকৃতি অপরাধীকে পেয়ে তার ওপর সাপের ছোবলের ক্ষিপ্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হাতকড়ি-আবদ্ধ করে ফেলে। অপরাধীকে জেগে উঠে অস্ত্র ধরবার সময়ও দেয়নি এই ক্ষুদে ট্র্যাকার।

বুলবুলকে ওর সহকর্মী ট্র্যাকাররাও দেবাংশী এক বিস্ময়কর মানবরূপ জ্ঞান করে। শোনা যায় সে ভরা ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে বুকে হেঁটে লুক্কায়িত অবস্থায় এমনভাবে এগিয়ে যেতে পারে যে বাইরে থেকে কোন মানুষ তা টেরই পাবে না চর্মচক্ষে। এমনকি ধানগাছগুলোতে সামান্যতম ঢেউও দৃশ্য হবে না।

কুইন্সল্যাণ্ডের ট্র্যাকার হ্যাপি অবশ্য বুলবুলের মত অতটা যশস্বী নয়। তবু গুণগত দিক দিয়ে সে তার খুবই কাছাকাছি বলা যায়। বিশেষ করে তার একটি অপরাধী সন্ধান তো তুলনাবিরল ঘটনা।

উইনটন নামক রগচটা ধনাঢ্য একজন কৃষকের স্ত্রী রাতারাতি উধাও হয়ে যায় একদা। পুলিস কর্তৃপক্ষ এটাকে নরহত্যাজাতীয় ঘটনা বলে সন্দেহ করলো।

কৃষক ভদ্রলোক কিন্তু সরাসরি এ অভিযোগ অস্বীকার করে বললে যে তার স্ত্রীর নাকি দুরারোগ্য ব্যাধি ছিল, তাই হয়ত সে মনের দুঃখে কোথাও চলে গেছে।

পুলিস সেই মহিলার কোন পাত্তাই করতে পারলো না। তাদের এরপর আর করবারও কিছু রইল না। অবশেষে অনন্যোপায় হয়ে তারা শেষ চেষ্টা হিসাবে তাদের চ্যাম্পিয়ন ট্র্যাকার হ্যাপিকে লাগিয়ে দিল ওই রহস্য উদ্ঘাটনে। হ্যাপি নামটি রসিকতা করে রাখা। কেননা তার মুখমণ্ডল সদাই বিষণ্ণ ও বিষাদপূর্ণ থাকতো। আরেকটি কারণও ছিল, তা হল হ্যাপির স্বজাতীয় নামটি ছিল পরিপূর্ণ অনুচ্চারণযোগ্য।

সাহেব ওকে ডেকে বললে, এই ভদ্রলোকের স্ত্রী বেপাত্তা হয়েছেন, তাঁকে তোমায় খুঁজে বার করতেই হবে হ্যাপি।

নদনদী পেরিয়ে ট্র্যাকার চলেছে খুনীর সন্ধানে।

বিরসবদনে হ্যাপি বিকৃত মুখ করে একসময় কাজে লেগে গেল। ফার্ম হাউসে বার কয়েক এলোমেলো পাক খেয়ে অবশেষে গেট পেরিয়ে প্রান্তরে নামলো সে। এগিয়ে যেতে লাগলো কাঁটাগুল্ম ঝোপের দিকে।

মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে কি যেন শুঁকতে লাগলো। গাছের ওপর হাত বুলিয়ে একসময় একটা সরু ডাল ভেঙে হাতে নিল, সেটাকে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসহকারে পর্যবেক্ষণ করে ফের এগিয়ে চললো।

সঙ্গী কনস্টেবলদের চোখে কিন্তু কোন প্রকার কিছু পড়লো না; এমনকি কোন পায়ের ছাপের চিহ্নমাত্রও নয়।

তল্লাশী কার্য এই ভাবে চললো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ট্র্যাকার কখনো থামে, কখনো গুটিগুটি

পায়ে চলে, পথরেখার প্রতিটি গজ সে শুঁকতে শুঁকতে ছুঁতে ছুঁতে চললো। এইভাবে আধ মাইলটাক পথ অতিক্রম করে একসময় একটা শুকনো নালার কাছে এসে হ্যাপি সহসা অতিশয় উত্তেজিত হয়ে পড়লো যেন। বলে উঠলো,—পাচ্ছি...পাচ্ছি...গন্ধ পাচ্ছি আমি। প্রায় নিজমনে কথাগুলো বিড়বিড় করতে করতে অতি শম্বুকগতিতে সে শুষ্ক নালা ধরে আরও নীচের দিকে এগিয়ে গেল।

অবশেষে সে একস্থানে থেমে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে একটা জলাজমিতে আঘাত করতে করতে বলে উঠলো, এই স্থান খুঁড়ে দেখুন স্যার। এরই তলায় রয়েছে শ্বেতাঙ্গিনী মেম মেরী!

মাটি খুঁড়ে সত্যিসত্যিই সেখানে পাওয়া গেল কৃষক পত্নী মেরীর মৃতদেহ। শবের মস্তকটি প্রবল আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গেল।

কৃষক উইনটন বাদবাকী জীবনের মত জেলে চলে গেল। আর বিষণ্ণ বিষাদমুখো হ্যাপি ফিরে গেল তার সহিসের কাজে, পুলিস ঘোড়াদের পরিচর্যা করতে।

অপরাধী সন্ধান ছাড়াও এই ট্র্যাকাররা আরেকটি বিষয়েও খুবই পারদর্শী। তা হল, শ্বেতাঙ্গদের টেলিগ্রাফ পদ্ধতিকেও হার মানানো এক অভিনব বার্তা প্রেরণ পদ্ধতি।

অদূর স্থানের জন্য ওরা দুটি কাঠিকে মেসিনগানের মত দ্রুততায় বাজিয়ে ওদের নিজস্ব কোড্-ভাষায় সংবাদ প্রেরণে সক্ষম।

আবার দূরবর্তী অঞ্চলের জন্য আরেক প্রকার অভিনব পদ্ধতি। প্রথমে যার কথা বলা হয়েছে, সেই বিল্লি একজন সাহেবকে এই পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়েছিল। সেটা হল ধোঁয়া-সিগন্যাল।

সে প্রথমে অগ্রভাগ সরু ঝুড়ি আকারের এক আগুন জ্বাললো গাছের অজস্র ডালপালা দিয়ে। ডাল দিয়ে আগুন, আর পাতা জ্বেলে ধোঁয়া। অতঃপর ঘাসে বোনা একটি মাদুর দিয়ে সে ধোঁয়াকে চেপে ধরে এক এক সময় এক এক প্রকার ধোঁয়া বের করতে লাগলো। সেই মাদুরের ফাঁক দিয়ে।

কখনো গোল, কখনো রিং আকৃতি, কখনো লম্বা, কখনো হ্রস্ব, কখনো দীর্ঘ, এই ভাবে বিভিন্ন প্রকার ধোঁয়া বের করে তাদের অদ্ভুত সংকেত-বার্তা পাঠাতে লাগলো দৃশ্যমান এক বহু দূরাঞ্চলে।

চীনে ভাষার মত এক একটি আকৃতির ধোঁয়ায় নাকি অনেক কিছু একবারেই বোঝায়। এক একটি সংকেত এক একটি বাক্য-বিশেষ।

যেমন দুটো গোলাকৃতি ধোঁয়ায় বোঝাবে, ভয়াবহ মৃত্যু। লম্বা লাঠির মত ধোঁয়ায় বোঝাবে শিকার জন্তু দৃশ্যমান হয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মহামূল্যবান এই ট্র্যাকারদের একটা অসুবিধা রয়েছে তা হল নিজ উপজাতি ছেড়ে বেশি দিন বাইরে থাকলে ওরা ওদের উক্ত অলৌকিক ক্ষমতা কালক্রমে হারিয়ে ফেলে। প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ নৈকট্য থেকে বেশ কিছু বছর বাইরে থাকলে ওদের সূক্ষ্ম প্রতিভাগুলি কালক্রমে ভোঁতা হয়ে একেবারে বিলীন হয়ে যায়। এবং বাদবাকী জীবন ওরা সাধারণ নগণ্য মানুষে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই জন্যেই মাঝে মাঝে ওদের ছুটি দেওয়া হয় স্বজাতীয়দের সঙ্গে বনেজঙ্গলে গাঁয়ে বসবাস করে আসার জন্য।

দর্পচূর্ণ

—মায়া বসু

বিষ্ণুভক্ত নারদ একদা ভাবে বসি মনে মনে ;
'আমার মতন দ্বিতীয় ভক্ত নাহি এই ত্রিভুবনে।'
স্মরণমাত্র অহং হইল তার
বৈকুণ্ঠেতে তখনি চলিল ভক্তের অবতার।
পূজিয়া কৃষ্ণে কহিল ; "হে প্রভু! সার তব শ্রীচরণ ;
তবুও একটি প্রশ্নে সদাই পীড়িত আমার মন।
কোনজন তব শ্রেষ্ঠ ভক্ত, জানিতে ব্যাকুল আমি
এ তিন ভুবনে কোথায় আছে সে? বল অন্তর্যামী!"

হৃদয়ে বুঝিয়া প্রিয় নারদের মন ;
মনে মনে হাসি, কহিলেন নারায়ণ ;
"দীন দরিদ্র ক্ষেত চাষী এক, দয়াল তাহার নাম,
সংসার লয়ে সদা বিরত, মর্ত্যলোকেতে ধাম।

হে নারদ শোন, সত্যভাষণে বলি আমি তোমাকেই,
এ তিন ভুবনে সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত আমার সেই।"

শ্রীহরির কথা শুনি;
অতি আশাহত, স্তম্ভিত হয়ে নীরব রহিল মুনি।
ভাবিল, এখনি যাইয়া মর্ত্যধামে,
দেখিব, প্রভুর শ্রেষ্ঠভক্ত কে আছে দয়াল নামে?
যার কাছে মোর সকল ভক্তি মানিয়াছে পরাভব
পূজা উপবাস, সাধন ভজন, আর যত জপ তপ।

ক্ষুব্ধ নারদ তখনি চলিল, দীন দয়ালের কাছে
অতীব জটিল কর্মকুটিল মর্ত্যধামের মাঝে।
অদৃশ্য থেকে দেখে, সে যে দিনরাত,
উদয় অস্ত অন্নের লাগি করিতেছে প্রাণপাত।
অতি দরিদ্র, অভাবী ও অভাজন,
স্ত্রীপুত্র আর সংসার লয়ে বিব্রত সারাক্ষণ।

প্রভাতে উঠিয়া মাত্র একটিবার,
'শ্রীহরি' স্মরিয়া, লাঙল লইয়া
হয় সে ঘরের বার।
বৃষ্টিতে ভিজে, রোদ্দুরে পুড়ে,
হাল চষে, খেটে খেটে,
সুদীর্ঘ দিন যায় তার অতি
সুকঠিন শ্রমে কেটে।
নাহিকো সময় নিঃশ্বাস ফেলিবার,
ভজন পূজন জপ তপ করিবার।
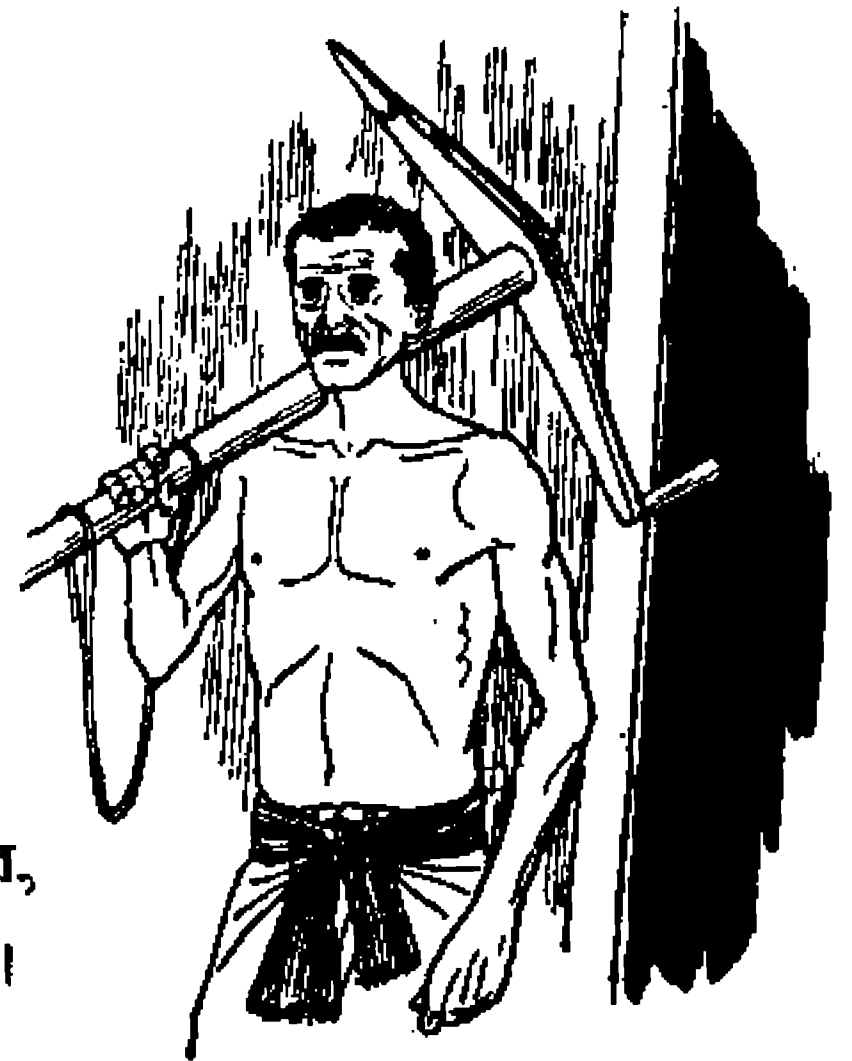
পরিশ্রান্ত, অতীব ক্লান্ত, সন্ধ্যায় ফিরে আসে
খুদ কুঁড়া যাহা জোটে। তাই খেয়ে যায় শয্যার পাশে।

শুইবার আগে আর একবার স্মরে শুধু; "নারায়ণ।"
তারপরই হয়, নিদ্রায় অচেতন।
সারা দিন রাত দুইবার নাম! তাহাতেই প্রভু খুশী?
ভাবিল নারদ বিস্ময়ে আর ক্রোধে অভিমানে ফুঁসি।
'প্রতি নিঃশ্বাসে, প্রতি রোমকূপে, জপ করি আমি তাঁর,
আমার চেয়েও ভক্ত সে তবু? এ কী ঘোর অবিচার?'

বিরস বদনে বৈকুণ্ঠেতে দাঁড়াল নারদ এসে।
বুঝি তার মন, অন্তর্যামী কহিলেন মৃদু হেসে;
"হে প্রিয় ভক্ত, একটি কর্ম কর,
পরিপূর্ণ এ তৈলপাত্র অতি সাবধানে ধরো।
লইয়া ইহারে, সারাদিন করে পৃথিবী পরিক্রমা।
সন্ধ্যায় আসি পাত্রটি ফের,
দিবে মোর কাছে জমা।
সতর্ক থেকো, দেখ যেন কোন ছলে,
আধার হইতে বিন্দু তৈল
পড়ে নাকো ভূমিতলে।"
পূর্ণ পাত্র হস্তে নারদ
চিন্তা ব্যাকুল মন;
তৈলের প্রতি সব মনোযোগ,
রহিয়াছে সারাক্ষণ।
তরল বস্তু করে টলমল,
প্রতিক্ষণে ছলকায়,

সতর্ক মুনি, উপচিয়া তেল, এই বুঝি পড়ে যায়!
অতি সাবধানে সারাদিন করি পৃথিবী পরিক্রমা,
সন্ধ্যায় দিয়া পূর্ণপাত্র, শ্রীহরির কাছে জমা,
সকৌতূহলে মুনি বলে; "প্রভু, অতি তুচ্ছ এ কাজ,
কেন দিলে মোরে, বুঝিতে না পেরে, পাই মনে বড় লাজ।"
হাসিয়া শ্রীহরি শুধান নারদে, "সত্য কহ তো মুনি;
সারা দিনমানে কতবার মোরে স্মরণ করেছ, শুনি?"

সচকিত ভীত, লজ্জিত ঋষি কুণ্ঠিত স্বরে কন,
'পূর্ণপাত্র তৈলের প্রতি স্থির নিবদ্ধ মন
ছিল প্রভু তাই, তোমারে স্মরিতে পারিনিকো সারাদিন,
বুঝিতে পারিনি, কখন প্রভাত, সন্ধ্যায় হল লীন।"
ঋষির বচনে শ্রীকৃষ্ণ তারে দেন তবে উত্তর;
এইবার তবে বুঝ মনে, মুনিবর,
চিরসুখী তুমি, জান না কেমন অভাবের সংসার,

রোগ শোক, অনাহারের যাতনা,
দুঃখীর হাহাকার।
একটি মুষ্টি অন্ন যোগাতে
কী কঠিন সংগ্রাম,
করিছে দয়াল! তবু তার মাঝে,
ভোলেনি তো মোর নাম।"

নিত্য প্রভাতে পূজে একবার,
আর একবার রাতে,
প্রার্থনাহীন দুইটি প্রণাম রাখে
মোর পদপাতে।

অন্নের লাগি তোমারে ঘুরিতে হয় না তো মাঠে ঘাটে,
চিরসুখী তুমি, অলস সময়, জপে তপে ধ্যানে কাটে।
তুচ্ছ একটি তৈলপাত্র সারাদিন হাতে ধরে,
হে ভক্ত মোর! কেমন করিয়া ভুলিয়া রহিলে মোরে?"

শ্রীহরির কথা শুনি,
অবনতশির, লজ্জিত অনুতপ্ত নারদ মুনি।
শুদ্ধ প্রেমের আলোক ঘুচিল অহমের আবরণ,
কৃষ্ণকৃপায় জ্ঞানের নেত্র হইল উন্মীলন।

● বোকার ধাড়ি—
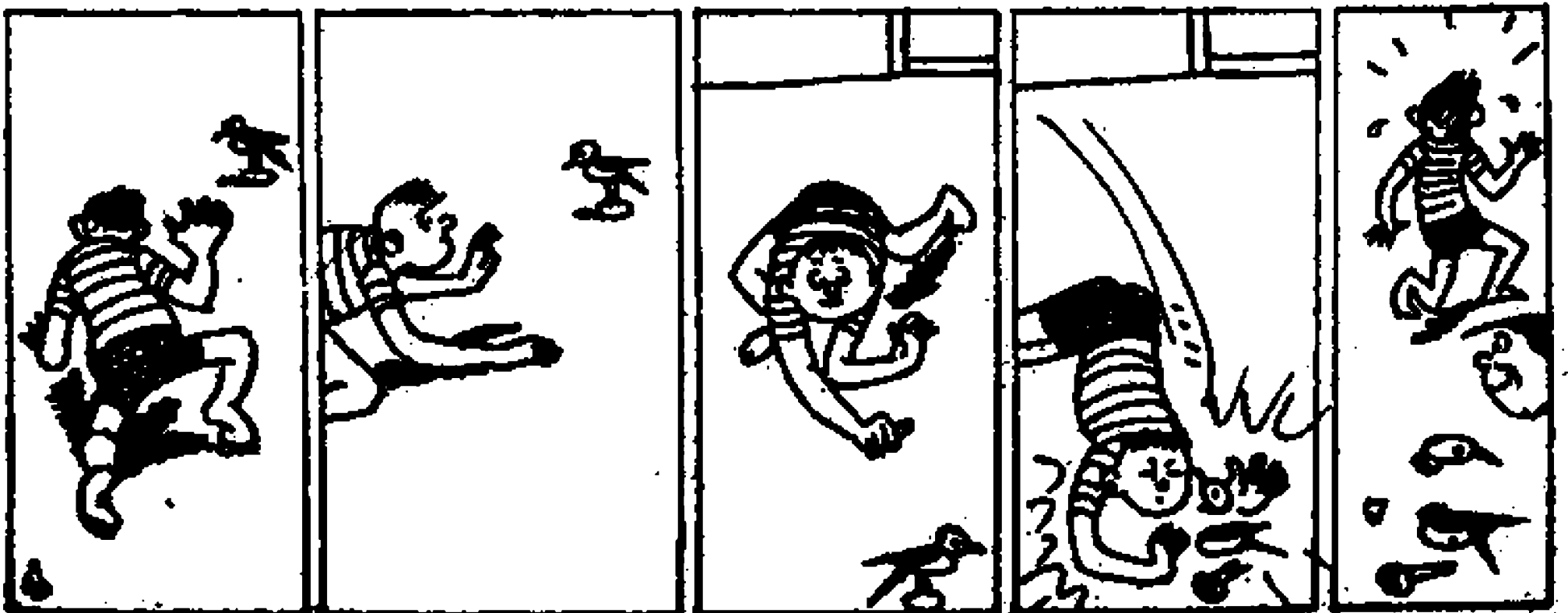
একটি আবিষ্কারের কাহিনী

—ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

১৬ই জুলাই। ১৯৪৫ সাল। শেষ রাত্রি। পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছেন নিউ মেক্সিকোর অ্যালামোগর্‌দা এয়ার বেস-এর সৈন্যদল। মরুভূমির প্রান্তে এই বিমানকেন্দ্র। সামনে মরুভূমির ধুধু প্রান্তর। ছ' মাইল দূরে একটি ইস্পাতের গম্বুজের ওপর বসানো রয়েছে একটি নতুন ধরনের বোমা। এ বোমা নাকি পৃথিবী ধ্বংস করে দিতে পারে।

জিততেই হবে! প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান জাতির উদ্দেশ্যে দৃপ্তস্বরে ঘোষণা করেছেন; যে ভাবেই হোক আমাদের জিততেই হবে। জার্মান বা জাপানের কাছে কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করব না।

বৈজ্ঞানিকের দল প্রতিজ্ঞা করেছেন—জাতির সম্মান, দেশের সম্মান বাঁচাতেই হবে। এর আগেও যখনই দেশের সমস্যা দেখা দিয়েছে, তখনই তার সমাধান করেছেন। মালয়, ইন্দোনেশিয়ায় প্রচুর রবার পাওয়া যায়। জাপানীরা ১৯৪২ সালের প্রথম দিকে ইন্দোনেশিয়া এবং মালয় অধিকার করে নিলেন, সঙ্গে ইওরোপের বাজার থেকে রবার একেবারে উড়ে গেল। আমেরিকার বৈজ্ঞানিকের দল সকলকে ভরসা দিয়ে বললেন—কোন ভয় নেই, আমরা রবারের মত জিনিস ল্যাবোরেটরীতে তৈরি করে দিচ্ছি। তাঁরা কথা রাখলেন। দেখতে দেখতে নিয়োপ্রিন থায়োকল, বুটিল, বুনা, বুনা এস প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের কৃত্রিম (সিন্থেটিক) রবার তৈরি করে বাজারে ছাড়লেন। এত তৈরি করে দিলেন যে শুধু আমেরিকা নয়, মিত্রপক্ষের সমস্ত দেশই এই রবার ব্যবহার করতে শুরু করলেন।

ঠিক তেমনি জার্মানীতে পেট্রলের অভাব দেখা দিল মারাত্মক রকমের। জার্মানীতে পেট্রল নেই। পেট্রল পাওয়া যায় সে সব দেশে, সবগুলিই মিত্রপক্ষের কবলে। পেট্রলের সংকট ঘোচাবার জন্যে জার্মানের বিজ্ঞানীরা গবেষণায় বসে গেলেন। দিনরাত গবেষণা করে কয়লা এবং লিগনাইট

থেকে কৃত্রিম তেল তৈরি করে ফেললেন। যুদ্ধের সময় জার্মানের অর্ধেকের চেয়ে বেশী পেট্রলের চাহিদা এই কৃত্রিম তেল মিটিয়েছে।

দ্রুতগতিসম্পন্ন বিমানপোত তৈরি করে জার্মান এত বলশালী হয়ে গেল যে বোমায় বোমায় মিত্রপক্ষকে পর্যুদস্ত করে ফেলল। সমস্ত বৃটেন জার্মানীর উন্নত ধরনের বিমানবাহী বোমার আঘাতে থরহরিকম্প। বোমার আঘাতে আঘাতে লণ্ডন শহরকে ধূলিসাৎ করে দেবার মনস্থ করেছেন হের হিটলার। চার্চিল নীরব নিথর। কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। ট্রুম্যান খাঁচায় বন্দী সিংহের মত গর্জন করছেন আর বলছেন—বোমা চাই। এমন বোমা, যে সমস্ত জার্মান আর জাপান বোমার আঘাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

বৈজ্ঞানিকের দল নীরবে এবং গোপনে গবেষণা করে গেছেন। তাঁদের গবেষণার কথা সাধারণের কেউ জানে না। ১৯৪৫ সালের ১৬ই জুলাই বৈজ্ঞানিক-দলের নেতা বললেন—আমরা প্রস্তুত।

ট্রুম্যান আদেশ দিলেন—প্রথম পরীক্ষা করা হবে নিউ মেক্সিকোর মরুপ্রান্তে। সৈন্যের দল অ্যাটেনশন্ হয়ে রইল এয়ার বেস-এ। দূরে—ছ মাইল দূরে—একটা ইস্পাতের গম্বুজের ওপর সেই নবাবিষ্কৃত বোমাটি।

—ফায়ার! আদেশ দিলেন সেনাপতি।

মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার সূর্য একসঙ্গে জ্বলে উঠল। কয়েক হাজার বিদ্যুৎ যেন একসঙ্গে ঝলকে উঠল। দেখতে দেখতে নানারকমের রঙ চোখের সামনে খেলা করতে লাগল। সোনালী, লাল, বেগুনে, ধূসর, নীল। তিরিশ সেকেণ্ডের মধ্যে বিকট আওয়াজ আর উত্তপ্ত বাতাসের ঢেউ। যাঁরা দূরে দাঁড়িয়ে বোমা ফাটানো দেখছিলেন, তাঁরা বিদ্যুতের ঝলকে ছিটকে মাটিতে পড়ে গেলেন। সকলের মনে হল, তাঁরা এক নতুন যুগের সূচনামুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছেন।

না—না। আমার কথা নয়। প্রত্যক্ষদর্শী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল টমাস এফ ফ্যারেল এই ভয়ংকর বোমার বর্ণনা লিখেছেন।

নতুন যুগের সূচনা হল। নতুন বোমার নাম হল অ্যাটমিক বোম। সমস্ত মানুষের মনে হল তারা যেন এক নতুন যুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে, যে যুগ ভীতি আর আশা নিয়ে এগিয়ে আসছে। অভিশাপ আর আশীর্বাদের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছেন।

১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্টের সকাল সাড়ে দশটায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হ্যারিস এস ট্রুম্যান ঐতিহাসিক বেতার ঘোষণা করলেন : ষোল ঘণ্টা পূর্বে আমেরিকার বৈমানিক জাপানের সৈন্যশিবির হিরোসিমার ওপর একটি অ্যাটমিক বোমা নিক্ষেপ করেছে।

এই বোমার শক্তি দু হাজার টি. এন. টি বোমার চেয়েও শক্তিশালী। এই বোমার নাম অ্যাটমিক বোমা।

আবার এই মারাত্মক বোমা পড়ল নাগাসাকির ওপর। আতঙ্কে শিউরে উঠল পৃথিবীর সাধারণ মানুষ। এই ভেবে যদি একটির পর একটি বোমা পড়তে থাকে, সমস্ত পৃথিবী অল্পদিনের মধ্যেই জনশূন্য মরুভূমিতে পরিণত হবে।

হিরোসিমার ওপর একটি অ্যাটমিক বোমা নিক্ষেপ করেছে। [পৃ. ১৩১

জাপান-জার্মান পরাজয় স্বীকার করল। অভিশপ্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটল।

আইনস্টাইন ১৯০৫ সালে ঘোষণা করেছিলেন ম্যাটার এবং এনার্জি একই পদার্থ এবং একটি থেকে আর একটিতে রূপান্তরিত সম্ভব। আইনস্টাইনের ইকোয়েশন ফিজিকস্-এর ছাত্রছাত্রীরা ভাল করেই জানে। লিখলে এই রকম দাঁড়ায়।

$E=mc^2$

E—Energy, m—mass, c-Velocity of light (186,280 miles per second).

এই অঙ্কের মধ্যেই নিহিত ছিল বিশ্ববিখ্যাত ইঙ্গিত। এর মধ্যে বলা আছে, অতি অল্প পরিমাণের বস্তুকে কল্পনাতীত শক্তিশালী এনার্জিতে পরিবর্তিত করা যেতে পারে।

ইটালীয়ান পদার্থবিদ এন্‌রিকো ফার্মি (১৯০১-৫৪) চেষ্টা করতে লাগলেন, নিউট্রনগুলোকে সাবঅ্যাটমিক বুলেট হিসেবে ব্যবহার করা যায় কি করে? তিনি নিউট্রনগুলোকে প্যারাফিনের ভেতর দিয়ে বাহিত করে দেখলেন নিউট্রনগুলো ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। প্যারাফিনের মত অন্য কোন কার্বনজনিত পদার্থের ভেতর দিয়ে নিয়ে গেলেও একই ফল পাওয়া যায়। কঠিন জলও (Hard water) এই কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ধরনের পদার্থকে বলা হয় মডারেটর।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানে বসবাসকারী ইহুদীরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। হের হিটলার কোন ইহুদীকে রেহাই দেবেন না। নাজী সৈন্যরা ইহুদী পেলেই নিধন করেন অথবা নির্বাসিত করেন।

লাইস্ মিটনার (Lise Meitner) একজন অস্ট্রিয়ান ইহুদী বৈজ্ঞানিক। তিনি পদার্থবিদ্যাবিশারদ। তিনি নাজীদের অত্যাচারে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে উঠলেন। কি করবেন তিনি? এখানে থাকলে নির্ঘাত নাজীসৈন্যরা তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। বিজ্ঞানী বলে কোন সম্মানই দেবে না। ষাট বছরের প্রবীণ বিজ্ঞানী লাইস্ সকলের অগোচরে গোপনে কোপন্‌হেগেন-এ পালিয়ে গেলেন।

জার্মানিতে দুজন বিখ্যাত জার্মান পদার্থবিদ্যাবিশারদ ওট্টো হ্যান্ এবং এফ্ স্ট্রস্‌ম্যান্ (Otto Hahn and F. Strassman) মন্থর নিউট্রন ইউরেনিয়াম বিস্ফোরণে ব্যবহার করতেন। কোপ্‌ন্‌হেগেনে পালিয়ে যাবার আগে লাইস্ এঁদের সঙ্গে গবেষণা করতেন। এঁরা যখন গবেষণার পরীক্ষা করতেন,

অবাক্ হয়ে দেখতেন, বিস্ফোরণের পর ইউরেনিয়ামের অধিকাংশই পুড়ে ছাই হয়ে বেরিয়াম-এ পরিণত হত। বেরিয়াম ইউরেনিয়ামের চেয়ে অনেক হালকা।

লাইস্ যখন কোপনহেগেন-এ পালিয়ে গেলেন, তাঁর সঙ্গে পালিয়ে গেলেন আরও দুজন বিজ্ঞানী। তাঁদের নাম ফ্রলেন মিটনার আর ও. আর. ফ্রিস্ক্ (Fraulen Meitner and O. R. Frisch). লাইস্ মিটনার ১৯৩৯ সালের ১৬ জানুয়ারী নেচার পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। সেই প্রবন্ধে লিখলেন মন্থর নিউট্রন যখন ইউরেনিয়ামের সঙ্গে বিস্ফোরিত হয়, তখন ছাই হিসেবে পড়ে থাকে বেরিয়াম। বেরিয়ামের অংশই বেশী। এই প্রবন্ধ পাঠ করে ফ্রলেন এবং ফ্রিস্ক্ আর একটি প্রবন্ধ লিখলেন। সেই প্রবন্ধে তাঁরা ঘোষণা করলেন, ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াই যখন নিউট্রনের সহযোগে বিস্ফোরিত হয়, তখন দুটি প্রায় একই মাপের নিউক্লিয়াসে ভেঙে যায়। তারই একটির নাম বেরিয়াম পরমাণু। নিউক্লিয়াস ভেঙে যাওয়ার প্রক্রিয়ার নাম দিলেন অ্যাটমিক ফিস্ন (Atomic fission).

ফ্রলিন এবং ফ্রিস্ক্ তাঁদের পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে বিখ্যাত ড্যানিশ পদার্থবিদ্যা-বিশারদ নীলস্ বোর্-এর সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা করেন। নিলস্ বোর্ ১৯৩৯ সালের প্রথম দিকে আমেরিকা যান। সেখানে তিনি অনেক বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার কথা আলোচান করেন। আমেরিকার বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণায় লক্ষ্য করেন, ইউরেনিয়াম পরমাণু যখন নিউট্রন-এর নিউক্লিয়াসের মধ্যে মিশে যায়, তখন বিস্ফোরণে নিউক্লিয়াসটি টুকরো টুকরো হয়ে বেরিয়াম, ক্রিপ্টন্ (Barium and Krypton) এবং আরও অজ্ঞাত পদার্থে পরিণত হয়। এই অজ্ঞাত বস্তু আরও টুকরো হয়ে, পারমাণিক বুলেটে পরিণত হয় এবং আরও অধিক সংখ্যক ইউরেনিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়। এই রকম পদ্ধতিতে দেখা গেছে, পরপর অনেকগুলো বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। একটি পরমাণুর পর, আর একটি পরমাণুর বিস্ফোরণ মাত্র কয়েক পল অনুপলের মধ্যেই ঘটতে পারে। জার্মান এবং ফরাসী বৈজ্ঞানিকরাও পরীক্ষা করে দেখলেন এক সেকেণ্ডের মধ্যে কয়েক কোটি পরমাণুর বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে শেষের দিকে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট একটি কমিশন গঠিত করলেন। এই কমিশনের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হল যে, এই পরমাণু বিস্ফোরণের পরীক্ষা-নীরিক্ষা যুদ্ধের কোন কাজে লাগানো যেতে পারে কিনা বিচার করবার। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে কমিশন তাঁদের রিপোর্ট পেশ করলেন, তাতে মন্তব্য করলেন—হ্যাঁ। এই পরীক্ষা-পদ্ধতিকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

সামরিক বিভাগ এই পদ্ধতিকে গ্রহণ করল এবং মেজর জেনারেল লেসলি আর গ্রোভার এই বিভাগের দায়িত্ব নিলেন। পারমাণবিক বোমার গবেষণা নিয়মিতভাবে চলতে লাগল, কিন্তু খুব গোপনে কোন সাধারণ মানুষ এ বিষয়ে যাতে ঘুণাক্ষরেও না জানতে পারে সে বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ রইলেন সামরিক বিভাগ। তারপর সাধারণ মানুষ একেবারে জানতে পারল ট্রুম্যানের ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্টের ঘোষণার পর। এর পরই প্রিন্সটোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেন্‌রী ডি. স্মিথ্ অ্যাটম বোমা তৈরি পদ্ধতি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে তাঁর ঐতিহাসিক প্রবন্ধ অ্যাটমিক এনার্জি ফর মিলিটারী পারপাস্ প্রকাশ করলেন।

দেখতে দেখতে তৈরী হল মহাকাশযান।

অভিশপ্ত যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষিত হল। পৃথিবীর বুকে আবার শান্তি নেমে এল, কিন্তু বিজ্ঞানীর দল অনুশোচনায় ছটফট করতে লাগলেন। এ কি হল? এমন মারণাস্ত্র তৈরি হল যার শক্তিতে পৃথিবী ছারখার হয়ে যেতে পারে যে কোন মুহূর্তে।

এই অমিতশক্তিকে কি কল্যাণকর কাজে লাগানো যাবে না? তৈরী হল নিউক্লিয়ার ফিজিকস্-এর গবেষণা। পারমাণবিক শক্তিকে মানুষের কল্যাণের কাজে লাগানো যেতে পারে, একথা বৈজ্ঞানিকরা ঘোষণা করলেন। পরমাণু বিস্ফোরণে যে গতির সৃষ্টি হয়, তা দিয়ে অতি দ্রুতগতিসম্পন্ন জাহাজ, এরোপ্লেন তৈরি করা সম্ভব।

দেখতে দেখতে তৈরী হল মহাকাশযান। প্রথম যুগের মহাকাশযানের চেয়ে এখন আরও ভাল ভাল মহাকাশযান তৈরী হচ্ছে। এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে যাতায়াত করা অনেক সহজ হয়ে গেছে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারে।

চিকিৎসাশাস্ত্রেও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের কল্যাণে অসাধারণ উন্নতি হয়েছে। আগে যে সব রোগের কারণ অজানা ছিল, রেডিও-অ্যাকটিভ্ আইসোটোপের জন্য অতি সহজেই বোঝা যায়। গাছের সবুজ রঙ কি ভাবে তৈরী হয়, সেই ফটোসিন্থেসিস-এর প্রক্রিয়া রেডিও-অ্যাকটিভ্ আইসোটোপের কল্যাণে জানা গেছে। রেডিও-অ্যাকটিভ্ কোবাল্টের সাহায্যে ক্যানসারের মত দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা করা হচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতে পরমাণুর ব্যবহারে পৃথিবীর চেহারা আরও সুন্দর আরও গতিসম্পন্ন হয়ে উঠবে।

একদিন যা অভিশাপ ছিল পৃথিবীর কাছে। আজ তাই আশীর্বাদরূপে দেখা দিয়েছে বৈজ্ঞানিকদের জাদুদণ্ডের ছোঁয়ায়।

ভুল
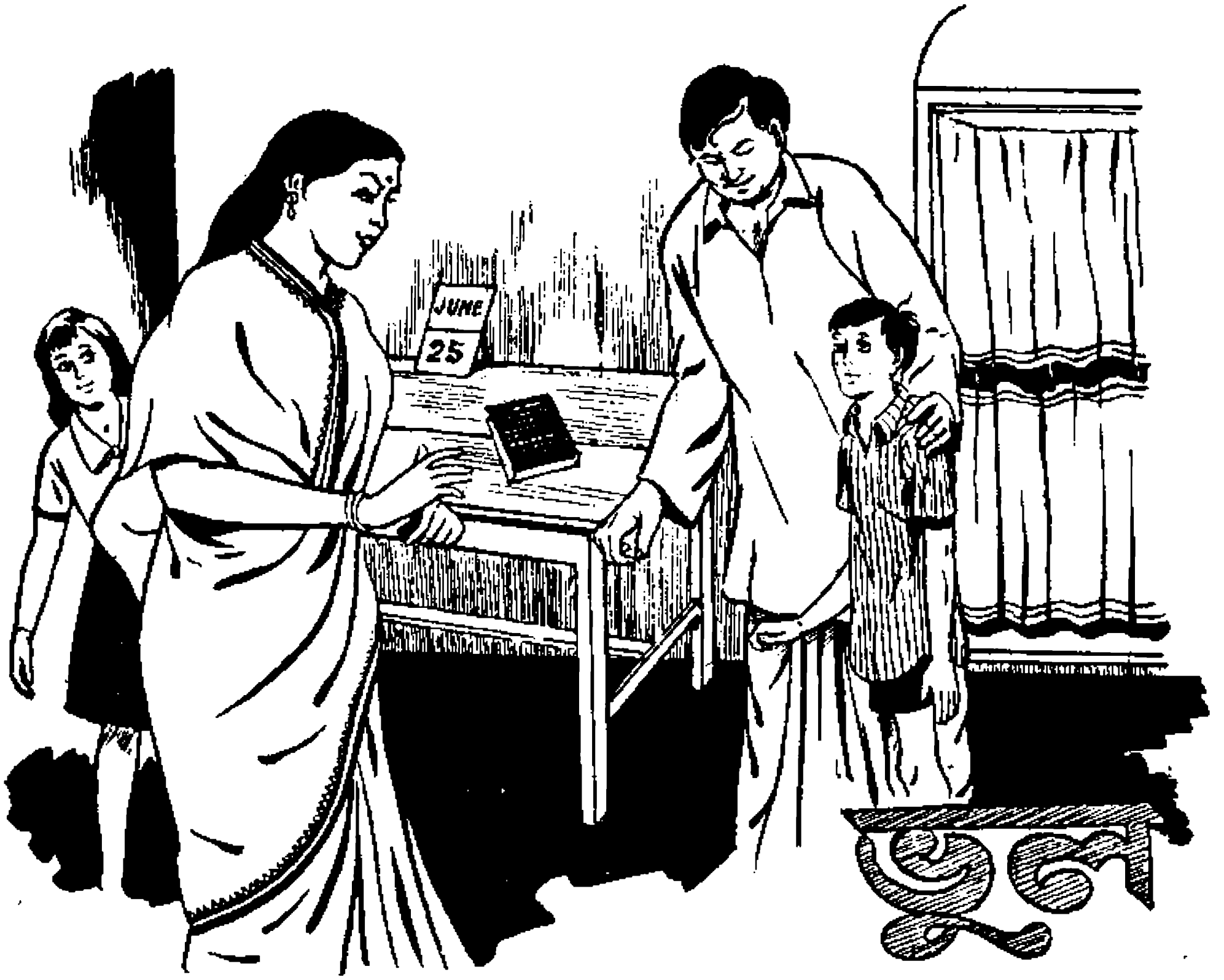
—নীহাররঞ্জন গুপ্ত

১

প্রথম দিন যেদিন এসেছিল—তখুনি ভবতোষবাবুর স্ত্রী বলেছিলেন, এটাকে কোথা থেকে ধরে নিয়ে এলে গো?

জানাশোনা লোক আমাদের অফিসের কেরানী ভুবনবাবু ওকে দিয়েছেন, বললেন ওদের গ্রামেরই ছেলে—খেতে পাচ্ছিল না—বাপ মা কেউ নেই—জানাশোনা। চুরি-চামারি করবে না—

তা যেন বুঝলাম—ভবতোষবাবুর গৃহিণী মমতাময়ী বললেন, চুরি-চামারি ছোটলোকের ছেলেরা করেই থাকে, তার জন্য আমি ভাবি না—ও হাতটান ওদের থাকবেই—কিন্তু ও কি পারবে!

কেন পারবে না—শুনি—

চেহারা দেখেছো—কতদিন খায় না কে জানে।

তা সত্যি—হাড়জিরজিরে চেহারা—এক মাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া অবিন্যস্ত চুল—বড় বড় দুটো

চোখে হাবাগোবার মত চাউনি—পরনে একটা অতি মলিন হাফপ্যান্ট—আর গায়ে ততোধিক মলিন একটা ছিটের শার্ট।

পারবে—পারবে খুব পারবে—বলতে বলতে ভবতোষবাবু গৃহিণীকে আর কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলেন।

মমতাময়ী কিন্তু ধরে নিয়েছিলেন, দু'বেলা কেবল গিলবে কাঁড়ি কাঁড়ি ভাত—এই র‍্যাশনের মাপা দিনে।

মেয়ে পুতুল ক্লাস সিক্সের ছাত্রী—সামনেই দাঁড়িয়েছিল, সে হঠাৎ বলে উঠলো, তা হোক মা রেখে দাও—innocent বলেই মনে হচ্ছে—

তুই থাম ত। মমতাময়ী মেয়েকে ধমকে ওঠেন।

ছেলেটা তখন দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে বোকা বোকা চাউনি মেলে দু চোখের।

রেখেই দেখ না মা—পুতুল আবার বললে।

তুই যা ঘরে—তোর পড়াশুনা নেই—

পুতুল কিন্তু যায় না। জিজ্ঞাসা করে, কি নাম রে তোর।

আমার—ছেলেটা বোকা বোকা মুখ করে জিজ্ঞাসা করে।

তবে আবার কার—তোকেই ত নাম জিজ্ঞাসা করচি।

মানিকলাল চৌধুরী।

অ মা—পুতুল হাসতে হাসতে বলে, শুনলে ওর নামটা মানিকলাল চৌধুরী।

তা হ্যাঁরে—কাজকর্ম পারবি ত—

হুঁ। ছেলেটা সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নাড়ে।

সংসারের কাজকর্ম কখনো করেছিস?

না ত—

তবে! কাজ করবি কি করে—

আজ্ঞে শিখিয়ে দেবেন—

শিখিয়ে দেবো।

হ্যাঁ—আমি পারবো—

কি হলো মমতাময়ীর রেখে দিলেন মানিককে। টুকটাক ফাইফরমাস খাটার জন্য তোলা ঝির মেয়েটা ছিল—কাজকর্মও বেশ করতো অতটুকু নয় বছরের মেয়ে হলে কি হবে লতা—কিন্তু ঐ যে বিশ্রী হাতটান—ফাঁক পেলেই এটা ওটা সরাবে। শেষ পর্যন্ত কর্তার টেবিল থেকে সোনার ঘড়িটাই হাতিয়ে নিল।

কবুল করাবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন মমতাময়ী, কিন্তু লতার সেই এক কথা, কালীর দিব্বি মা এই আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, মাইরী আমি নিইনি—

লতার মা পুরানো ঝি রাখিও দিব্বি কেটে বলেছিল, ওর মেয়ে ঘড়ি নেয়নি।

অথচ ঘড়িটা টেবিলের উপরই ছিল। ভবতোষবাবু অফিস থেকে এসে হাত থেকে ঘড়িটা খুলে টেবিলের উপর রেখে কয়েক মিনিটের জন্য হাত মুখ ধুতে বাথরুমে গিয়েছিলেন, ঘরে ফিরে দেখেন ঘড়ি নেই।

লতা একটু আগে ঘরে ছিল—লতাকে শুধালেন। সে বললে, কই আমি ত ঘড়ি দেখিনি গিন্নীমা।

শেষ পর্যন্ত ঘড়িটা আর পাওয়াই গেল না।

মমতাময়ী লতাকে ছাড়িয়ে হাঁপ ছাড়লেন। লতার আগেও তিন চারটে বাচ্চা চাকর এসেছে। কিন্তু সকলেরই ঐ এক রোগ—খাবে এক কাঁড়ি করে, কাজে দেবে ফাঁকি—তার উপরে ঐ বিশ্রী হাতটান—

টাকা সিকিটা বাইরে ভুলে রাখলে আর রক্ষা নেই—ফুসমন্তরে যেন উড়ে যায়।

তা সে ছিল টাকা-সিকেটা—কিন্তু হাত ঘড়িটা যখন উধাও হলো—কষ্ট হলেও মমতাময়ী বাচ্চা চাকর আর রাখেননি মাস চার পাঁচ।

অসুবিধা হচ্ছিল খুবই—কিন্তু সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল।

পাঁচ মাস পর মানিককে দেখে তাই তার মনঃপূত হয়নি, কিন্তু কি জানি ছেলেটার জীর্ণশীর্ণ হাবাগোবা চেহারা দেখে আর শেষটায় অমত করলেন না।

মানিক চাকরি পেয়ে গেল।

তোলা ঝিই সব করে দিয়ে যায় সংসারের কাজ দু'বেলা এসে—টুকটাক দোকান যাওয়া এটাওটা আনা—ঘরের ছোটোখাটো কাজ—এই আর কি। ভারী কাজ ত কিছু নয়।

মাসখানেক খুবই অসুবিধা ভোগ করতে হলো মানিককে নিয়ে মমতাময়ীর। কোন কাজই জানে না ছেলেটা—তবে হাবাগোবা দেখতে হলে কি হবে—এক মাসের মধ্যেই সব শিখে নিল। তবে একটু ধীরে এই যা।

কাজের মধ্যে পুতুলের ফাইফরমাস খাটাই বেশী যতক্ষণ সে বাড়িতে থাকে।

এই মানিক আমার স্কুলের সুটকেশটা নিয়ে আয়, আমার জুতো জোড়া দে—টিফিন বাক্সটা আর সুটকেশটা নিয়ে চল আমার সঙ্গে স্কুলে।

মানিক না হলে পুতুলের একদণ্ড চলে না।

মানিককে তারই মধ্যে—গিন্নীমা ও কর্তাবাবুর এটাওটা কাজ—দোকান যাওয়া—সিগ্রেট আনা ইত্যাদি করতে হয়। ধীরে হলেও করে—করতে পারে।

মমতাময়ী আরো খুশী হয়েছিলেন এই কারণে যে—বকো ঝকো—দুচারটে চড় চাপড় দাও রা করে না—কেবল বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

দেখলে তখন মমতাময়ীর কেমন যেন মায়া হয়।

পুতুলের হাতের চড় চাপড় ত লেগেই আছে।

হাজার রকমের বায়নাক্কা মেয়ের—বাপ মা ঐ একটি মাত্র মেয়ের জন্য অস্থির সদাই।

সেদিন রবিবার—শনিবার একগাদা টাস্ক দিয়েছে স্কুল থেকে—পড়াবার মাস্টারও আবার সেদিন আসেননি—সকাল থেকেই ঘ্যানঘ্যান করছিল পুতুল।

ভবতোষবাবু গোবরডাঙ্গায় কোন এক আত্মীয়ের বাড়ি গেছেন, ফিরবেন সেই রাতের ট্রেনে।

বড় বড় দুটো মাল্টিপ্লিকেশন কিছুতেই উত্তরের সঙ্গে মিলছে না। পুতুল কেবলই করছে কিন্তু বার বারই ভুল হয়ে যাচ্ছে।

বিরক্ত হয়ে কেঁদে কেটে পুতুল খাতা পেনসিল ছড়িয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল সোজা রান্নাঘরে।

মমতাময়ী মাংস রাঁধছিলেন—বললেন, কি হলো কাঁদছিস কেন।

অঙ্ক হচ্ছে না—

মন দিয়ে কর—হবে—

হবে না—হবে না—পুতুল কান্না জুড়ে দিল। ও মাস্টারমশাইকে ছাড়িয়ে দাও— খালি কামাই করবেন রোজ রোজ।

এখন থাক দুপুরে আবার চেষ্টা করিস—

তুমি দেখিয়ে দাও—

এখন পারব না—দুপুরবেলা খাতা নিয়ে আসিস করে দেবো—মমতাময়ী রান্নার কাজে ডুবে গেলেন।

পুতুল বের হয়ে গেল বাড়ি থেকে।

ঘণ্টা দুই বাদে ফিরে এসে খাতা পেনসিল তুলতে যাবে, দেখে অঙ্কটা কে করে রেখেছে খাতার পাতায়।

এই তো—এই তো ঠিক ঠিক উত্তর মিলেছে—মা মা করে ডাকতে ডাকতে পুতুল রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো। বললে, অঙ্কটা করে দিয়েছো—

অঙ্ক—

হ্যাঁ—এখন ত ঠিক মিলছে উত্তরের সঙ্গে।

মমতাময়ী বললেন, আমি ত রান্নাঘর থেকেই বের হইনি।

তবে কে করলে অঙ্কটা!

ভূতে—যা দিক করিস না ত—আমাকে কাজ করতে দে—

পুতুল ঘরে এসে আবার ঢুকলো। মানিক তখন পুতুলের বই খাতাগুলো নিত্যকার মত গুছিয়ে রাখতে ব্যস্ত—

এই মানিক।

কি দিদিমণি।

আমার অঙ্কটা কে ঠিক ঠাক কষে দিল রে?

রাগ করবে না ত দিদিমণি—

রাগ করবো কেন বল না।

আমি—

তুই—তুই অঙ্কটা করেছিস্?

হ্যাঁ—

তুই অঙ্ক কষতে জানিস—

ও তো সোজা অঙ্ক—মানিক এক গাল হেসে বললে—সাত আটে ছাপান্ন হবে তুমি পঞ্চান্ন করে গেছো প্রত্যেক বার—

পুতুলের চোখে যেন বিস্ময়ের অবধি নেই—চেয়ে আছে ও মানিকের মুখের দিকে। বলে, তুই লেখাপড়া জানিস?

বিরাটির স্কুলে ত আমি পড়তাম—

পড়তিস—

হ্যাঁ—

তুই স্কুলে পড়তিস?

হ্যাঁ—ক্লাস এইটে—

সত্যি বলছিস।

হ্যাঁ—মিথ্যা আমি বলি না।

ইংরাজী জানিস?

হ্যাঁ—যতটা পড়েছি—জানি।

বল তো—Sudden মানে কি?

হঠাৎ।

Rouge মানে কি?—

বদমাশ।

আর innocent মানে।

নিরীহ—গোবেচারা—

সব ঠিক ঠিক জবাব।

বল তো—মহীরুহ মানে কি?

বড় গাছ—

আমাদের প্রধানমন্ত্রী কে?

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী—প্রিয়দর্শিনী।

মানিক—

তুই—তুই অঙ্কটা করেছিস্? [পৃ. ১৩৯

কেন দিদিমণি—

তুই তবে পড়াশুনা না করে—চাকরের কাজ করতে এসেছিস কেন?

দাদা বৌদি যে আর পড়ালো না—বৌদি দাদাকে বললে—

কি বললে?

কোথাও চাকর বাকরের একটা কাজ জুটিয়ে দাও—কাঁড়ি কাঁড়ি দুবেলা অন্ন ধ্বংস করছে—ন্যাকাপড়া শিখে কি হাতি ঘোড়া হবে—বলতে বলতে যে মানিকের চোখে সাত চড়েও কেউ কখনো জল দেখেনি—দু'চোখ তার ছলছল করে ওঠে।

দিদিমণি—আমি একটু বেশী খাই—আমার যে অল্পে পেট ভরে না—আমি কি করবো ক্ষিদে পায়।

তা সত্যি—একজন বয়স্ক মানুষের মত প্রায় দু'বেলা খায় মানিক।

দাঁড়া বাবা আজ এলে তোর কথা বলবো।

না, না—দিদিমণি তোমার দুটি পায়ে পড়ি—বাবু আর তাহলে আমাকে চাকরিতে রাখবেন না—

কেন—চাকরিতে রাখবে না কেন বাবা তোকে—

চাকর লেখাপড়া করতো শুনলে তিনি আমাকে আর রাখবেন না, দাদা বলে দিয়েছে বার বার করে—

কে তোর দাদা—

ঝোঁকের মাথায় অনেক কথাই বলে ফেলেছিল মানিক, এবারে হঠাৎ একেবারে চুপ করে গেল বোবা।

পুতুলের কোন প্রশ্নেরই আর জবাব দেয় না।

হ্যাঁরে তোর মা বাবা নেই—

না—সে ত কবেই মারা গেছে—আমি যখন সাত বছরের—

২

পুতুল কিন্তু ভবতোষবাবুকে সব বলে দিল।

জান বাবা—মানিক ক্লাস এইটে পড়ত।

তাই নাকি!

হ্যাঁ—ও ইংরাজী—বাংলা অঙ্ক সব জানে।

মমতাময়ী পাশে বসে ঐ দিনকার বাংলা খবরের কাগজটা পড়ছিলেন, মেয়েকে ধমকে উঠলেন, থাম ত—

হ্যাঁ মা সত্যি—

তবে আর কি ওকেই না হয় টিচার করে নে তোর।

জান আজ মালটিপ্লিকেশনটা ওই কারেক্ট করে দিয়েছে—

তোর অঙ্ক! মমতাময়ী এতক্ষণে খবরের কাগজ ফেলে মুখ তুলে মেয়ের দিকে তাকালেন।

হ্যাঁ মা, সেটা আমার কিছুতেই ঠিক হচ্ছিল না।

দেখে ত মনে হয় না—ভবতোষবাবু বললেন, মনে হয় যেন আস্ত একটা idiot! বোকা—

জান বাবা, ও innocent মানেও জানে!

মমতাময়ী এবারে বললেন, ওসব হয়ত শুনে শুনে শিখেছে।

না না মা—মানিক সত্যিই লেখাপড়া করতো।

কিন্তু মমতাময়ী বা ভবতোষবাবু কেউই আর ঐ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো আবশ্যক বোধ করলেন না। ব্যাপারটা ঐখানেই চাপা পড়ে গেল।

দিন যেমন চলছিল তেমনই চলতে লাগল। মানিকও যেমন ঘরের কাজ করছিল করে যেতে লাগল।

দিন পনের বাদে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার দিকে মানিক একটা সংবাদপত্রের সান্ধ্য বুলেটিন এনে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, গিন্নীমা জানেন—যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা আমাদের গভর্নর ধরমবীর ভেঙে দিলেন।

তোকে কে বললে, কোথা থেকে শুনলি—

শুনবো কেন, এই দেখুন না কাগজে বের হয়েছে—দশ পয়সা দিয়ে ত রাস্তা থেকে কিনে আনলাম—

মমতাময়ী ইংরাজী কাগজটা হাতে নিয়ে দেখলেন কথাটা সত্যি।

হঠাৎ মমতাময়ীর মধ্যে যেন একটা পরিবর্তন দেখা দিল, বললেন, সত্যিই তুই লেখাপড়া করতিস মানিক।

মানিক এবার একেবারে চুপ—একেবারে পাথর, চোখে কেবল ভয়ার্ত দৃষ্টি।

মমতাময়ী নিজেও লেখাপড়া জানেন—বি. এ. পাস।

গিন্নীমা—ভয়ে ভয়ে ডাকল মানিক?

কি?

আমাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেবেন না ত?

কেন রে ছাড়িয়ে দেবো কেন?

আমি যে স্কুলে পড়তাম—চাকররা লেখাপড়া জানলে নাকি কাজে রাখে না।

কে বললে তোকে ও কথা?

কেন দাদাই ত বার বার বলে দিয়েছে—আমাকে কাজ থেকে ছাড়াবেন না ত—

তোর দাদা কে—যিনি তোকে কাজে দিয়েছেন এখানে—ওর অফিসের ভুবনবাবু।

মানিক একেবারে চুপ।

কি রে কথা বলছিস না কেন, ভুবনবাবু তোর দাদা। কি রকম দাদা তোর—আপন দাদা?

না গিন্নীমা—উনি—মা-মানে ভুবনবাবু ত আমার কেউ হোন না—আমার দাদার সঙ্গে জানাশোনা ছিল—তাই—

মানিক জীবনে প্রথম মিথ্যা কথা বললো, যা এর আগে কখনো সে বলেনি।

মমতাময়ী আর কোন কথা বললেন না—কি ভাবতে ভাবতে যেন রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

মিথ্যা কথা জীবনে প্রথম বলার দরুন মানিকের দুচোখ বেয়ে তখন জল ঝরছে। ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

রাত্রে কিন্তু কথাটা মমতাময়ী স্বামীর কাছে বললেন না। এবং পরের দিন মানিক পুতুলকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসার পর ডাকলেন, এই মানিক শোন।

মানিক সামনে এসে দাঁড়াল, আমাকে ডাকছিলেন গিন্নীমা।

হ্যাঁরে তুই স্কুলে পড়বি?

স্কুলে?

হ্যাঁরে পড়িস ত বল—তোকে আমি নাইট স্কুলে ভরতি করে দেবো।

পড়বো গিন্নীমা। ঘরের কাজকর্ম করে ঠিক আমি পড়তে পারবো।

পারবি ত?

পারবো—

মানিককে মমতাময়ী কাছেরই একটা নাইট স্কুলে ভরতি করে দিলেন। মানিক দিনের বেলায় কাজ করে সন্ধ্যার পর নাইট স্কুলে যায়—রাত নটায় ফেরে।

ভবতোষবাবু একদিন স্ত্রীকে শুধোলেন, মানিকটা সন্ধ্যার পর কোথায় যায়।

পুতুলই জবাব দিল, মা যে ওকে পাড়ার নাইট স্কুলে ভরতি করে দিয়েছে বাবা—

তাই বুঝি?—ভবতোষবাবু স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন।

হ্যাঁ—ছেলেটার লেখাপড়ার দিকে খুব ঝোঁক—তাই দেখে—

ভবতোষবাবু হাসলেন।

হাসচো যে।

না এমনিই।

মমতাময়ী জানতেন না—পাড়ার নাইট স্কুলে অনেক ধেড়ে ধেড়ে লোকও পড়ে ছোটদের

সঙ্গে এবং সবাই প্রায় আশেপাশে বস্তির। এবং তাদের সঙ্গে মিশে কিছুদিনের মধ্যেই নানা দুষ্কৃতির সঙ্গে তার নিত্যনতুন পরিচয় ঘটতে লাগল। পরিবেশ থেকে কতদিন আর দূরে থাকা যায়। মানিক দেখতে দেখতে তাদের একজন হয়ে উঠলো।

নাইট স্কুলেই যেত—পড়াশুনা কিছুই করত না।

কখনো জামা কাপড়ের জন্য মানিক মমতাময়ীকে কিছু বলে নি—মাস তিনেক বাদে একদিন বললে, আমাকে একটা লম্বা প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট কিনে দেবেন?

কেন—লম্বা প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট দিয়ে কি করবি।

কেন—পরবো—

না—ওসব পাবি না—

আমার মাহিনা থেকে কিনে দিন।

মমতাময়ী তখনি একশো ষাট টাকা এনে ছুড়ে দিলেন।

এত দিন কাজ করছে মানিক, আগে কখনো মাইনার কথা বলেনি—মমতাময়ীই বলেছেন, তোর মাইনা আমার কাছে জমা থাক—কেমন।

তাই থাক গিন্নীমা।

মমতাময়ী আজ মানিকের কথায় একটু আশ্চর্যই বোধ করলেন, মাইনা—

হ্যাঁ, আট মাস কাজ করছি—কুড়ি টাকা হলে এই আট মাসের একশো ষাট টাকা হয়—তা থেকেই চল্লিশটা টাকা দিন।

মমতাময়ী হঠাৎ কঠোর হয়ে উঠলেন—বললেন, তোর মাইনা চাস!

হ্যাঁ,—দিন।

মমতাময়ী তখনি ঘরে ঢুকে আলমারি খুলে একশো ষাট টাকা এনে ছুড়ে দিলেন মানিকের সামনে, নে তোর মাইনার টাকা।

মানিক নোটগুলো কুড়িয়ে নিল।

তোকে আর কাজ করতে হবে না, কাল সকালেই তুই চলে যাবি।

বেশ ত যাবো—কাজের আবার অভাব কলকাতা শহরে—

কি বললি—হতভাগা শুয়োর।

গাল দিচ্ছেন কেন। রাখবেন না—রাখবেন না—

তুই এতদূর গোল্লায় গেছিস—এখুনি বের—এ বাড়ি থেকে—বের হ—

যাচ্ছি—

ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস।

আমার সুটকেশটা নিয়ে যাবো—

সুটকেশ—তোর সুটকেশ এলো কোথা থেকে—

কিনেছি—অম্লান বদনে বললে মানিক।

কিনেছিস—টাকা পেলি কোথা থেকে—

আমার এক বন্ধু ধার দিয়েছে—

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মমতাময়ী—তখনো বিস্ময়ের কিছু বাকী ছিল—সুটকেশটা হাতে নিয়ে এসে মানিক দাঁড়াল। ছাড়িয়েই যখন দিচ্ছেন এ মাসের এই কুড়ি দিনের মাইনাটা দিন।

বের হ—এক পয়সাও আর দেবো না।

আমার মাইনা দেবেন না।

না—

দেবেন না।

না।

বেশ আমিও জানি কি করে মাইনা আদায় করতে হয়।

বেরিয়ে যা—যা—

যাচ্ছি—

মানিক সুটকেশটা হাতে নিয়ে বের হয়ে গেল।

মমতাময়ী জানতেন না—মানুষের পরিবেশ কি ভয়ানক প্রভাব বিস্তার করে—বোঝেননি তিনি একটা ভাল ছেলেকে একদল চোর ছ্যাঁচড় অশিক্ষিতদের মধ্যে ঠেলে দিয়ে কি সর্বনাশ তিনি করেছেন—দয়াপরবশ হয়ে নাইট স্কুলে ভরতি করে।

পুতুল স্কুল থেকে এসে বললে, মা মানিক আজ স্কুলে যায়নি কেন।

তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি—

কেন?

ওকে আর রাখবো না বলে।

পরের দিন সকালেই মানিক এসে হাজির—পরনে তার চোঙ্গা প্যাণ্ট—চক্কর-বক্কর হাওয়াই শার্ট গায়ে।

বললে, স্যার আমার কুড়ি দিনের মাইনাটা মিটিয়ে দিন—

মানিকের সঙ্গে তার থেকে কিছু বড় বয়স্ক দু চারটি মস্তান ছেলে।

ভবতোষবাবু গালাগালি করে তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন—কিন্তু মমতাময়ী বললেন, দিয়ে দাও টাকাটা—হিসাব করে—ছোটলোকের ছেলে—

কি বলছো তুমি, ভবতোষবাবু বললেন, এতদিন তোমাকে আমি বলিনি—ও তো আমাদের অফিসের ভুবনবাবুরই ছোট ভাই—

তা তুমি জানলে কি করে—

বিরাটির এক ভদ্রলোকই ত বলেছেন—

তাহলে ও ভদ্রঘরের ছেলে—তবে—

কি তবে—

এমন হলো কি করে—

কেমন করে আবার—নাইট স্কুলে পড়তে দাও আরো—

মমতাময়ী তার আগেই ত ভুলটা তার বুঝতে পেরেছিলেন। কিছু বললেন না চুপ করে রইলেন।

● টা-টা! কলা খা!

বাঘে মানুষে

(সত্য ঘটনা)

—শতদল ভট্টাচার্য

বাঘে মানুষে সম্পর্কটা কি? খাদক খাদ্য সম্পর্ক, তাই না? বাঘকে দেখলেই মানুষ ভয় পায়। পাছে খেয়ে ফেলে। অবশ্য কিছু কিছু বাঘকে আমরা দেখি পোষা বাঘ। যেমন সার্কাসের বাঘ। মানুষের হুকুমে সে খেলা দেখায়, আগুনের রিং পার হয়ে যায়। কিন্তু তারা যা কিছু কেরামতি দেখায় সব খাঁচার মধ্যে বা জাল ঘেরা নির্দিষ্ট জায়গায়। মানুষের কথা তারা শোনে মানুষকে ভালবেসে নয়, ভয়ে। ঐ যে রিং মাস্টারের হাতে ছড়ি থাকে, ওটাকে ওদের ভয় খুব। ছড়িটা ইলেকট্রিক ছড়ি। কথা না শুনলে ওর একটু ছোঁয়ায় বাঘ বাবাজীর অত বড় শরীরটা চনচন করে উঠবে। সার্কাসের সব বাঘ সিংহের এ অভিজ্ঞতা আছে। একে কি আমরা পোষ মানা বলব?

কিন্তু এমন বাঘের সন্ধান পাওয়া গেছে যে সত্যিই পোষ মেনেছে। সে থাকে কোন খাঁচায় নয়, বাড়ির এখানে সেখানে। শোয় ঘরের ভেতর মাথায় বালিশ দিয়ে খাটের ওপরে। তাকে শাসন করতে বৈদ্যুতিক ছড়ি লাগে না। মুখে বললেই সে কথা শোনে। সে থাকে পোষা বেরালের মত।

বাঘটার নাম খৈরী। থাকে যোশীপুর জঙ্গলের ডাকবাংলোয় উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলায় যোশীপুর গ্রাম। খৈরীকে প্রথম পাওয়া যায় ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলে। তখন সে খুব ছোট। তার মা বোধ হয় তাকে ফেলে পালিয়েছিল। খৈরীকে বাঘ বলছি বটে আসলে সে বাঘিনী। যোশীপুরের বাংলোয় সরোজ চৌধুরীবাবু ওকে নিয়ে আসলেন আর ওনার ভাইঝি নীহারদেবী ওকে মানুষ করতে লাগলেন। বাঘিনীর বয়স তখন সতেরো মাস। এই সতেরো মাস ধরে নীহারদেবী ওকে সন্তান স্নেহে পালন করেছেন। বাঘিনীও মানুষ-মাকে খুবই ভালবেসেছে, একদিনও সে নিমকহারামি করেনি। বরং মানুষ-মার কাছে তার দিন দিনই আবদার বেড়ে যাচ্ছে। নীহারদেবী খাইয়ে না দিলে ওর খাওয়া হয় না, নীহারদেবী কাছে না থাকলে ওর ভাল ঘুম হয় না। এই রকম আর কত কি! মানুষ-মা নীহারদেবীও খৈরীর যাতে ভাল লাগে এমনভাবে খাবার মেখে দেন। খৈরীর প্রিয় খাবার হল মিল্ক পাউডার গোলার সঙ্গে মাংস। নীহারদেবী ওকে সেইভাবে খাবার তৈরি করে নিজ হাতে খাইয়ে দেন। খৈরীও মহা খুশী হয়ে মানুষ-মার হাত থেকে বেশ খায়। সে এক দেখবার জিনিস। একবার খৈরী একটু বেচাল করেছিল বলে নীহারদেবী শাসন করেছিলেন, সেবার খৈরী নিজেকে বোধ হয় অপমানিত বোধ করেছিল বলে ঠিক থাকতে পারেনি। নীহারদেবীকে একটুখানি কামড়ে দিয়েছিল। নীহারদেবীর তাতে বিশেষ কিছু হয়নি, কিন্তু মানুষ-মাকে আঘাত দেওয়ার জন্যে খৈরী খুব লজ্জা পেয়েছিল। শুনলাম খৈরী নাকি দিন তিনেক লুকিয়ে দিন কাটিয়েছে, মানুষ-মা বা সরোজবাবু কারো সামনে আসেনি। তাহলে দেখা যাচ্ছে কুকাজ করলে বাঘেরও লজ্জা হয় তাই না? এবার খৈরীর দরদী মনের একটা খবর দিই—একবার ফোঁড়ার জন্যে নীহারদেবীকে একটা ছোটোখাটো অপারেশন করতে হয়েছিল। ডাক্তারবাবু জায়গাটা অসাড় না করেই অপারেশন করায় নীহারদেবীর

একটু লেগেছিল। নীহারদেবী যেই একটু আর্তনাদ করেছেন অমনি কোথায় ছিল খৈরী ছুটে এসে বারবার মানুষ-মাকে জড়িয়ে ধরতে লাগল, যেন বলতে লাগল মা, তোমার কি খুব লেগেছে? আর লাগবে না, আর লাগবে না।

খৈরীর নিত্য সঙ্গী বাংলোর পোষা দুটো কুকুর—ব্ল্যাকি আর বাঘা। গোটাকতক হরিণ আছে তারাও খেলার সঙ্গী। তবে তারা ঐ বাংলোয় থাকে না, আসে বন থেকে। খেলা সেরে আবার বনে চলে যায়। প্রথম প্রথম অবশ্য বাঘকে দেখে হরিণগুলো ভয় পেত। কিন্তু যখন দেখল বাঘটা কিছু করে না, কেবল খেলা করতে চায় তখন হরিণগুলো দেখল এ তো বেশ মজা। তাই রোজ খৈরীর সঙ্গে খেলতে আসে। খুব মজার ব্যাপার তাই না?

খৈরী আরামে ঘুমুচ্ছে।

খৈরীকে মাঝে মাঝে স্বজাতির সঙ্গে মিশবার জন্যে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসা হয়। মাঝে মাঝে স্বজাতির সঙ্গে মেলামেশা করলে কার না ভাল লাগে? খৈরীর ভালই লাগে। একবার সে বনে হারিয়ে গিয়েছিল। শেষকালে জীপ নিয়ে যাওয়া হল তাকে খুঁজতে। জঙ্গলের মধ্যে খৈরী বলে ডাকতে ডাকতে খোঁজা শুরু হল। এক সময়ে খৈরীকে পাওয়া গেল। কিন্তু সে কিছুতেই বাড়ি ফিরবে না। তার অভিমান সরোজবাবু কিংবা মানুষ-মা নীহারদেবী তাকে নিতে আসেননি কেন? অতএব যাব না। তাকে নিয়ে যেতে অগত্যা সরোজবাবুকে নিয়ে আসতে হল, তবে খৈরী বাড়ি এল।

এইভাবে চলছে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলার যোশীপুর জঙ্গলের বাংলোয় খৈরী বাঘিনীর জীবন। এ যেন একটা গল্পের বাঘের গল্প। কিন্তু গল্প মোটেই নয়, ঘটনা। খুব আশ্চর্যের ব্যাপার!

বেইমান

—নটরাজন

অপরের দুঃখ-কষ্টে কাতর হওয়া মনুষ্য চরিত্রের একটি মহৎ গুণ। এই গুণ সকলের থাকে না। যাদের থাকে তাদের লোকে শ্রদ্ধা করে। আবার যত্র-তত্র এই গুণটির প্রয়োগ মানুষের মঙ্গলের চাইতে অনেক সময় আবার অমঙ্গল ডেকে আনে। চিকিৎসক যদি নিজের অন্তর দিয়ে রোগীর জ্বালা-যন্ত্রণা অনুভব করতে পারে, তা'হলে তার চিকিৎসা হবে বাস্তবিকই আন্তরিক। রোগীকে সারিয়ে তুলতে চিকিৎসক নিঃসন্দেহে প্রাণপণ চেষ্টা করবে। কিন্তু কোন অস্ত্রোপচারের সময় রোগীর দুঃখ-কষ্টে অভিভূত হয়ে চিকিৎসক যদি হাতের ছুরি ফেলে দেয় তা'হলে সে রোগীর অপকারই করবে, তাকে সারিয়ে তুলতে কখনই পারবে না। সেখানে চিকিৎসককে একটু নির্দয় হতে হবে রোগীর নিজের মঙ্গলের জন্যে।

পুলিস বিভাগের বেলাও এ কথা খাটে। কথায় আছে—পাপকে ঘৃণা করো, কিন্তু পাপীকে নয়। পাপী কিংবা অন্যায়কারীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করা উচিত যাতে সে একদিন নিজের ভুল বুঝতে পেরে পাপের পথ ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও অন্যায়কারীর প্রতি সময় সময় কঠোর হওয়ার প্রয়োজন আছে। পুলিস বিভাগের হৃদয়হীন কঠোরতা যেমন অন্যায়, তেমনি অতিরিক্ত দয়া-প্রদর্শনও অনুচিত। দুটোই মঙ্গলের চাইতে অমঙ্গল ঘটায় বেশী।
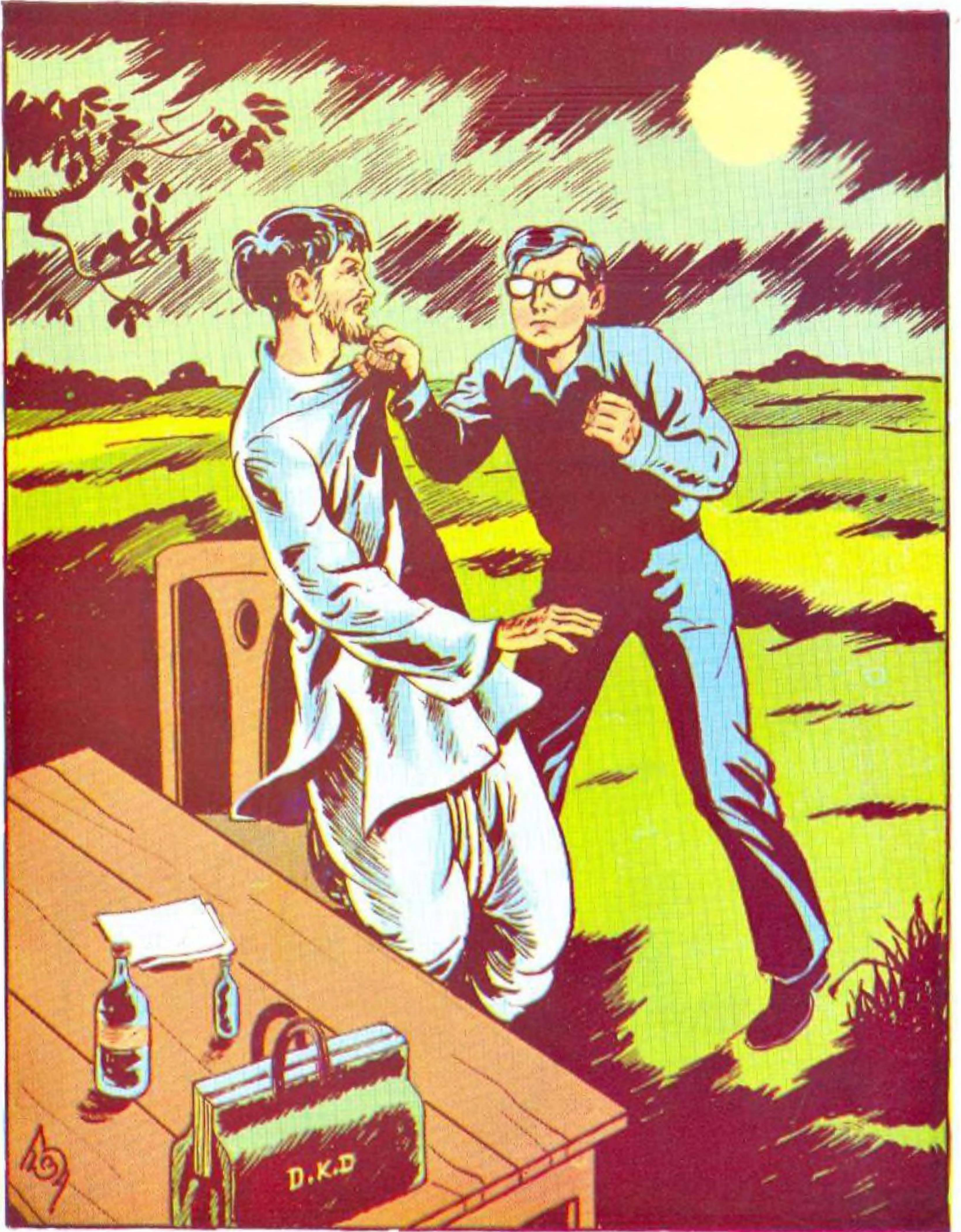
শিশির উত্তেজনায় আধবুড়ো লোকটার জামা চেপে ধরলো।

তুমি কি চালাবে? মেয়েছেলে?

অপরাধীর দুঃখ-কষ্টে অতিরিক্ত কাতরতাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত পি.-কে.র চাকরি-জীবনের অসাফল্যের কারণ হয়ে উঠলো একদিন। পি. কে.র পুরো নাম পবিত্র কুমার চৌধুরী। মহকুমা পুলিস অফিসার তিনি। সর্বভারতীয় পুলিস সার্ভিসের সদস্য। আগে তিনি ছিলেন একটা কলেজের অধ্যাপক, পরে যোগ দিলেন পুলিসের চাকরিতে। পুলিস মহলে তিনি পি. কে. নামেই পরিচিত।

মহকুমার পুলিস মহল তাকে নিয়ে আলোচনা করে, সমালোচনা করে। বলে—ভদ্রলোক অতিরিক্ত ভালো মানুষ। এমন ভালো মানুষকে দিয়ে কলেজের মাস্টারীই চলে। পুলিসের চাকরি চলে না। উনি যদি এমনিভাবে যত্র-তত্র দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাতে শুরু করেন তাহলে আর পুলিস বিভাগের প্রয়োজন কি? এই বিভাগটি তো কেবল দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাবার জন্যে খোলা হয়নি।

অধঃস্তন পুলিস অফিসারদের এ ধরনের সমালোচনা কিন্তু পি. কে.র কানে আসে। সব শোনেন তিনি, কিন্তু কোন মন্তব্য না করে কেবল একটু হাসেন। মুখের এই হাসিটুকু দিয়েই যেন তিনি ঐ সমালোচনাকে উড়িয়ে দিতে চান।

কিন্তু উড়িয়ে দিতে চাইলেই সব সময় দেওয়া যায় না। জেলা কর্তৃপক্ষের কানেও ওঠে কথাটা। তারা একটু বুঝে-সুঝে চলতে নির্দেশ দেন তাকে, মনে করিয়ে দেন যে পুলিস-বিভাগে কঠোরতারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তাঁদের আদেশ কিংবা উপদেশ কোনোটাই তেমন গায়ে মাখেন না পি. কে.।

এদিকে গোটা মহকুমায় পি. কে.র চরিত্রের কথা ছড়িয়ে পড়তেই প্রতিদিন দলে দলে দর্শনার্থী এসে হাজির হয় তার কাছে। বিভিন্ন অভিযোগ তাদের, নানারকম প্রতিকার চায় তারা। তাদের মধ্যে যেমন সৎ লোক আছে তেমনি অসৎ লোকেরও অভাব নেই। নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করতেই তারা দরবার করতে আসে মহকুমা পুলিস অফিসার পি. কে.র কাছে।

পি. কে. কিন্তু কাউকে ফেরান না। যথাসাধ্য করতে চেষ্টা করেন তাদের জন্যে। এতে সময় সময় খোদ পুলিস বিভাগই অসুবিধায় পড়ে। বেকায়দায় পড়ে গিয়ে থানা অফিসারেরা দাঁতে দাঁত চেপে তাঁর মুণ্ডুপাত করলেও তাঁর মুখের ওপর কেউ কিছু বলতে পারে না। শত হলেও পি. কে. হচ্ছেন মহকুমার পুলিস বিভাগের বড়কর্তা—সর্বভারতীয় পুলিস সার্ভিসের লোক।

সেদিন বিকেলে মহকুমা শহরের ব্যস্ত ব্যবসা-কেন্দ্রে একটা ঘটনা ঘটে গেল। একটা মুদি দোকানের ক্যাশ-বাক্স থেকে এক বাণ্ডিল নোট হাতিয়ে নিতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়লো একটি লোক।

লোকটির বয়স বছর তিরিশের মত। রোগা লম্বা গড়ন। পরনে একখানা আধময়লা ধুতি, গায়ে হাফ-শার্ট, পায়ে এক জোড়া স্যাণ্ডাল, মাথার লম্বা চুলের সঙ্গে তেলের সম্পর্ক নেই।

লোকটি কিন্তু খদ্দেরের বেশেই ঢুকেছিল দোকানে। গ্রীষ্মকালের দুপুর। বাইরে দারুণ গরম। খালি গায়ে দোকানী একখানা হাত-পাখা নাড়তে নাড়তে মাঝে মাঝে ক্লান্তিতে ঢুলছিল।

খদ্দের দেখেই হাত-পাখাখানা নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে বসে সে জিজ্ঞেস করেছিল, কি চাই?

একখানা লম্বা টুলের একপাশে বসে কাপড়ের খুঁটে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে জবাব দিয়েছিল লোকটি, দু'কিলো নুন দিন তো।

মুদি দোকানে নুনের বস্তা সাধারণতঃ দোকানীর হাতের কাছে না রেখে দোকানের এক কোণে রাখা হয়। একটা ঠোঙ্গা হাতে দোকানী উঠে গিয়ে বস্তা থেকে ঠোঙ্গায় নুন তুলতে থাকে।

খদ্দের লোকটি এই সুযোগের অপেক্ষায়-ই ছিল। দোকানী অন্যমনস্ক হতেই লোকটি হাত বাড়িয়ে ক্যাশ বাক্সের ডালা খুলে এক বাণ্ডিল নোট তুলে নিয়ে পকেটে রাখার মুহূর্তেই সেদিকে নজর পড়ে দোকানীর।

—ওকি—ওকি, অপানি ক্যাশ বাক্সে হাত দিয়েছেন কেন? বলতে বলতে নুনের ঠোঙ্গা ফেলে রেখেই দোকানী ছুটে লোকটার দিকে এগিয়ে আসতেই সে উঠে দাঁড়ায়। তারপর দোকানী কিছু অনুমান করার আগেই এক লাফে বাইরে এসে দ্রুতপায়ে পথচারীদের মধ্যে মিশে যেতে চেষ্টা করে।

দোকানীও নাছোড়বান্দা। সেও সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে রাস্তায়। তারপর চোর—চোর বলে চিৎকার করতে করতে দৌড়তে শুরু করে লোকটার পিছু পিছু।

লোকটি বুঝতে পারে তার বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। এখনই হয়তো সে ধরা পড়বে। তাই পালাবার আর কোন পথ খুঁজে না পেয়ে সেও দৌড়তে শুরু করে, আর পেছনে চোর—চোর বলে সমানে চিৎকার করতে করতে ছুটতে থাকে সেই দোকানী।

এবার আর শুধু দোকানী একা নয়, তার চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে আরও কিছু পথচারী সঙ্গ নেয় তার। অবশেষে সামনের দিক থেকে এগিয়ে আসা একদল লোকের হাতে ধরা পড়ে সেই লোকটা।

চোর হাতে-নাতে ধরা পড়লে তার যা দুর্দশা হয় এক্ষেত্রেও তার কিছু ব্যতিক্রম হলো না। বেশ কিছু চড়-চাপড় পড়লো তার পিঠে। মারের চোটে তার মুখখানা ফুলে উঠলো। টাকার পুরো বাণ্ডিলটাও পাওয়া গেল তার পকেটে। অবশেষে লোকটাকে নিয়ে আসা হলো থানায়।

থানা অফিসার লোকটাকে জিজ্ঞেস করে, কি নাম তোর?

—আজ্ঞে অভয় বাগদী। ভাঙ্গা গলায় জবাব দেয় লোকটা।

—তুই দোকান থেকে টাকা চুরি করেছিলি?

লোকটি কোন জবাব না দিয়ে মাথা নীচু করে থাকে। থানা অফিসার এবার ধমকে ওঠে তাকে, ওকি, জবাব দিচ্ছিস্ না কেন? টাকা চুরি করেছিলি তুই?

—আজ্ঞে, বলেই অভয় হাত জোড় করে তাকিয়ে থাকে থানা অফিসারের মুখের দিকে।

আবার জিজ্ঞেস করে থানা অফিসার, এর আগে এরকম কবার করেছিস্?

—আজ্ঞে, এই প্রথম, স্যার। টাকার দরকার ছিল, তাই—

মুখ ভেংচে বলতে থাকে থানা অফিসার, তাই দোকান থেকে টাকা চুরি করে সরে পড়তে চেষ্টা করেছিলি?

অভয় আর কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে।

অফিসার আবার প্রশ্ন করে, তোর দলে আর কে কে আছে?

—আজ্ঞে স্যার, আমার কোন দল নেই। আমি একা।

—সত্যি করে বল্, আগে কখনও জেল খেটেছিস্?

—না, স্যার। সত্যি কথা বলছি। কখনও জেলে যাই নি।

—মিথ্যে বললে কিন্তু মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব। হুমকি দেয় থানা অফিসার। কাঁচুমাচু মুখে জবাব দেয় অভয়পদ, না স্যার, সত্যি বলছি।

—বেশ, দেখা যাবে। বলেই থানা অফিসার একজন কনস্টেবলকে হুকুম দেয় অভয়কে থানার গারদে পুরে দিতে।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা ম্লান হয়ে ওঠে অভয়ের। একটা ঢোক গিলে সে বললে, স্যার, চুরি করেছি বলে মার খেয়েছি। দরকার হয় আমাকে আরও মারুন, কিন্তু দোহাই স্যার, আমাকে গারদে পুরবেন না।

অভয়ের কথায় থানা অফিসার বিদ্রূপের সুরে বললে, চোরকে গারদে পুরবো না তো সিংহাসনে বসিয়ে রাখবো নাকি রে, হতভাগা! শীগ্‌গির গারদে গিয়ে ঢোক্। বলেই হাতের রুলারটা বোঁ করে শূন্যে একবার ঘুরিয়ে নেয় অফিসার।

অভয় একবার রুলারটার দিকে তাকায়। তারপর অফিসারের মুখের পানে তাকিয়ে মিনতিভরা কণ্ঠে বললে, স্যার আমাকে জামিনে ছেড়ে দিন। আমি কথা দিচ্ছি, মামলার তারিখের দিন আদালতে হাজির হবো।

গম্ভীর কণ্ঠে বললে থানা অফিসার, থানায় জামিন হবে না। কাল সকালে তোকে আদালতে চালান দেবো। পারিস্ তো সেখান থেকে জামিনে নিজেকে ছাড়িয়ে নিস্।

—না স্যার, না। প্রায় কেঁদে ফেলে অভয়, দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন। আমি কথা দিচ্ছি—

থানা অফিসার একটা প্রচণ্ড ধমকে অভয়কে থামিয়ে দিয়ে রুলার হাতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে থানায় প্রবেশ করেন মহকুমা পুলিস অফিসার পি. কে.।

পোশাক পরা ঊর্ধ্বতন অফিসার পি. কে.-কে দেখে থানা অফিসার তাড়াতাড়ি হাতের রুলার নামিয়ে রেখে কড়া হাতে স্যালুট করে তাঁকে।

পি. কে. অফিসারকে জিজ্ঞেস করেন, অফিসার-ইন্-চার্জ কোথায়?

জবাব দেয় থানা অফিসার, আজ্ঞে উনি সকালে একটা ডাকাতির তদন্তে বেরিয়েছেন, এখনও ফেরেন নি।

—ও—আচ্ছা। উনি ফিরে এলে আমার অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন।

—আচ্ছা স্যার। মাথা নেড়ে সায় দেয় অফিসার।

এতক্ষণে মেঝেয় উবু হয়ে বসে থাকা অভয়ের দিকে নজর পড়তেই পি. কে. ভ্রূ-কুঁচকে জিজ্ঞেস করেন, এ কে?

জবাব দেয় অফিসার, শপ্‌-লিফ্‌টার—দোকান থেকে টাকা চুরি করে পালাচ্ছিল। পথচারীরা হাতে-নাতে ধরে ফেলেছে।

—আই সী! বলে ওঠেন পি. কে. কী নাম তোমার?

অভয় বুঝতে পারে এই মানুষটি ওই থানা অফিসারের চাইতে অনেক বড় দরের অফিসার। তাই সে কাঁচু-মাচু মুখে জবাব দেয়, অভয় বাগদী।

—তুমি দোকান থেকে টাকা চুরি করেছিলে?

—মাথা নেড়ে সায় দেয় অভয়।

পি. কে. আর কিছু না বলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই হঠাৎ অভয় ঝড়ের বেগে তার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে, দয়া করুন স্যার, দয়া করুন। আমাকে হাজতে পুরবেন না স্যার। আমার সর্বনাশ হবে। আমাকে দয়া করে জামিনে ছেড়ে দিন।

পি. কে.র মুখের ওপর একটা বিব্রতভাব ফুটে ওঠে। কিছু না বলে তিনি কেবল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকান থানা অফিসারের দিকে।

জবাব দেয় অফিসার, কথা-বার্তায় মনে হচ্ছে হার্ড ক্রিমিন্যাল, স্যার। ও যদিও অস্বীকার করছে, কিন্তু আমার ধারণা ও বোধহয় এর আগে জেলও খেটেছে। এমন লোককে জামিনে ছেড়ে দেওয়া বিপদজনক। হয়তো পালাবে। কোর্টে হাজির হবে না, স্যার।

অফিসারের কথা শেষ হতেই পি. কে.র পা তেমনি জড়িয়ে ধরে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলতে থাকে অভয়, না স্যার—না, আমি পালাবো না। কথা দিচ্ছি আমি ঠিক আদালতে হাজির হবো। আমাকে জামিনে ছেড়ে দিন।

পি. কে. কিছু বলার আগেই থানা অফিসার আবার ধমকে ওঠে অভয়কে বললে, তোর কথার মূল্য কিরে? তা ছাড়া তোর হয়ে কে জামিন দাঁড়াবে?

এবার জিজ্ঞেস করেন পি. কে. এখানে জামিন দাঁড়াবার মত কেউ নেই?

—হ্যাঁ স্যার, আছে। বলতে থাকে অফিসার, কাছেই একজন উকিলবাবু থাকেন। আমরা বললে উনি জামিন দাঁড়াবেন। কিন্তু লোকটা সত্যিই যদি পালায়—তাহলে শেষ পর্যন্ত সমস্ত দোষ এসে আমাদের ঘাড়ে পড়বে।

কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে অভয়, আমি শপথ করছি, স্যার। পালাবো না আমি। মামলার তারিখের দিন আমি আদালতে হাজির হবো। আমাকে একটিবার বিশ্বাস করুন স্যার।

লোকটার অনুনয় ও কান্নাকাটিতে মনটা ভারী হয়ে ওঠে পি. কে.র। অভয়ের হাত থেকে নিজের পা দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে অভয়কে জিজ্ঞেস করেন, পালাবে না তো?

—না স্যার, না। এতক্ষণে যেন একটু আশার আলো ফুটে ওঠে অভয়ের মুখে।

—কথা দিচ্ছো?

—হ্যাঁ স্যার।

—কথার নড়চড় হবে না তো?

—আমাকে হাজতে পুরবেন না স্যার। আমার সর্বনাশ হবে। [পৃ. ১৫২

—না স্যার—না। কিছুতেই নড়চড় হবে না।

পি. কে. এবার থানা অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললেন, মনে হচ্ছে ও মিথ্যে বলছে না, আপনি ওকে জামিনে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

—বেশ স্যার, তাই হবে। মাথা নেড়ে সায় দেয় অফিসার। পি. কে. একবার অভয়ের উজ্জ্বল চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে থানা থেকে গটগট করে বেরিয়ে যান। দরজার কাছে বন্দুক হাতে কনস্টেবল পায়ের বুটের শব্দ তুলে সেলাম জানায় তাঁকে।

রাতে থানায় ফিরে এসে ও-সি. সব শুনে মন্তব্য করে, সাহেবের কথায় লোকটিকে জামিনে ছেড়ে দিয়ে ভালই করেছ। এখন না পালালেই মঙ্গল।

কিন্তু মঙ্গলের বদলে অমঙ্গলই ঘটলো শেষ পর্যন্ত। মামলার দিন অভয় আদালতে হাজির হলো না। যে উকিল ভদ্রলোক তার হয়ে জামিন দাঁড়িয়েছিলেন বিচারক তাঁর অর্থদণ্ডের আদেশ দিলেন। সাবডিভিশনাল পুলিস অফিসারের আগ্রহেই থানা থেকে জামিন হয়েছিল বলে বিচারক পি. কে.র বিরুদ্ধে মন্তব্য করে তা পাঠিয়ে দিলেন জেলার পুলিস সুপারের কাছে।

কাগজটা পেয়েই তো খাপ্পা হয়ে উঠলেন পুলিস সুপার। এই ভদ্রলোককে নিয়ে তো কাজ চালানোই মুশকিল! কি প্রয়োজন ছিল ওঁর ঐসব জামিনের ব্যাপারে মাথা গলাবার? পুলিস সুপার কৈফিয়ত তলব করলেন পি. কে.র। আর সেই সঙ্গে নির্দেশ দিলেন যে করে হোক লোকটাকে আবার অ্যারেস্ট করতে হবে।

কৈফিয়তের কাগজটা হাতে পেয়ে মনটা ভয়ানক খারাপ হয়ে উঠল পি. কে.র। এ যুগে সত্যিই যে আর কারুর ওপর বিশ্বাস রাখা চলে না! লোকটা এমন নিদারণু ভাবে তাঁকে ঠকালো? কিন্তু সেদিন লোকটার কথায় তাকে অবিশ্বাস করতে মন চায় নি তাঁর। অন্য অফিসারেরা তাহলে ঠিকই বলে—এ যুগে বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই—উপকারের কোন দাম নেই। ঐ লোকটাকে সেদিন তিনি বিশ্বাস করেছিলেন বলেই আজ তাঁকে কৈফিয়ত দিতে হচ্ছে।

নাঃ, আর কোন দিন কাউকে তিনি বিশ্বাস করবেন না। এর আগেও অন্যকে বিশ্বাস করে ঠকেছেন তিনি। আর নয়। যদিও মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ, তবুও এবার থেকে মানুষকে অবিশ্বাস করতেই শুরু করবেন তিনি। ঐ অভয় যদি আবার ধরা পড়ে তাহলে এবার নিজের হাতে তিনি তাকে চাবুক মারবেন।

কথাটা একদিন থানার ও.-সি.-কে বলতেই সে জবাব দেয়, হ্যাঁ স্যার, চেষ্টায় তো কোনই ত্রুটি করছি না, কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছি না লোকটাকে। তবে খবর পেয়েছি লোকটা এই শহরেই আছে। শুধু কি তাই, এর পরেও তিনটে দোকানে সেই একই ঢংয়ে চুরি করে প্রায় হাজার খানেক টাকা নিয়ে পালিয়েছে।

কথাটা শুনেই পি. কে.র মুখখানা একটু ম্লান হয়ে ওঠে। জিজ্ঞেস করেন তিনি, এর পরেও আরও তিনবার সে চুরি করেছে? এখন দেখছি, সত্যিই সেদিন অপাত্রে দয়া করেছিলাম। যাক্ গে, যে করেই হোক লোকটাকে ধরা চাই-ই।

একটু থেমে পি. কে. আবার জিজ্ঞেস করেন, নিজের বাড়িতে লোকটা থাকে না?

—না স্যার। খবর নিয়েছি, থানা থেকে জামিনে ছাড়া পেয়েই সে অন্য কোথাও চলে গেছে।

—হুঁ। চিন্তিত কণ্ঠে বলে ওঠেন পি. কে.।

এদিকে অভয় কিন্তু শহরের মধ্যে একটার পর একটা শপ্-লিফ্টিং করেই চলেছে। পুলিস কিছুতেই ধরতে পারছে না তাকে। শেষবার সে চুরি করলো একটা পেট্রোল পাম্পে। সেখান থেকে সে প্রায় হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে গেল। রাস্তায় তার চাল-চলনে সন্দেহ করে একজন পুলিস কনস্টেবল তাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। অভয় কনস্টেবলটির মুখে একটা ঘুষি মেরে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। শত চেষ্টা করেও পুলিস তাকে আর খুঁজে বের করতে পারে নি।

পুলিস মহলে দারুণ চাঞ্চল্য। একটা লোক দিনের পর দিন পুলিসের নাকের ডগায় বসে এমনিভাবে চুরি করে বেড়াচ্ছে, কিন্তু পুলিস তার কিছুই করতে পারছে না। এর চাইতে লজ্জার আর কি থাকতে পারে? জেলার পুলিস সুপারের কড়া নির্দেশ আসে পি. কে.র ওপর। পি. কে.ও কড়া নির্দেশ দেন থানার ও-সিকে—যে করেই হোক ধরে আনো সেই অভয় বাগদীকে। আর কোন দয়া-মায়া নয়। থানায় ধরে নিয়ে এসে ওর পিঠের ছাল খুলে নাও। তারপর ওকে চালান করো আদালতে। ওকে বুঝিয়ে দাও পুলিসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম।

অবশেষে একদিন ধরা পড়লো অভয় বাগদী।

সবে সকাল আটটা। দোতলার কোয়ার্টার থেকে একতলার অফিস ঘরে এসে বসেছেন সাবডিভিশনাল পুলিস অফিসার পি. কে.। টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত ফাইলপত্র থেকে একটা ফাইল টেনে নিয়ে সবে কাজ শুরু করেছেন তিনি, হঠাৎ আরদালী কনস্টেবল এসে সেলাম করে দাঁড়ায়।

পি. কে. ফাইল থেকে চোখ তুলে আরদালীর দিকে তাকাতেই সে বলে ওঠে, হুজুর এক আদমী ভেট্ করনে মাংতা।

দর্শনার্থীদের সামনে পি. কে.র দরজা সব সময়ই খোলা। জবাব দেন পি. কে. আনে দো।

একটু পরেই ঘরে যে লোকটি প্রবেশ করে তাকে দেখে চমকে ওঠেন পি. কে.—অভয়—অভয় বাগদী।

মাথার চুল উস্কো-খুস্কো, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখ দুটো কোটরগত, পরনে ছেঁড়া ধুতি, গায়ে একখানা মলিন চাদর—এই বেশে অভয় পি. কে.র সামনে এসে দাঁড়াতেই চোখ দুটো দপ্

করে জ্বলে ওঠে পি. কে.র। কর্কশ-কণ্ঠে প্রশ্ন করেন তিনি, তুমি এখানে?

নিরুত্তাপ কণ্ঠে জবাব দেয় অভয়, হ্যা স্যার, শেষ পর্যন্ত আসতেই হলো আপনার কাছে।

লোকটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে রাগে গা জ্বলে যাচ্ছিল পি. কে.র। ইচ্ছে করছিল একটা চড়ে ওর কয়েকটা দাঁত ফেলে দিতে কিংবা দেয়ালের পাশে দাঁড় করানো মোটা বেতের লাঠিখানা ওর পিঠে ভাঙতে।

নিজেকে সামলে নিয়ে পি. কে. তেমনি কর্কশ সুরেই জিজ্ঞেস করেন আবার, জামিন থেকে পালিয়ে গিয়ে আমার সঙ্গে বেইমানী করছিলে কেন?

অভয় কোন জবাব না দিয়ে স্থির হয়ে কেবল দাঁড়িয়ে থাকে।

পি. কে. প্রশ্ন করেন, কেনই বা জামিনে ছাড়া পেয়ে একটার পর একটা চুরি করে আমাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলে?

চুরি করার জন্যেই তো জামিনে ছাড়া পেতে চেয়েছিলাম।

শান্ত মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় অভয়, চুরি করার জন্যেই তো জামিনে ছাড়া পেতে চেয়েছিলাম।

—চুরি করার জন্যে?

—হ্যাঁ স্যার, এই জন্যেই আপনার সঙ্গে বেইমানী করেছিলাম।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে পি. কে. কেবল তাকিয়ে থাকেন অভয়ের মুখের দিকে।

হঠাৎ অভয় তার গায়ের কাপড়টা সরিয়ে ফেলতেই বিস্ময়ে থ হয়ে যান পি. কে.। অভয়ের বুকের সঙ্গে লেপটে রয়েছে পাঁচ-ছয় মাসের অস্থিচর্মসার একটি শিশু। শিশুটির চোখ দুটি বোজা। একখানি হাত ঝুলে রয়েছে একপাশে। দেহটি রুগ্ন হলেও শিশুটির মুখখানা কিন্তু ঢলঢলে, যেন অভয়ের গায়ের সঙ্গে লেপটে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে রয়েছে শিশুটি।

পি. কে. কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই অকস্মাৎ ডুকরে কেঁদে ওঠে অভয়। উবু হয়ে বসে শিশুটিকে মেঝেয় নামিয়ে রাখতে রাখতে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলতে থাকে, বলতে পারেন স্যার, এত চেষ্টা করেও আমার এই খোকাটাকে বাঁচাতে পারলাম না কেন? ওর চিকিৎসার জন্যেই তো চুরি করেছি, ওর জন্যেই তো আপনার সঙ্গে বেইমানী করে জামিনে ছাড়া পেয়ে পালিয়েছি, ওর জন্যেই তো পর পর চুরি করে প্রতিটি পয়সা দিয়ে ওর চিকিৎসার খরচ

চালিয়েছি। তবে কেন ওকে বাঁচাতে পারলাম না স্যার? কেন—কেন বাঁচাতে পারলাম না ওকে?

পি. কে. আর একটি কথাও জিজ্ঞেস করতে পারেন না। বিস্ময়ের চরমে পৌঁছে তিনি যেন বোবা হয়ে গেছেন।

পি. কে.কে চুপ করে থাকতে দেখে অভয় ঠিক তেমনি সুরে বলতে থাকে, আপনি না বললেও আমি জানি কেন এমন হলো। আপনার সঙ্গে আমি বেইমানী করেছি বলেই আমার খোকাও আমার সঙ্গে এমনি বেইমানী করে চলে গেল। এত চেষ্টা করেও ওকে রাখতে পারলাম না আমি।

একপাশে চেয়ারে সাব্ ডিভিশনাল পুলিস অফিসার পি. কে., অন্যপাশে মাটিতে উবু হয়ে বসে অভয়। মাঝখানে একটি শিশুর মৃতদেহ। অভয়ের দু'গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে চোখের জল। দৃষ্টি তার শিশুটির মুখের দিকে।

এক সময় পি. কে. ধীরে ধীরে বললেন, এবার ওঠো অভয়। শ্মশানে নিয়ে যাও তোমার ছেলেকে।

চমকে উঠে অভয় বললে, কি বললেন স্যার? ছেলেকে শ্মশানে নিয়ে যাবো? হ্যাঁ—হ্যাঁ, শ্মশানে তো যেতে হবেই। কিন্তু এতদিন পরে আমাকে হাতে পেয়েও কি ছেড়ে দেবেন, স্যার? আবার যদি আমি পালিয়ে যাই?

অভিভূত কণ্ঠে জবাব দেন পি. কে., না অভয়। আমি জানি তুমি আর পালাবে না—তুমি আর পালাতে পারো না।

● পালোয়ান—

বল্ডহীন হেয়ার টনিক
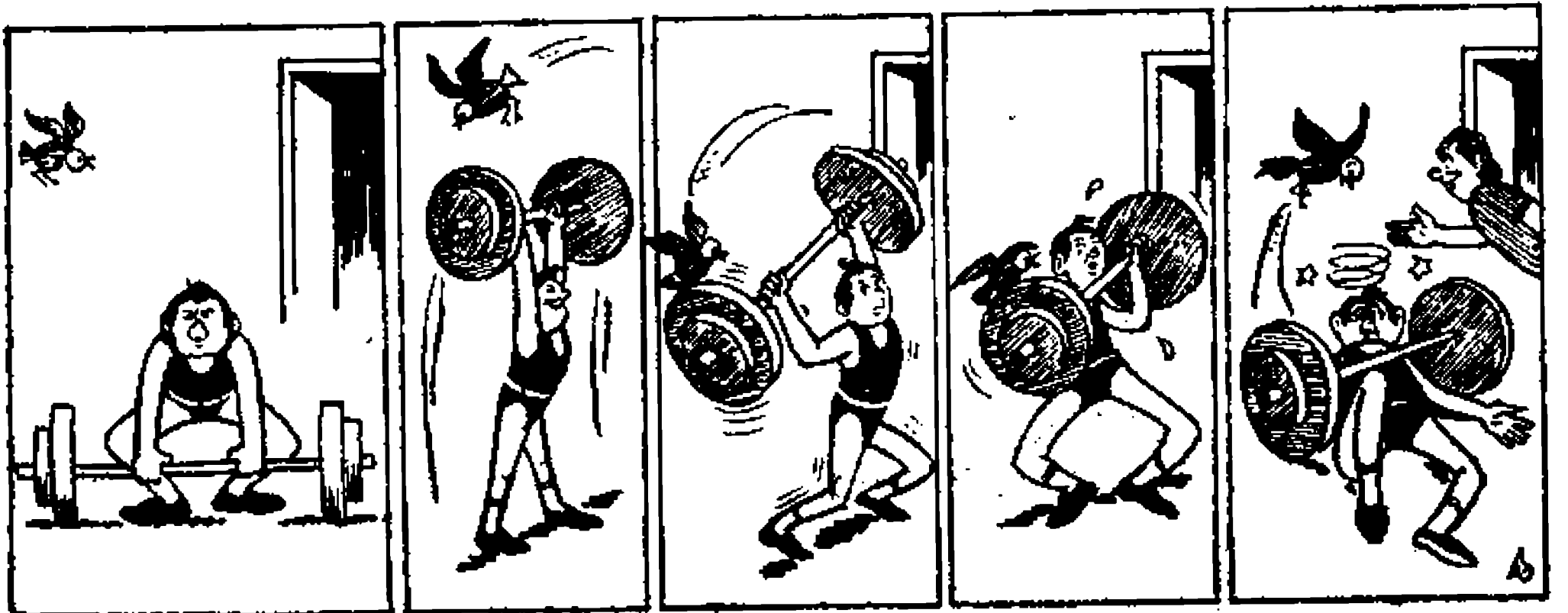
—কুমারেশ ঘোষ

সেদিন রাস্তায় হঠাৎ নন্তেদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দেখলাম, নন্তেদা বেশ গম্ভীর। অথচ নন্তেদা সব সময়েই বেশ হাসিখুশি ভাব নিয়েই থাকে, আর বেশ খোস-মেজাজী। চিন্তিত হয়েই জিগ্যেস করলাম, নন্তেদা, তোমাকে এমন মনমরা দেখাচ্চে কেন? মনে হচ্চে, তুমি যেন অন্যমনস্ক, কী নিয়ে ভাবচো। কী ব্যাপার?

নন্তেদা একটু ম্লান হেসে বললো, ধরেচিস ঠিকই। মনটা ভাল নেই। একটা টেম্পোরারী চাকরি করছিলাম, জবাব হয়ে গেচে। তাই ভাবচি আর চাকরি-বাকরি করবো না। এবার নিজেই কিছু করবার চেষ্টা করবো। তাছাড়া আজকাল নতুন কোন ব্যবসা করতে গেলে গভর্নমেন্ট থেকে ব্যাঙ্ক থেকেও টাকা পাওয়া যাচ্চে।

—তা, কী ব্যবসা করবে ঠিক করেচো? জিগ্যেস করলাম।

—ভাবচি একটি তেল বাজারে বার করবো।

—তেল? কিসের তেল নন্তেদা? নারকেলের তেল, সুবাসিত নারকেল তেল বা তিল তেল?

—না, না। নন্তেদা বললো, ওসব কিছু নয়। ও রকম তেল তো বাজারে ছেয়ে আছে।

—তবে।

—টাকের তেল তৈরি করবো।

—টাকের তেল?

—হ্যাঁ, টাকে চুল গজাবার তেল। মেডিকেটেড হেয়ার অয়েল বা টনিক। একটা নামও তার ঠিক করে ফেলেচি।

জিগ্যেস করলাম, কী নাম?

নন্তেদা গম্ভীর হয়ে জবাব দিলো, বল্ড-উইন হেয়ার টনিক। মানে বল্ডহেড বা টাক মাথাকে যে তেল উইন করবে বা জিতে নেবে। আর তেল বা অয়েল না বলে বলবো টনিক। বেশ একটি ওষুধ ওষুধ ভাব থাকবে। তাছাড়া জানিস তো, বল্ডউইন নামে ইংল্যাণ্ডে এক প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন। কাজেই নামটা খুব জোরদার হবে। কী বলিস?

হেসে বললাম, তা মন্দ বলোনি নন্তেদা। আর জানো তো, রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারী সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর মস্ত টাক ছিলো, তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আদর করে ডাকতেন 'বল্ডউইন' বলে।

—জানি। নন্তেদা বললো, আর জানিস, এই নিয়ে একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল একবার?

—না, জানিনে তো। স্বীকার করলাম।

সবজান্তা নন্তেদা আবার একটু হেসে বললেন, একদিন কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথ সুধাকান্তকে বললেন, দ্যাখ বল্ডউইন, আমার বয়স হয়েছে তাই চুলগুলো পেকে সাদা হয়ে গেচে, তবুও আমার মাথায় কত ঘন কোঁকড়ানো চুল, আর তোর মাথাটা একেবারে টাকে ভরতি। লোকসমাজে তোকে আমার সেক্রেটারী বলে পরিচয় দিতেও লজ্জা করে। তোকে আমি সেক্রেটারীর পদ থেকে ডিসমিস করে দেবো। শুনে সুধাকান্ত নিজের টাক চুলকে বললেন, গুরুদেব, আপনি ঠিক কথাই বলেচেন। তবে শুনুন, এই টাক আমার পৈতৃক সম্পত্তি। আমার বাবার মাথায় টাক ছিল, ঠাকুর্দার মাথায়ও ছিল শুনেচি। আর তাছাড়া, আপনি জানেন তো, আমি টাকির জমিদার রায়চৌধুরী বংশের ছেলে। কাজেই আমার মাথায় টাক তো থাকবেই। এই টাকই আমাদের বংশের গৌরব, ঐতিহ্য। শুনে রবীন্দ্রনাথ আর জবাব দিতে পারলেন না, হেসে বললেন, যাক, তোর চাকরিটা রয়ে গেল দেখচি!

শুনে বললাম, বাঃ, চমৎকার মজার গল্প তো। তারপরেই বললাম, আচ্ছা, নন্তেদা, তুমি হঠাৎ এত রকম ব্যবসা থাকতে টাকের ওষুধ বা তেল তৈরি করবে ঠিক করলে কেন?

নন্তেদা বললো, অনেক ভেবেচিন্তেই এই ব্যবসায় নামবো ঠিক করেচি। দ্যাখ, ভেবে দেখলাম, টাকা কাদের হয়? বড়লোকদেরই, যাদের টাকা আছে। গরিব কুলী-মজুরদের মাথায় টাক দেখেচিস? কাজেই বড়লোকেরাই তাদের টাকের জন্যে টাকা খরচ করতে পারবে আর করেও থাকে। কাজেই এই ব্যবসাই সহজে ফুলে ফেঁপে উঠবে। তাছাড়া অল্প বয়েসে কারোর টাক হলে সে তো উঠে-পড়ে লাগবে টাকে চুল গজাবার জন্যে!

হেসে বললাম, যাক, মতলব করেচো ভালই।

তারপর কয়েক বছর আমাকে বাইরে থাকতে হলো, জব্বলপুরে। অফিসের কাজে। চিঠিপত্রের মাধ্যমেই কলকাতায় সামান্য যোগাযোগ ছিল। নন্তেদার খবরও জানা ছিল না। নন্তেদা তাঁর বল্ডউইন হেয়ার টনিক বার করেচে কিনা কে জানে! আর করে থাকলেও কেমন চলচে তাও জানতাম না। আর জব্বলপুরে বাংলা খবরের কাগজ মাঝে মাঝে যা চোখে পড়তো, তাতে সেরকম কোন টাকের ওষুধের বিজ্ঞাপনও দেখা যেতো না। শুনেচি এ ধরনের কোন ওষুধ বা তেল বার করলে, প্রচারের জন্যে বেশ কিছু টাকা বিজ্ঞাপনে খরচ করতে হয়। লোককে জানাতে হয়। জিনিসের প্রশংসা করে জনসাধারণের কাছে প্রচার করতে হয়। নইলে লোকে জানবে কী করে?

একটা ছাপান লেবেল আমার হাতে দিয়ে বললো, ওতেই সব ন্যাকা আছে। [পৃ. ১৬০

তোমরা দেখোনি সব বিজ্ঞাপন? কেবল আত্মপ্রচার। ভাবটা, ওগো, এমন জিনিস আর হয় না। এসো, তোমরা কেনো। না কিনলে ঠকবে। পরে হাত কামড়াতে হবে। ইত্যাদি।

নন্তেদা সেরকম কোন বিজ্ঞাপন, কই দিচ্চেন না তো? না কি, শেষ পর্যন্ত তাঁর বদলে গেচে মতটা?

তাই পরে একবার যখন কলকাতায় এলাম, তখন সময় করে একদিন গেলাম নন্তেদার বাড়িতে। তবে নন্তেদার দেখা পেলাম না। বাড়ির চাকরটা বললো, এজ্ঞে, বাবু তো এখন বেশির ভাগ সময় দোকানেই থাকেন।

জিগ্যেস করলাম, কোন্ দোকানে?

—এজ্ঞে তার নিজের দোকানে।

—কিসের দোকান।

চাকরটা হেসে মাথা চুলকে বললো, এজ্ঞে, টেকের তেলের দোকান।

ও, তাহলে নন্তেদা টাকের তেল বার করেচে!

জিগ্যেস করলাম, তা বাবুর টাকের তেল কোথায় তৈরী হয়?

—কেন, বাড়িতেই। আসেন না, দ্যাখেন না?

চাকরটা আমাকে চিনতো। কাজেই বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে দেখালো, উঠোনে কাঁচের বড়

বড় জার, ড্রাম, শিশি, বোতল, ছিপি, প্যাকিং বাক্স, খড় ইত্যাদি। আর একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে দেখালো সে, দু' তিন জন স্ত্রীলোক আর দু'টি ছোট ছেলে মেঝেয় বসে শিশিতে তেল ভরচে, ছিপি আঁটচে, লেবেল লাগাচ্চে!

বটে! কারবার যেন ভালই চলচে মনে হলো।

চাকরটা একগাল হেসে বললো, কেমন দ্যাখলেন বাবু?

হেসে বললাম, ভালই। তা তোমার বাবুর দোকানের ঠিকানাটা আমাকে দাও তো। সেখানেই দেখা করবো।

দাঁড়ান, দিচ্চি। বলেই একটা ছাপান লেবেল আমার হাতে দিয়ে বললো, ওতেই সব ন্যাকা আছে।

পড়ে দেখলাম, কাগজটায় লেখা ঃ সন্ন্যাসীপ্রদত্ত বল্ডউইন হেয়ার টনিক। গ্যারান্টিযুক্ত। যে কোন প্রকার টাকের উপযুক্ত মহৌষধ। বল্ডউইন কেমিক্যাল ওয়ার্কস। আর দেখলাম, মহাত্মা গান্ধী রোডের ঠিকানা। কাগজটা পকেটে পুরে নিয়ে বললাম, আচ্ছা, চলি। নন্তেদাকে বলো আমি এসেছিলাম, দোকানেই দেখা করবো।

চাকরটা হেসে বললো, আচ্ছা। তা বাবু, একটু চা খাবেননি?

—না, দেরি হয়ে যাবে। চলি।

পথে যেতে যেতে ভাবলাম, নন্তেদা তা হলে ভালই ব্যবসা করচে। আর বাড়িটাকে দিব্যি কারখানা বানিয়ে ফেলেচে। তা কোন তো অসুবিধে নেই। বিয়ে থা করেনি। থাকার মধ্যে বুড়ী মা, আর ভাই বোন কেউ নেই, কাজেই বাড়িটা তো তারই হবে পরে। আগে থেকেই তার সদ্ব্যবহার করচে।

সেদিন আর নন্তেদার দোকানে যাওয়া হলো না। আমার একটা অন্য কাজ ছিল। গেলাম পরদিন।

দেখি, বেশ সাজানো-গোছানো দোকান। বাইরে সাইন বোর্ড। ভেতরে আলমারিতে বল্ডউইন হেয়ার টনিকের সব ওষুধের শিশি সাজানো। আর সেল-কাউন্টারে এক মোটা গোছের তরুণী দাঁড়িয়ে। গায়ের রং ফরসা। তার পাশেই দাঁড়িয়ে নন্তেদা কী যেন বলচে মেয়েটিকে।

আমাকে দেখেই নন্তেদা চেঁচিয়ে উঠলো, আরে তুই এখানে? কবে এলি? দোকানের ঠিকানা কোথায় পেলি?

একসঙ্গে তার এতগুলো প্রশ্নের জবাব এক-এক করে দিয়ে বললাম, তা তোমার টাকের ওষুধের কারবার তো ভালই চলচে দেখচি।

নন্তেদা বললো, এই চলচে একরকম। আয়, আয়, ভেতরে আয়।

নন্তেদা সেল-কাউন্টারের পেছনে তার টেবিলের সামনের চেয়ারটায় বসালো আমাকে নিজেও বসলো তার চেয়ারে। বললো, তারপর বল কেমন আচিস?

—ভালই। কলকাতায় এলাম, তাই ভাবলাম, তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। যাক, তাহলে শেষ পর্যন্ত যা বলেছিলে, তাই করলে। ভালই।

নন্তেদা হেসে বললো, কেন, তোর নন্তেদাকে এখনও চিনিসনি বুঝি? একে বলে, মরদকা বাৎ হাত্তিকা লাথ। বুঝলি?

বললাম, তা তোমাদের এই বল্ডউইন হেয়ার টনিকের বিজ্ঞাপন দাও না কাগজে?

—দিতাম। তবে এখন তেমন দিই না। খুব চালু হয়ে গেচে। অবশ্য মাঝে মাঝে দিতে হয়।

কথা বলতে-বলতে দেখলাম, কয়েকজন খদ্দের সেল-কাউন্টারে এসে ঐ সেলস-গার্লটির কাছ থেকে টাকের তেল কিনে নিয়ে গেল। কেউ এক শিশি, কেউ দু' শিশি। বাইরের এক দোকানদার আধ ডজন কিনলো একসঙ্গে।

নন্তেদা তাদের দিকে আড়চোখে দেখে নিয়ে, আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপে নীচু গলায় বললো, দেখচিস তো?

—দেখলাম। পরে বললাম, আচ্ছা নন্তেদা, সেল-কাউন্টারে ঐ মেয়েটিকে রেখেচো কেন? কোন ছেলেকে রাখলেও তো পারতে?

—কারণ আছে। নন্তেদা বললো হেসে, সেলস-গার্লের জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। অনেক মেয়ে এসেছিলো চাকরির জন্যে। পরে বেছে ঐ মেয়েটিকেই রেখেচি।

—কেন, খুব ভাল বিক্রী-টিক্রি করতে পারে বুঝি?

—না, তা নয়।

—তবে?

—অনেক সময় বেকায়দায় পড়লে, ঐ মেয়েটিই তখন উদ্ধার করে আমাকে।

কথাটা শুনে কৌতূহলী হলাম। বললাম, তোমার কথাটি বুঝলাম না ঠিক। কোন খদ্দের এসে গোলমাল করলে তখন তো কোন পুরুষ মানুষেরই দরকার হয়।

—তা হয়। বলেই নন্তেদা হেসে বললো, কেন জানিসনে, মা দুর্গা মেয়েমানুষ, আর তাঁকে বলা হয় দুর্গতিনাশিনী? মেয়েরাই তো শক্তিরূপিণী।

বললাম, তা বটে। তবে মনে হচ্ছে, তুমি কিছু চেপে যাচ্চো।

নন্তেদা বললো, তা যদি মনে করিস তো তাই-ই। মনে কর্ বিজনেস সিক্রেট। সবাইকে কি সব কথা বলা যায়?

শুনে একটু অভিমান করেই বললাম, বিশ্বাস না হয় তো দরকার নেই বলবার।

উঠতে যাচ্ছিলাম, আচ্ছা, চলি এখন।

—না, না বোস। নন্তেদা যেন থাবা মেরে বসিয়ে দিলো, এই এলি, এখনি যাবি কেন? কত দিন পরে দেখা বল? একটু চা খেয়ে যা—

এমন সময় এক ভদ্রলোক দোকানে ঢুকলেন। মাঝারি বয়েস। মাথায় বিরাট টাক। আর একজোড়া মোটা গোঁফ।

সেল-কাউন্টারে এসে মেয়েটিকে বললেন, কই দেখি, টাকে চুল গজাবার কী ওষুধ আছে আপনাদের।

মেয়েটি একটি শিশি বার করে ভদ্রলোককে দিলেন।

ভদ্রলোক শিশিটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললেন, এমন গ্যারাণ্টি-ফ্যারাণ্টি তো অনেকেই লেখে, কিন্তু সত্যিই কি চুল গজাবে টাকে?

—দেখুন না ব্যবহার করে! মেয়েটি হেসে উত্তর দিলো।

ভদ্রলোক জবাবে বললেন, অনেকরকম তেল ওষুধ ব্যবহার করেচি এই টাকে। কিসসু হয়নি। বহু টাকা খরচ করেচি এজন্যে। সব জলে গেচে। তবু আপনাদের বল্ডউইন হেয়ার টনিকের কথা শুনে ভাবলাম, যাই একবার দেখে আসি। তা দেখুন, আপনাদের এই এক শিশি কিনতে পারি—কিন্তু কোন ফল না হলে টাকা কিন্তু ফেরত দিতে হবে।

মেয়েটি বললে, আগে ব্যবহার করেই দেখুন না, অত অবিশ্বাস করচেন কেন?

বেশ কথা কাটাকাটি হচ্চে দেখে নন্তেদা তার চেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে সেল-কাউন্টারের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন মেয়েটির পাশে। কী হয় দেখবার জন্যে আমিও নন্তেদার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ভদ্রলোক বললেন, অমন বাজে বাগুলো মারে সবাই। আমি অমন ঢের দেখেচি।

এবার উত্তর দিলো নন্তেদা। বললো, আপনি তো দেখচি মশায় ঝগড়া করতে এসেচেন। আমাদের হেয়ার টনিক ব্যবহারই করলেন না, অথচ—

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক বললেন, বিশ্বাস করে অনেক ঠকেচি। অনেক টাকা জলে দিয়েচি। তাই আর এইসব ওষুধে বিশ্বাস করতে মন চায় না।

—বেশ, আপনি যাতে বিশ্বাস করেন, তার প্রমাণ আমি এখনি দিচ্চি—নন্তেদা কথাটি জোর গলায় বললেন।

শুনে ভদ্রলোক একটু অবাক্ হলেন। আমিও।

নন্তেদা বলে কি? এখুনি প্রমাণ দেবে?

নন্তেদা পাশের সেলস-গার্লটিকে দেখিয়ে বললো, আপনি এই মেয়েটিকে দেখচেন?

ভদ্রলোক একটু রাগত সুরে বললেন, দেখতে পাচ্চি বৈকি! কানা তো নই। আর জলজ্যান্ত যখন দাঁড়িয়ে আছেন।

নন্তেদা বললো, বেশ ভাল করে দেখুন।

থতমত খেয়ে ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ, দেখচি তো। ভাল করেই দেখচি।

—কী দেখচেন?

ভদ্রলোক আবার একটু রেগে বললেন, কী আবার দেখবো, একটি মেয়েকে দেখচি। হ্যাঁ মশায়, আপনি কী বলতে চান, আমি এখানে বিয়ের জন্যে মেয়ে দেখতে এসেচি?

নন্তেদা হেসে বললেন, না, না। আমরাও এই মেয়েটিকে কারোর সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে

এখানে দাঁড় করিয়ে রাখিনি। এই মেয়েটি আমাদের সেলস-গার্ল হলেও নট ফর সেল।

ভদ্রলোক এবার অধৈর্য হয়ে বললেন, আপনি কী বলতে চান বলুন তো খুলে।

নন্তেদা বললো, আমি বলতে চাই মেয়েটিকে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখুন। আচ্ছা, মেয়েদের কখনও গোঁফ গজায় দেখেচেন?

—না। ভদ্রলোক থতমত খেয়ে বললেন।

—কিন্তু এ মেয়েটির কী দেখচেন? জেরা করলো নন্তেদা।

—অল্প অল্প গোঁফের রেখা।

হ্যাঁ, তাইতো।—আমিও লক্ষ্য করে দেখলাম।

—ঠিক ধরেচেন। আরো বেশী রকম গোঁফ হয়ে যেতো। ভাগ্যিস—

নন্তেদা সেল্‌স্ গার্লটিকে দেখিয়ে বললো, আপনি এই মেয়েটিকে দেখচেন? [পৃ. ১৬২

ভদ্রলোক অবাক্ হয়ে জিগ্যেস করলেন, তা আপনাদের হেয়ার টনিকের সঙ্গে ওঁর ঐ গোঁফের রেখার কী সম্বন্ধ?

—আছে মশায় আছে। নন্তেদা বললো, আমাদের হেয়ার টনিকের শিশির ছিপিটা একদিন ঐ মেয়েটি তার দাঁতে চেপে খুলতে গেছলো। আর ব্যস, ছিপি হঠাৎ খুলে গিয়ে দু'চার ফোঁটা ওর ঠোঁটের ওপরে ছিটকে পড়লো। আর তার দুদিন পরেই ঐ কাণ্ড! ওখানে চুল গজিয়ে গেল। আমার কথা বিশ্বাস না হয় তো ওকে শুধুন।

শুনে ভদ্রলোক হতভম্ব! আমিও তাই। এ্যাঁ!

ভদ্রলোক মেয়েটিকে জিগ্যেস করলেন, তাই নাকি?

উত্তরে মেয়েটি মিষ্টি হাসলো। অর্থাৎ, হ্যাঁ। তখনি ভদ্রলোক টাকা বার করে বললেন, দিন আমাকে তিন শিশি!

নন্তেদা আর সেখানে না দাঁড়িয়ে আমার হাত ধরে টেনে চেয়ারে বসিয়ে বললো, বোস, চা খাবি।

আমার তখন মাথা ঘুরচে।

সোনা আর চুনীর শহরে

—অদ্রীশ বর্ধন

আজ থেকে ২০০ বছর পরে কি তেপায়া রোবটরা রাজত্ব করবে পৃথিবীতে?

ক্যামেরার তিন-পায়া স্ট্যাণ্ডের মাথায় যদি একটা বাটি উপুড় করে বসানো হয় এবং সেই বাটির গায়ে সারিসারি জানলা থাকে। তা তার নীচ থেকে তিনটে ধাতুর শুঁড় কিলবিল করে ঝুলতে থাকে নীচে—তাহলে যে জিনিস দাঁড়ায় ত্রিপদ দানোকে দেখতে অবিকল তাই। শুধু যা আকারে বড়। বেজায় বড়। বারোতলা বাড়ির সমান।
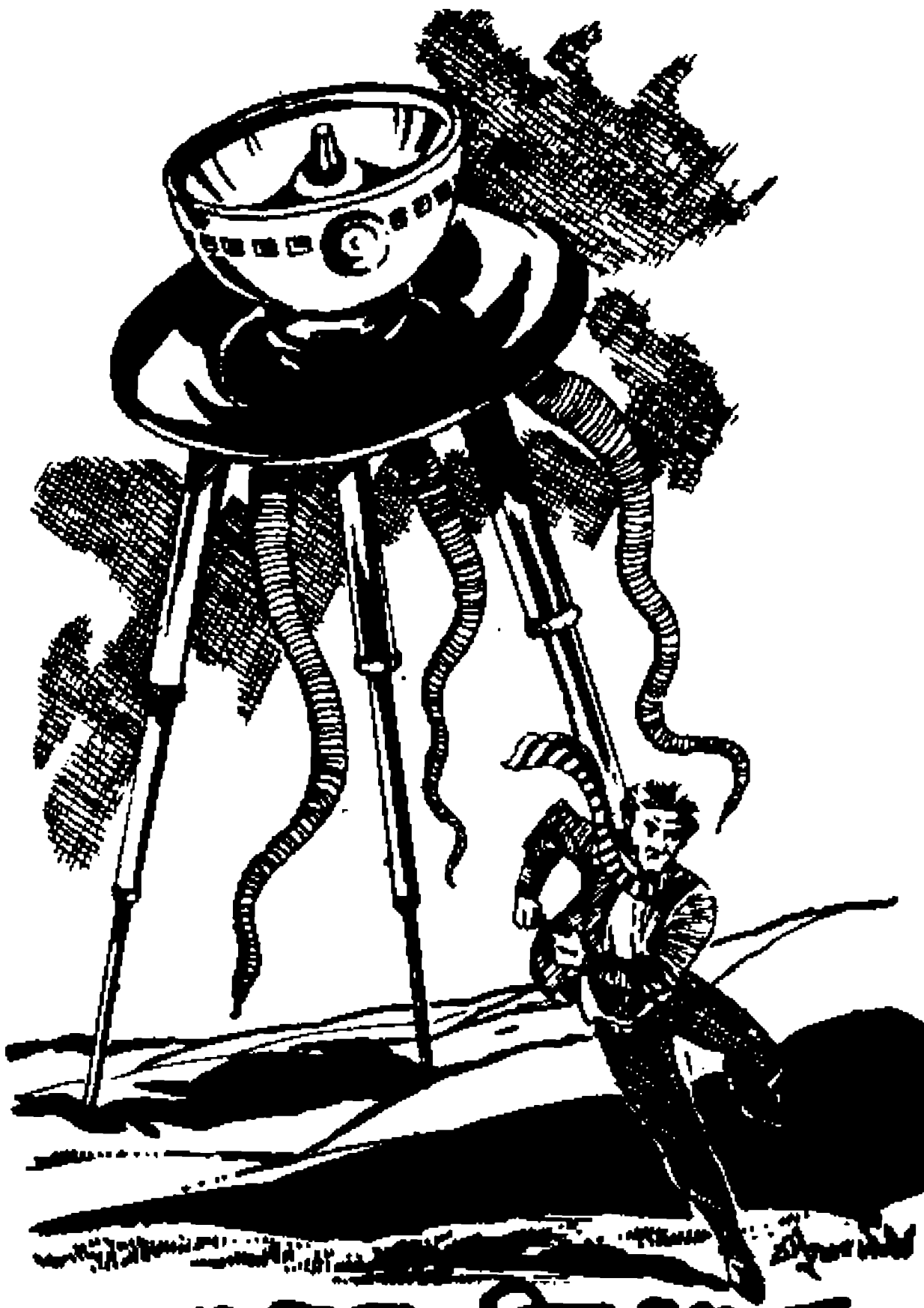
প্রতিটি ধাতুর পায়ে তিন ভাগে তিনটে কবজা অর্থাৎ হাঁটু। সেই হাঁটু ভেঙে অদ্ভুতভাবে টলমল করতে করতে ত্রিপদ দানো তেড়ে এল আমার দিকে। কিলবিলে শুঁড় তিনটের একটা আর একটু হলে ধরে ফেলত আমাকে। কিন্তু এক হ্যাঁচকায় প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র আমাকে টেনে নিলেন টাইম মেসিনের মধ্যে। ঝাঁ করে মেসিন চালিয়ে বোঁ করে আমরা মিলিয়ে গেলাম বাতাসে। ত্রিপদ দানোর শুঁড়টা যেন বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল আমাদের ওপর দিয়ে—ধরতে পারল না।

কপালের ঘাম মুছে বললাম—"প্রফেসর, এ কোথায় এলাম?"

"ভবিষ্যতে"। বললেন প্রফেসর।

হ্যাঁ, ভবিষ্যতে। পৃথিবীর ভবিষ্যতে। টাইম মেসিন বানিয়েই প্রথমে অতীতে ঘুরে এসেছিলাম আমি আর প্রফেসর। তারপর পালিয়ে এলাম ভবিষ্যতে।

কিন্তু পালিয়ে এসে একি চেহারা দেখলাম পৃথিবীর? টাইম মেসিন থেকে নেমে প্রথমে

দেখেছিলাম অনেক দূরে একটা গোল গম্বুজ। যেন টকটকে লাল চুনীপাথর দিয়ে ছাওয়া একটা গোল গম্বুজ। তলায় সোনার রিং। সূর্যের আলো রক্তরশ্মি হয়ে ছিটকে যাচ্ছে সেই গম্বুজের মাথা থেকে—ঝকঝক করছে সোনালী পাঁচিল। চারপাশে কিছু নেই। ফাঁকা মাঠ। মাইল কয়েক শুধুই প্রান্তর। মাটি ফুঁড়ে উঠে এসেছে একটা নদী। জলধারা প্রান্তরের ওপর দিয়ে এসে অদৃশ্য হয়েছে চুনী গম্বুজের মধ্যে। চারিদিক নিঝুম, নিস্তব্ধ, থমথমে।

এই পর্যন্ত দেখার পরেই হাওয়ায় একটা আলোড়ন অনুভব করেছিলাম। মনে হল পায়ের তলায় মাটি যেন কাঁপছে। চাপা ধুপধাপ আওয়াজ ভেসে এল কানে। ঘাড় ফিরিয়েই দেখলাম ত্রিপদ ধাতব-দানোকে! অদ্ভুতভাবে দৌড়ে আসছে—কিন্তু বেশ বেগে!

তারপরের ঘটনা আগেই বলেছি।

প্রফেসর ভুরু কুঁচকে যন্ত্রপাতির দিকে চেয়েছিলেন। একমাস এগিয়ে গেলাম। মানে, আরো একমাস ভবিষ্যতে গিয়ে আবার মেসিন থামালাম। থামিয়েই আশেপাশে দেখে নিলাম কেউ আছে কিনা। না, সেই কিম্ভূতকিমাকার মেট্যাল রোবটগুলো ধারে কাছে নেই বটে—তবে দূরে দূরে আছে। অনেক দূরে দেখলাম রক্তলাল গম্বুজটার তিন দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনটে বারোতলা উঁচু দানব।

টাইম মেসিন থেকে নামলাম। লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে দেখছি ধাতুর রাক্ষসদের, এমন সময়ে আমার পায়ের তলা থেকে উঠে দাঁড়াল একটি ছেলে। মাথায় লাল রঙের ধাতুর টুপি খুলির ওপর এঁটে বসানো। চোখ দুটো ছুরির মত তীক্ষ্ণ। পরনে ময়লা জামা আর হাফপ্যান্ট। চোখের কোলে কালি। কিন্তু খুব মজবুত গাঁট্টাগোট্টা শরীর। মাথায় বেঁটে হলেও বয়সে আমার সমান।

অবাক্ হয়ে ছেলেটা আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে চাপা গলায় কি যেন বলল। একবর্ণ বুঝলাম না। কিন্তু জবাব দিলেন প্রফেসর। উনি যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন খেয়াল করিনি। সেই অদ্ভুত ভাষাতে কথা বলতেই ছেলেটি তাঁর দিকে ঘুরে দাঁড়াল। হাসি-হাসি ফোকলা মুখের পানে সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে কি বলতেই প্রফেসর হাত তুলে লম্বা ঘাসের আড়ালে প্রায়-অদৃশ্য টাইম মেসিনটা দেখালেন। অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল ছেলেটি। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সেইদিকে।

সেই ফাঁকে প্রফেসর তোবড়ানো গাল আরো তুবড়ে হাসলেন আমার দিকে চেয়ে। বললেন খাটো গলায়—"স্প্যানিশ বলছে ছেলেটা। স্পেনের ছেলে।"

"স্পেনের ছেলে! এখানে কেন?"

"সেইটাই জানতে চাই।" বলে ছেলেটার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন প্রফেসর। লাল ধাতুর টুপিতে হাত বুলোতে বুলোতে ছেলেটা তখনও হাঁ করে তাকিয়ে আছে টাইম মেসিনের দিকে। যেন এমন কলকবজা জন্মে দেখেনি।

মৃদু কণ্ঠে কথা শুরু করলেন প্রফেসর। পরে শুনেছিলাম, উনি বুঝিয়ে বলছিলেন টাইম মেসিন কাকে বলে। এ মেসিনে চেপে ইচ্ছেমত অতীতে বা ভবিষ্যতে কিভাবে বেড়িয়ে আসা যায়। মাথার ওপরে হেলিকপটারের মত ঐ পাখা চালিয়ে আকাশপথে যেখানে খুশী যাওয়া যায়। তলার ঐ

প্যাড জলে ভাসে—দরকার মত হোভারক্র্যাফটয়ের স্পীডে জল কেটে এগোতেও পারে।

এই পর্যন্ত শুনেই ছেলেটি চকিতে চোখে দূরের ত্রিপদ রোবট আর আকাশের সূর্যের দিকে আঙুলে দ্রুতস্বরে কি বলতেই প্রফেসর ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন—দীননাথ এসো, দিনের বেলা এ জায়গা নিরাপদ নয়। বারো ঘণ্টা এগিয়ে যাই। রাত্রিরে পৌঁছে এদের ঘাঁটিতে উড়ে যাবো।"

বোবা হয়ে মেসিনে উঠে বসলাম। সঙ্গে ছেলেটা। বুঝলাম, ভবিষ্যতের পৃথিবীতে তিন-ঠেঙে ঐ বারোতলা কলের দৈত্যদের দেখে কেন মানুষ এত ভয়ে জুজু হয়ে আছে, সে রহস্য এবার জানা যাবে।

মেসিন চালিয়ে বারো ঘণ্টা আরো ভবিষ্যতে গেলাম। মানে, হঠাৎ রাত হয়ে গেল—সূর্য চক্ষের নিমেষে ডুবে গেল। ত্রিপদ দানোদের আর দেখতে পেলাম না।

ছেলেটির সঙ্গে স্প্যানিশ ভাষাতেই বেশ গল্প করছেন প্রফেসর। বুড়োর বিদ্যে অনেক। বড় বৈজ্ঞানিকই শুধু নন—ভাষাবিদ্‌ও বটে। অথচ বাইরে থেকে দেখে মনে হয় পাগল-ছাগল কেউ হবে।

ঘটাংঘট করে সুইচ টিপে দিলেন প্রফেসর। ভ্রমর-গুঞ্জন শুনলাম মাথার ওপর। প্রপেলার ঘুরছে। সোজা মেঘের কোলে উড়ে গেল টাইম মেসিন। ছুটে চলল পুবদিকে। সমস্ত রাত উড়ে গিয়ে ভোরের দিকে যেখানে নামল তার চারধারে পাহাড়ের পাঁচিল। কালো পাহাড়। মাঝখানে অজস্র গুহা। পিলপিল করে অনেক ছেলে বেরিয়ে এল সেই সব গুহা থেকে মেসিনের আওয়াজে। হাতে পাথর আর লাঠি। চোখে ভয় আর বিস্ময়। কিন্তু চারদিক থেকে ঘিরে ধরল মারমুখো ভঙ্গিমায়। লাফ দিয়ে নামল স্প্যানিশ ছেলেটা। ছুটে গেল তাদের দিকে।

প্রফেসর ইঞ্জিন বন্ধ করে আমাকে বললেন—"এই হল কালো পাহাড়। এদের ঘাঁটি। পৃথিবীর বুদ্ধিওলা ছেলেদের একমাত্র ঘাঁটি। এইখান থেকেই ওরা প্ল্যান করছে প্লায়াডিস আতঙ্কদের ধ্বংস করার।"

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। একটা বর্ণও বুঝতে পারলাম না। পরে প্রফেসরই বুঝিয়ে দিলেন প্লায়াডিস আতঙ্ক কারা, লালরঙের ঐ গম্বুজটা কিসের এবং তেপায়া রোবট কাদের অনুচর। তার আগে অবশ্য দেশ-বিদেশের নানা রঙের নানা মুখের ছেলেরা হইহই করে আমাদের নিয়ে গেল একটা গুহায়।

সব কথা শুনলাম প্রফেসরের মুখে, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারলাম না। মন কিছুতেই মানতে চাইল না সেই ভয়াবহ সত্য। এ কি সম্ভব? আমরা মাত্র দু'শ বছর এগিয়েছি বিংশ শতাব্দী থেকে। কিন্তু এই দু'শ বছরের মধ্যেই পৃথিবীকে পদানত করেছে অন্য গ্রহের জীবরা। তাদের জীবই বলব—কারণ তারা মানুষ নয়। তাদের চোখে কেউ দেখেনি। দেখেছে কেবল এই তেপায়া ভয়ংকরদের। এরাই মানুষ জাতটাকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে আজ একশ' বছর ধরে।

হ্যাঁ, একশ' বছর ধরে। একশ' বছর আগে প্লায়াডিস নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে পৃথিবীতে এসে পৌঁছোলো এই তেপায়া দানবরা। চোদ্দবছর বয়সের ছেলেদের ধরে ধরে মাথায় পরিয়ে দিল লাল টুপি। ধাতুর টুপি। ঐ বয়সের পর খুলি আর বাড়ে না। কিন্তু ধাতুর টুপি এঁটে বসে গেল মাথার মধ্যে। নিজে থেকে আর খোলা যেত না। ও টুপি যাদের মাথায় আছে, তারাই তেপায়া দানবদের হুকুমের দাস। স্বাধীন চিন্তাশক্তি বা ইচ্ছাশক্তি পর্যন্ত নেই। তেপায়া দানবদের মনিব বলে মানে। বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতাও নেই। কারণ, ঐ টুপিগুলো নিছক টুপি নয়—মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র। ঐ টুপির মধ্যে দিয়ে তেপায়া দানবদের ইচ্ছেই মস্তিষ্কের কোষে কোষে সঞ্চারিত হয়ে যেত বেচারীদের—নিজেদেরকে উৎসর্গ করত দানব-সেবায়—জীবন পর্যন্ত দিত মুখটি বুঁজে।

একশ' বছর ধরে এইভাবে ধীরে ধীরে সমস্ত মানুষদের পায়ের তলায় রেখেছে দানবরা। কলের দানব হয়েও রক্তমাংসের মানবদের ক্রীতদাস বানিয়ে রেখেছেন শুধু ব্রেন কন্ট্রোল করে। এই একশ' বছরে তারা তিনটে ঘাঁটি বানিয়েছে ভূমণ্ডলের তিন অঞ্চলে। ঠিক যেন একটা ত্রিভুজের তিন কোণে। এমন একটি ঘাঁটিরই একটি আমরা দেখেছি টাইম মেসিন থেকে নেমেই। সোনার পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, চুনীর মত টকটকে লাল গম্বুজ দিয়ে ঢাকা। ঘাঁটিগুলির মধ্যে কি আছে কেউ দেখেনি। কিন্তু পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের ব্রেন-কন্ট্রোল যে ঘাঁটি তিনটে থেকেই হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই।

লাল গম্বুজের ভেতরে যায় এই তেপায়া দানবরা। আর বছরে একবার যায় কিছু শক্তসামর্থ ছেলে। গম্বুজের সামনে খেলাধুলার আসর বসে। চারিদিকে পাহারা দেয় বারোতলা উঁচু কলের দানোরা। প্রতিযোগিতায় সবাইকে হারিয়ে যারা সেরা হয়, তাদেরকে শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে গম্বুজে ঢুকে যায় দানবরা। আর ফিরিয়ে দেয় না। বছর-বছর অত ছেলে যায় ভেতরে—কিন্তু কেন ফিরে আসে না—সে খবর কেউ রাখে না। রাখার মত ইচ্ছেও মগজে আসে না। কয়েকজনের ছাড়া। এরা তেপায়া দানোদের খপ্পর থেকে পৃথিবীকে বাঁচানোর ফন্দী এঁটেছে। দানোদের ধোঁকা দেওয়ার জন্যে চোদ্দ বছরের আগেই মাথায় নকল টুপি এঁটে নিয়েছে। মিথ্যে টুপি দেখে দানবরাও ধরতে পারে না। তাই এই কজনের ব্রেনের ওপর খবরদারিও হয় না। এরা স্বাধীন চিন্তা করতে পারে।

স্পেনের ছেলেটি এদেরই একজন। কালো পাহাড় এদের গোপন ঘাঁটি। সারা পৃথিবী থেকে এরা জড়ো হয়েছে এই কালোপাহাড়ে। উদ্দেশ্য চোরা গোপ্তা হেনে কলের দানবদের অকেজো করে দেওয়া। ব্রেন-কন্ট্রোলের ঐ রহস্য নিকেতন তিনটে ধ্বংস করে দেওয়া।

তার আগে দরকার রহস্যপুরীর অন্দর দেখে আসা। সে কাজও সমাধা হয়েছে দীর্ঘদিনের চেষ্টায়। ছদ্মটুপিপরা ছেলেরা বাৎসরিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে—প্রথম হয়েছে এবং ভেতরে ঢুকেছে। ধাতুর শুঁড় দিয়ে একে-একে স্বাস্থ্যবান সুন্দরদেহী ছেলেগুলোকে তুলে নিয়েছে তেপায়া দানবরা, মাথার গোলাকার গম্বুজ-খুপরিতে বসিয়েছে এবং অদৃশ্য হয়েছে রহস্যময় চুনীগম্বুজের ভেতরে।

দূর থেকে গম্বুজগুলোকে ছোটই মনে হয়েছিল। কিন্তু কাছে আসার পর দেখা গিয়েছিল এক-

একটা গম্বুজ খানকয়েক গড়ের মাঠের মত বিরাট। শেষ দেখা যায় না—এত বড়। ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে লাল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল ছেলেদের। সেই সঙ্গে মেরুদণ্ড নুয়ে পড়েছিল প্রচণ্ড ভারে। আচমকা ভয়ানক ভারী মনে হয়েছিল নিজেদের—পা পর্যন্ত তোলা যায় নি। কয়েকজন তো ককিয়ে উঠে পড়েই গিয়েছিল। যন্ত্রণার সেই কিন্তু শুরু। কেন না, অসহ্য গরমে মনে হয়েছিল, যেন গা ঝলসে যাচ্ছে। যেন আগুনের হলকা বইছে। শুকনো গরম নয়—তাই ঘেমে-নেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই নেতিয়ে পড়েছিল অমন শক্ত ছেলেরাও।

ওদের নিয়ে যাওয়া হল একটা কামরায়। সেখানে শ্রান্তক্লান্ত একজন বেশী বয়েসের ছেলে এগিয়ে এসে সবাইকে পরিয়ে দিলে নতুন জামা আর প্যাণ্ট। সব লাল রঙের। আর দিলে নাকে পরার জন্যে একরকম প্যাড। এই ঘরের বাইরে গেলেই শুরু হবে দানবদের আসল ঘাঁটি। মালিকরা থাকেন সেখানে। তাঁরা যে বাতাসে নিঃশ্বাস নেন, সে বাতাসে মানুষ বাঁচে না। তাই মালিকদের সেবা করার সময়ে নাকে পরতে হবে এই প্যাড। নিজেদের কোয়ার্টারে ফিরে এলে প্যাড খুলে ফেললেই হবে। গোলামদের কোয়ার্টারের বাতাসে মানুষ বাঁচে।

'গোলাম', 'মালিক', 'সেবা' ইত্যাদি শব্দগুলোর মানে বোঝা গিয়েছিল একটু পরেই। নাকে প্যাড পরিয়ে নিজেদের দেহভারেই নুয়ে পড়া ছেলেগুলোকে মার্চ করিয়ে নিয়ে যাওয়া হল রাস্তা দিয়ে। সোনা আর চুনীর শহর দেখে তাজ্জব হয়ে গেল ছেলেরা। বিশাল শহর। রাস্তাগুলো কখনো সোজা নয়—এঁকেবেঁকে বাড়ির কোণ ঘেঁষে উধাও দূরে অনেক দূরে। বাড়িগুলো সব পিরামিডের মত। রাস্তায় গাড়ি চলছে। পিরামিডের মতন গড়ন গাড়িগুলোর। তলায় চাকা নেই। ঈষৎ কাৎ হয়ে একটিমাত্র কিনারায় ভর দিয়ে যেন পিছলে যাচ্ছে মসৃণ রাস্তা দিয়ে। দম আটকানো গরমে আইঢাই করতে করতে এবং রক্তাভ আলোর মধ্যে কোন মতে আশ্চর্য এই শহর দেখতে দেখতে ওরা এসে পৌঁছোলো বিরাট পিরামিড হলঘরের মধ্যে।

দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল সার বেঁধে। কোমর টনটন করতে লাগল, শিরদাঁড়া যেন ভেঙে পড়তে চাইল, তবু দাঁড়িয়ে রইল ওদের শেষ পরিণতি দেখার জন্যে।

কিন্তু শেষের তখনো দেরি। তাই একটু পরেই সারি দিয়ে যারা ঘরে ঢুকল, অতি বড় দুঃস্বপ্নেও তাদের কল্পনা করা যায় না। কোনো জীব যে এত কদাকার ও কিম্ভুতকিমাকার হতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ছদ্মটুপিপরা ছেলেগুলি চকিতে বুঝে নিলে, তেপায়া কলের দানবদের ভেতরে বসে গাড়ির মত তাদের চালিয়ে নিয়ে যায় কুৎসিতদর্শন এই জীবগুলোই, সোনা আর চুনীর মত লাল গম্বুজ শহরের ভেতরে বসে কোটি কোটি মানুষের মগজ নিয়ন্ত্রণ করছে এই জীবগুলোই। এরাই এসেছে প্লায়াডিস নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে মহাশূন্যের বুক চিরে। পৃথিবীর বাতাস এদের কাছে বিষাক্ত, তাই গম্বুজের মধ্যে বানিয়ে নিয়েছে নিজেদের উপযোগী বাতাস, পৃথিবীর তাপমাত্রা এদের কাছে কনকনে ঠাণ্ডা—তাই গরমের হল্কা ছুটিয়েছে গম্বুজের মধ্যে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণেও এরা অনভ্যস্ত—তাই যান্ত্রিক উপায়ে নিজেদের ওজন বাড়িয়ে রেখেছে গম্বুজের মধ্যে।

কিন্তু কি বীভৎস এক একজনের মূর্তি নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত উঠে গেছে তেকোনা পিরামিডের মতন নীচে থ্যাবড়া—ওপরে সরু। খুব খাটো কচ্ছপের পায়ের মত তিনটে পা আছে দেহের নীচে। বারো ফুট উঁচুতে মাথাটা ফুটখানেক চ্যাপটা। তিনটে চোখ তেকোনা ত্রিভুজের তিনকোণে যেন বসানো। মুখের একটা ফোকর আছে বটে, কিন্তু কথা বলে নাকের ফুটো দিয়ে। ফুট পাঁচেক পরিধি পেটের কাছে—সেখানে তিনটে অজগর সাপের মত শুঁড় ঝুলছে শিথিলভাবে। সারা গায়ে রাশি রাশি লাল আঁচিল শুকনো খসখসে লাল চামড়া।

একজন পিরামিড-জীব শুঁড় দিয়ে ওকে শূন্যে তুলে নিল।

তিনটে শুঁড় শূন্যে দুলিয়ে পিরামিড-জীবরা এসে দাঁড়ালো ছেলেদের সামনে। যাদের মাথায় লাল টুপি সত্যিকারের, তারা যেন বর্তে গেল মালিকদের সেই প্রথম চাক্ষুষ দেখে। শিউরে উঠল তারা যাদের মাথায় ছদ্মটুপি, এদের মধ্যেই ছিল কার্লো—স্পেনের সেই ছেলেটা। পিরামিড জীবদের দেখতে কি রকম, সেই প্রথম জ্যান্ত বেরিয়ে এসে বর্ণনা করল সবাইকে।

রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে সে কয়েক মাসের মধ্যে। কার্লোর সামনে এসেছে মালিকরা—কিন্তু কেউ ওকে পছন্দ করেনি ওর বেঁটে চেহারার জন্যে। ভেবেছে গায়ে জোর নেই। শুঁড় বুলিয়ে দেখেছে—গা শিরশির করেছে কার্লোর—তবুও হাসি-মুখে চেয়ে থেকেছে কৃতার্থ হয়ে যাওয়ার ভঙ্গিমায়। মনে মনে শঙ্কিত হয়েছে, শেষ পর্যন্ত ওর মত অপদার্থকে এরা মেরে ফেলবে না তো? কারোরই তা পছন্দ হচ্ছে না...

সব জাতের ছেলেদের সঙ্গেই তাদের ভাষায় কথা বলতে পারে পিরামিড-জীবরা। কার্লোর সঙ্গেও স্প্যানিশ ভাষায় গুরুগম্ভীর গলায় কথা বলেছে তারা, কিন্তু পছন্দ হয় নি।

খুব যখন মুষড়ে পড়েছে কার্লো, তখন ওর বরাতে শিকে ছিঁড়লো। একজন পিরামিড-জীব শুঁড় দিয়ে ওকে শূন্যে তুলে তিনটে চোখের সামনে এনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললে গমগমে গলায়—"ভারী অদ্ভুত ছেলে তো তুমি! এসো আমার সঙ্গে!"

গোলাম হল কার্লো। কিন্তু বুক কাঁপতে লাগল দারুণ ভয়ে। টুপির তলায় যদি শুঁড়ের ছুঁচালো ডগা ঢুকিয়ে পরখ করে মালিক, তবেই হয়েছে!

কিন্তু সেরকম দুর্ঘটনা তখুনি ঘটল না। ঘটল অনেকদিন পরে। মালিক ধরে ফেলল কার্লোর আসল মতলব কি।

তার আগে অবশ্য পিরামিড জীবদের সম্বন্ধে অনেক দরকারী খবর জেনে নিয়েছিল কার্লো। বেঁটে হলেও তার গাঁটে গাঁটে বুদ্ধি। গায়েতেও দারুণ জোর। গম্বুজের গরম আর সাংঘাতিক ওজন সয়ে গিয়েছিল দুদিনেই। তবে সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর রাত্রে কোয়ার্টারে ফেরার পর অন্যান্য ছেলেগুলোর আধমরা চেহারা দেখেই বুঝেছিল কেন বছর-বছর এত তেজী ছেলেরা ভেতরে আসে—কিন্তু বাইরে আর যায় না। যাবে আর কি করে? এক বছরের বেশী কেউ বাঁচে না। সাংঘাতিক গরম আর মারাত্মক ওজনের ধকল সইতে না পেরে এক বছরেই যখন মুমূর্ষু হয়ে পড়ে শক্ত সমর্থ ছেলেগুলো—তাদের পাঠানো হয় 'সুখের কামরায়'। আসলে তা মৃত্যুর কামরা। আসল টুপিপরা ছেলেগুলো কিন্তু মনে করে তারা পরম সুখে পুড়ে ছাই হতে চলেছে। পিরামিড জীবরাই ঐ ইচ্ছে তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেয় টুপির মধ্যে দিয়ে। লাইন দিয়ে ঢোকে সুখের কামরায়। লেলিহান আগুনের শিখায় চোখের নিমেষে ছাই হয়ে যায়—সেই ছাই ভেসে যায় নদীর জলে। এই সেই নদী যা আমরা তেপান্তরের মাঠে দেখেছিলাম গম্বুজের মধ্যে ঢুকতে। অপর দিক দিয়ে এই নদীই বেরিয়ে গিয়েছে গম্বুজ থেকে। এবং এই নদীপথেই শেষ পর্যন্ত কার্লো পালিয়ে এসে ঘাসের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসেছিল। হঠাৎ টাইম মেসিনে চেপে আমরা আবির্ভূত হয়েছিলাম ওর বিস্মিত চোখের সামনে।

নদীর জল তিনটে গম্বুজের মধ্যে দিয়েই টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নদী ছাড়া বাঁচতে পারে না পিরামিড জীবরা। ভীষণ গরম ভিজে বাতাসে ওরা সুস্থ থাকে আর, হরবখৎ গরম কুণ্ডে নেয়ে ওঠে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় গরম জলে গা ডুবিয়ে বসে থাকতে হয় বলেই শহরময় পথেঘাটে ছড়ানো বিস্তর কুণ্ড। পরমানন্দে পিরামিড জীবরা স্নান করে সেই সব কুণ্ডে। সেই সময়ে ওরা একরকম পাইপ মুখে লাগিয়ে ফুকফুক করে টানে আর সোনালী ধোঁয়ার রিঙ ছাড়ে। বেশীক্ষণ পাইপ টানলে নেশা আসে—মেজাজ শরীফ হয়—আবোল-তাবোল বকে। এই রকম এক মুহূর্তে ইচ্ছে করে বেশ খানিকটা পাইপ খাইয়ে মালিকের মুখ থেকে ভয়ংকর সেই সত্যটা বার করে নিয়েছে কার্লো।

কথাটা শুনেই হাড় পর্যন্ত হিম হয়ে গিয়েছিল কার্লোর। কি ভাগ্যিস তখন নেশায় চুর হয়েছিল মালিক, তাই কার্লোর ভয়ে পাংশু মুখ দেখেও সন্দেহ হয় নি। প্লায়াডিস নক্ষত্রের ভীষণ গরম আর বেজায় ভারী যে গ্রহ থেকে পিরামিড-জীবরা এসেছে, সেখান থেকে আর একটা মহাকাশ জাহাজ রওনা হয়েছে পৃথিবীর দিকে। পৃথিবীর সব ভাল, শুধু এখানকার হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেওয়া যায় না। গরম মোটে নেই, মাধ্যাকর্ষণ দারুণ কম। মহাকাশ জাহাজে বিরাট বিরাট যন্ত্রপাতি আসছে পৃথিবীর চেহারা পালটে দেওয়ার জন্যে। পৃথিবীর তিন দিকে এই যন্ত্রপাতি বসানো হবে, তারপর আস্তে আস্তে হাওয়া পালটে যাবে, মাধ্যাকর্ষণ বেড়ে যাবে, আগুনের হলকা ছুটবে, লাল আভায়

সহজে তাকানো যাবে। তখন আর গম্বুজের মধ্যে কৃত্রিম পরিবেশে আবদ্ধ থাকবে না পিরামিড-জীবরা। বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীময়। এই পৃথিবী হবে তাদের নতুন উপনিবেশ। কোটি কোটি মানুষ অবশ্য ঐ হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে না পেরে মরবে তক্ষুণি—তাতে কি আসে যায়? মানুষরাও আরশুলা, মাছি, মশা মারবার জন্যে ঘরে স্প্রে করে না?

কার্লো তখন মালিককে দলাইমলাই করছিল তারের বুরুশ দিয়ে। মোটা শক্ত চামড়ায় তারের খোঁচা দিয়ে রগড়ে দিলে আরামে চোখ বুজে আসে মালিকদের। কার্লোর মালিকও নেশার আমেজে চোখ বুজে বকবক করে চলেছে—এমন সময়ে কার্লোর বুরুশ গিয়ে ঠেকলো ঘাড় বলতে যে জায়গাটা বোঝায়—সেইখানে। যদিও গর্দানের কোনো অস্তিত্ব নেই পিরামিড-জীবদের। কিন্তু কার্লোর বুরুশ সেখানে ঠেকতেই গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠে শুঁড়ের এক ঝটকায় কার্লোকে ছিটকে ফেলে দিল মালিক।

কপাল জোরে সেদিন হাড়গোড় ভাঙেনি কার্লোর। কিন্তু বুঝতে পারল না কি এমন অন্যায় করেছে সে যার জন্যে আছাড় মারার দরকার হল। একটু পরেই অবশ্য সামলে উঠে মালিক বললে, "কার্লোর কোনো দোষ নেই। না জেনে সে পিরামিড-জীবদের দুর্বলতম জায়গায় খোঁচা দিয়ে ফেলেছে। মুখের নীচে ঐ জায়গায় জোরে লেগে গেলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে মালিকের। সুতরাং সাবধান—ওখানে আর হাত নয়।"

দুদিন পরেই এই তথ্যটা কাজে লাগল কার্লোর। সেদিনও মালিক নেশা করছিল চোখ বুজে। কার্লো সাহসে বুক বেঁধে জিজ্ঞেস করেছিল—"মালিক, আপনাদের জাহাজটা কবে আসবে?"

শুনেই চোখ খুলে তাকিয়েছিল মালিক। তিনটে চোখ মেলে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলেছিল—"কোন্ জাহাজটা?"

"ঐ যে সেদিন বলছিলেন বিরাট বিরাট যন্ত্রপাতি নিয়ে আসছে?"

"বলেছিলাম নাকি?" তিনটে চোখ অনিমেষে চেয়ে রইল ওর পানে। "তোমার মনেও আছে দেখছি। ভারী অদ্ভুত ছেলে তো! কবে আসবে জেনে কি করবে হে ছোকরা? মতলব কি? এসো, কাছে এসো—"

বলেই একটা শুঁড় দিয়ে কার্লোর কোমর জড়িয়ে ধরে চোখের কাছে তুলে ধরেছিল মালিক, আর একটা শুঁড়ের সরু ছুঁচের মত ডগা বুলিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছিল নকলটুপির তলায়।

একি! টুপি উঠে আসছে কেন?

বিস্মিত মালিক আর একটি কথাও বলতে পারেনি। মরিয়া হয়ে কার্লো দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে লাথি মেরেছিল মালিকের মুখের নীচে সেই দুর্বলতম জায়গাটিতে। শুঁড়ের ঝটকায় আবার ছিটকে গিয়েছিল কার্লো। উঠে বসে দেখেছিল, মালিক কাৎ হয়ে পড়ে আছে। নিষ্প্রাণ।

সেই রাতেই নদীর জলে ডুব দিয়ে মাটির সুড়ঙ্গ দিয়ে গম্বুজের বাইরে চলে এসেছিল কার্লো। লুকিয়েছিল ঘাসের মধ্যে—এমন সময়ে দেখল হঠাৎ কোত্থেকে চোখের সামনে জেগে উঠল একটা বিদকুটে মেসিন, আমি আর প্রফেসর।

মরিয়া হয়ে কার্লো দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে লাথি মেরেছিল। [পৃ. ১৭১

কালো পাহাড়ের সংগ্রামী ছেলেদের নেতাদের সঙ্গে মিটিংয়ে বসলেন প্রফেসর। এদের লীডার দুজন—একজন বেনসন, জাতে জার্মান। অপরজন হার্ভার্ড—জাতে ইংরেজ। দুজনেই সায় দিলে প্রফেসরের প্রস্তাবে। এখুনি একটা পিরামিড-জীবকে জ্যান্ত ধরা দরকার। কার্লো প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছে বটে, কিন্তু গম্বুজের সমস্ত পিরামিড-জীবকে কি করে নিকেশ করা যায়, তা জেনে আসেনি। নদীর জলে বিষ মিশিয়ে মারা সম্ভব। কি বিষে ওরা মরে, তা আবিষ্কার করার জন্যে জ্যান্ত ধরে আনতে হবে একটি পিরামিড-জীবকে।

বুদ্ধি বাতলালো বেনসন। বললে—কার্লো একটা বড় খবর এনেছে। তেপায়া রোবটের ভেতরে বসে চালাচ্ছে এই পিরামিড-জীবরা। সুতরাং খানায় ফেলে একটা রোবটকে জখম করলেই ল্যাটা চুকে যায়।"

"তারপর তাকে রাখা হবে কোথায়?" প্রফেসরের প্রশ্ন।

বেনসন আর হার্ভার্ড মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে উঠে দাঁড়ালো। প্রফেসরকে বললে—"আসুন!"

আমিও গেলাম পেছন পেছন। গিয়ে দেখলাম এক এলাহি কাণ্ড। পৃথিবীর যে যুগে যন্ত্র-সভ্যতা তুঙ্গে উঠেছিল, সেই যুগের বিশাল এক মিউজিয়াম আর লাইব্রেরী রয়েছে কালো পাহাড়ের তলায় পাতাল গহ্বরে। কংক্রীটের মস্ত হলঘরে থরে থরে সাজানো যন্ত্রপাতি আর বই।

বেনসন বললে—"আমাদের পূর্বপুরুষদের কীর্তি। তেপায়া দানবরা এই মিউজিয়ামের সন্ধান পায়নি—আমরা পেয়েছি। এইখানেই একটা ঘরে গরম জল আর হাওয়ার মধ্যে বন্দী করে রাখব পিরামিড-জীবকে।"

"কিন্তু আমাদের বাতাসে নিঃশ্বাস নিলেই তো সে মারা পড়বে?"

বেনসন বললে—"প্রফেসর, তেপায়া দানবের মধ্যে যেখানে বসে মালিক রোবট চালাচ্ছে, সেখানে নিশ্চয় নিঃশ্বাসের হাওয়া তৈরি করে নেওয়ার কলকব্জা আছে?"

"তা আছে," বলেই লাফ দিয়ে উঠলেন প্রফেসর—"বটে! সেই কলটা এই পাতালঘরে বসিয়ে ওর হাওয়া বানিয়ে দেবে বলছো?"

"হ্যাঁ।"

এর পরের ঘটনাগুলো ছোট্ট করে বলছি। খাদের ওপর ফাঁদ পেতে রেখে একদিন বেনসন ঘোড়ায় চেপে একটা তেপায়া দানবকে পথ ভুলিয়ে এনে ফেলে দিল ফাঁদে। গভীর খাদে পা ভেঙে পড়ে রইল দানব। আমরা অচেতন পিরামিড-জীবকে ওর ঘর সমেত তুলে এনে রাখলাম পাতাল কুঠরিতে। তারপর একদিন দৈবাৎ জানা গেল যে জলের মধ্যে অ্যালকোহল অর্থাৎ মদ মিশিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে বেহুঁশ হয়ে পড়ে পিরামিড-জীব। চব্বিশ ঘণ্টা পড়ে থাকে স্রেফ মড়ার মত।

এর পরের ঘটনা আরো সংক্ষিপ্ত। প্রফেসর পাতাল-ল্যাবোরেটরীতে বসে পিপে পিপে মদ তৈরি করে দিলেন। পৃথিবীর তিন দিকের তিনটে লাল গম্বুজের ধারে কাছে খুব গোপনে সেই মদ জড়ো করা হল। দু জায়গায় মদ তৈরি করে নেওয়া হল আঙুর থেকে। তারপর বিশেষ একটা দিনে একই সময়ে তিনটে গম্বুজেরই নদীর জলে বাইরে থেকে মিশিয়ে দিল পিপে পিপে মদ।

ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে ফলটা টের পাওয়া গেল। হঠাৎ পৃথিবীর সর্বত্র টুপিপরা ছেলেগুলো যেন ঘোরের মধ্যে থেকে জেগে উঠল। প্রত্যেকেই নিজের নিজের ভাববার ক্ষমতা ফিরে পেল। বুঝতে পারল না হঠাৎ কেন এমন হল।

বুঝলেন প্রফেসর। গম্বুজ তিনটের পিরামিড-জীবরা সকলেই বেহুঁশ। কলকব্জা তাই থেমে গিয়েছে। ব্রেন-কন্ট্রোলও বন্ধ। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা পরেই নেশা ছুটে যাবে। আবর শুরু হয়ে যাবে মস্তিষ্ক ধোলাই। সুতরাং তার আগেই ধ্বংস করতে হবে গম্বুজ তিনটের চুনী আবরণী। পৃথিবীর হাওয়া গম্বুজের মধ্যে ঢুকলেই অক্কা পাবে বাছাধনেরা!

সে ব্যবস্থাও করে রেখেছিলেন প্রফেসর। মিউজিয়ামের মধ্যেই ছিল মস্ত বেলুন। একটা নয়, অনেক! সেই সঙ্গে ছিল বিস্তর ডিনামাইট। বেলুন আর ডিনামাইট গোপনে তিনটে গম্বুজের ধারে কাছে আগে থেকেই পাচার করে দিয়েছিলেন প্রফেসর। এখন সেই বেলুনে গ্যাস ভরে শূন্যে তোলা হল। ছেলেরা বাণ্ডিল বাণ্ডিল ডিনামাইট নিয়ে, বেলুনে চেপে পৌঁছোলো চুনী গম্বুজের ছাদে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সব কটা গম্বুজের ছাদ ভীষণ শব্দে ফেটে উড়ে গেল আকাশে। লাল গ্যাস আর গরম হাওয়া ছিটকে গেল শূন্যে। দেখা গেল কাতারে কাতারে পিরামিড-জীব চিৎপটাং হয়ে পড়ে আছে পথে ঘাটে। এর পর টাইম-মেসিন চালিয়ে আমরা ফিরে এসেছি বর্তমানে। সেই মহাকাশ জাহাজটা এসে পৌঁছেছিল কিনা খবর রাখিনি।

—শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

এখনো বেলেঘাটার পামার বাজারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শিশিরের মন খারাপ হয়ে যায়। শিশিরকুমার রায়। নামের পাশে একগাদা ডিগ্রি। কলকাতার নানা প্রান্তে যত নতুন নতুন বসতি গড়ে উঠছে—তার নকশা, জায়গা, টাকা-পয়সার হিসেব শিশিরকেই দেখে দিতে হয়।

মাঝে মাঝে তার গাড়ি ওই পথ দিয়েই দমদম যায়। সেখান থেকে শিশির প্লেনে উঠে রোম, নিউইয়র্ক, টোকিও যায়। সে সব শহরে লোক বেড়ে যাওয়ায় নয়া বসতিগুলো কীভাবে গড়ে উঠছে, তৈরী হচ্ছে—তা সরেজমিনে গিয়ে দেখে আসতে হয় চিফ ইঞ্জিনীয়ার শিশির রায়কে।

তার ছবি সমেত বিবৃতি সকালের কাগজে ছেপে বেরোয়। চল্লিশ পেরিয়েও পাকা ছ' ফুটের জওয়ান। সবাই তাকে সংক্ষেপে ডাকে এস. কে. আর.। আবার কেউ কেউ বলে ময়দানব। রাতারাতি কলকাতার পুবে সে বাড়ির পর বাড়ি তুলে যাচ্ছে। লম্বা লম্বা রাস্তা বানিয়ে ফেলছে। তার দু'ধারে ছায়া আর ফুলের জন্যে গুলমোহর, ক্যাসিয়া, কৃষ্ণচূড়া শিশিরেরই কথায় বসানো হচ্ছে। এমন লোককে তার অসাক্ষাতে ময়দানব বলে ডাকা কিছু আশ্চর্য নয়।

সাইটে দাঁড়িয়ে ভিত খোঁড়া, পাইলিং, গাঁথুনি, ছাদ ঢালাই সবই দেখতে হয় শিশিরকে, রোদ বৃষ্টি তুচ্ছ করে। মিকশ্চার মেসিনে ঢালাইয়ের মসলা ঠিক মিশলো কিনা—ভাইব্রেটর ঝাঁকুনি দিয়ে ছাদের সব জায়গা সমান করতে পেরেছে কি না—এসবও দেখতে হয় শিশিরকে।

কলকাতার পুবে এ জায়গাটা মাত্র সাত আট বছর আগেও মাছের ভেড়ি ছিল। এখন যেখান দিয়ে জিপ, লরি ছুটে যায়—সেখানে কিছুকাল আগেও নৌকো ভেসে বেড়াতো। টানা জালে মাছ তোলা হোত। এখন সেখানে নতুন নতুন বাড়ি, স্কুল, বাজার তৈরী হচ্ছে। কলকাতা এদিকটায় সরে এল বলে।

একদিন দুপুরেই মেঘ করে বৃষ্টি এসে গেল। দু'জন ইঞ্জিনীয়ার আর একজন ওভারসিয়ার নিয়ে ময়দানব জিপে কলকাতা ফিরছিল। এমন জোরে বৃষ্টি এল—ফাঁকা মাঠের ভেতর গাড়ির ছেঁড়া ত্রিপল তা কিছুতেই সামলাতে পারছিল না।

ড্রাইভার নতুন বসতি এলাকার একেবারে কিনারে এসে জিপ থামিয়ে বলল, স্যার ওই ঘরটায় গিয়ে দাঁড়ান সবাই। বৃষ্টি থামলে আবার যাওয়া যাবে।

পিচরাস্তা এদিকটায় এসে শেষ। তারপরেই বড় বড় ঘাস, এবড়ো খেবড়ো জমি। গত বর্ষায় ঝড়ে ওপড়ানো মাদার গাছ কোনক্রমে শেকড় নামিয়ে দিয়ে শুয়ে শুয়েই বেঁচে আছে আর বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা সব ক'টা পাতাকে পিষে ফেলছে একদম। তারপরেই সেই ঘরখানা।

ওভারসিয়ার ইঞ্জিনীয়ারদের নিয়ে শিশির রায় ছুটতে ছুটতে ঘরের বারান্দায় গিয়ে উঠলো। তখন দুপুরবেলাতেই সন্ধ্যের চেহারা। বিশাল এক খাবলা মেঘ দূরের মাঠে নেমে পড়ে অন্ধকার করে ফেললো চারদিক।

এ কি ঘর বাবারে! লোকজন নেই?

এমনিই অবাক হয়ে কথাটা বলেছিল শিশির। এমন নির্জনে একখানা ঘর। তার সরু এক ফালি বারান্দা। সিমেন্টে মাজা মাটির দেওয়াল। কিন্তু মাথার ওপরের গোলপাতা পচে ঝুরঝুরে অবস্থা। দরজা জানলা ভেতর থেকে বন্ধ। তালগাছ চিরে খুঁটি। তাতে অনেককাল আলকাতরা পড়েনি। বারান্দায় থুপ থুপ গোবর। বোঝাই যায় ফাঁকা দেখে গরু ছাগলও এ-বারান্দায় উঠে আসে।

ঘরের ভেতর থেকে ভেসে এল, লোক থাকবে না কেন? আছে।

চমকে শিশির থেমে গেল। বৃষ্টিও জোরে এসে গেল। যেন আগের পালকে তাড়িয়ে নিয়ে আরেক পাল। জিপে বসে বসেই ড্রাইভার ইঞ্জিন গরম রাখার চেষ্টা করছে। জল ধরে এলেই সাহেবকে নিয়ে যাতে ছুটতে পারে।

দুই ইঞ্জিনীয়ারের মধ্যে অল্পবয়সী ছেলেটির নাম তরুণ। সে বলল, আমরা তো ভিজে গেলাম। দরজাটা একটু খুলুন না।

না। খুলবো না। বৃষ্টি থেমে গেলেই আপনারা চলে যাবেন।

ওভারসিয়ারবাবু এই বেয়াদবিতে ক্ষেপে উঠল। ময়দানবকে বলল, স্যার আপনাকে বলেছিলাম না—ডি সেকটরে খানিক জায়গা দখল করা যায়নি। এই সেই জায়গা। ঘর। এদিকটায় কালই আপনি নোটিশ ছাড়ুন। আইনের ফ্যাকড়া তুলে টিকে থাকা দেখাচ্ছি। এরাই স্যার ডেভেলপমেন্টের পথে বাধা।

ভেতর থেকে পরিষ্কার ভেসে এল, যতক্ষণ আমার বারান্দায় আছেন—আমার নিন্দা করবেন না। নেমে গিয়ে করুন।

গোড়ায় শিশিরের যেটুকু রাগ হয়েছিল—এ-কথায় তা কেটে গেল। একটা ফাঁকা মাঠের ভেতর এমন ঘরে যে লোক আইনের প্যাঁচ কষে টিঁকে থাকে—বড় রাস্তা, ইলেকট্রিক আলো, কলের জল যে চায় না—ঘরের ভেতরে বসে কোন অদৃশ্য ফুটো দিয়ে সব দেখে আর কান খাড়া করে শুনে কথার জবাব দেয়—সে আসলে, আর যাই হোক খুনী বা মামলাবাজ লোক নয়। বরং মজার লোক। কিংবা ক্ষ্যাপা। নয়তো কঠিন অসুখের রুগী।

ওভারসিয়ার আরও চটে যাচ্ছিল। শিশির তাকে থামিয়ে বলল, আপনি বাইরে আসুন না। আপনাকে একটু দেখবো।

দেখার কিচ্ছু নেই। আপনাদের মত দু'খানা হাত। দু'খানা পা। এখন বাইরে বেরোলে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

এইতো বলছেন।

আপনারা বলাচ্ছেন তাই বলছি। এ জায়গার মানুষজন তো সবাই আমাকে দেখেছে। তারা তো এখন নেই। দূরে সরে সরে গেছে। আপনারা এসেছেন সেখানে। রাস্তা বানাচ্ছেন। বাড়ি বানাচ্ছেন। সব পাখি চলে গেল।

একটা বাজ পড়তে ঘরের ভেতরের গলা থেমে গেল।

শিশির সব বুঝতে পারছিল। সে এদিকটার ওলটপালটের গোড়া থেকে আছে। পাখিরা হিমালয়ের ওপার থেকে উড়ে এসে এখানকার ভেড়ির জলে সারাদিন ভেসে থাকতো। এখানকার বাসিন্দারা এই নয়া বসতির ঠিক গায়েই ছোট ছোট গাঁয়ে সরে গেছে। এখনো খাল ধরে বিচুলির নৌকো আসে। এয়ারপোর্ট যাবার পথে শিশিরের চোখে পড়েছে।

বৃষ্টি থামতেই ওরা জিপে এসে উঠলো। ময়দানব আবার কাজে ডুবে গেল। তার কোন অভাব নেই। ছিমছাম বাড়ি। পড়াশুনোয় ভালো দুই ছেলে দুই স্কুলে ফার্স্ট হয়। তারা বছর বছর প্রাইজ আনে। শিশির তাদের ডেকে বলে, হ্যাঁরে? স্কুলে তোদের কোন বন্ধু নেই?

কত! আমার তো ষোলজন বন্ধু। ক্লাস সিকসে পড়ে ছোট ছেলে। দীপংকর। হাসতে হাসতেই বলল।

নারে! সেরকম বন্ধু নয়।

তবে?

তোদের ক্লাসে কোন একজন কি খুব বন্ধু তোর?

বুঝেছি বাবা! তোমার সেই ডি. কে. ডি.-র মত? না বাবা! আমি কোন বন্ধুকে অত ভালবাসি না। তার কোন খোঁজ পেলে?

না। কোথায় হারিয়ে গেছে। এখন দেখলে চিনতে পারবো না। হয়তো লুধিয়ানার সেলসম্যান।

কিংবা শক্তিগড়ে ধান কেনে বসে বসে। কে খুঁজে পাবে এই বিরাট পৃথিবীতে—

ডি. কে. ডি. তোমাকে খুব ভালবাসতো?

ভীষণ। একদিন দেখা না হলে ঘুমোতে পারতো না রাতে।

কতদিন দেখা নেই তোমাদের?

তা পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর। ওর সব বইতে ও বড় হাতে ডি. কে. ডি. লিখে রাখতো। দেবকুমার দাশ। আমরা থাকতাম বেনেখামার পাড়ায়। ওরা পঞ্চবীথির মোড়ে। সেখানে শহরের পাঁচটা রাস্তা এসে মিশেছে। একটা বড় গাব গাছ ছিল। গাছতলায় বই নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো দেবু। আমার জন্যে। একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে স্কুলে যেতাম। বসতাম থার্ড বেঞ্চে। পাশাপাশি। দেবু পিসীর কাছ থেকে আমসত্ত্ব এনে আমায় দিত।

ময়দানবের হাজার কাজ। ক্বচিৎ কখনো দুই ছেলে—অনমিত্র আর দীপংকরের সঙ্গে তার গল্পগাছা করার সুযোগ হয়। বেশির ভাগ সময় কাটে সাইটে। রোড রোলার গলন্ত পিচ আর পাথরের মাথা রাতারাতি দুরমুশ করে বড় বড় রাস্তা বানিয়ে ফেলছে। জল ধরে রাখার তিন তিনটে ট্যাঙ্ক উঠে গেছে আকাশে। ডি সেক্টরে কাজ শুরু হলেই সেখানেও একটা উঠবে।

পুরো এলাকাটার দিকে ময়দানব তাকায় আর স্বপ্নের একটা ছবি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। সব সেক্টরে বাড়ি তৈরি হয়ে গেছে। সুন্দর সুন্দর রংয়ের। লোকালয় গড়ে উঠেছে।

ছেলেদের মাকে নিয়ে একদিন বিকেলে শিশির পুরো এলাকাটা দেখতে বেরোলো। সন্ধ্যের মুখে মুখে ডি সেক্টর দিয়ে যাওয়ার সময় দীপংকরের মা বলল, ও ঘরখানা কাদের? বিচ্ছিরি!

গাড়ি থামালো শিশির। ঘরের মালিককে দেখতে পেল। আধবুড়ো একটা লোক মাঠের ভেতর টেবিল চেয়ার পেতে বসেছে। টেবিলে ব্যাগ। মাঠ ভেঙে দু'চার জন করে লোক আসছে। দূরের গাঁয়ের মানুষ হবে। ও হরি! লোকটা তাহলে ডাক্তার। তাই বল। রুগী দেখে ওষুধ দিচ্ছে। শিশির ইলেকট্রিক হর্ন বাজালো। রুগীরা কেউ কেউ ফিরে তাকালো। ডাক্তারবাবু কিন্তু তাকালেন না। দীপংকরের মা গৌরী বলল, কোন ধন্বন্তরী হবে বোধ হয়। তাগা তাবিজ দিচ্ছে। কিংবা হাতুড়েও হতে পারে। এখনো তুলে দাওনি লোকটাকে?

কাজ এদিকে এগোলেই উঠে যেতে হবে। মামলা করেছেন অবশ্য।

দামী জায়গা হয়ে যাবে। ভালো ভিজিট পাবে। সেই আশায় বসে আছে ডাক্তারবাবু!

স্ত্রীর কথায় কিছু বলতে পারলো না ময়দানব। সে আসলে পুরোপুরি সায় দিতে পারছিল না। ফাঁকা আকাশের নীচে খোলা মাঠে লগবগে কাঠের টেবিল পেতে একজন লোক যদি কোটি কোটি টাকার এই নয়া শহরকে তুচ্ছ করতে পারেন—তবে তাঁকে মতলববাজ ভাবতে শিশিরের যেন কোথায় আটকায়। কোনো দিকে না তাকিয়ে দিব্যি ওষুধ দিয়ে যাচ্ছে। এত বড় উঠতি শহরটাকে কোন ভ্রূক্ষেপই নেই।

এই নতুন নগরের গায়েই আগেকার ঝিল, ডোবা, ন্যাড়া মাঠ, গ্রাম—পর পর সব পড়ে আছে। জায়গা দেখতে এসে একেবারে গোড়ায় ময়দানব ওসব গ্রাম ঘুরে এসেছে। মাছ চাষের পুকুর, জাল শুকোনোর ভারা, উলটো করে শুকোতে দেওয়া রঙ লাগানো নৌকো, মাছের বাঁক—আর কিছু আদুর গায়ে শিশু।

পামার বাজারের পাশ দিয়ে ফেরার পথে গৌরী শিশিরকে বলল, এখানে তো তোমার বন্ধু থাকতেন। দি গ্রেট ডি. কে. ডি.।

থাকতেন বোলো না। এখান থেকেই দেবু নিরুদ্দেশ হয়েছিল। তখন বোধ হয় ওর সতেরো আঠারো বছর বয়েস। আমি কলেজে পড়ি। ওর সৎ মায়ের চিঠি পেয়ে দেখা করতে গেলাম।

তোমার ঠিকানা পেলেন কি করে?

দেবুর সঙ্গে সেই ক্লাস থ্রির পর দেখা না হলেও আমি চিঠি লিখতাম। দেবু দু'একখানার জবাব দিয়েছিল। চিঠির ভাষা পড়ে বুঝতাম—ও মনে মনে অন্য জগতের লোক হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। ওকে চিঠি লিখতাম মেদিনীপুরে ওর দাদুর ঠিকানায়। দেবকুমার দাশ। কেয়ার অব মহেন্দ্রনাথ দাশ। মিয়াবাজার। মেদিনীপুর। চিঠির জবাব পেয়েছি দশখানা লিখে একখানার। মহেন্দ্রনাথ দাশ ওর আপন দাদু ছিলেন।

বেলেঘাটা ডাকঘরের ছাপমারা একখানা পোস্টকার্ড পেলাম একদিন। মেয়েলী হাতে লেখা—বাবা শিশির। এই অভাগিনী তোমার বাল্যবন্ধু দেবুর মা। দেবুর বাবা আজ চার বছর হয় গত হইয়াছেন।

তোমার দেখি সব মনে আছে।

ছোটোবেলায় দেবুই আমার একমাত্র বন্ধু ছিল। দেবুর সব খুঁটিনাটি আমি মনে করে রেখেছি গৌরী। ঠিকানা দেখে এই পামার বাজারের পেছনের দিকে একটা গোলাপি রংয়ের বাড়িতে গেলাম। গরমকালের বিকেলবেলা। আগুন বেরোচ্ছিল বাড়িটার গা থেকে। দোতলায় উঠতে একজন বিধবা মহিলা আমায় দেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। রাস্তাঘাট কত পালটে গেছে। পরে সে বাড়ি আর খুঁজে পাইনি। পোস্ট-কার্ডখানাও হারিয়ে বসে আছি। আমাদের মত দেবুরাও পার্টিশনের মুখে মুখে কলকাতায় চলে আসে গৌরী।

তুমিই শিশির তো?

হ্যাঁ। আমার ঠিকানা পেলেন কোত্থেকে?

দেবুর মুখে তোমার কথা শুনেছি অনেক।

আমি অভিমানে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। জল এসে যাচ্ছিল। যাকে অতগুলো চিঠি লিখে মোটে তিন চারখানা চিঠি পেয়েছি—সে আমার কথা খুব বলতো? আশ্চর্য! তাহলে অত ফাঁক দিয়ে দিয়ে জবাব দিত কেন?

চারিদিকে শুকনো অভাবের চেহারা। কাঁচা ড্রেনের দুর্গন্ধ। বিকেলটা রোদে ভাজা ভাজা হচ্ছে। তার ভেতর অচেনা অজানা জায়গায় দোতলার একখানি লাল রঙের ফাঁকা বারান্দায় একজন বিধবা মহিলা কাঁদছেন আর কথা বলছেন—যার চেহারার কিছুই আমার মনে নেই। তাঁরও আমার চেহারা মনে থাকার কথা নয়। অদ্ভুত অবস্থা। আর আমার বয়স তো তখন সতেরো কি আঠারো।

এঁর বিয়েতেই তো তোমরা বরযাত্রী গিয়েছিলে?

হ্যাঁ। ঠিক বিয়ের সময়টায় আমাকে আর দেবুকে রসগোল্লা দিয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

দেবুর নিজের মা তো ওর তিন বছর বয়সে মারা যান। দেবুকে দেখতেন ওর বিধবা পিসী। দেবুর বাবা কাজের ব্যাপারে বাইরে বাইরেই ঘুরতেন। এই বিয়ের আগের দিন দেবুকে ওর বাবা একটা তিন নম্বর ফুটবল কিনে দিয়েছিলেন।

সব মনে আছে তোমার!

সব! এইতো সেদিনের কথা। তা দেবুর মা বললেন, ওই তো দেবুর ডাইরি পড়ে আছে। তোমার চিঠিগুলোও রয়েছে ওর ভেতর। সেখান থেকেই ঠিকানা পেলাম।

দেবু ক্লাস ফোরে উঠে কিছুকাল ওর বাবার সঙ্গে কাজের জায়গায় স্কুল পালটে পালটে ঘুরেছিল। তারপরেই দাদুর ওখানে চলে যায়। ওর মায়ের কথায় বুঝলাম—বাবা গত হতেই কিংবা তার কিছু আগে থেকে দেবু ওর এই মায়ের কাছে চলে আসে।

দেবুর মা বললেন, ও তো এ মাসেই কারখানায় ভরতি হয়ে যেত। কিন্তু সেই যে একদিন বাড়ি থেকে বেরুলো—আর ফেরেনি। সেও মাস ঘুরে গেল। এখন আমি কি করি বল তো বাবা। ওই তো দেবুর এক ভাই। ছ'বছর এখনো পূর্ণ হয়নি। আমি কোথায় দাঁড়াই এখন? হাতের গয়না একখানাও দাঁড়িয়ে নেই। দু'মাসের ভাড়া বাকি।

বুঝলে গৌরী—সে বয়সে অভাবের চেহারা অমন করে আর দেখিনি। আমি কিছু বুঝতে পারছিলাম না কি করব। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছি। আশা করে গিয়েছিলাম—যদি দেবুর কোন খবর পাই।

তোমাকেই বা সাত কাহন করে বলার কি ছিল? মহিলার তো বোঝা উচিত ছিল—তুমি নেহাত নাবালক।

বিপদে পড়লে মানুষ আশ্রয় খোঁজে। আমি সেদিন কিছুই করতে পারিনি।

পরে তো সেই ছেলেটির চাকরি করে দিয়েছো।

চাকরিতে পাকা হোল। বিয়ে করলো। অবশ্য নেমন্তন্ন করেনি।

চিফ ইঞ্জিনীয়ারকে ওয়ার্ক সুপারভাইজার নেমন্তন্ন করে বিয়েতে!

কিন্তু দেবুর ভাই তো। খোঁজ নিলেই বলে—নাঃ। দাদার কোন খোঁজ পাইনি আর। ওর মা মারা গেলেন। সেও বছর পনেরোর খবর। এখন বোধ হয় ছেলেটি পুরুলিয়ার ঝালদায় থাকে। বাচ্চাটাচ্চা হয়েছে এতদিনে। ওরা তো দেবুর ভাইপো ভাইঝি। খবর দিলে আমি হাতে করে কিছু নিয়ে যেতাম নিশ্চয়।

দেবুর জন্যে তোমার এত মন কাঁদে কেন? অ্যাতো বছরের ব্যবধানে এখন সম্পূর্ণ আলাদা দু'জন মানুষ তোমরা। রুচি আলাদা। পরিচয় আলাদা। দেখা হলেও মেলাতে পারবে না। দুঃখই বাড়বে শুধু।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে। গৌরীর কিছু শপিং আছে। ময়দানব তার বউকে বলল, দুঃখ পাই, সুখ পাই—একবার যদি দেখা হতো শুধু—

কি হোত?

গলা জড়িয়ে ধরে বলতাম, দেবু তুই যে ক্লাস ফোরে উঠেই চলে গেলি—একবার দেখা দিলিনে—আর আমি রোজ রাতে শুয়ে শুয়ে তার জন্যে কাঁদতাম!

বাড়ি ফিরে কাঁদতে বসবে চলো!

এ তুমি বুঝবে না গৌরী।

ময়দানব আবার কাজের নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ক'মাসের ভেতর কাজ হু হু করে ডি সেকটরের দিকে ছুটে চলল। একদিন মুখ্যমন্ত্রী সব ঘুরে দেখে বললেন, শিশির এই মাঠটায় স্টেডিয়াম হয় না? একলাখ লোক বসে খেলা দেখবে।

কাজের গন্ধে শিশির ওড়ে। বলল, খুব হয় স্যার। নকশা তো অনেকদিন রেডি।

কাজ এগোতে এগোতে একদিন সেই ক্ষ্যাপাটে, আধবুড়ো ধন্বন্তরীর ঘরের দরজায় এসে থামলো। সেদিনই অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়াররা ঘরখানা ভেঙে ফেলার অর্ডার দিত। সকাল থেকে সরু ফালি মাটির বারান্দায় ক্ষ্যাপা ধন্বন্তরী গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। তার মুখে পরিষ্কার ঘোষণা ঃ বুলডজার চালালে আমার ওপর দিয়ে চালাও। আমি নড়ছি নে।

একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার থানায় ফোন করলেন। লাইন পেলেন না। তখন ময়দানবকে রাইটার্সে ফোন করলেন।

ময়দানব বলল, এখনো তো মাপজোকের কাজ কিছু বাকী। দু'তিন দিন লাগবে। লোকটাকে এখুনি ঘাঁটিয়ে দরকার নেই। জেদ পড়ে গেলে এমনিই উঠে যাবে।

ওর পেশেন্টরা এসে একটা হাঙ্গামা বাধাতে পারে স্যার। শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা দেখা দিতে পারে।

ওপাশ থেকে ফোনে ময়দানব বলল, আমি তো বিকেলেই যাচ্ছি। তখন দেখা যাবে। এর ভেতর তোমরা কিছু বাধিয়ে বোসো না।

শিশিরের এসে পৌঁছতে বিকেল প্রায় ফুরিয়ে যাওয়ার দশা। জিপ থেকে নামতে নামতে দু'টো জিনিস একসঙ্গে দেখতে পেল। ফাল্গুন মাসে সন্ধ্যে আর বিকেলের জোড় ধরা যায় না। একসঙ্গে পাশাপাশি মিশে থাকে। সাইটে অফিসাররা কেউ নেই। ঠিকেদারের মজুররা ঘরে ফিরে যাচ্ছে। ক্ষ্যাপা ধন্বন্তরী ওরই ভেতর তিনজন রুগীকে ওষুধ দিচ্ছে। আগের দুই রুগী মাঠের ভেতর দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে বাড়ির দিকে ফিরছে। ধন্বন্তরীর ভাঙা ঘরের চাল বরাবর সিধে একখানা চাঁদ উঠছে। হলুদবর্ণের। আউটলাইনটা স্পষ্ট। ভেতরটা এখনো গাঢ় হয়নি।

জিপের ড্রাইভারকে বলল, তুমি গাড়ি নিয়ে ফিরে যাও।

আপনি কিসে যাবেন স্যার?

তুমি যাও না। আমি কন্ট্রাক্টরদের লরি ধরে মানিকতলা যাব। সেখান থেকে ট্যাক্সি নেব। বলছি শুনছো না কেন? যাও।

তা কি করে হয় স্যার। আপনি কষ্ট পাবেন এতটা পথ হেঁটে। বরং আমি গাড়ি রেখে চলে যাচ্ছি। আপনার সময়মত নিজে চালিয়ে ফিরবেন।

ডিপার্টমেন্ট সুদ্ধ সবাই এই ময়দানবটির স্বভাবচরিত্র জানে। তাকে নিয়ে পিওন থেকে অফিসারদের গর্ব আছে। প্রশ্রয় আছে। আছে ভালবাসা। সবাই সমীহ করে চলে।

এবার শিশির এক ধমক লাগালো । গাড়ি নিয়ে চলে যাও বলছি।

অনিচ্ছুক ড্রাইভার বোঁ করে জিপ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল। এবড়ো খেবড়ো জমি পেরিয়ে শিশির এগোতে লাগলো। ঠিক করলো, আজ সে এই ক্ষ্যাপা ধন্বন্তরীর সঙ্গে কথা বলবে। পরিষ্কার বলবে, কি ভেবেছেন আপনি? এখানে এখন আদর্শবাদী ডাক্তার সেজে আছেন কোন্ মতলবে? সরকার থেকেই ক্লিনিক বানানো হচ্ছে। পাস করা ডাক্তার বসবেন। আশপাশের সবাই এসে ওষুধ নিতে পারবে। কোন অসুবিধে থাকবে না।

অন্যদিনের মতই লোকটা খোলা আকাশের নীচে চিকিৎসায় বসেছে। মাথায় কাঁচা পাকা চুল। পিঠটা একটু কুঁজো। গায়ের হাফশার্টের কলার ফেটে গেছে। মুরগির ঠ্যাং—দু'খানা পা ঝুলে আছে চেয়ার থেকে। পায়ের নলি বেশ রোগা। ঘাসের ওপর কেম্বিসের জুতো।

বুলডজার চালালে আমার ওপর দিয়ে চালাও। [পৃ. ১৮০

শিশির আর কয়েক পা এগোলেই ধন্বন্তরীর চেয়ারের হাতায় পৌঁছে যেত। শিশির দেখতে পেল ফাঁকা ডি সেকটরে ঘন ঘাসের মাঠটা কালো হয়ে উঠছে। চাঁদটা চিনি মেশানো বাটা হলুদের চেয়েও গাঢ় চেহারায় ভেসে উঠলো। চারদিকে একদম দোল পূর্ণিমার আলোবাতাস।

ঠিক সেই সময়েই—

সেই সময়েই ময়দানব তার নিজের বানানো শহরে পাক খেয়ে পড়ে গেল। যা দেখতে পাচ্ছিল সবই চোখের কানাতে এসে ঢলে পড়ল। বাবাগো—

প্রথমে কেউ দেখতে পায়নি। পুরিয়া মুড়ে দিতে দিতে ধন্বন্তরীর সন্দেহ হল কেমন। একটা যেন শব্দ শুনলাম। পেছন ফিরে তাকিয়েই লাফিয়ে উঠলো।

একটা প্রমাণ সাইজের মানুষ বুনো পাতিঘাসে ঢাকা নালাটায় ঘুরে পড়ে গিয়ে উঠতে পারছে না। লেগেছে খুব। চোখ বুঁজে এল।

এই লেটো। ধরতো।

ওষুধ নিতে এসে লেটো কখনো এমন কাণ্ড দেখেনি। ধরাধরি করে বারান্দায় বিছানো মাদুরে রাখতে হল লোকটাকে। শেষে উনুন ধরিয়ে জল চড়াতে হল। লম্বা মানুষটার ডানপায়ের জুতো মোজা খুলে ফেল গরম জলের সেকও দিতে হল। লোকটাকে বারান্দায় শুইয়ে দিয়ে মিনিট দশেক চুপচাপ রেখে দিল আধবুড়ো লোকটা। মাঝে এক পুরিয়া ওষুধ দিয়েছে শুধু। ঠোঁট ফাঁক করে খাওয়াতে হল। জ্ঞান ফিরে এলে সেক-তাপ শুরু। খানিকবাদে লেটো চলে গেল।

করছেন কি? পায়ে হাত দেবেন না।

এখন ন্যাকামোর সময় নেই। সেক না পেলে আপনি উঠে দাঁড়াতে পারবেন না। আচমকা মুচড়ে গেছে।

আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেব।

এখন তুলে রাখুন। কিছু খুঁজে পেলে তখন দেবেন। এদিকে কোথায় আসছিলেন?

শিশির বুঝলো, ধন্বন্তরী তাকে চিনতে পারেনি এখনো। বলল, আপনার কাছে।

আমার কাছে? আমি তো আপনাকে চিনি না।

চেনেন। ভুলে গেছেন। ক'মাস আগে এক বৃষ্টির দিন আমরা ক'জনে আপনার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। আপনি ভেতর থেকে কথা বলছিলেন।

আপনার জ্ঞান ফিরে এসেছে। আচমকা ব্যথা পেয়ে যে শক্ পেয়েছিলেন—তাও কাটিয়ে উঠেছেন এতক্ষণে। এবার আপনি আসুন।

আমি যে হাঁটতে পারছি না।

গাড়িতে যাবেন।

গাড়ি ছেড়ে দিলাম যে—

আমায় জিজ্ঞাসা করে তো ছাড়েননি। আশেপাশের সাতগাঁয়ের লোক বিনা গাড়িতেই অন্ধকার মাঠ দিয়ে আমার কাছে হেঁটে আসে রাতবিরেতে। আপনিও পারবেন।

আমি দাঁড়াতে পারছি না। দেখুন আমার পা কাঁপছে।

তাহলে বসে জিরিয়ে নিন। বলেই ধন্বন্তরী বারান্দা থেকে নেমে মাঠের ওপর ফাঁকা চেয়ারটায় গিয়ে বসলো। শিশিরকে নিয়ে এই আধবুড়োর ধকলটা কম যায়নি। এখন নতুন নগরে একটাও লোক নেই। এখন শুধু জ্যোৎস্নার দৌরাত্ম্য। এই সময়টায় ধন্বন্তরী ভেড়ির তাড়িয়ে দেওয়া জলের ফিরে আসার শব্দ পায়। এখানে আজ তিরিশ বছরের ওপর তার আস্তানা। এক সময় কি শান্তির ছিল জায়গাটা। কিন্তু এখন আর বোধহয় থাকা যাবে না এখানে। এই লোকগুলো তাকে শীগগিরি ঝাড়েবংশে তুলে দেবে। তাদেরই একটা এখন বারান্দায় কাতরাচ্ছে।

বারান্দার লোকটা বলল, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বারান্দা থেকে নামবো কি করে?

হাতড়ে দেখুন। একটা টর্চ পাবেন।

শিশির সত্যি একটা টর্চ পেয়ে গেল। ধন্বন্তরী মাঠের ভেতর চেয়ারে বসে। একবার ঘুরেও

তাকালো না। তার সামনের টেবিলে ওষুধের বড় ব্যাগটা। এখনো তোলা হয়নি।

পা কাঁপছিল। তবু একটু একটু করে শিশির মাঠে নেমে এল। যে-লোক তাকে এতক্ষণ সেবা করে খাড়া করে তুলেছে—তারই এখন এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে শিশির রীতিমত কষ্ট পাচ্ছিল মনে মনে। একবার ভাবছিল—এখনই এ-ঘর ভেঙে দিতে হবে। আবার মনে হচ্ছিল—এই লোকটাই তাকে পায়ে সেক দিয়ে ব্যথা কমিয়ে দিয়েছে।

সবে মাঠের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে শিশির। ধন্বন্তরী তার দিকে পিঠ ফিরে চেয়ারে বসে। সারাটা এলাকা এখন জ্যোৎস্নার শাসনে। টর্চের বোতাম টিপতেই ফোকাস গিয়ে ধন্বন্তরীর পিঠে, তার ব্যাগে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আলগা হাতের ভেতর থেকে টর্চটা শিশিরের পায়ে খসে পড়লো। উঃ! বলে মাটিতে উবু হয়ে গেল সে।

কি হল? পা ঠিক হয়নি—

ধন্বন্তরী কাছাকাছি এসে শিশিরকে ধরে তুললো। আবার লেগেছে? টর্চটা কোথায়?

তুমি চিনলে কোত্থেকে? দেবকুমারকে? [পৃ. ১৮৪

শিশির কোন জবাব না দিয়ে টলতে টলতে ধন্বন্তরীর ফাঁকা চেয়ারটায় গিয়ে বসলো। এই ব্যাগটা কার?

আধবুড়ো লোকটা শিশিরের গলার আওয়াজে ক্ষেপে উঠলো। কেন? তাতে আপনার কি দরকার?

ফাঁকা নগরীতে শিশিরের গলায় বাজ ডেকে উঠলো। তাতে আদেশের রেশ। মেলা বকবেন না। যা জানতে চাইছি বলুন। আমার শরীর এখনো কাঁপছে। ব্যথায় পা টলছে।

ওষুধ দিয়ে ব্যথা কমালাম কিনা তাই এমন চেঁচাচ্ছেন। আমারই জায়গায় বসে! যান! এখুনি বেরিয়ে যান। যান—

হ্যাঁ। আমি চলে যাচ্ছি। থাকবার জন্যে আসিনি। বলে উঠে দাঁড়ালো শিশির। তখনও পা টলছে তার। সেই অবস্থাতেই টেবিলের ওপরকার ব্যাগটা খপ করে ধরল। কিন্তু এ ব্যাগটা আমি নিয়ে যাবো। সাদা রং দিয়ে কে ডি. কে. ডি. লিখেছে?

বাঃ! ভালোরে আবদার! ওষুধ খেলেন। ব্যথা কমলো। এখন ধমকে ব্যাগটা নিয়ে যাবেন। এবার ধন্বন্তরী ধমকে উঠলেন। ব্যাগ রাখুন। বেরিয়ে যান।

যাবো না আমি। ব্যাগের গায়ে এ কথা কে লিখেছে? ভাগ্যিস টর্চের আলো পড়েছিল তাই দেখতে পেলাম। আমি জানতে চাই কে এই ডি. কে. ডি. লিখেছে? কে?

কেন? তা জেনে আপনার কি হবে?

আমার ভয়ংকর দরকার। এখুনি বলুন। শিশির উত্তেজনায় আধবুড়ো লোকটার জামা চেপে ধরলো। পা টলছিল তার। এই পৃথিবীতে শুধু একজনই এভাবে ডি. কে. ডি. লিখতে পারে— সব বড় হাতের—

জামা ছাড়ুন। আমার এখন থিয়েটার দেখার সময় নেই। বেরিয়ে যান বলছি। চেয়ার তুললো আধবুড়ো ক্ষ্যাপা লোকটা।

বিশাল নতুন নগরের গায়ে ফাঁকা মাঠের ভেতর ময়দানবের হাতে ওষুধের ব্যাগ। সে কিছুতেই ছাড়বে না। আর আধবুড়ো ক্ষ্যাপা লোকটার হাতে চেয়ার। আমার ব্যাগ নিয়ে ইয়ারকি? রাখো বলছি।

আপনার? তোমার ব্যাগ? দেবকুমার দাশ কোথায়?

শূন্যে তোলা চেয়ারখানা ধন্বন্তরীর হাত থেকে খসে পড়লো। চেয়ারের চারখানা পা শূন্যে। তাতে দলা দলা চাঁদের আলো।

তাকে আপনি—তুমি চিনলে কোত্থেকে? দেবকুমারকে?

আহা! বল না সে এখন কোথায়? শিশির আবার লোকটার জামা ধরে ফেলেছে।

ধন্বন্তরী বলল, জানি না। তারপর পেছন ফিরে ঘরের দিকে হাঁটতে লাগলো। যেন এখুনি গিয়ে শুয়ে পড়বে। দেবকুমার মারা গেছে। বলেই মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়ালো ধন্বন্তরী।

বাঁ হাতের ব্যাগটা শিশির মাটিতেই নামিয়ে দিল। মারা গেছে?

আর কিছু বলতে পারলো না সে। তার পা আগের চেয়ে এবার দ্বিগুণ কাঁপতে শুরু করেছে। টাল রাখবার জন্যে কোনক্রমে গিয়ে চেয়ারটা তুলে নিয়ে মাঠে সোজা করে বসালো। তারপর নিজেই বসে পড়লো তাতে। দূরে কলকাতার বাসাবাড়ির আলো।

আধবুড়ো লোকটা বলল, তুমি কি শিশির?

ময়দানব মাথা তুলে তাকিয়ে দেখলো, লোকটার পেছনের ভাঙাচোরা ঘরখানা অন্ধকার। মাঠের বাতাস জ্যোৎস্নার মতই নিঃশব্দ হয়ে গেল। ময়দানব খুব আস্তে বলল হ্যাঁ। তুমি নিশ্চয় দেবু— বলেও শিশিরের বুক কাঁপছিল।

একথায় মাঠের ওপর ব্যাগটার পাশে বসে পড়লো লোকটা। হ্যাঁ। আগে বলবে তো!

কি করে বুঝবো বল! চেনার তো কোন উপায় রাখিসনি দেবু।

খানিক পরে দেখা গেল, ওরা দু'জন একটা শালিখ পাখির বাচ্চা পোষ মানানো নিয়ে কথা বলছে। দু'জনেই দেখা গেল, পাখির বাসা বানানো থেকে বাচ্চাকে খাবার খাওয়ানো ভালোভাবেই জানে।

আসলে ডি. কে. ডি. আর এস. কে. আর. থ্রিতে থাকতে তিনমাস ধরে একটা শালিকছানা পুষেছিল। রোজ দু'বেলা ওকে দেখতো ওরা। খাওয়াতো। বাসা ঠিক করে দিত।

আর কিছুদিন পরেই পাখিটা উড়তো। এমন সময় দেবুর বাবার বিয়ে এসে গেল।

বিয়ের দিন গোলমালে ওরা পাখিটাকে দেখতে ভুলেই গিয়েছিল। পরদিন দেবুর সঙ্গে তার নতুন মাকে নিয়ে ফিরে এসে দেখে, পাখিটা তার বাসায় মরে কাঠ হয়ে আছে।

জল দেয়নি কেউ সারাদিনে। সারা গায়ে ডাই পিঁপড়ে।

তোর দেখি সব মনে আছে দেবু!

তুইও তো কিছু ভুলতে পারিসনি শিশির!!

"মাই হেড্"

—বিভূতি বিদ্যাবিনোদ

"মাই হেড্" আমার মাথা
শিখিয়ে গেল মাস্টার,
পড়ছে খোকা "মাই হেড্"
"স্যারের মাথা" বার বার,
দিদি শুনে বললে, 'ওরে,
"মাই হেড্" আমার মাথা।'
"দিদির মাথা" পড়ছে খোকা
বলছে না আর যা'তা।

শুনে দাদা বললে, 'বাঁদর,
দিদির মাথা নয়,—
"আমার মাথা" "আমার মাথা"
"মাই হেড্" মানে হয়।"
"দাদার মাথা", "দাদার মাথা"
পড়ছে এবার খোকা,
বাবা বলেন, "গুষ্ঠীর মাথা"
পড়িস্ এবার বোকা।'

শমী গাছের সেই অস্ত্র

—গজেন্দ্রকুমার মিত্র

যাঁরা মহাভারত পড়েছেন তাঁরা সকলেই জানেন—পাণ্ডবরা যখন দ্বিতীয়বার কৌরবদের সঙ্গে পাশা খেলতে বসেন তখন পণ বা বাজি ছিল, যে পক্ষ হারবেন সে পক্ষকে বারো বছরের জন্যে বনে যেতে হবে, তা ছাড়াও এক বছর অজ্ঞাতবাস করতে হবে। মানে তাঁরা কোথায় কি ভাবে আছেন কেউ জানতে পারবে না। যদি অপর পক্ষ জানতে পারে তবে এ পক্ষকে আরও বারো বছর বনে কাটাতে হবে।

পাণ্ডবরা যে হারবেন সে তো জানা কথাই, কেন না যুধিষ্ঠির সাদাসিধে ভাল-মানুষ, ধর্মভীরু লোক, তিনি সাধারণ ভাবে—যেমন খেলে আর পাঁচ জন সেই ভাবেই খেলতে শিখেছেন, আর কৌরব পক্ষের শকুনি মামা ছিল মহা জোচ্চোর, সে খেলছে জুচ্চুরি ক'রে কিসে ভরা পাশা নিয়ে, তাকে হারাবে কে?

কাজেই পাণ্ডবদের অত বড় রাজ্য, অমন নতুন কোটি কোটি টাকা দামের সভাগৃহ, সব সম্পদ ছেড়েছুড়ে দিয়ে গুটিগুটি বনে যেতে হল। তা তো হল, বনে বাস করার কষ্ট যা হবার তা তো হলই, তার চেয়ে বেশী ভাবনা দেখা দিল বারো বছর কাটাবার পর। কোথায় কেমন করে অজ্ঞাতবাস করবেন—এই নিয়েই হল ওঁদের চিন্তা। পাঁচ ভাইই বিখ্যাত বীরপুরুষ, সুন্দর

বলিষ্ঠ চেহারা, বারো বছর আগেই রাজসূয় যজ্ঞ করেছেন, দেশদেশান্তর থেকে রাজারা এসে দেখে পরিচয় করে গেছেন, তার আগে ছোট চার ভাই দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে কর আদায় করেছেন, চেহারা সব বেশির ভাগই চেনা। আর ঐ সব 'তাগড়াই' চেহারা একবার দেখলে ভোলা শক্ত। যদি কেউ চিনে ফেলে এবং কৌরবদের খবর দেয় তাহ'লেই তো সব মাটি। আবার বারো বছরের জন্যে বনে যেতে হবে।

যাই হোক, ওঁরা ভেবে চিন্তে ঠিক করলেন, মৎস্য দেশে (বর্তমান জয়পুরে) বিরাট রাজার সভায় ওঁরা পাণ্ডবদের পুরনো কর্মচারী হিসেবে পরিচয় দিয়ে চাকরি নেবেন। দ্রৌপদীও ওখানেই থাকবেন—রাণীর চুল বাঁধার, সাজসজ্জা করার আর ফরমাশ খাটার ঝি নিযুক্ত হবেন। তিনি বলবেন, 'আমি যক্ষের স্ত্রী কোন নীচ কাজ করব না, পদসেবা বা পা-মোছার কাজ তো নয়ই।' এঁরা পাঁচ ভাই কেউ রাঁধুনী, কেউ ঘোড়াশালের কেউ বা গোশালার রক্ষক হিসেবে কাজ নেবেন। সে কথায় আমাদের বিশেষ দরকার নেই অবশ্য।

কিন্তু এই সময় আর এক মহা সমস্যা দেখা দিল।

ওঁদের সকলেরই কিছু কিছু নিজস্ব বিশেষ অস্ত্র ছিল। অস্ত্রগুলি সাধারণ বাজারে যা পাওয়া যায় সে রকম নয়, সবগুলোই বিশেষ ভাবে তৈরী করানো বা দেবতাদের দেওয়া। তার মধ্যে ভীমের গদা, অর্জুনের গাণ্ডীব ধনুক আর অক্ষয় তূণীর তো জগদ্বিখ্যাত। এ দুটি দিয়েছিলেন অগ্নি, খাণ্ডবদাহনের সময়। এসব কোথায় রেখে যাবেন? যেখানে সেখানে রেখে গেলে চোরের ভয়, আবার সঙ্গে নিয়ে গেলেও পরিচয় বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। ঐ রকম বিপুলকায় ধনুক কি গদা পথে-ঘাটে পাওয়া যায় না, অন্য কেউ ব্যবহার করা তো দূরের কথা, হাতে তুলতেই পারবে না।

শেষে অনেক ভেবেচিন্তে ওঁরা ঠিক করলেন, বিরাটনগরে ঢোকার মুখে শহরের বাইরে শ্মশানঘাটের পাশে এক জঙ্গলের মধ্যে একটি টিলা বা ছোট্ট পাহাড় আছে, সেখানে পুরনো খুব বড় এক শমী বা সাঁইবাবলা গাছের মগডালে সেগুলো বেঁধে রেখে যাবেন। হঠাৎ সেখানে কেউ যাবে না, নীচে যারা মড়া পোড়াতে আসবে, তারা নিজেদের কাজেই ব্যস্ত থাকবে, তা না হলে জঙ্গলের মধ্যে অত উঁচুর দিকে কে আর চেয়ে দেখছে?

তবু তাতেও যেন মন ঠিক শান্তি পায় না। বীর যোদ্ধার অস্ত্র বা হাতিয়ারই হল প্রাণ, ওঁদের তো ভবিষ্যতের এই একমাত্র সম্বল। কৌরবরা যে এই তেরো বছর ভোগ করার পর ওঁদের রাজ্য সহজে ফিরিয়ে দেবেন তা মনে হয় না। লড়াই করেই আদায় করতে হবে। এসব অস্ত্র ছাড়া সে লড়াই হবে কিসে?

ভাবতে ভাবতে অর্জুনের মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। শ্মশানঘাটে এক বেওয়ারিশ মড়া পড়ে ছিল, সেটাই তুলে এনে ঐ গাছের নীচু ডালে বেঁধে রাখলেন। যদি বা কেউ এখানে এসে ওপরের দিকে তাকায়, পচা মড়ার গন্ধে আর কঙ্কাল ঝুলছে দেখে ভয়ে পালাবে। গাছে ওঠার সাহস কারও হবে না।

কাজ সেরে যাবার পথে দু একজন জিজ্ঞেস করলে ওঁরা উত্তর দিলেন, আমাদের মায়ের শব, বহু দিনের কুলপ্রথা মড়া আমরা পোড়াই না, জলে ভাসাই না, মাটিতেও পুঁতি না। গাছে বেঁধে রাখাই নিয়ম। ওঁর ব্যবহার-করা বিছানা-মাদুরও ঐ সঙ্গে বেঁধে রাখতে হয়। এ প্রথা কেন? দু একজন জিজ্ঞাসা করতে এঁরা বললেন, তা জানি না। যা চলে আসছে চিরকাল, সেই ভাবেই তো করতে হবে!

কাজ সেরে তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়ে বিরাট রাজার রাজধানীর দিকে চলে গেলেন।

এ পর্যন্ত মহাভারতে আছে। যা নেই, সেইটুকুই বলছি।

আসলে মড়াটা মোটেই বেওয়ারিশ নয়। এক গরিব ব্রাহ্মণের মায়ের মৃতদেহ। ব্রাহ্মণের নাম? ধরো দেবদত্ত।

দেবদত্তর টাকাপয়সা জমিজমা কিছু ছিল না। মা মারা যেতে অনেকের কাছে মেগেপেতে, লোকের হাতেপায়ে ধরে পাঁচটি ব্রাহ্মণ ডেকে মায়ের শব নিয়ে শ্মশানে আসেন। তখনকার রেওয়াজ অনুযায়ী একগাড়ি জ্বালানী কাঠও সঙ্গে এনেছিলেন। শ্মশাঘাটে তখন কাঠ বিক্রীর ব্যবস্থা ছিল না। এখনও পাড়াগাঁয়ের দিকে নেই, যে মড়া আনে সে গাড়ি বোঝাই করে কাঠও আনে। সাধারণতঃ কেউ মারা গেলে সেই বাড়িরই কোন অকেজো বুড়ো গাছ—বিশেষ করে আমগাছ কাটা হয়।

এখন দেবদত্তর এমনই বরাত—ওঁরাও শ্মশানে পৌছলেন আর আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। পুরো দুই প্রহর বা ছ ঘণ্টা ধরে চলল সেই মুষলধারে বৃষ্টি, নদীনালা উপচে উঠল, কিছু বাড়িঘর ভেসেও গেল। যারা দেবদত্তর সঙ্গে এসেছিল শ্মশানবন্ধু—তারা সব যে যেদিকে পারল পালাল, কিছুক্ষণ এদিকে ওদিকে মাথা গুঁজে থেকে যখন দেখলো জল থামার কোন লক্ষণ নেই তখন কোনমতে ভিজতে ভিজতেই যে যার বাড়ি ফিরে গেল। পরের মড়ার জন্যে কি নিজের প্রাণটা দেবে? বামুনটার যা অবস্থা, একপাত বোধ হয় খাওয়াতেও পারবে না, অসুখ হলে বদ্যির খরচ দেওয়া দূরের কথা।

দেবদত্ত অবশ্য যতক্ষণ পেরেছিলেন ততক্ষণ গাছতলায় থেকে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন, শেষে তাঁরও অসহ্য হতে গ্রামে গিয়ে এক বাড়ির গোয়ালে মাথা গুঁজে আশ্রয় নিতে হয়েছিল তাঁকেও। এ অবস্থায় কোন গৃহস্থবাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেবে না, গোয়ালে নাকি দোষ নেই, ওটা কতকটা তীর্থের মতো।

জল যখন কমলো তখনও আসার উপায় নেই, সব জলে ভাসছে, গ্রামের পথ বেয়ে জলের ধারা চলেছে নদীর স্রোতের মতো। যখন আবার শ্মশানে আসার মতো অবস্থা হ'ল—এসে দেখলেন কাঠগুলোর একটিও নেই, শুধু কাঠ কেন, দাহ করার অন্য যা সব উপকরণ—নদীর জল বেড়ে সব ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। শবটা কিছু উঁচুতে একটা বড় পাথরের ওপর ছিল বলে সেইটে বেঁচে গেছে।

তখন গ্রামে এসে পুনরায় বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে ক'রে বেড়ানো—আবার সব যোগাড় করতেও

দেরি হল। তারা একবার দিয়েছে, বার বার দিতে গেলে বিরক্ত হবে বৈকি। ছোট্ট গ্রাম, বেশির ভাগ লোকই চাষী গৃহস্থ, কোন রকমে দিন কাটায়—তাদের এত বাড়তি সঞ্চয় নেই। জিনিসও তো কম নয়, কাঠ ঘি চন্দনকাঠ কর্পূর, তিল, কাঞ্চন, যবের আটা যোগাড় করে—ঐ সঙ্গে আর দুজন লোককে হাতে পায়ে ধরে ডেকে নিয়ে বলদের গাড়িতে সব চাপিয়ে যখন ফের শ্মশানে এসে পৌছলেন তখন দেখলেন মড়াটি নেই।

সর্বনাশ! দেবদত্ত তো মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন। স্বভাবতই এ অবস্থায় মনে হল বাঘে কি শিয়ালে খেয়েছে। কিন্তু তারা খেলে মাংসটাই খাবে, হাড়গুলো যাবে কোথায়? এক যদি জঙ্গলের দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে থাকে। তাও পাতি পাতি করে খুঁজলেন চারদিক, গভীর বনের মধ্যেও গেলেন—পাহাড়ের ওপরটা যে দেখা যেতে পারে তা অবশ্য মনে হয় নি—কোথাও কোন চিহ্ন পেলেন না।

যারা সঙ্গে এসেছিল গাড়ি টেনে, তারা বিরক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গেল—'পাগলা' বামুনটাকে গালাগাল দিতে দিতে। কাঠ-কুটো সব নিয়ে দেবদত্ত পড়লেন একা। এ কী অবস্থা হল তাঁর, কৈ আর কারও তো এমন হয়েছে বলে শোনেন নি। কোথায় গেল মার দেহ? তবে কি ভূত হয়ে উঠে চলে গেল? উঁহু, ব্রাহ্মণের মড়া, ভূত হবেই বা কেন! তা ছাড়া, ঠিক সময় মতো সৎকার হয় নি বলে যদি বা ভূত হয়ে থাকে—কাছাকাছি শূন্যে কোথাও থাকবে—দেহটা যাবে কোথায়?

অনেক ভাবলেন, অনেক খুঁজলেন। আরও পুরো একটা দিনরাত অপেক্ষা করেও যখন কোন হদিস হল না, তখন ডাক ছেড়ে খানিকটা কাঁদলেন দেবদত্ত—একা একাই। বরাতের দুঃখেই কাঁদলেন। তিনি এমনই হতভাগা—মায়ের মৃতদেহটাও সুশৃঙ্খলে সৎকার করতে পারলেন না। দু দুবার ভিক্ষা করে উপকরণ সংগ্রহ করলেন, কত না কাকুতি মিনতি করে লোক ডাকলেন—শুধু শুধু এই দীনতা স্বীকার করা সার হল। ছিঃ ছিঃ, এমন জন্মও বিধাতা দিয়েছিলেন তাঁর!

কিন্তু যতই কাঁদুন যতই কপাল চাপড়ান—আর না খেয়ে অপেক্ষা করে বসে থাকুন—কোন সুরাহাই হল না। না ফিরল সে মড়া, না পেলেন তার খোঁজ।

আসলে দেবদত্ত যখন দ্বিতীয়বার গ্রামে যান তখন সব যোগাড় করে ফিরতে তিন প্রহরের বেশী লেগেছে। এরই মধ্যে পাণ্ডবরা এসে কাজ সেরে চলে গেছেন। সে সময় তাঁদের সঙ্গে যাদের দেখা হয়েছিল তারা সবাই রাহী—জঙ্গলে কাঠ কেটে বাড়ি ফিরছিল, দূর-দূরান্তের গ্রামবাসী—তারাও কেউ তখনও বসে নেই যে খবরটা দেবদত্ত পাবেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হল, রাত্রি ঘনিয়ে এল—দেবদত্ত উঠলেন না। কোথায় যাবেন? কি করে যাবেন? মার মৃতদেহ সৎকার হল না, অশৌচান্ত হবারও কোন উপায় নেই। এ অবস্থায় বাড়ি যাবেন কেমন করে? আর কার বাড়িই বা যাবেন, কেউ তো ঘরে ঢুকতে দেবে না। গ্রাম থেকে ভিক্ষা করে দু দুবার সৎকারের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন—সেখানেই বা এ অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াবেন কোন্ মুখে? তা ছাড়া অশৌচান্ত না হলে, শ্রাদ্ধ ক্রিয়া শেষ করতে না পারলে অপর গোত্রে তো খাওয়াও চলবে না। গৃহস্থবাড়ির দাওয়াতেও উঠতে দেবে না কেউ। ওঠা উচিতও নয়।

না ফিরল সে মড়া, না পেলেন তার খোঁজ। [পৃ. ১৮৯

অবশ্য, কেউ কেউ বলেন, শব দাহ না হলে অশৌচ লাগে না। আবার তেমনি কেউ বা বলেন, শব শ্মশানে এলে দাহ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে দেহ ছেড়ে যেতে নেই, বিশেষ আত্মীয়দের। সেই একটা মহা অপরাধ হয়ে গিয়েছে, মার শবদেহ ছেড়ে গ্রামে ফিরে যাওয়া। উনি যদি বসে থাকতেন, অন্য কোন শবযাত্রী এলে তাদের কাউকে বসিয়ে গ্রামে যেতেন তাহলে বোধ হয় এমন হত না। ওঁর যে একটা ভাই বা নিকট আত্মীয়ও কেউ নেই যে—উনি ফিরছেন না দেখে সে খোঁজ নিতে আসবে। নিরুপায় হয়েই ওঁকে যেতে হয়েছিল—ভগবান কি সেটাও ভাবলেন না!'

দেবদত্ত আর সে শ্মশান ত্যাগ করলেন না।

ঐ অবস্থায় বসে আছেন, স্নান নেই, খাওয়া নেই, কাপড় বদলানো নেই—ক্ষৌউরী হওয়ার তো কথাই ওঠে না। দেখতে দেখতে চুল-দাড়ি-গোঁফ বড় বড় হয়ে উঠল, ধুলোয় কাদায় জট পাকিয়ে যেতেও দেরি হল না। মধ্যে মধ্যে নিষাদ বা ব্যাধরা আসে জঙ্গলে শিকার করতে, তাদেরই কার দয়া হল একবার, সে আর তার দলবল সেই শ্মশানেই পাতালতা দিয়ে একটা পর্ণকুটির বা 'ঝোপড়া' বানিয়ে দিয়ে গেল, বর্ষায় শীতে মাথা গুঁজে থাকার জন্যে। খাবারও দিতে প্রস্তুত ছিল তারা—হরিণের খরগোশের শজারুর তাজা মাংস—কিন্তু এই না-অশৌচ না-শুদ্ধ অবস্থায় তিনি ফল ছাড়া কিছু খেতে রাজী হলেন না। অগত্যা তারা বনে জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে কিছু বনফল বা কন্দ পেলে দিয়ে যেত। ওঁর কথা মুখে মুখে ছড়িয়ে যেতে অনেকেরই কৌতূহল বাড়ল। সবাই এসে নানা প্রশ্নে বিরক্ত করে বলে উনি কথা বলাই ছেড়ে দিলেন, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে চুপ করে থাকতেন, উত্তর দিতেন না। শেষে 'শ্মশানবাবা' বা 'মৌনীবাবা' বলে নাম রটে গেল—যে সব শবযাত্রীরা আসত তারাও কিছু কিছু ফলমূল এনে রেখে যেত।

এইভাবে পুরো একটি বছর কেটে গেল। জটায় দাড়িতে গোঁফেতে বড় বড় নখে এক বিদ্‌কুটে চেহারা দাঁড়াল দেবদত্তর, দেখলে ভয় করে এমন চেহারা। ওঁর নিজের গ্রামের লোকেরা এসে বলে, 'তুমি এ জায়গা ছাড়, ঘরে ফিরে যাও। মার জন্যে যথেষ্ট তো করলে, তবু সন্দেহ থাকে,

প্রায়শ্চিত্ত শ্রাদ্ধ করে শুদ্ধ হও গে। তোমার তো কোন দোষ নেই। আমরা শাস্ত্রের বিধান আনিয়েছি, এক বছর পার হলে মার কুশের মূর্তি তৈরী করে সেটা দাহ করেও শ্রাদ্ধ করতে পারো।'

দেবদত্ত এসব কোন পরামর্শেই কান দিলেন না। তাঁর বিশ্বাস একদিন না একদিন তিনি মার গলিত শবদেহ—অন্ততঃ তার কঙ্কাল বা হাড় কখানা ফিরে পাবেনই। মার প্রতি শেষ কর্তব্য পালন করে তবে তিনি অব্যাহতি নেবেন। ততদিন এই ভাবেই চলবে তাঁর প্রায়শ্চিত্ত।

এরপর মহাভারত যাঁরা পড়েছেন তাঁরা সবাই জানেন, পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের এক বছর পার হওয়ার ঠিক পরেই, বিরাট রাজা যখন সদলবলে অন্য এক শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে রাজ্যের বাইরে গেছেন—বৃহন্নলা বা অর্জুন ছাড়া বাকী পাণ্ডবরাও সেই সঙ্গে—কৌরবরা এসে ওঁর গোরুগুলি চুরি করে পালাচ্ছিলেন। রাজধানীতে ছিলেন বিরাটের ছোট ছেলে উত্তর, তিনি প্রথমটা খুব সাহস দেখিয়ে বলেছিলেন, 'একটা সারথি পেলেই আমি গিয়ে যুদ্ধ করে কৌরবদের হারিয়ে দেব।' অর্জুন তো ওর দৌড় জানেন, তবু তিনি হেসে বললেন, 'তুমি চলো, আমিই রথ চালাব।' বৃহন্নলা বা মেয়েছেলের বেশে অর্জুন রাজবাড়িতে মেয়েদের নাচগান শেখাতেন। অবাক্ হয়ে উত্তর বললেন, 'তুমি কি চালাবে? মেয়েছেলে?'

'চল না দেখাই যাক। গাড়ি চালানো আমার অভ্যাস আছে।'

উত্তর তো খুব উৎসাহভরে রওনা দিলেন কিন্তু কাছাকাছি এসে কৌরবদের বিপুল সেনাবাহিনী আর বড় বড় রথীদের দেখে ভয়ে তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি রথ ফেরাতে বললেন, অর্জুন কথা না শুনতে রথ ছেড়ে লাফিয়ে মাটিতে পড়ে দিলেন ছুট। অর্জুন তাঁর পিছু পিছু গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে ভয় ভাঙ্গিয়ে বললেন, 'তুমি বরং রথ চালাও, আমি যুদ্ধ করে, ওদের কাছ থেকে তোমাদের গোরু ফিরিয়ে নিই। তবে তার আগে অস্ত্র বা হাতিয়ার দরকার। ঐ যে টিলাটি দেখছো, ওর ওপর ঐ বড় সাঁইবাবলা গাছে আমাদের সব অস্ত্র বাঁধা আছে, তার মধ্যে আমার গাণ্ডীব আর অক্ষয় তূণও আছে, পেড়ে নিয়ে এসো।'

উত্তর ভয় পেয়ে বললেন, 'কিন্তু ওখানে যে মড়া বাঁধা। ছুঁলে নাইতে হবে!'

অর্জুন মিছে করে বললেন, 'মড়াটিড়া কিছু আর নেই ওখানে, অস্ত্রগুলোই ঐ রকম দেখতে। যাক গে, তোমার যখন সন্দেহ হচ্ছে, তখন পাশের ঐ ডালটার দিকে যেয়ো না, ওপর থেকে আমার ধনুক আর তূণীর নামিয়ে নিয়ে এসো।'

উত্তর সেই মতো করলে অর্জুন বর্ম আর ধনুক হাতে নিয়ে রথে চড়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দেখতে দেখতে ঘোর যুদ্ধ বেধে উঠলো। শেষ পর্যন্ত হারিয়েও দিলেন কৌরবদের, অপমানিত পরাজিত হয়ে তাঁরা ফিরে গেল।

একে এদিকটার জঙ্গল, সাঁইবাবলা গাছটাও প্রকাণ্ড, তা ছাড়া বেশ উঁচু টিলার ওপরেও বটে—সেই জন্যেই দেবদত্তের এদিকে নজর পড়ে নি, পচা মড়ার গন্ধও পান নি। এখন এই নির্জন

জায়গায় রথ আসতে দেখে স্বভাবতই কৌতূহলবশে কাছে এসেছিলেন, অর্জুনদের কথাবার্তাও তাঁর কানে গেছল। উত্তররা চলে যেতে তিনি আরও কাছে এসে ওপরের দিকে চেয়ে দেখলেন, ডালে বাঁধা কঙ্কালটাও নজরে পড়লো। ঐটেই যে তাঁর মায়ের হারানো কঙ্কাল সে বিষয়েও কোন সন্দেহ রইল না। মার মাথার গঠন,—ডান হাতের হাড়টা ভেঙেছিল—সে হাড়, সব মিলিয়ে পেলেন। কিন্তু তখনও তিনি সেটা নিয়ে যাবার কোন চেষ্টা করলেন না, এতকাল অপেক্ষা করে ওতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, সেখানেই স্থির হয়ে চুপ করে বসে রইলেন।

সন্ধ্যার কিছু আগে বিজয়ী অর্জুন ফিরে এসে অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে আবার শাড়ি পরে মেয়েছেলে সাজলেন—যদিও একবছর হয়ে গেছে, তবু সবাই মিলে কী ভাবে পরিচয় দেবেন সে পরামর্শ হবার আগে হঠাৎ অর্জুনবেশে যাওয়া ঠিক নয়—উত্তরকে বললেন, 'এই ধনুক আর তূণ যেমন ছিল তেমনি রেখে এসো।'

এইবার দেবদত্ত এগিয়ে এলেন। এতক্ষণে অর্জুনের পরিচয়ও তাঁর বুঝতে বাকী নেই। কাছে এসে বললেন, 'শোন, একটুখানি দাঁড়াও।'

অর্জুন তো অবাক্। এ আবার কী কিম্ভূতকিমাকার জীব তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে তাঁকে—এত বড় কুরুবাহিনী-বিজয়ী অর্জুনকে হুকুম করছে! মানুষ বলে চিনতেই দেরি হল। ঐ দাড়ি গোঁফ জটা, বড় বড় বাঁকানো নখে ঢাকা মূর্তিটা দেখে—সত্যি বলতে কি, অত বড় বীরও একবার একটু শিউরে উঠেছিলেন।

'কে তুমি? কী চাও?' শেষে ধমকের সুরেই প্রশ্ন করলেন অর্জুন।

'তুমি তো অর্জুন, তোমরা পাণ্ডব রাজারাই তো এখানে তীরধনুক বেঁধে রেখে গেছ?'

'হ্যাঁ, তাতে কি?'

'তাতে কিছু নয়। কিন্তু লোককে ভয় পাইয়ে চোর তাড়াবার জন্যে যে মড়াটা তুলে এনে বেঁধেছ—সেটি আমার মায়ের। আমার মায়ের দেহ আজও পোড়াতে পারি নি, আমিও লোকালয়ে মানুষের সমাজে ফিরতে পারি নি। আমরা ব্রাহ্মণ—এ হেন অনাচার আমাদর পক্ষে রীতিমতো অপরাধ, পাপ। নিজেদের সামান্য স্বার্থের জন্যে আমার মায়ের পরকাল ও আমার ইহকাল, সমস্ত জীবনটা নষ্ট করবার কী অধিকার ছিল তোমাদের? শবটা নেওয়ার আগে আমার অনুমতি নিয়েছিলে? তোমরা চিরদিনই ঘোর স্বার্থপর। শুনেছি নিজেরা নিরাপদে পালিয়ে বেঁচে, পরে রাজ্য ভোগ করবে বলে বারণাবতে এক নিষাদী আর তার পাঁচ ছেলেকে ডেকে এনে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে বেহুঁশ ক'রে রেখে গোটা বাড়িটায় আগুন লাগিয়ে বেচারাদের বেড়া আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিলে।'

বলতে বলতে রাগে যেন গলা বন্ধ হয়ে এলো ব্রাহ্মণের, একটু চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'তোমরা আজও তেমনিই আছো, এখানে অনায়াসে আমার জীবনটা নষ্ট করে দিলে, একবার ভাবলে না যাদের শব তাদের কী কষ্ট হতে পারে। তোমাদের বিবেকেও একটু বাধল না। শোন, এই আমিও অভিশাপ দিচ্ছি, যে রাজ্য-লোভে তোমরা শ্মশান থেকে শব চুরি করে এনে এই অন্যায়টা করলে, সে রাজ্য তোমরা পাবে কিন্তু তোমাদেরও সেই শ্মশানেই

অর্জুন তো অবাক্! এ আবার কী কিম্ভূতকিমাকার জীব... [পৃ. ১৯২

রাজত্ব করতে হবে। ভাই বন্ধু ছেলে— আপনার লোক বলতে একজনও থাকবে না। সব মড়া হয়ে এই শ্মশানে লুটোবে। আমার মাকে তোমরা যেমন তাঁর ছেলের আগুন থেকে বঞ্চিত করলে, তোমাদেরও মুখাগ্নি করতে একটি ছেলেও থাকবে না। তোমরা মনের সুখে ইন্দ্রপ্রস্থের মহাশ্মশানে রাজত্ব করো।

অর্জুন লজ্জায় মাথা হেঁট করে রথে চড়ে চলে গেলেন।

দেবদত্ত কিছুক্ষণ সেদিকে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে মায়ের কঙ্কালটা টানতে টানতে এনে নদীর ধারের সেই ঝোপড়ায় রাখলেন, তারপর ঝোপড়াটা ভেঙে তাতে চাপা দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিলেন। ঘরটা পুড়ে ছাই হয়ে যেতে কার একটা ফেলে যাওয়া কলসি নিয়ে নদীর জল তুলে এনে সে চিতা ধুয়ে ভগবানের নাম করতে করতে নিজেও নদীতে নেমে গেলেন। তাঁর আর জীবনের সাধ ছিল না, শক্তিও ছিল না যে ঘরে ফিরে গিয়ে আবার ভিক্ষা-দুঃখ করে শ্রাদ্ধশান্তি করবেন। না খেয়ে খেয়ে শরীর একেবারেই ভেঙে গেছিল, তিনি ঐ নদীতে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে ভগবানের নাম-জপ করতে করতেই প্রাণত্যাগ করলেন।

মুণ্ডাবাবা

—দৃষ্টিহীন

গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ঢুকে পড়েছিলাম সৈন্যবিভাগে চাকরি নিয়ে। যুদ্ধ চলছে, তাই ভেবেছিলাম মরণের মুখোমুখি হয়তো আমায় দাঁড়াতে হবে। কিন্তু যুদ্ধ কোথায়, আর আমি কোথায়। যুদ্ধ চলতে লাগলো সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে, আমি ভারতবর্ষে কোহিমা থেকে বম্বে, আর হিমালয় থেকে সেতুবন্ধ রামেশ্বর করে বেড়াতে লাগলাম। যদি ভারতে যুদ্ধ লাগে, কাজ আমাদের তখন শুরু হবে।

কিন্তু আমার সৌভাগ্যেই হোক, আর দুর্ভাগ্যেই হোক, ভারতে যুদ্ধ শুরু হল না, তাই মরণের মুখোমুখি আর দাঁড়ানোও হল না।

থাক সে কথা। এমনই যখন আমার মনের অবস্থা, তখন আমাদের কনভয় একদিন এসে পৌঁছালো দেওঘরে। দেওঘর থেকে সোজা চলে যাবে আসাম অঞ্চলে।

বন কেটে রাস্তা তৈরী হয়েছে অর্থাৎ দেওঘর থেকে জেসিডি হয়ে বনের ভেতর দিয়ে সোজা চলে যাবে মোকামাঘাট। আর এই মোকামাঘাট থেকে গঙ্গা পার হয়ে পৌঁছাতে হবে উত্তর বাংলায়; সেখান থেকে সোজা আসাম।

আমাদের কনভয় সকালবেলাই চালু হল। জেসিডির রেলস্টেশন পার হয়ে নতুন রাস্তা দিয়ে গাড়ি ছুটল পাহাড়ের কোল ঘেঁষে। কিন্তু এই জায়গায় হঠাৎ একটা দৃশ্য আমার চোখে পড়ল। একটা সুন্দর তকতকে বাংলো, পেছনে একটা ছোট সাঁওতালী গ্রাম।

বাংলোতে মানুষ বাস করে কিনা ঠিক বুঝতে পারলাম না। এগিয়ে চললাম, দাঁড়াবার উপায় নেই।

যতক্ষণ পারলাম, বাংলোটার দিকে চেয়ে রইলাম। অবশেষে একসময় চোখের ওপর থেকে বাংলোর ছবিটা মুছে গেল। কিন্তু মুছলো না তাঁর স্মৃতি। ওই বাংলো যেন আমাকে আকর্ষণ করতে লাগল। আর সেই আকর্ষণের টানে, আরও বছরখানেক পর আমি গেলাম জেসিডিতে। আমাকে দেখতে হবে ওই বাংলোতে কে থাকে।

তাই '৪৬ সালে ছুটি নিয়ে আমি আবার দেওঘর গেলাম। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি, আজকের দেওঘর-জেসিডি দেখলে, সেদিনকার দেওঘর-জেসিডির কোন কল্পনাই করা যায় না। সন্ধ্যের সময় দেওঘর ছাড়লে একেবারে ডুবে যেতে হত অন্ধকারের মাঝখানে। তখন সম্বল ছিল হ্যারিকেনের আলো কিংবা টর্চ। আর তা না থাকলে আকাশের তারার আলো।

আমার মনে প্রশ্ন, ওই বাংলোতে কে থাকে? একদিন সকালবেলা গরুর গাড়ি চড়ে গেলাম জায়গাটায়। দেখলাম, ঘরগুলো সব বন্ধ, বটের ঝুরি নেমেছে। সীমানার দেওয়ালটাও অশ্বত্থ আর বটগাছের জন্য জায়গায় জায়গায় ফেটে গেছে। বাড়ির সামনে লেখা আছে, "রেভারেন্ড ফিলিপস্ অ্যালফ্রেড ক্যান"। বুঝলাম, বাড়িটা কোন পাদরী সাহেবের ছিল।

কিন্তু এই জঙ্গলে কেন তিনি? পেছনের সাঁওতাল বস্তিতে খোঁজ করলাম, ফিলিপস্ সাহেব কোথায়। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, তিনি অদ্ভুত রহস্যজনকভাবে মারা গেছেন। তিনি কিভাবে যে মারা যান, তা কেউ বলতে পারে না, তবে একদিন সকালে সাহেবকে তাঁর নিজের বিছানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। পুলিশ তদন্ত হয়, কিন্তু কোন কারণ পাওয়া যায়নি। তবে স্থানীয় লোকেদের বিশ্বাস, গ্রামের মধ্যে যে মুণ্ডাবাবা রয়েছেন, তাকে তিনি পুজোর দিনে অপমান করেছিলেন। পুজোর মণ্ডপে জুতো পরে গিয়েছিলেন। স্থানীয় লোক বহু বারণ করেছিল তাঁকে। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, এক যীশু ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কোন দেবতা নেই। সেই রাত্রেই তিনি মারা যান। ওই বাড়ির পেছনেই তাঁকে কবর দিয়ে রেখেছে।

আমি মিলিটারি ফেরত, এ কাহিনী আমার বিশ্বাস হবে কেন! তারপর যখন শুনলাম, খাজনার অনাদায়ে ঘাটোয়াল (সিপাহী বিদ্রোহের সময় যে সমস্ত লোক ইংরেজদের সাহায্য করেছিল, তাদের ইংরেজরা পরে বিহারের স্থানে স্থানে জমিদারি দেয়। তখন এ সমস্ত জমি পুরো বনে ভরতি ছিল। তাদেরই বলা হয় ঘাটোয়াল) সাহেবের বাড়ি ও জমি খাসে নিয়ে নিয়েছেন। তখন সস্তায় পাবার আশা আমার মনে জেগে উঠল। দেখাই যাক না, যদি এই বাড়ি ও জমি পাওয়া যায়।

সেখান থেকে গেলাম ঘাটোয়ালের কাছে। আমাদেরই বয়সী হবেন তিনি। ফিলিপস্ সাহেবের বাড়ি ও জমি আমি নিতে চাওয়ায় তিনি বললেন, "ওটা নেবেন না বাবু।"

আমি নাছোড়বান্দা। মাত্র হাজার টাকায় প্রায় পাঁচ বিঘে জমি ও বাড়ি আমি কোথায় পাব?

আমি নাছোড়বান্দা দেখে ভাঙা বাংলায় তিনি বললেন, "বাবুজী, যে জমিতে দিনের বেলায় লোকে ঢুকতে চায় না, ঠিক বুঝতে পারছি না, আপনি কেন সেই জমি ও বাড়ি চান। অবশ্য আপনি নিলে আমার টাকা লাভ হয়, কিন্তু তবুও বলছি, আপনি নেবেন না।"

আমার কিন্তু সেই এক কথা, ও বাড়ি আমার চাই।

'মুণ্ডাবাবা, দয়া করে বাবুকে ক্ষমা কোর।'' [পৃ. ১৯৮

আমাকে নাছোড়বান্দা দেখে তিনি বললেন, ''তাহলে এক হাজার টাকা জমা দিয়ে ওর সমস্ত স্বত্ব আপনি ৯৯ বছরের জন্য ভোগদখল করুন। জানি না বাবা মুণ্ডার মনে কি আছে, তিনি আপনার মঙ্গল করুন।''

সেইদিনই সব সই-সাবুদ হয়ে গেল, আর সন্ধ্যে থেকে রেভারেণ্ড ফিলিপস্ সাহেবের বাড়ির মালিক হলাম আমি। রাত্রে আর সেখানে যেতে সাহস হল না, তাই ফিরে গেলাম দেওঘরে আমার নিজের হোটেলে।

ভূত-প্রেতের ভয় আমি কোনদিন পাই না, তাছাড়া পুজোমণ্ডপেও আমি তাঁকে অশ্রদ্ধা করিনি। সুতরাং আমার কোনো ভয় ছিল না। কিন্তু সাপখোপ, বন্য বিছে, জন্তু-জানোয়ারের ভয় তো আছে। তাই তাদের হাত থেকে বাঁচবার উপায় ঠিক না করে ওখানে যাওয়াটা যুক্তিসঙ্গত হবে না বলেই আমার মনে হল।

পরের দিন একেবারে মালিক হয়ে বাড়িতে ঢুকলাম। দেখলাম, বাড়ির জানালার কাঠ দামী সেগুনের। খাট-আলমারি, টেবিল-চেয়ার যা রয়েছে, তার দাম খুব কম হলেও পাঁচ ছ'হাজার টাকার নীচে নয়। বসবার ঘরে সোফা-কোচও রয়েছে, তবে অব্যবহারের ফলে সবই নোংরা। প্রত্যেক ঘরে ঘরে রয়েছে কেরোসিন তেলের বাতির ঝাড়, সেগুলো আবার বিলিতী বেলোয়ারি কাচ দিয়ে ঢাকা। মনে মনে একটা হিসেব করে নিলাম কত টাকা লাভ করেছি।

আমাকে দিনের বেলা বাড়িতে ঢুকতে দেখে পাশের গ্রামের দু'চারজন সাঁওতাল যুবক আমার কাছে এসেছিল। তাদের মধ্যে থেকেই একজনকে সেই বাড়ির মালী ঠিক করলাম। তার নাম ছিল শুক্রা। শুক্রার চেহারাটা ছিল একেবারে কষ্টিপাথরে গড়া। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, আর গায়ে ছিল অসম্ভব শক্তি। শুক্রা আমার মালী হওয়ায় মনে মনে খুশীই হলাম।

সেই লোকজন ডেকে নিয়ে এসে বাড়ি সাফের ব্যবস্থা করল। প্রায় মাস দেড়েকের মধ্যে বাসের যোগ্য করে তুলল। এইবার একটা ভাল দিন দেখে বাড়িতে গিয়ে থাকার মনস্থ করলাম।

শুক্রা আমাকে বলল, ''বাড়িতে ঢোকবার আগে আপনি একটা মুণ্ডাবাবার পুজো দিন।'' মুণ্ডাবাবার

হেঁইয়ো—তার এক হ্যাঁচকায় উঠে আসি সটান।

তারা রণজয়কে চেপে ধরে তুলে নিয়ে গেল।

পুজো! হাসি পেল। বিজ্ঞানের যুগের ছেলে আমি, ঠাকুর দেবতা, ভগবান কিছুই বিশ্বাস করি না। তবুও তার সামনে হাসতে পারলাম না। কারণ আমি জানি, আমি হাসলেও এরা মুণ্ডাবাবাকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে।

তাই কথাটা ঘুরিয়ে বললাম, "চল, তোমাদের মুণ্ডাবাবাকে একবার দেখে আসি।"

আমার বাংলোর ঠিক পাশ দিয়ে এবড়ো-খেবড়ো আলের রাস্তা। তাই ধরে প্রায় কোয়ার্টার মাইল যাবার পর পড়ল সাঁওতাল পল্লী। আর ওই পল্লীটার শেষে যেখানে বন আরম্ভ হচ্ছে, সেইখানে রয়েছে মুণ্ডাবাবার মন্দির। মন্দির মানে ইট-সিমেন্ট বা পাথরের নয়, একটা কাদা দিয়ে বেদীর মত করা হয়েছে।

বেদীর ওপর একটি কাঠের বিগ্রহ। চারদিকে চারটে বাঁশ পুঁতে তার ওপর হোগলা দিয়ে ছাউনি করা হয়েছে। সেই ছাউনি দেবতাকে বাঁচিয়ে রাখে রৌদ্র আর বর্ষার হাত থেকে। কিন্তু মুণ্ডাবাবার মূর্তি দেখে আমি চমকে উঠলাম, একটা আধবয়সী বৃদ্ধের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু মুখখানা কি ভয়ংকর! চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে রেরোচ্ছে। মুখখানার সঙ্গে বেড়ালের মুখের অনেক মিল আছে। মুখ থেকে জিভটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, যেন সে কার রক্তপান করতে চায়।

পুজোর উপকরণের মধ্যে সেখানে দেখলাম, দশটা মুরগী আর একটা ছাগল বাঁধা রয়েছে। পুজোর উপকরণ বলে বুঝলাম, কারণ প্রত্যেকটির মাথায় সিঁদুর দেওয়া ছিল। জায়গাটা বড় অস্বস্তিকর, তাই শুক্রাকে বললাম, "চল্ এখান থেকে চলে যাই।"

শুক্রা বলল, "কিছু পুজো দেবেন না?"

ওইরকম এক বীভৎস দেবতাকে পুজো দেবার ইচ্ছে আমার মোটেই ছিল না। তবুও কি করব, কারে পড়ে রাজি হতে হল।

জিজ্ঞেস করলাম, "কি পুজো দিতে হয় এখানে?"

শুক্রা বলে, "বাবা তো সকালে পাঁঠার মাংস আর ভাত খান। রাত্রিতে খান রুটি আর মুরগী। ওই তো বাঁধা রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন না? আপনি অন্ততঃ দুটো মুরগীর দাম দিন।"

মুরগীর দাম দেব কি, তখন যে কোন উপায়ে সেখান থেকে পালিয়ে আসতে পারলে বাঁচি। তাই কোন রকমে দুটো মুরগীর দাম দিয়ে শুক্রাকে বললাম, "চল্।"

একবার সে প্রশ্ন করল, "প্রসাদ নেবেন না?"

আমি ওকে এড়াবার জন্যই বললাম, "আর একদিন এসে নেব।"

কোন রকমে গৃহপ্রবেশ হয়ে গেল। সে বাড়িতে রাত্রিবেলা যখন কেরোসিনের বাতি জ্বলল, তখন সত্যিই যেন একটা মায়াজাল সমস্ত বাড়িটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

এর কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন গ্রামের দিক থেকে ঢাকের আওয়াজ শোনা গেল। কিসের আওয়াজ! শুক্রাকে জিগ্যেস করলাম। শুক্রা বলে, "মুণ্ডাবাবার আজ বিশেষ পুজো। এই গ্রামের সব লোক আজ মুণ্ডাবাবার পুজো দিতে যাবে। বাড়িতে কেউ রাঁধবে না, সকলে খাবে ওই মন্দিরের চত্বরে।"

এরপর শুক্রা বলল, "আপনি কিছু দেবেন না সাহেব?"

আমি বললাম, "সকলে যদি বোকা হয়, আমিও কি তোদের মত বোকা হব? নে, রান্না চাপা।"

শুক্রা বলে, "আপনার জন্য রান্না করে দিচ্ছি, তবে আমি কিছু খাব না। আমি আজ ওখানে প্রসাদ খাব। মুণ্ডাবাবার রাজ্যে বসে, তাঁকে অস্বীকার আমি করতে পারব না। আপনিও বাবু প্রসাদের একটু মাংস খেলে ভাল করতেন।"

আমি বললাম, "মাংস কি রকম রান্না করে রে?"

—"খেয়েই দেখুন, তবে আপনাদের মতো রান্না হবে কি? এ আমাদের বন্যদের রান্না, মাংসটাকে কোনরকম ভাবে পুড়িয়ে খাওয়া।"

আমি একটু মুখ সিটকালাম, যার অর্থ, মাগো।

আমাকে মুখ সিটকাতে দেখে শুক্রা যেন লাফিয়ে উঠল, "বাবু কি করলেন, বাবু কি করলেন। "মুণ্ডাবাবার প্রসাদকে এত ঘেন্না করলেন?"

কপালে হাত ঠেকিয়ে সে বলে, "মুণ্ডাবাবা, দয়া করে বাবুকে ক্ষমা কোর।"

আমি একটু মুচকে হাসলাম। মনে মনে ভাবলাম, এই অজ্ঞ বিশ্বাস সারা দেশে আজ উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সকালটা এইভাবেই কেটে গেল। দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে বেশ ঘুম দিচ্ছি। শুক্রা মুণ্ডাবাবার পুজোতে গেছে, সন্ধ্যের সময় আসবার কথা। ঘুমোতে ঘুমোতে মনে হল, আমার বাংলোর দরজায় কে যেন সজোরে লাথি মারছে। সে লাথির আওয়াজ আমি পরিষ্কার শুনতে পেলাম। তাই তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে ছুটে গেলাম, দরজা খুলে দিতে।

লোকটা কি অসভ্য! দরজায় ধাক্কা মারছে, মনে হচ্ছে, দরজাটাকে ভেঙ্গে যেন ঘরে ঢুকতে চায়। আমি যতবার মুখে 'যাই' বলছি, তাতে যেন তার ভ্রূক্ষেপ নেই। চোর ডাকাত নয়তো! আমি একা আছি জেনে দরজায় ধাক্কা মারছে।

কিন্তু এখানে চোর ডাকাতের কথা তো শুনিনি। হতে পারে এখানের বাসিন্দারা গরিব, তা বলে এরা হিংস্র চোর ডাকাত নয়।

আমার রিভলবারটা বের করলাম, গুলি ভরতি করে নিলাম, তারপর দরজা খুলতে গেলাম। ইচ্ছে, তেমন বুঝলেই গুলি চালাব। অন্তত মরবার আগে ওদের দলের চার পাঁচজনকে নিয়ে যাব। ওরা বুঝুক, ক্যাপ্টেনও কিছু কম নয়।

তখনও অনর্গল দরজায় ধাক্কা পড়ে যাচ্ছে। দরজা খুললাম। হরি হরি, কে কোথায়। কেউ তো দাঁড়িয়ে নেই কাছে পিঠে। তবে, দরজায় কে ধাক্কা মারল! আমি তো নিজেই বিস্মিত।

বাংলো থেকে বাগানের মধ্যে নামলাম। দেখলাম, বাগানের ফটক আগেকার মতই বন্ধ রয়েছে। বাগানের মধ্যে গিয়ে ঘুরতে লাগলাম। সেখানে দেখি, শুক্রা নিজে হাতে তকতকে পরিষ্কার করে রেখেছে, একটি ছেঁড়া পাতাও পড়ে নেই, মানুষ থাকা তো দূরের কথা।

সারা বাগানটা ঘুরে বেড়ালাম। তবে আমি কি স্বপ্ন দেখে ভয় পেলাম! কিন্তু, ঘুম থেকে উঠে রিভলবারটা যখন হাতে নিয়েছি, যখন গুলি ভরেছি, তখনও তো আওয়াজ শুনেছি। এ তো ভুল হবার নয়। তবে মানুষটা উবে গেল কি করে! সেই চিন্তায় বাকী দিনটুকু অর্থাৎ শুক্রা না আসা অবধি বাগানে

পায়চারি করেই আমার কেটে গেল।

বিকালবেলা কিন্তু ঘটল আর একটা বিপদ। পশ্চিম দিক থেকে একটা কালো মেঘ সনসন করে এসে সারা আকাশটা ছেয়ে ফেলল। দম্‌কা হাওয়া উঠে সমস্ত বাড়ি-ঘরদোরগুলোকে যেন কাঁপিয়ে দিতে লাগল। পেছনের বনের শাল মহুয়ার গাছগুলো যেন আর মাটির বুকে আটকে থাকতে চাইল না। তাদের বন্দী দশা কাটিয়ে তারা ছুটে বেড়াতে চায়। কিন্তু বাঁধন কাটতে পারছে না, তাই মাটির ওপর শুয়ে পড়ে তাদের পালাবার কি আগ্রহ।

এমনি সময় শুক্রা ফিরে এল। আমিও বাইরে থাকা বিপজ্জনক মনে করে বাড়ির ভেতরে আশ্রয় নিলাম।

শুক্রা চা করে আমায় দিল, তারপর বলল, "সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

বন্যজন্তুর চোখ মনে করে সেইদিকে তাক করে গুলি করলাম। [পৃ. ২০০

আমি প্রশ্ন করি, "কি হয়েছে?"

—"বাবার পুজোতে আজ খুঁত হয়েছে। তিনটে মুরগী বলির সময় হঠাৎ কোথায় পালিয়ে গেছে।"

আমি বললাম, "তাতে বিপদ কি হল?"

শুক্রা বলে, "বিপদ অন্য কিছু নয়, সেই তিনটে মুরগী না দিতে পারলে কার ওপর যে বাবা রুষ্ট হবেন, তা বলা খুব শক্ত।"

আমি হাসতে গেলাম, কিন্তু পারলাম না। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, বিকালবেলা কে যেন আমার দরজা ঠেলেছিল।

রাত্রের খাওয়া দাওয়া মেটবার আগেই আকাশ ভেঙে নামল বৃষ্টি, আর তার সঙ্গে বাজ ডাকারও শেষ নেই। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সমস্ত পৃথিবীটা জুড়ে যে কালো অন্ধকার নেমেছে, সেটাকে যেন খান খান করে ছিঁড়ে ফেলছে। সে কি ভয়ংকর। গা আমার এমনিতেই ছমছম করতে লাগলো। মুখে কিছু প্রকাশ না করে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলাম তাড়াতাড়ি। তারপর আশ্রয় নিলাম বিছানার কোলে।

কিন্তু অব্যাহতি কি আমার আছে। বেশ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ আমার মনে হল, সারা বাংলোটা জুড়ে খড়ম পরে কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। আশ্চর্য ব্যাপার! কে এই বর্ষাবাদল রাত্রে বারান্দায় পায়চারি করতে পারে।

বিছানা থেকে আবার উঠলাম, শুক্রাকে ডাকলাম। শুক্রা আওয়াজটা আগে থেকেই শুনেছিল।

সে বলল, "বোধহয় মুণ্ডাবাবা এসেছেন আপনার কাছে মুরগীর জন্য।"

আমার সাহস তখন অনেক কমে গেছে। আমি বললাম, কি করে বুঝলি?

সে জবাব দিল, "দরজা খুললে আপনিও বুঝতে পারবেন।"

বন্দুক হাতে করে শুক্রাকে সঙ্গে নিয়ে আমি দরজা খুললাম। কিন্তু কারুকেই দেখতে পেলাম না। একটা কাঠের মানুষ কিংবা জন্তু যে ঘুরে বেড়াচ্ছে বারান্দায় তা পরিষ্কার অনুভব করলাম, অবশ্য দেখতে কিছুই পেলাম না। স্তব্ধ আমি।

ঠিক সেই সময় ওই কাঠের পায়ের আওয়াজের সঙ্গে অন্ধকার ভেদ করে দুটো দপদপে হিংস্র চোখ যেন আমি দেখতে পেলাম। ওঃ, কি বীভৎস, সমস্ত বুকের রক্তটা যেন ঠাণ্ডা হয়ে যেতে চায়।

কোন বন্যজন্তুর চোখ মনে করে সেই দিকে তাক করে গুলি করলাম। সঙ্গে সঙ্গে আকাশে বাজ ডেকে উঠলো। বিদ্যুতের আলোয় একটা অস্পষ্ট ছায়া দেখতে পেলাম। আমার মনে হল, সে ছায়া আর কারুর নয়, মুণ্ডাবাবার।

মনের দুর্বলতা কাটিয়ে আবার গুলি করতে যাচ্ছিলাম। আবার পৃথিবী কাঁপিয়ে বাজ পড়ল। আলোতে আবার সেই দৃশ্য।

গুলি ছুড়তে যাব, শুক্রা বলল, "করছেন কি সাহেব? ওঁর গায়ে গুলি লাগলে আপনি আমি আজ রাত্রে আর কেউ বাঁচব না। তার চেয়ে বলুন, আজকের তিনটে মুরগী তো আপনি দেবেনই, কালকে ছাগল এবং আরও পাঁচটা মুরগী আপনি দিয়ে আসবেন।"

আমিও শুক্রার কথাতে তাই বলে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গে কি আশ্চর্য ব্যাপার, ভোজবাজির মতো সেই খটখট আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। আর সেই বীভৎস চোখ দুটোকেও দেখা গেল না।

শুক্রা দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, "সাহেব, শুয়ে পড়ুন, আর কোন ভয় নেই।"

আমি যন্ত্রচালিতের মতো গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

পরের দিন সকালবেলা শুক্রাকে দিয়ে পুজোর সব কিছু উপকরণই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আমি নিজেও একবার গিয়েছিলাম মুণ্ডাবাবাকে দেখতে। পল্লীর মধ্যে ঢুকে দেখি, কাল ঝড়ে বহু লোকের চালা উড়ে গেছে। বৃষ্টির জলে অনেকের মাটির দেওয়ালের ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, মুণ্ডাবাবার মাটির বেদীর, আর হোগলার চালার এতটুকু ক্ষতি হয়নি।

সেদিন শুক্রা পুজো দিয়ে এসে আমাকে প্রসাদ দিয়েছিল, আমি তা খেয়েও ছিলাম।
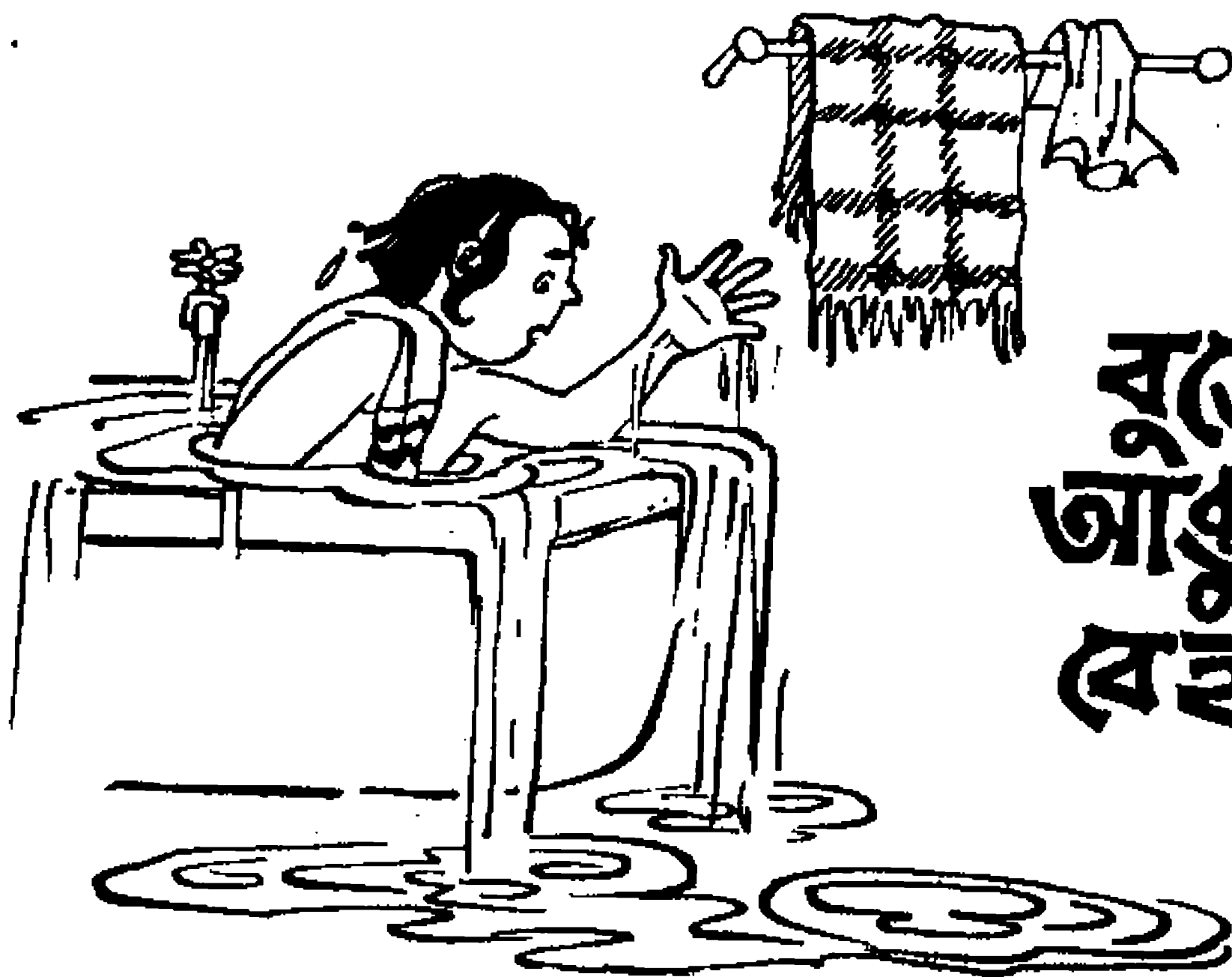
বুড়ো আঙুল বেহাত

—শিবরাম চক্রবর্তী

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, বিরাগের বশে কদাচ কাউকে প্রদর্শনের বস্তু হলেও, বস্তুতঃ যা জানি, অকস্মাৎ কিছু অদর্শন হবার নয়।

এবং সেটাও, মানে, এই প্রদর্শনীর কাজটা কেবল হাতের বুড়ো আঙুলের সাহায্যেই হয়, কেন না পায়েরটিকে কোথাও পা তুলে পাচার করতে গেলে তখুনি উলটে পড়ে আছাড় খাবার কথাই!

পায়ের বুড়ো আঙুল হাজার রাগ হলেও কেউ কখনো কাউকে দেখাতে যায় না।

সেটা কিছু দর্শনীয় জিনিস নয়। প্রদর্শনীয়ও না।

কিন্তু তাই যদি, কাউকে দেখাতে না গিয়েও, হঠাৎ লোপাট হয়ে যায় তাহলে কী বলব?

যাই বলি না কেন, সেদিন সেটা আমার গাছাড়া হয়ে গেল হঠাৎ। আমার এই চোখের সামনেই তাকে গায়ের ওপর গায়েব হয়ে যেতে দেখলাম।

তাজ্জব বনতে হয়।

'অনিমেষদা এসেছিলেন', বাড়ি ফিরতেই বিনি জানালো, 'নেমন্তন্ন করে গেছেন আমাদের।'

'কেন হঠাৎ?' আমি একটু অবাক হই, কইতে কি!

'নতুন বাড়ি বানিয়েছেন না?' সে বলে, 'তাই দেখতেই ডেকেছেন আমাদের।'

'কেন, বাড়ি কি আমরা কখনো দেখিনি নাকি? রাস্তায় পা বাড়ালেই তো বাড়ি দেখা যায়। দুধারেই এনতার—নানা রঙের নানা ঢঙের—কতো রকমের বাড়ি যে! বিনে পয়সাতেই দেখা যায়।' আমি জানাইঃ 'তাই দেখতে আবার গাঁটগচ্ছা দিয়ে সাত মাইল ঠেঙিয়ে কেউ যায় নাকি?'

'অনিমেষটার বাড়ি নাকি যা তা বাড়ি নয় নেহাৎ।' সে না বলে পারে না, 'দেখলে তাক লেগে যায় নাকি। তাকিয়ে দেখবার মতই নাকি একখানা।'

'তাই বুঝি? দেখলে তাক লেগে যায়?'

'বললেন তো! গৃহপ্রবেশের দিন যাইনি আমরা, তাই দুঃখ করলেন কতো।'

'করবেই।' আমি সায় দিই কথাটায়—'শুধু তার বাড়ি কেন সেও এখন দস্তুরমতই মর্তমান।'

'কী বললে অ্যাঁ? সে কী কথা!' বিনি নিজেই যেন হতবাক্।

'বর্তমান বলতে গিয়ে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে কথাটা।' আমি কইঃ 'তবে সেকথাও বলা যায় বই কি। লটারির টাকাটা পেয়ে গিয়ে বাড়িটা বানিয়েছে না? বাড়ির মতন সে নিজেও এখন একটা দর্শনীয়। লটারির টাকা পায় কজনা? বাড়ির মতই জলজ্যান্তরূপে মর্তমান।'

'মর্তমান?'

'তাছাড়া কী? আঙুল ফুলে কলাগাছ হলে কী হয়?' আমার ব্যাখ্যা করা।—'তখন সে একটা প্রদর্শনী হয়ে ওঠে। সবাইকে নিজের কলাকাণ্ড দেখাতে চায়। কাঁদি কাঁদি।'

'কাঁদি কাঁদি?'

'তাও বলা যায় বই কি এখন। কিন্তু কাঁদিতে তো জীবন গেল, তার ওপর কারো বাড়ি বয়ে কাঁদতে যেতে আমার ইচ্ছে করে না।' আমি জানিয়ে দিই।

'কাঁদবে কেন? ওঁর গৃহপ্রবেশের দিন যাইনি তো। সেদিনকার দারুণ খাওয়া-দাওয়া ফসকে গেছে আমাদের। আজ গেলে সেটা পাওয়া যাবে। খাওয়াবেন খুব।'

তাই নাকি? তাহলে আর বেশী বলতে হয় না। তক্ষুনি আমরা বেরিয়ে পড়ি।

বাড়ি নয়, বেশ বাড়াবাড়িই করে বসেছে দেখি গিয়ে।

বৈঠকখানায় ঢুকতেই তাক লেগে যায় আমার।

'না, মেজেটা মোজাইক করা নয়।' বিনি একটু খুঁতখুঁত করে দেখে।

'মোজাইক নয়, তবে মোজা আছে ঠিকই।' আমি বলি, 'মার্বেল পাথরের মেজে তো! ওর মার্জিত রুচির পরিচয়।'

'তুমি যে বললে মোজাইক নয় তবে মোজা আছে ঠিক।' বিনি শুধোয়—'মোজাটা কোথায় শুনি?'

'পিছলে পড়লেই টের পাবি'খন।' আমি বলি—'মাথা ফেটে চৌচির! আর বেশ মোজা পাব আমি।'

'বৈঠকখানা তো বানিয়েছে বেশ, কিন্তু বাথরুমটা কোন দিকে?' জানতে চাই তারপর—'জলযোগের আগে একটু জলবিয়োগ করে নেওয়া দরকার। বাহার না করলে আহার রাখব কোথায়? জলবিয়োগ স্থলবিয়োগ দুইই করে যাই না হয়।'

বাথরুমটা দেখে বলতে হয়—সাবাস!

লম্বা চওড়া চমৎকার একখানা। এর মধ্যে আয়েসে গড়িয়ে আগাপাশতলা খাসা চান করা যায় আরামে।

এমন একখানা কোথাও আমি কারো বাড়িতেই দেখিনি।

তবে কটা বাড়িই বা দেখেছি আমি।

'বাথটব। হাঁ করে দেখছ কি আবার!' বিনি না বলে পারে না—'তাকিয়ে দেখবার জিনিস নয়, চান করে দেখবার।'

'তাই দেখব ভাবছি।' আমি বলি। 'এমন বাথটবম্ পরিত্যজ্য পাদমেকম্ ন গচ্ছামি। তুই ভেতরে যা, অনিমেষের বৌকে বলে দিস যে একটি ক্ষুদ্র রাক্ষসকে ল্যাজে বেঁধে নিয়ে এসেছিস।'

এখন হাঁ করে এই দেখার পর খাবার পাতে হাঁ হাঁ করে পড়ব গিয়ে। এখন চোখে দেখার পর, তখন সেটা হবে চেখে দেখার ব্যাপার!
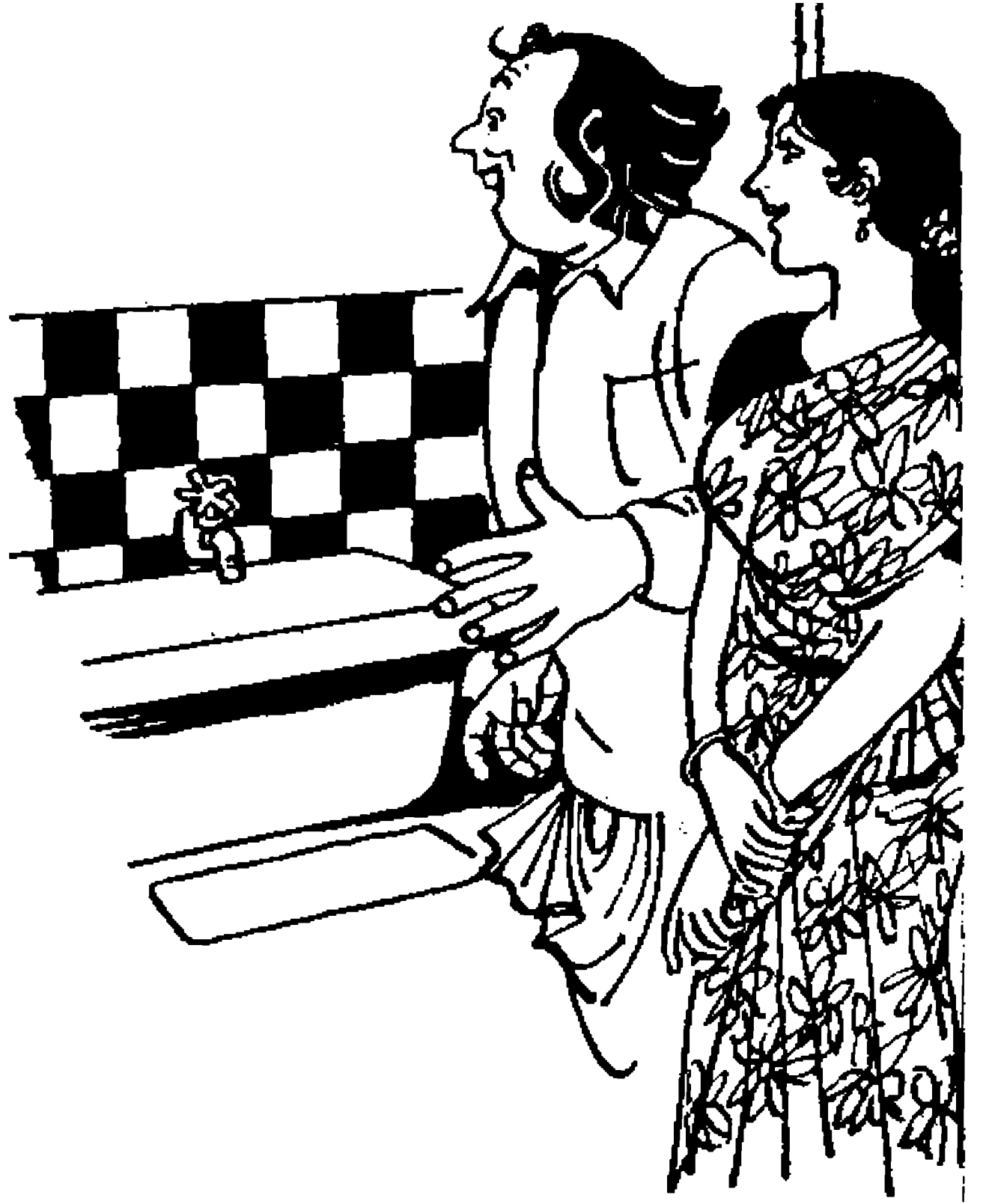
'বাথটব। হাঁ করে দেখছ কি আবার!'

খাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, এখন আমার স্নানযাত্রা শুরু হোক। আলনায় গামছা তোয়ালে মজুদ সব। গামছাটা নিয়ে জামা কাপড় খুলে সব সেখানে রাখলাম। তারপর গড়ালাম গিয়ে টবটায়। লম্বা চৌড়া চকচকে চৌকস টব। গা গড়িয়ে পা ছড়িয়ে লম্বা হওয়ায় বাধা নেই কোথাও। দুধারে গায়ে লাগানো দুটো কল। খুলে দেখি একটা গরম আর একটা ঠাণ্ডা জলের। ঠাণ্ডা জলেরটা খুলে দিয়ে টব ভরতি হলে তারপরে খানিক গরম জল মিশিয়ে আরামদায়ক গা সওয়া করে নিলাম।

জলে টইটম্বুর হোলো টবটা। জল তো ভরে উঠলো। একি, আরো ভরতি হচ্ছে দেখি। এত জল বেরুবার পথ আছে কি কোথাও? দেখতে হয় এখন!

ভাবনার কথাই বই কি। নইলে এই টবের জলেই সলিলসমাধি হয়ে যাবে আমার। আমি আবার সাঁতার জানিনে। জানলেই বা কী, এইটুকুর ভেতর কি সাঁতার কাটা যায়? টইটুম্বুর এই টবের মধ্যেই হাবুডুবু খেতে হবে আমায়।

'বিনি, ও বিনি', হাঁক পাড়তে হয়—'জল তো হোলো বেশ।' আমি বলি—'এখন এ জল বার করা যায় কি করে। কোন্ পথে তাই বল।'

'ওমা! তোমার বুড়ো আঙুলের আধখানা দেখছি না তো।' [পৃ. ২০৫

'ডানদিকের কলটা ডান দিকে ঘুরোও। বাঁদিকেরটা বাঁ ধারে।' সে এসে বাতলায়।

'আরে, তাই করেই—সেই পথেই তো জল এসেছে। কিন্তু বেরুবে কি করে? কোন্ পথে?'

'উল্‌টো করে ঘুরিয়ে দ্যাখো না!'

উল্‌টো পালটা সব করেই ঘুরিয়ে দেখি, কিন্তু জল ক্রমশঃ বাড়তেই থাকে। কানায় কানায় জল গলায় গলায়। আমি তলাচ্ছি তার তলাতেই।

আর, আমার অন্তস্তল থেকে নিঃশব্দে আর্তনাদ উঠছে—সর্বনাশ!

বাথটব থেকে টবটবে জল উছলে এখন অনিমেষের বৈঠকখানায় উথচে পড়ছে। উথালপাথাল দৃশ্য। নির্নিমেষ নেত্রে এ দৃশ্য দেখা যায় না।

'টবের তলার দিকে কোথাও জল বেরুবার কোনো ছ্যাঁদা আছে আলবাত। হাতড়ে দ্যাখো।' সে বাতলায়।

কোথায় হাত আর কোথায় আমি! বসার সময় অবশ্যই টবের পাতলের দিকে একটা ছিপি আটকানো ছ্যাঁদার মত দেখেছিলাম যেন, সেইটাই পা দিয়ে হাতড়াই। কিংবা পাতড়াই—যাই বলা যাক।

হাতড়ে পাতড়ে পাই অবশ্যি শেষটায়।

পায়ের চেষ্টাতেই সেই ছিটকিনি আলগা করা যায়।

জলও বেরুতে থাকে সেই পথে।

সব জলই দেখি বেরিয়ে যায়। এবার জল আটকানোর দরকার।

ফের আবার পা লাগিয়ে সেই ছ্যাঁদার নাগাল পাই, কিন্তু সেই ছিটকিনিটার পাত্তা মেলে না। পায়ের বুড়ো আঙুলটা গুঁজে দিই সেই ছ্যাঁদায়।

আমার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটিই নিজগুণে সেই জলাধারের ছিদ্রপথে গিয়ে পুঞ্জীভূত হয়েছে। তখন আবার হাঁক পাড়তে হয় বিনিকে।

চেঁচামেচির চোটে বিনি কাছাকাছি এসে গেল।

'দ্যাখ্ এবার কী কাণ্ড! তোর কথায় ডানটা ডানদিকে আর বাঁটা বাঁদিকে ঘুরিয়ে...'

'সে তো জল আমার জন্যেই গো। এখন জল বের করার বেলায় তার উল্টোটা করতে বললাম না?'

'তাই তো করেছি রে! দুটোই দুদিকে ঘুরিয়েছি যদ্দূর যায়। কিন্তু তারপর আর ঘোরানো যায় না—কিন্তু জল যাচ্ছে কোথায়? জল তো সেই আমার গলায় গলায়।'

জলের গলাগলির দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

'কই, জল তো বেরুচ্ছে না আর।' সে কয়ঃ 'আটকে গেছে।'

'আমার বুড়ো আঙুলটা দিয়ে ঠেকিয়েছি—তাই আটকেছে।'

'যাক, আটকালেই হোলো। এবার উঠে পড়ো টবের থেকে।' তার তাগাদা।

'কিন্তু উঠব কি করে! আমারো যে আটকে গেছে।' সকাতরে কই।

'তোমার আবার আটকাচ্ছে কোথায়?'

'ওই ছ্যাঁদাতেই—যেটার দিয়ে জল বেরুচ্ছিল না।' আমি জানাই—'আমি ছাড়তে চাইলেও টব আমায় ছাড়ছে না যে!'

'এই মরেছে! দাঁড়াও, ধরে টানছি তোমাকে।'

বলেই সে আমার হাত ধরে, বগল ধরে, চুল ধরে—কেবল কান ধরাটা বাদ দিয়ে সর্বাঙ্গ ধরে সর্বাঙ্গীণ টানাটানি লাগায়।

না, বিনির জোর আছে বেশ। তার টানাটানির দাপটে টব আর আমায় বাগিয়ে রাখতে পারে না।

হেঁইয়ো—তার এক হ্যাঁচকায় আপাদমস্তক উঠে আসি সটান।

উঠতেই, এই নাও তোমার জামা কাপড়—আমার গায়ের ওপরে সে ফেলে দেয়।

কাপড় জামাটা কোনোরকমে গায়ে জড়িয়েই না আমি তীরবেগে বেরুতে চাই—'চ পালাই এখেন থেকে। অনিমেষ দেখলে আর রক্ষে রাখবে না। তার সাধের বাথটবের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি। ওর ট্যাপ্‌কল, যতই টেপ না, কোনোদিকেই ঘুরবে না আর। যারপরনাই যা ঘুরিয়েছি—দফা রফা হয়ে গেছে বেটার। আমার পা ধরে টানাটানি? আক্কেল দ্যাখো না হতভাগার হতচ্ছাড়া!'

টবের গায়ে একটা লাথি মেরে বার হই।

'ওমা! তোমার বুড়ো আঙুলের আধখানা দেখছি না তো।' বিনি কাতরে ওঠে—'গেল কোথায় সেটা?'

'তোর ঐ টবের গর্ভেই। ছ্যাঁদার মধ্যে গোঁজা রয়ে গেছে আরেক ট্যাপকল।'

'যাক গে! যেতে দাও।' সান্ত্বনাছলে সে আমায় উৎসাহ দেয়—'বুড়ো আঙুল গেলে হবে, আবার হয়ত গজাবে। কিন্তু তুমি খোয়া গেলে আর পাবার কথা নেই কোনো।'

না, আমি খোয়া যাইনি বটে, কিন্তু যা খোয়ারটা গেল না আমার! রক্তাপ্লুত পায়ে রাজপথে পদার্পণ করি। পালিয়ে আসি সেখান থেকে। সেই প্রদর্শনী কক্ষের বাথটবে আমার গোঁজামিলের প্রয়াস সেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শিত হতে থাকে।

গজানন শর্মার কাপালিক দর্শন

—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

পুজোর ছুটিতে সবাই নানা জায়গায় বেড়াতে যায়। কাঁহাতক আর এক জায়গায় সারাবছর সেই থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড় করে দিন কাটে? নতুন-নতুন জায়গায় গেলে ক্ষিদে চাঙ্গা হয়। অন্যরকম জলহাওয়ায় শরীর আর মেজাজও চাঙ্গা হয়ে ওঠে। আমাদের পাড়ার গজাননবাবুর কথাই বলছি। পাড়ায় তো সবাই ওঁকে জানে গোমড়ামুখো বদমেজাজী মানুষ। রাস্তায় দেখে-শুনে পা ফেলে হাঁটেন। কলার খোসা পড়ে থাকতে দেখলে তাই নিয়ে হুলুস্থুল বাধিয়ে তোলেন। সেবারে তের নম্বর বাড়ির দোতলা থেকে কান্তবাবুর ঝি ক্ষান্তবালা একগুচ্ছের তরকারির খোসা আর চুনোমাছের আঁশ যেই নীচে না ফেলেছে, অমনি পড়বি তো পড় একেবারে গজাননবাবুর টাকে। সে নিয়ে যা কুরুক্ষেত্তর হল, কহতব্য নয়। শেষ অব্দি ক্ষান্ত ঝি ওঁর পায়ে ধরে কেঁদে কেটে ক্ষমা চেয়ে নিল। তাও গজাননবাবুর রাগ পড়ে না। গোঁফ কাঁপিয়ে গর্জে-গর্জে বলছিলেন, ভাগ্যিস আমার মাথায় চুল নেই! চুল থাকলে টেড়ি থাকত এবং তাহলে কী অবস্থা হত? বোঝা গেল, আবর্জনাটা নেহাত টাকে পড়ার জন্য ক্ষান্তবালা বেঁচে গেল।

তো এহেন গজাননবাবু পুজোর ছুটিতে বেড়াতে গিয়ে কতটা বদলে যান, তা ভাবা যায় না। হেসে-হেসে এবং যেচে সবার সঙ্গে আলাপ করেন। একমুখে একশো কথা বলেন। একটু ভাব হলেই ডেকে খাইয়ে দেন। এমন কি এও শোনা গেছে, উনি তখন গলা ছেড়ে রবীন্দ্রসংগীত গান এবং ধারে-কাছে কেউ না থাকলে কোমর দুলিয়ে নাকি টুইস্ট নাচও নাচেন।

এবার পুজোয় গজাননবাবু গেলেন মোহনপুর। অন্য-অন্যবার যান পুরী, নয়তো কাঠমাণ্ডু,

কিংবা সিমলা, অগত্যা মধুপুর। চেনা জায়গায় বারবার যেতে কি ভাল লাগে? তাই যেখানে কখনও যান নি, সেই মোহনপুরে গেলেন। জায়গাটা স্বাস্থ্যকর তো বটেই, প্রাকৃতিক দৃশ্যও সেখানে ভারী সুন্দর। গজাননবাবুর পায়ে বাত আছে। বাত আছে যখন, তখন ডাক্তার আছে। সেই ডাক্তারের নাম নরহরি। নরহরিবাবুই বলেছিলেন, মোহনপুরেই যান। ওখানকার জলহাওয়ায় বাতের ওষুধ আছে। এমন স্বাস্থ্যকর মাটি যে গুনেগুনে একশো পা হাঁটতেই বাতবাবাজী হাঁটু থেকে কাত হয়ে পড়বে।

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, মোহনপুরে তাঁর এক বন্ধু কেষ্ট ঘোষের জামাই আছেন। জামাইবাবুর নাম করুণাসিন্ধু। কাছাকাছি একটা অভ্রের খনি আছে। ভদ্রলোক সেই খনির একজন ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর কোয়ার্টারটা আছে পাহাড়ের গায়ে। তাই বলে পাহাড়ে চড়ার জন্য কষ্ট করতে হবে না। মোটরগাড়ি আছে না? কেষ্টবাবু জামাইকে আগেভাগে লিখে দিয়েছিলেন যে গজাননবাবু যাচ্ছেন। যেন কোন অসুবিধে না হয়।

তাই গজাননবাবুর কোন অসুবিধে হয় নি। যত্নআত্তি ভালমতোই হচ্ছে। প্রথম দিনটা মোটরগাড়ি পেয়েছিলেন বেড়াবার জন্যে। পরের দিন বলেছেন, আর দরকার নেই বাবাজী। পায়ে হেঁটে ঘুরতেই আমার ভাল লাগে।

করুণাসিন্ধুর একটি মোটে মেয়ে। বছর আষ্টেক বয়েস। নাম হচ্ছে দূর্বা। বড় বিচ্ছু মেয়ে। সবসময় চঞ্চল। একদিনেই গজাননের সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে তার। উঠতে-বসতে শুতে-খেতে সারাক্ষণ দাদামশাই দাদামশাই করে পাগল। সকাল-বিকেল গজাননবাবু যখন দূর্বাকে নিয়ে বেড়াতে বের হন, তখন কে বলবে এই সেই ছাতুবাবু লেনের গোমড়ামুখো একানড়ে গজানন সিঙ্গি? দূর্বা যত হাসে, উনি তত হাসেন। দূর্বা একটু লাফ দিলে উনি অনেকটা লাফ দেন। দূর্বা কচি গলায় ছড়া বলে, গান গায়। তারপর বলে, দাদামশাই! আপনি একটা শোনান না! অমনি গজানন কেসে-টেসে গলা সাফ করে ছড়া, নয়তো গান শুনিয়ে দেন। হেঁড়ে গলার সেই আওয়াজ শুনে দূর্বা হেসে খুন হয়। ভিড় জমে যায় বৈকি। গজাননের তাতেও লক্ষ্য নেই। এ তো নতুন জায়গা। এখানে ওঁকে চেনে কে?

শেষ অব্দি এই গান গাইতে গিয়েই গজাননবাবু বিপদে পড়ে গেলেন।

বিপদ বলে বিপদ! এমন সাংঘাতিক বিপদে গজানন কখনও পড়েন নি। মোহনপুরের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে সারদানদী। পাহাড়ী নদী। দুধারে ছোট-বড়-মাঝারি পাহাড় আছে। নদীটা এঁকেবেঁকে চলেছে। প্রচণ্ড স্রোত আছে। তবে জায়গায় জায়গায় মস্তো পাথর নদীর মধ্যিখানে উঁচু হয়ে রয়েছে। এখন হয়েছে কী, নদীর ধারে একটা পাহাড়ের ঢালু গায়ে সুন্দর পার্ক আছে। পার্কের নীচের দিকের গেট পেরোলে কয়েক ধাপ পাথরের সিঁড়ি। সিঁড়ি নদীর জলে গিয়ে নেমেছে। ইচ্ছে করলে স্নান করার অসুবিধে নেই। তাছাড়া দুধারে বসার চত্বরও রয়েছে। তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হতে চলেছে। ওপারে পাহাড়ের আড়ালে সূর্য ডুবেছে। দেখতে দেখতে পার্ক এবং ঘাট থেকে লোকেরা একে একে চলে যাচ্ছে। সেই সময় গজাননবাবুর মনে ভাবের উদয় হয়েছে। চারদিক ফাঁকা দেখে
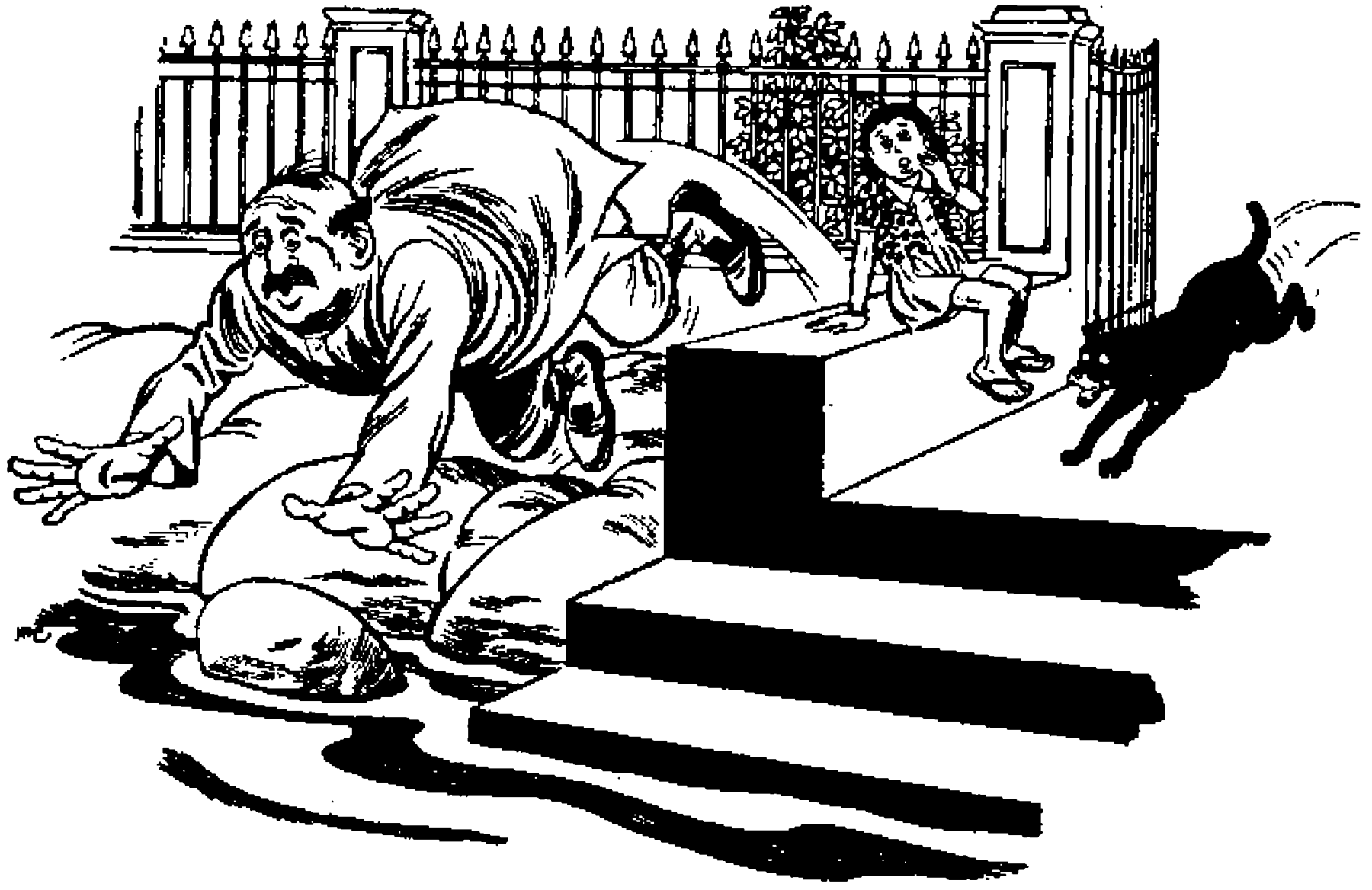
গজাননবাবু দিশেহারা হয়ে লাফ দিলেন।

মনের আনন্দে তিনি গলা ছেড়ে গান ধরলেন। দূর্বা খুশি হয়ে নতুন দাদামশায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

গজাননবাবুর মনে ভাব এলে তিনি এই গানটাই গান ঃ আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে—এ—এ—এ...

বার দুই কলিটা যেই গাওয়া, হঠাৎ বিকট চেঁচানি শোনা গেল ঘেউ-উ-উ-উ! তারপর গজাননবাবু গাইতে-গাইতে ঘুরে দেখেন, এক ইয়া হোঁতকামোটা কালো কুকুর পার্ক থেকে দৌড়ে নেমে আসছে তাঁর দিকে। কাছাকাছি এসে কুকুরটা প্রচণ্ড জোরে আবার ঘেউ-উ-উ করেই লাফ দিল। আর অমনি গজাননবাবুও দিশেহারা হয়ে লাফ দিলেন। লাফ না বলে ঝাঁপ বলাই ভাল। কারণ তিনি বেমক্কা গিয়ে পড়লেন সারদা নদীর জলে। আগেই বলেছি, জলে তীব্র স্রোত আছে। গজাননবাবু ভেসে যেতে যেতে আর্তনাদ করলেন, বাঁচাও। বাঁ-চা-ও!

ওদিকে আচমকা চোখের পলকে এই কাণ্ড দেখে ছোট্ট দূর্বা বেচারা তো ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে। সে সেই চত্বরে হাঁটু দুমড়ে ভয়ে গুটিসুটি বসে পড়েছে। সেই কুকুরটা এসে তার ফ্রক শুঁকতে শুঁকতে নদীর দিকে তাকিয়ে আরেকবার একখানা ঘেউ-উ ঝেড়ে দিল।

তখন কিছুটা অন্ধকার হয়ে এসেছে। গজাননবাবু অসহায় হয়ে ভাসছেন আর চেঁচাচ্ছেন বাঁচাও! বাঁ-চা-ও! হায় হায়! গান গাইলে যে একদিন এমন বিপদে পড়বেন, তা কি জানতেন? ভাগ্যিস, ছেলেবেলায় হেদোর জলে সাঁতার কাটার অভ্যাস ছিল। ছেলেবেলায় মানুষ যা শেখে তা সারাজীবন ভোলে না।

গজাননবাবু চিৎ সাঁতার দিতে দিতে তীরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু স্রোত তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। আর কিছুদূর গেলেই জলপ্রপাত। এই নদীর জল সেখানে একশো ফুট নীচে গিয়ে পড়ছে এবং জলকণা ছিটকে উঠছে। ফেনা জমছে। সেই জলপ্রপাতের ভয়ংকর

গর্জন কতদূর থেকে শোনা যায়। ওখানে গিয়ে পড়লে আর কারও বাঁচার আশা থাকে না। জলের সঙ্গে প্রচণ্ড বেগে নীচের পাথরে পড়ামাত্র হাড়গোড় টুকরো হয়ে যাবে।

যেই জলপ্রপাতটার কথা মনে পড়া, গজাননবাবু আঁতকে উঠলেন। মরীয়া হয়ে পাড়ের দিকে এগোবার চেষ্টা করলেন। ততক্ষণে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। হঠাৎ তাঁর পায়ে কী ঠেকল। স্রোতের টানে ভেসে যেতে-যেতে তিনি মরীয়া হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন। হ্যাঁ, এখানটায় জল এক কোমর মাত্র। তলায় এবড়োখেবড়ো পাথর রয়েছে। তখন স্রোতের সঙ্গে লড়াই করে অতিকষ্টে এগোলেন তীরের দিকে। জলের ওপর একটা পাথর মাথা উঁচিয়ে আছে। গজাননবাবু সেই পাথরে হাত রেখে কয়েক পা যেতেই জল কমে এল।

যখন ঢালু পাড়ে উঠলেন, তখন তাঁর অবস্থা শোচনীয়। এইসব পাহাড়ী নদীর জল খুব কনকনে ঠাণ্ডা। ঠকঠক করে কাঁপতে থাকলেন বেচারা। গায়ের জামাকাপড় ফুলে ঢোল হয়েছিল। এখন গায়ে সেঁটে বসেছে। তাতে ঠাণ্ডাটা আরও বেড়ে যাচ্ছে। অনেক দূরে চলে এসেছেন ভাসতে ভাসতে। কিন্তু জায়গাটা কোথায় তা বুঝতে পারছেন না। চেঁচিয়ে কাকেও ডাকবেন ভেবে যেই মুখ খুললেন, দেখলেন গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে না। নাঃ, জীবনে এমন বিপদে আর কখনও পড়ে নাকাল হন নি গজাননবাবু।

পাড়টা ঢালু হয়ে উঠেছে। অন্ধকারে পা বাড়াতে গিয়ে টের পেলেন সোজা হয়ে হাঁটা যাবে না। এ যে রীতিমতো পাহাড়। তার ওপর ঘন জঙ্গল। আহা, যদি পাহাড়ে চড়াটা শিখে রাখতেন। যাই হোক, এখন আফসোস করে লাভ নেই। হামাগুঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে উঠতে লাগলেন। কাঁটাঝোপে জামাকাপড় ছিঁড়ে ফর্দাফাই হয়ে গেল। পাথরে হাঁটু ছড়ে গেল। তার ওপর ঠাণ্ডা জলে ভিজে হাঁটুর বাতও কটকট করে উঠল। গজাননবাবু আতঙ্কে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তাহলে কি এই পাহাড়ী জঙ্গলেই মরে পড়ে থাকতে হবে!

মরীয়া হয়ে হামাগুঁড়ি দিতে দিতে কতক্ষণ পরে টের পেলেন জায়গাটা কিছুটা সমতল। তখন উঠে যে দাঁড়াবেন, তার উপায় নেই। হাঁটুর বাত কটকট করে কামড়াচ্ছে।

গজাননবাবু অন্ধকারে এদিক ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ দেখলেন, একটু দূরে একটা আলো জ্বলছে। অমনি সাহস ফিরে এল। বুকে দম ভরে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, কে আছো—ও—ও! বাঁচা—ও—ও ও!

কোন সাড়া এল না। তখন ভাবলেন, ভুল হল। এদেশে বাংলা তো কেউ বোঝে না। হিন্দীতে চেঁচানো যাক। গজাননবাবু ফের চেঁচালেন, কৌন হ্যায়! মুঝকো রখ্‌শা কারো—ও-ও! বার দুই ডাকার পর দেখলেন, আবার ডাকতে গেলেই নির্ঘাত হার্টফেল করে বেঘোরে মারা পড়বেন। হায় হায়! কী কুক্ষণে আজ অবেলায় গান গাইতে গেলেন! তবে রোস, দেখাচ্ছি মজা। যদি এ যাত্রা প্রাণে বাঁচি, গোয়েন্দা লাগিয়ে ওই কুকুরটা খুঁজে বের করব। তার মালিকের নামে মামলা ঠুকে তবে ছাড়ব—নয়তো আমি গজানন শর্মাই নই!

এই প্রতিজ্ঞা করে মনে জোর পেলেন গজাননবাবু। আবার এগোলেন। কখনও হামাগুঁড়ি দিয়ে

কখনও দু হাঁটুতে হাত রেখে পায়ে হেঁটে, কীভাবে যে সেই আলোটার কাছে পৌঁছোলেন, নিজেই বুঝতে পারলেন না।

কিন্তু কাছে গিয়ে যা দেখলেন, তাতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। চোখের পাতায় পলক পড়ে না, বুক টিপটিপ করছে, এমন অবস্থা।

একটা ভাঙা পাথরের মন্দিরের সামনে প্রকাণ্ড একটা দাড়িগোঁফ জটাজুটধারী লাল কাপড় পরা সন্ন্যাসী বসে আছেন। তাঁর সামনে ধুনি জ্বলছে। সন্ন্যাসীর ডান হাতে একটা মড়ার খুলি। খুলি থেকে কী গলায় ঢেলে খাচ্ছেন। বাঁ হাতে ধুনিটা উসকে দিচ্ছেন মাঝে মাঝে। অমন ভয়ংকর চেহারার সন্ন্যাসী গজানন কখনও দেখেন নি। তবে সবচেয়ে সাংঘাতিক দৃশ্য, সন্ন্যাসীর পাশে একটা খাঁড়া পড়ে রয়েছে। খাঁড়াটা আগুনের ছটায় চকচক করে উঠছে।

সর্বনাশ! কাপালিক না হয়ে যায় না! গজাননবাবু আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেলেন। কাপালিকরা নরবলি দেয়। এর কাছে যাওয়া মানে মুণ্ডুটি স্রেফ খসে যাওয়া। শুধু ধড় নিয়ে কলকাতা যদি বা ফেরা যায়, সে এক হুলুস্থুল কাণ্ড হবে না?

পা টিপে টিপে পালিয়ে আসবেন ভাবছেন, সেই সময় কাপালিক হঠাৎ মুখটা ঘোরাল। তারপরই তাঁকে দেখতে পেল।

দেখামাত্র সে দুর্বোধ্য ভাষায় কী একটা হুংকার দিয়ে লাফিয়ে উঠল। গজাননবাবু পিঠটান দেবার আগেই সে এসে তাঁকে ধরে ফেলল। তারপর হিড়হিড় করে টেনে ধুনির কাছে নিয়ে গেল।

তারপর কাপালিক প্রচণ্ড একখানা অট্টহাসি হাসল হা হা হা হা হা! গজাননবাবুর মনে হল, ওই হাসির দাপটে পৃথিবীতে ভূমিকম্প হয়ে গেল যেন। কাপালিক দুর্বোধ্য ভাষায় তাঁকে ইশারা করে বসতে বলল।

না বসে উপায় আছে! গজাননবাবু বসে পড়লেন। তখন আতঙ্কের চোটে হাঁটুর বাতের ব্যথা, শীত—সব কিছু বেমালুম উবে গেছে। এখন শুধু প্রাণ নিয়ে সমস্যা। তিনি আড়চোখে খাঁড়াটার দিকে লক্ষ্য রাখলেন। খাঁড়াটায় কাপালিকের হাত পড়লেই যাই হোক একটা কিছু করতেই হবে প্রাণ বাঁচাতে।

কাপালিক তাঁর সামনে বসে পড়ল। মধ্যিখানে রইল আগুনের কুণ্ডুটা। গজাননবাবু দেখলেন, সে চোখ বুজে রয়েছে এবং বিড়বিড় করে কী মন্ত্র পড়ছে। এদিকে আগুনের আঁচে গজাননবাবু তখন আরাম পাচ্ছেন। যখন দেখলেন, কাপালিক চোখ খুলছে না—তখন দুহাতে আগুনের আঁচ নিতে শুরু করলেন। দুটো হাঁটুও এগিয়ে দিলেন সাবধানে। দু'মিনিটের মধ্যেই শরীর থেকে শীতটা চলে গেল।

তারপর কাপালিক চোখ খুলে কটমট করে তাকিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বলল, তুমি কে?

গজাননবাবু বাংলা শুনে চমকে উঠেছিলেন। কাপালিকরা নাকি হিন্দী আর সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষা জানে না। এ যে দস্তুরমতো বাঙালী কাপালিক! এতে গজাননবাবুর সাহস হল একটু। দুহাত জোড় করে খুব ভক্তির ভাব দেখিয়ে বললেন, বাবা! আমার নাম গজানন শর্মা। কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছিলুম। এসেই এক বিপদে পড়েছিলুম। তাই আপনার শরণ নিতে এসেছি।

কাপালিক গম্ভীর স্বরে বললে, কী বিপদ? কি বিপদ?

বিপদ বলে বিপদ! গজাননবাবু কাঁচুমাচু মুখে বললেন। বাবা, ওখানে যে পার্কটা আছে, আমার এক নাতনীকে নিয়ে বেড়াতে এসেছিলুম। এসে বুদ্ধির ভুলে আর মনের খেয়ালে যেই গলা ছেড়ে গান ধরেছি...

এইটুকু শুনেই কাপালিক বাধা দিয়ে বলল, গান। তুমি গান গাইতে পারো?

গজানন একটু সাহস পেয়ে বললেন, একটু আধটু পারি বাবা!

কাপালিক জোরে আগের মতো পৃথিবী কাঁপানো অট্টহাসি হেসে বলল, বাঃ! কই, তাহলে মন্দিরের মাকে গলা ছেড়ে একখানা শুনিয়ে দাও দিকি। নইলে বুঝতেই পারছ, কী হবে।

কাপালিকটা বাপ্‌রে বলে চেঁচিয়ে তক্ষুণি ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে পালিয়ে গেল। [পৃ. ২১২

কাপালিক খাঁড়ার দিকে চোখের ইশারা করতেই গজাননবাবু বললেন, খুব বুঝছি বাবা। বিলক্ষণ! কিন্তু আপনার কোন কুকুরটুকুর নেই তো?

কুকুর? কাপালিক চোখ লাল করে বলল, ক্ষেপেছ তুমি? মায়ের মন্দিরে কুকুর? সাবধান! আর কখনো কুকুর কথাটা এখানে উচ্চারণ করো না। কুকুর অতি অপবিত্র প্রাণী। খবরদার! নাও, এবার মায়ের নামে গান ধরো, শুনি।

গজাননবাবু বললেন, তাহলে বাবা, রামপ্রসাদী ধরি?

কাপালিক অধীরভাবে বলল, যা ধরবে, চটপট ধরো। মায়ের বলির লগ্ন বয়ে যাচ্ছে। আমি আর দেরি করতে পারব না। মাও অস্থির হয়ে উঠেছেন। ওই দ্যাখ্, মন্দিরে মায়ের করাল জিহ্বা লকলক করছে! রক্ত পান করার জন্য মা ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন।

গজাননবাবুর যেটুকু জোর এসেছিল, তক্ষুণি শেষ। ভয়ে ভয়ে মন্দিরের দিকে তাকালেন। কিন্তু অন্ধকার মন্দিরে কিছু ঠাহর হল না। তিনি কাঁপতে কাঁপতে বললেন, বাবা! এ কী কথা! আমি যে নেহাত প্রাণ বাঁচাতে আপনার শরণ নিতে এলুম, আর আপনি...

বাধা দিয়ে কাপালিক গর্জে বলল, স্তব্ধ হও অর্বাচীন! মাই তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। কারণ, মা বড় ক্ষুধার্ত। নাও, আর দেরি নয়। কেমন গান গাও, শুনি।

গজাননবাবু কাপালিকের চোখের দিকে তো বটেই, হাতের দিকেও তাকিয়েছেন তখন।

কাপালিকের হাত খাঁড়ার মুঠোয় পড়েছে। কাপালিক ফের গর্জন করে বলল, গাও বলছি। অমনি গজাননবাবু গলা ছেড়ে ধরলেন একখানা রামপ্রসাদী ঃ

মা আমায় ঘুরাবি কতো!
কলুর চোখবাঁধা বলদের মতো॥

তিনি মোটে এই একখানা রামপ্রসাদী জানেন। মায়ের দয়া পাবার ইচ্ছেয় তিনি যথাসাধ্য গলা চড়িয়ে গাইতে থাকলেন, মা আমায় ঘুরাবি কতো—ও—ও!

আর সঙ্গে সঙ্গে সেই পার্কের ধারে নদীর ঘাটে যেমন হয়েছিল, ঠিক তেমনি কাণ্ডটাই ঘটে গেল।

আচমকা আওয়াজ শোনা গেল বনবাদাড় থেকে ঘেউ—উ—উ—উ! তারপরই সেই কালো বিকট কুকুরটাকে দেখা গেল ঝোপ ডিঙিয়ে মন্দিরের সামনের ফাঁকা জায়গায় এসে পড়েছে। এসে সে আবার একটা মারাত্মক ঘেউ ঝাড়তেই কাপালিক লাফিয়ে উঠল। আর কুকুরটা বিকটা গর্জন করে তেড়ে এল তার দিকে।

গজাননবাবু এমন হতভম্ব হয়েছেন যে আর নড়তেও ভুলে গেছেন। কাপালিকটা বাপ্‌রে বলে চেঁচিয়ে তক্ষুণি ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে পালিয়ে গেল।

কুকুরটা এসে কিন্তু গজাননবাবুর কাছে দাঁড়াল। তারপর লেজ নাড়তে নাড়তে ওঁর গা শুঁকতে শুরু করেছে। ভয়ে চোখ বুজেছেন গজানন শর্মা।

তারপর একদল ছেলের হইচই শোনা গেল জঙ্গলে। টর্চের আলো শিসিয়ে উঠল। দেখতে দেখতে ওরা এসে পড়ল মন্দিরের উঠোনে। গজাননকে দেখে ওরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, পেয়েছি! পেয়েছি!

ব্যাপারটা হয়েছে এই ঃ

ওরা একদল ছেলেমেয়েও মোহনপুরে বেড়াতে এসেছে। সঙ্গে কালু নামে মস্তো এক দিশী কুকুরও এনেছে। নদীতে গজাননবাবুর ঝাঁপ দেখে প্রথমে ওরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। পরে সবাই সাহস করে টর্চ নিয়ে নদীর পাড় ধরে পাহাড় জঙ্গল ডিঙিয়ে খুঁজতে বেরিয়েছিল! নদীতে যত তীব্র স্রোত থাক, পাহাড়ী নদী তো! জল এক গলার বেশি নয়। একজন বয়স্ক মানুষ ওই জলে ডুবে মরবে, তাদের মনে হয় নি। অনেক পাথরও জলে মাথা তুলে রয়েছে। তাই ভেবেছিল, যেভাবে হোক, মানুষটা কোথাও পাথরে আটকে যাবে।

তবে এভাবে মন্দিরে আগুনের ধুনি জ্বালিয়ে গজাননবাবু যে খাঁড়া আর মড়ার খুলি নিয়ে বসে থাকবেন, ওরা ভাবেই নি।

যাই হোক, করুণাসিন্ধুর বাংলোয় অনেক রাতে গজানন বারান্দায় বসে আছেন। জ্যোৎস্না উঠেছে। জ্যোৎস্না দেখে মনে ভাব এল। "আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে" গানটা গাইতে গিয়ে চুপ করলেন। দরকার নেই বাবা। আবার কী বিপদ ঘটে যায়। তবে এও সত্যি, গান না গাইলে তো স্বচক্ষে কাপালিক দর্শনটা হত না। ফিরে গিয়ে সেই গল্পে সকলকে তাক লাগিয়ে দেবেন।

আসামের ঘন জঙ্গলে। চারিদিকে মৃত্যুর হাতছানি! চাঁদের আলোয় সারা অরণ্য মায়াময়! তার মাঝে পথ চলেছে এক পথিক..... নাম সুমন ভাল্লা.....
ঘাসের বনে আর এক শিকারী.....

আর কত দূর?

চাঁদনী রাতের মরীচিকা

সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত......
ররররর!
দেরী হয়ে গেছে! বাঁচতে হলে বন্দুক চাই!

রররর
গুলির শব্দে শত্রুরা সজাগ হবে, কিন্তু আমি নিরুপায়!

নির্জন বনের আকাশে ছড়াল গুলির আওয়াজ.....
বাঘটা পালাল, এবার ওসমানকে চাই।

ওই, ওই দেখা যাচ্ছে ওসমানের নিশানা! এবার নিশ্চিন্ত!

নিশানটা উড়ছে বটে,
কিন্তু ওসমান কৈ?

ওসমান!
এধারে
সুমন ভাল্লা!

কে?

মাথার ওপর হাত তোল ভাল্লা!
ওসমান কি বিশ্বাসঘাতকতা করল?......আশ্চর্য!
তোমার যম!
মাথার ওপর হাত তোল!

ওসমান
বিশ্বাসঘাতক?

বৃথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই ভাল্লা, ভারতের ঐ গুপ্ত দলিলটা আমাদের হাতে দিয়ে দাও! তাহলে তোমার মুক্তি!

প্রাণ থাকতে নয় কুকুরের দল!
আঃ!
আচমকা আক্রমণ করে
সুমন ভাল্লা!
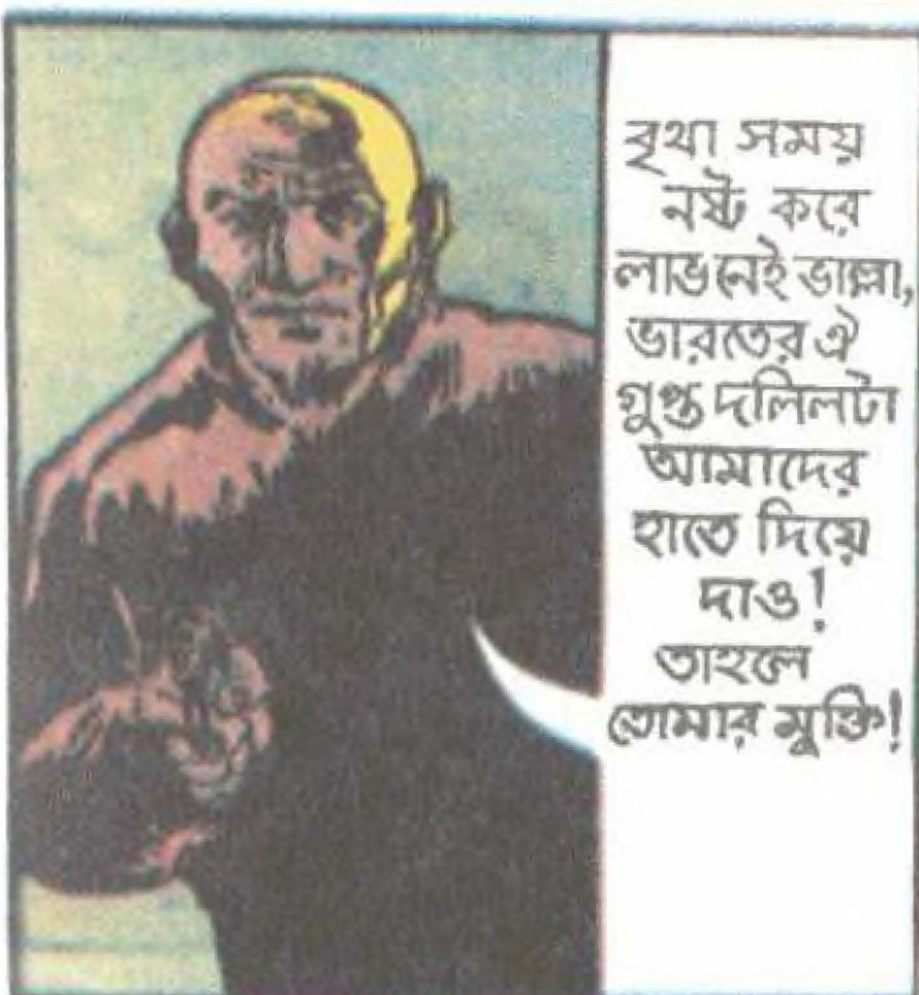
আক্রমণ করে সুমন ভাল্লা উল্টোদিকে লাফ দেয়
যদি পালাতে পারি....

এবার হাতের কাছে
আরে এখানেও!

আ—আঃ!

সুমন ভাল্লা, বড় তড়পাচ্ছিলি এবার!

নড়লেই গুলি করব! ওয়ান...টু....
আসন্ন মৃত্যুর দিকে অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সুমন ভাল্লা।

ভারত সরকারের দলিলটা হাতছাড়া হল! তাহলে........ ওসমানই তাহলে বেইমানী করল!
ওয়ান টু
নিশ্চিত মৃত্যু.....

হঠাৎ অন্ধকার থেকে দেখা দিল এক মূর্তি.....
খবরদার!
ওঃ! কেও?

চারিদিকে শুরু হল ভয়ঙ্কর ঘুঁসি বৃষ্টি!
দূর হ' কুকুরের দল!
আঃ!

ওঃ

কে?

ওসমান
ওসমান এসে গেছে!

এত সাহস!
বাহাদুর ওসমান, সাবাস!
একি, গুলি ফসকে গেল!
5

ওসমানের বজ্রমুষ্টি!
বারণ করলাম গুলি করতে!
ওঃ

আর কেউ লড়বার আছে? আর কেউ?
ধন্যবাদ ওসমান! কিন্তু তুমি এত দেরী করলে কেন?

আমি....
ওকি!

ওকি!
ওসমান, ওসমান তুমি মারাত্মক আহত!

সেই আহত চিতাবাঘটা ....সাবধান!
৫

সাবধান ওসমান

ওসমান আজ অজেয়…
বুম!

বাঘটা ঘাবড়ে গিয়ে পালাল, খুব বেঁচে গেছি আমরা!
এবার আমিও পালাব!

তুমি শিগ্গির চলে যাও! আমি চললাম…
ওসমান, আমার সঙ্গে চল। তুমি আহত।

ওসমানের ব্যবহার কেমন অস্বাভাবিক! ও কি বিশ্বাস-ঘাতক?

কিন্তু ও খুব আহত, এ অবস্থায় ও পালাল কেন?….ওই ওর রক্তমাখা রুমালটা পড়ে রয়েছে!
ওসমান
7

ওসমান

আশ্চর্য, লোকগুলোকে মেরে ছাতু করে দিল! নাঃ, আর অপেক্ষা করা যায় না, দলিলটা পৌঁছন চাই

আর ভয় নেই, ওই সুমন ভাল্লা আসছে।

এই নাও ক্যাপটেন, দলিলটা।
ধন্যবাদ ভাল্লা!
৪

ক্যাপটেন, ওসমান… ওসমান এসেছিল।

সরি মিঃ ভাল্লা, আপনার বন্ধু ওসমান সকাল ১২ টাতে শত্রুর আঘাতে মারা গেছে। তার সবই পেয়েছি, শুধু……

না না, সেকি! ওসমান মারা গেছে! না না! সে সে……

মিঃ ভাল্লা, ওসমানের সব জিনিসই পেয়েছি। শুধু তার নাম লেখা রুমালটা বাদে। আমি দুঃখিত ভাল্লা!

আহা, বেচারা—
ওসমান, ওসমান, তুমি তোমার বন্ধুকে বাঁচাতে এসেছিলে, আর আমি ভাবলাম, তুমি বিশ্বাসঘাতক!

ওসমান
আমাকে…. আমাকে তুমি ক্ষমা করো। ওসমান!
শেষ।

—অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

ন্যাড়ার কথা গতবারে বলেছি, ন্যাড়ার বয়স যদিও পনেরো বছর, কিন্তু সে নিয়মিত গল্প কবিতা লেখে।

শরৎচন্দ্রের রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, মহেশ গল্পগুলি পড়ার পর ন্যাড়ার কাছে শরৎচন্দ্র দেবতা। ন্যাড়া এখন রাতদিন চিন্তা করে, কেমন করে শরৎচন্দ্রের রামের সুমতি বা বিন্দুর ছেলের মতন গল্প লেখে, যে গল্প পড়তে পড়তে চোখে আপনিই বর্ষার বৃষ্টির মতন ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ে। শরতের নির্মল সুনীল আকাশের মতন সমস্ত হৃদয় মন উদার হয়ে যায়।

ন্যাড়া 'প্লট' খুঁজে বেড়ায় কিন্তু ঠিক জুতসই পায় না।

হঠাৎ শরৎচন্দ্রের গল্পের মতন একটা প্লট মাথায় এসে গেল, এসে গেল বললে ভুল হবে, তাদের নবনিযুক্ত বালক ভৃত্য ছোট্টুর মধ্যেই পেয়ে গেল। ছোট্টুর আগে ন্যাড়াদের বাড়িতে সহদেব নামে একটি বাচ্চা ছেলে কাজ করত। তাকে ন্যাড়া কোনদিন বাড়ির চাকর হিসেবে ভাবত না, নিজেই ভাই বন্ধুর মতনই মনে করত। ন্যাড়ার ঘরেই মেজেতে সহদেব রাত্রিবেলা শুত। শনিবার রাত্রে ওদের অনেক রাত পর্যন্ত সুখ-দুঃখের গল্প হত। সুখটা হচ্ছে, আজকের পাড়ার খেলায় ন্যাড়ারা জিতেছে। দুঃখটা হচ্ছে, দুপুরে সহদেব সামনের রেসের মাঠের আম গাছে আম চুরি করতে গিয়ে দারোয়ানের কাছে তাড়া খেয়ে হাতের কাছে আমটা ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এসেছে।

'কান তো তোর দুটি'। সহদেব পাশ ফিরে খাটে শোয়া ন্যাড়ার দিকে চেয়ে বলে, 'আমরা দুজনে বেলা দুটো নাগাদ বেরুব, দারোয়ানটা আসে তিনটে নাগাদ।'

'ঠিক আছে' ন্যাড়া উত্তর দেয়, 'মাকে বলিস নি।'

'আরে পাগল নাকি।' বলে সহদেব হাই তোলে।

ওদিকে ন্যাড়াও তখন স্বপ্নলোকে চলে গেছে।

সেই সহদেব যে হঠাৎ তাদের চাকরি ছেড়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে কেউ ভাবেনি। মাও সহদেবকে খুব ভালবাসত। পরে জানা গেল সহদেবের বাবা সহদেবকে নিউ মার্কেটের কোন এক দোকানে বেশী মাইনের কাজে ঢুকিয়েছে। বাড়িতে কাজের অসুবিধের চেয়ে সহদেবের চলে যাওয়াটাই ন্যাড়া, ন্যাড়ার দাদা রবি এবং বাবা মার সকলের মনে বেশ একটা আঘাত দিল। ন্যাড়া প্রায় শরৎচন্দ্রের গল্পের আবহাওয়া বাড়ির মধ্যেই দেখতে পেল। এমন সময় ন্যাড়ার বাবা গঙ্গার ওপার পুঁটিয়ারি থেকে একটি বাচ্চা ছেলে নিয়ে এলো। ছেলেটার রং কুচকুচে কালো, মুখটা গোল, ট্যারা, কিন্তু ছোট বড় দুটো চোখই গোল, যেন ওর ফোলা ফোলা দুটো গালের ওপর কে যেন একজোড়া ছোট ছোট ডুগি তবলা ঠুকে বসিয়ে দিয়েছে। নাকটা থ্যাবড়ানো, নাকের ফুটো দুটোও বড় বড় গোল গোল, ছেলেটার নামও গলু। সময়টা তখন শীতকাল, একটা ছেঁড়া গেঞ্জি পরে তার দাদার সঙ্গে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে এলো। ন্যাড়ার মা সবিস্ময়ে ওর দাদাকে জিজ্ঞেস করে—'কাজ জানে।'

গলুই ঘাড় কাত করে উত্তর দেয়, 'সব জানি।'

'বেশ আজ থেকেই লেগে যাও', বলে ন্যাড়ার বাবা জামা ছাড়তে ভেতরে চলে গেল। একটু পরে ন্যাড়া দেখল মা খাটের তলা থেকে পুরোনো ট্রাঙ্কটা টেনে ন্যাড়ারই একটা পুরোনো সোয়েটার বার করে।

'এই শোন।' দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা গলুকে ডাকে।

গলু সলাজে এগিয়ে আসে।

'দেখি, এটা তোর হয় কিনা?' মা বলে।

'ঠিক হবে ঠিক হবে'—ন্যাড়া তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে মায়ের হাত থেকে সোয়েটারটা নিয়ে গলুকে দেয়। গলু তক্ষুণি পরে ফেলে। দেখা গেল ওর গায়ে একটু বড় হলেও মোটামুটি শীত রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। গলু ঢোল্‌লা সোয়েটারটা পরে কাজে মন দিল। কিন্তু বোঝা গেল, কোন কাজই সে জানে না, মায়ের মুখ বিষণ্ণ হয়। ন্যাড়ার বাবা সান্ত্বনা দেয়—'ও তো বাচ্চা, কাজ শিখিয়ে নাও।'

'কাজ শিখেই তো সহদেবের মত পালাবে।' মা ঝংকার দিয়ে ওঠে।

বাবা উত্তর দেয়, 'উপায় কি? যা দিনকাল পড়েছে, এরপর আর চাকর-বাকর রাখতে হবে না। ওদের দেশে খুব বড়লোকরা ছাড়া—'

মা বাধা দিয়ে বলে—'যাক তোমায় আর লেকচার দিতে হবে না।'

সারা সকাল গলু ফাইফরমাস খেটে দুপুরে ভাতটাত খেয়ে বলে, 'আমি একবার দাদার সঙ্গে দেখা করে আসছি' বলে চলে গেল। বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলো গলু আর ফিরল না। রাত্রিবেলা বাবা কাজ থেকে ফিরে ন্যাড়াকে বলে, 'কি রকম কাজ করছে রে নতুন ছেলেটা।'

উত্তরে মা বলেন, 'সে তো সেই দুপুরে খেয়ে গেছে এখনও ফেরেনি।'

'সে কি!' বাবা বিস্মিত হল।

মা জিজ্ঞেস করে, 'তোমাকে এই ছেলেটাকে কে দিয়েছে?'

বাবা উত্তর দেয়—'ঐ তো আমাদের রিকশাওলা শিবু।'

তার পরদিন রিকশাওলা শিবু এসে জানাল, 'গলু তার মায়ের সঙ্গে দেশে চলে গেছে।'

'দেশ কোথায়?' বাবা জিজ্ঞেস করে।

শিবু সসংকোচে বলে—'ওর দাদা বললে আমতলা।'

গলু আর আসেনি। মা ন্যাড়ার পুরোনো সোয়েটারটার জন্যে দুঃখ করে বলে, 'ন্যাড়ার সোয়েটারটা আমি নিজে পছন্দ করে কিনে নিয়ে এসেছিলাম, হতভাগাটা সেটা নিয়ে পালাল।'

'দেখি এটা তোর হয় কিনা?' মা বলেন। [পৃ. ২২২

'যাক গে যাক গে।' ন্যাড়া মাছি তাড়ানোর মতন করে হাতটা নেড়ে বলে চলে যায়।

কয়েকদিন পর পাড়ার হরেনবাবু কমলা নামে একটি ২৩।২৪ বছরের মেয়েকে দিয়ে গেল। মেয়েটার জীবনে খুবই দুঃখ। তার স্বামী তাকে ছেড়ে পালিয়েছে। কমলার চেহারাটা এদিকে বেশ মোটা সোটা, মুখটা থ্যাবড়া আমের মতন। কমলা কিন্তু খুব কাজের। ন্যাড়ার মা তো খুব খুশী। বাবা অবশ্য এই সব মেয়েছেলে রাখা পছন্দ করেন না। একটা ঠিকে বুড়ী ঝি রয়েছে, তার ওপর আর একটা মেয়ে জুটলেই নিত্যি ঝগড়া হবে। কিন্তু দেখা গেল বাবার অনুমান মিথ্যে, কমলা খুব কম কথা বলে, ঠাণ্ডা মেজাজের। মা বাবার ফেবারিট রান্নাগুলো কমলাকে কয়েকদিনের ভেতর শিখিয়ে দিলে। বাবাও নিশ্চিন্ত হলো।

ন্যাড়ার ফুটবল খেলতে গিয়ে হাঁটুতে চোট লাগল, বিছানা থেকে উঠতে পারে না। কমলা কি সেবাটাই না করল, রাত্রে ন্যাড়ার হাঁটুতে গরম চুনে হলুদ লাগিয়ে দেওয়া, আরও কত কি!

ন্যাড়া ঠিক করল কমলাকে নায়িকা করে শরৎচন্দ্রের মতন একটা গল্প লিখবে। রাত্রে শুয়ে শুয়ে প্লটটা ভাবছে। কমলা এসে ন্যাড়ার খাটের মশারি টাঙ্গিয়ে চারপাশ গুঁজে দিয়ে গেল। ন্যাড়া ভাবছে—কমলা ঝি হলেও সে রামের সুমতির বৌদি বা বিন্দুর ছেলের বিন্দুর মতন।

ন্যাড়া মনে মনে গল্পটাকে সাজাচ্ছে। কমলা যেমন তার মা না হয়েও মায়ের মতন সব

ন্যাড়ার ঘুম ভেঙে যায়। উঠে দেখে...

করে যাচ্ছে, তাকেও রামের মতন কিছু একটা করতে হবে। কমলাকে অসুস্থ করতে হবে, খুব অসুস্থ। ন্যাড়া তাড়াতাড়ি বোস ডাক্তারকে নিয়ে আসবে। না এটা যে একেবারে রামের সুমতির নকল হয়ে যাচ্ছে। ভাবতে ভাবতে ন্যাড়া ঘুমিয়ে পড়ে। ভোরবেলা একটা অপরিচিতা নারীর কণ্ঠে ন্যাড়ার ঘুম ভেঙে যায়। উঠে দেখে, তার মা একটা কুঁজো কালো রঙের ব্যাটা ছেলের মতন চুল ছাঁটা বুড়ীর সঙ্গে কথা বলছে। বুড়ীর মুখে একটিও দাঁত নেই। সে ফকফক করে বলল—'কমলির সোয়ামী এসেছে, ওকে আবার নিয়ে ঘর করবে।'

'কোথায়?' মা জিজ্ঞেস করে।

'ঐ যে'—বুড়ী রাস্তার ধারে একটা রোগা লম্বা গোছের লোককে দেখাল।

বাবা তাকে জিজ্ঞেস করলে—'তুমি কোথায় কাজ কর?'

লোকটা মাটির দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়, 'একটা কারখানায়।'

মা উকিলের মতন জেরা করে, 'আর বৌকে ছেড়ে পালাবে না তো?'

লোকটা মাথা নীচু করে ঘাড় নাড়ে। কমলাকে মা মাইনের সঙ্গে একটা ভাল শাড়ি দিল। কমলা মা বাবাকে প্রণাম করে, ন্যাড়াকে আদর করে গাল টিপে স্বামীর সঙ্গে হেলে দুলে চলে গেল। মা আপন মনে বলে—"আহা বেচারী সুখী হোক্।'

ন্যাড়া মনে মনে বলে—'মা-টা যেন কি? এই কমলা চলে যাওয়াতে যে আমার গল্পর প্লটটা মার্ডার হয়ে গেল, সেদিকে কারও খেয়াল নেই।'

ন্যাড়ার অসম্ভব রাগ হল।

এর কয়েকদিন পরে ন্যাড়ার বাবা স্টুডিও থেকে ছোট্টুকে নিয়ে এল। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার, ন্যাড়ার বাবা টালিগঞ্জে তাদের বাড়ির কাছেই একটা ফিল্ম স্টুডিওতে কাজ করে। সেই স্টুডিওর ক্যান্টিনে ছোট্টু আগে বয় ছিল। সে-কাজ ভাল না লাগায়, সে বাড়ির কাজ করব বলে বাবার সঙ্গে চলে এলো।

ছোট্টুর চেহারাটাও ছোট্ট খাট্টো, যদিও সে ন্যাড়ার বয়সী। মাথায় করে নিয়ে এলো বিরাট এক কাঠের বাক্স। ন্যাড়া আড় চোখে ছোট্টুকে আর তার বাক্সটিকে দেখল।

খুব তাড়াতাড়ি ন্যাড়ার সঙ্গে ছোট্টুর আলাপ হয়ে গেল। ছোট্টুর দেশ চব্বিশ পরগনা জেলায় বেড়াচাপা গ্রামে। বাড়িতে তার বাবা, সৎমা আর দুটো সৎ ভাই বোন আছে। সৎমা তাকে একদম ভালবাসে না। ভাল ভাবে খেতে পরতে দিত না, রাতদিন খাটাত।

'তোর বাবা কিছু বলত না।' ন্যাড়া অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করে।

ছোট্টু নির্বিকার ভাবে উত্তর দেয়—'বাবা সৎমাকে যমের মতন ভয় খায়।' তারপর কোন একটি ফিল্ম কোম্পানি ওদের ওখানে সুটিং করতে গেছল, তাদের সঙ্গে ছোট্টু টালিগঞ্জের স্টুডিওতে পালিয়ে আসে।

ন্যাড়া তার খাটে বুকে বালিশ দিয়ে শুয়ে শুয়ে ছোট্টুর জীবন কাহিনী শুনছিল। তাড়াতাড়ি উঠে বসে, বড় বড় চোখ করে জিজ্ঞেস করে, 'পালিয়ে এসছিস। তোর বাবা জানে?'

ছোট্টু ঘাড় কাত করে একমুখ হেসে বলে—'হ্যাঁ, সে তো গত বছরের ব্যাপার। তারপর কতবার বাড়ি গেছি, এইছি, বাবা এসে মাস মাস টাকা নিয়ে যায়।'

ন্যাড়া নিশ্চিন্ত হল। ছোট্টুও বেশ কাজের ছেলে। চা-টা সহদেবের চেয়ে ভাল করে। ক্যান্টিনে কাজ করত কিনা। কয়েকদিনের মধ্যে ন্যাড়া আর ছোট্টু, হরিহর আত্মা হয়ে গেল।

রবিবার। ন্যাড়া একমনে একটা গল্পের বই পড়ছে। ছোট্টু এসে ফিসফিস করে বলল, 'জানিস, তোর এই জানলার ধারে ঐ সজনে গাছটার গর্তে টিয়াপাখি ডিম পেড়ে গেছে।'

'তাই নাকি!' ন্যাড়া বইটা রেখে বলে, 'চল চল দেখে আসি।'

দু'জনে বেরিয়ে যায়। পেছনের দরজা দিয়ে ঘুরে, জানলার ধারের সজনে গাছের কাছে আসে। ছোট্টু গাছে উঠে গর্তে হাত ঢুকিয়ে দুটো ছোটো ছোটো সবুজ ডিম দেখায়।

'ভাল করে রেখে দে।' ন্যাড়া পরামর্শ দেয়, 'বাচ্চা হলে পুষব। বাড়িতে একটা খাঁচা আছে।'

ছোট্টু ডিম দুটো গর্তের মধ্যে রেখে লাফিয়ে নামে। গাছের নীচে জঙ্গল, পাশ দিয়ে একটা পাখি, হঠাৎ বিরাট একটা কোলা ব্যাঙ লাফ মেরে চলে যায়। ছোট্টু চমকে যায়। ন্যাড়া দেখে—ব্যাঙটা তার দিকে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে আছে। ছোট্টু একটা ইট দিয়ে ব্যাঙটাকে মারতে যায়, ন্যাড়া বাধা দেয়, ''না না মারিস নি, ও আমাদের জ্যাঠামশাই।'

'জ্যাঠামশাই।' ছোট্টু অবাক হয়ে বলে।

ন্যাড়া বলে, 'বাবা ওর নাম দিয়েছে জ্যাঠামশাই। বর্ষার রাতে আমি আর সহদেব যখন একা ঘরে শুয়ে থাকতাম, ভয় করত, তখন জ্যাঠামশাই জানলার ধার থেকে আমাদের সাহস দিয়ে বলত—গ্যাঙোর গ্যাং গ্যাঙোর গ্যাং—এর মানে জানিস।'

'কি?' ছোট্টু পালটা প্রশ্ন করে।

ন্যাড়া গম্ভীরভাবে জবাব দেয়, ''বাবা বলেছেন—গ্যাঙোর গ্যাং মানে—হেয়ার আই য়্যাম। মানে আমি আছি, ভয় কি।'

'টিক টিক টিক', ওধারে ন্যাড়ার মায়ের ঘরের জানলা থেকে একটা টিকটিকি ডেকে ওঠে।

ন্যাড়া তৎক্ষণাৎ ছোট্টুর কাঁধে আঙুল দিয়ে তিনবার টোকা মেরে বলে—'সত্যি সত্যি সত্যি, ঐ দ্যাখ মামা আমায় সাপোর্ট করল।'

'মামা!' ছোট্টু আবার অবাক্ হয়।

ন্যাড়া হেসে বুঝিয়ে বলে, 'ঐ টিকটিকিটা মায়ের ঘরে দাদুর ছবির পেছনে থাকে। মা বাবার যখন তর্ক হয়, তখন মা কোন কথা বললেই ঐ টিকটিকিটা টিক টিক টিক করে ওঠে। মা তখন মেজেতে বুড়ো আঙুল দিয়ে তিনবার টোকা দিয়ে বাবাকে বলে ঠিক ঠিক ঠিক—ঐ দ্যাখ। বাবা তখন মাকে বলে ও শালা তোমার চামচে, আর বাবা যাকে শালা বললে সে তো আমার মামা হয়ে যাবে। তাই আমি আর দাদা টিকটিকিটাকে মামা বলে ডাকি। তবে, মামা কিন্তু ঠিক জায়গায় ঠিক ঠিক ঠিক করে ওঠে।' ছোট্টু ঠাট্টা করে বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে, 'তোরা অদ্ভুত, ব্যাঙকে জ্যাঠা, টিকটিকি মামা, এবার বোধহয় ইঁদুরকে খুড়ো বলবি।'

'ইঁদুরকে ঠাট্টা করিস নি।' ন্যাড়া বলে, 'ফিলিম স্টুডিওয় কাজ করতাম, মিকিমাউস ছবি দেখেছিস ওয়াল্ট ডিজনের?'

ছোট্টু অপ্রস্তুত হয়ে মাথা নেড়ে বলে—'না।'

ন্যাড়া গম্ভীর ভাবে বলে, 'ডিজনের অবস্থা তখন খুব খারাপ, একটা মটোর গ্যারাজে থাকতেন, সেখানে শুয়ে শুয়ে একটা ইঁদুরের চালচলন দেখে তাঁর মাথায় মিকিমাউসের আইডিয়া হল। আর এই মিকিমাউসের জন্যেই তিনি পৃথিবীখ্যাত।'

'তাই নাকি?' ছোট্টু অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করে।

ন্যাড়া চোখ বড় বড় করে উত্তর দেয়, 'ইয়েস হ্যাঁ, বাবাকে জিজ্ঞেস করিস।'

এমন সময় বাড়ির কুকুর ধলা মুখ ফাঁক করে, জিভ বার করে হাসি হাসি মুখে ন্যাড়ার কাছে এসে ল্যাজ নাড়তে থাকে। ন্যাড়াও হাসিমুখে বলে, 'আসুন আসুন ধলু বাবুর খবর কি?' ধলা অমনি সামনের পা দুটো ন্যাড়ার পেটে তুলে খেলা করতে থাকে।

ছোট্টু যদিও ওয়াল্টডিজনের নাম জানে না, মিকিমাউস দেখেনি, কিন্তু ওর ঐ কাঠের বাক্সে ন্যাড়া দেখল প্রচুর কাটা বিভিন্ন ছবির ফিল্ম, আর একটা ছোট্ট ম্যাজিক লণ্ঠন। ন্যাড়া উৎসাহিত হয়ে ওঠে—'আয় তোর সিনেমা দেখি।' ছোট্টু বিমর্ষ হয়ে বলে, 'বাল্ব কেটে গেছে।' ন্যাড়া বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে একটা হাই পাওয়ারের বাল্ব কিনে আনল। দুপুর বেলায় তারা ঘরের জানলা কপাট বন্ধ করে অন্ধকার ঘরে বিভিন্ন সিনেমা ছবি দেয়ালে 'প্রজেক্ট' করে দেখত। কয়েকটা দিন বেশ কাটল। ছোট্টুও বেশ বাড়ির লোকের মতন হয়ে গেছে। র‍্যাশন শপ, মুদির দোকান চিনে নিয়েছে। হঠাৎ একদিন লজ্জা লজ্জা মুখ করে ছোট্টু মাকে বলল, 'কিছু টাকা দিন, বাবা এসেছে।'

মা তক্ষুণি আলমারি খুলে ছোট্টুর মাইনে হাতে দিয়ে বললে, 'তোর বাবা কোথায়?'

'ঐ যে বাইরে।' ছোট্টু বাইরের ঘরের দিকে আঙুল তুলে দেখায়। ন্যাড়াও দেখে, একটা আধবুড়ো আধময়লা জামা-কাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে।

ছোট্টুর বাবা কিন্তু বিনা মেঘে বজ্র হানল।

'মা', ছোট্টুর বাবা সবিস্ময়ে বলে, 'আজ আমি ছোট্টুকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।'

মা সবিস্ময়ে বলে, 'সে কি! কবে ফিরবে।'

'আজ বেস্পতিবার, রোববার বিকেলেই ফিরে আসবে।'

কি আর করা যায়। ছোট্টু তার বাবার সঙ্গে আর এক সেট জামা নিয়ে চলে গেল।

রাত্রে বাবা রবি এই সিদ্ধান্তে এলো—'ও ছোট্টু আর আসবে না। এরপর একটা লোক এসে ওর কাঠের বাক্সটা নিয়ে আসে।' রবি মাকে অনুযোগ করে, 'তোমার পুরো মাইনেটা দেওয়া ভুল হয়েছে।'

রবিবার তিনটের সময় ন্যাড়া মায়ের ঘরে মায়ের কাছে শুয়ে আছে, বাবা বাইরের ঘরে লিখছে। রবি নিজের ঘরে ঘুমুচ্ছে, এমন সময় দরজায় খট খট আওয়াজ হল। ন্যাড়া দরজা খুলে দেখে ছোট্টু হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। ন্যাড়া আনন্দে চিৎকার করে বলে—'মা ছোট্টু এসেছে, ছোট্টু এসেছে।'

মা তাড়াতাড়ি দিবানিদ্রা ত্যাগ করে উঠে পড়েন। ধলা প্রথমে ঘেউ ঘেউ করে ছুটে এসে ছোট্টুকে চিনতে পেরে ল্যাজ নাড়তে থাকে। বাবা বাইরের ঘর থেকে হাঁক দিয়ে বলেন "ছোট্টু চাকর।"

ছোট্টুও তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে চায়ের কেটলিতে জল ঢালতে থাকে, ন্যাড়া রান্নাঘরে ছোট্টুর পাশে উবু হয়ে বসে ফিসফিস করে বলে, 'টিয়াপাখির ডিমগুলো ফুটে বাচ্চা হয়েছে।'

'তাই নাকি!' ছোট্টু স্টোভ ধরাতে ধরাতে বলে ওঠে।

—'হ্যাঁ, তবে এখনও গায়ে পালক হয় নি।'

—'আরও দু-চারদিন যাক।'

ওদের কথার মাঝে মা আসেন।

'হ্যাঁরে বাড়ির খবর সব ভাল।' মা জিজ্ঞেস করে। ছোট্টু ঘাড় কাত করে তাচ্ছিল্য ভাবে বলে—'হ্যাঁ একই রকম, সৎমার ইচ্ছে ছিল না আমি আসি। আর একটা বুন হয়েছে তো, সেটাকে রাতদিন কোলে করে ঘোর, যদি কাঁদে, পিঠে চ্যালা কাঠ ভাঙবে, আর বুনটাও হয়েছে চামচিকার মতন।'

'আহা!' মা সমবেদনা জানায়, 'একদিনেই রোগা হয়ে গেছিস।'

এর পরে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে—ছোট্টু ও ন্যাড়া টিয়াপাখির বাচ্চাগুলো আর সেই সজনে গাছের গর্তে পায়নি। ছোট্টুর ধারণা—ওর মা বুঝতে পেরে ঠোঁটে করে অন্য গাছে নিয়ে গেছে। রবি বাধা দিয়ে বলে—'সাপে টাপে খেয়ে গেছে।'

'ওখানে সাপ নেই?' ছোট্টু মাতব্বরের মতন বলে।

'কি করে জানলি?' রবি তর্ক করে।

ছোট্টু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়—'ঐ বটগাছটায় তোক্কক আছে। যেখানে তোক্কক থাকবে, সেখানে সাপ বাপ্ বাপ্ করে পালাবে।' ছোট্টুর বলার ধারা দেখে ন্যাড়া হেসে ফেললে।

তারপর দিন ন্যাড়া, ন্যাড়ার মা ও রবি পুজোর বাজার করতে গেল। সবাইয়ের জামা-কাপড়ের সঙ্গে ছোট্টুর একটা সুন্দর লাল চেক চেক হাওয়াই শার্ট আর নীল প্যান্ট কেনা হল। বাজার থেকে মা এসে ছোট্টুকে নিজে হাতে ন্যাড়াকে যেমন করে জামা প্যান্ট পরায় ঠিক সেই ভাবে নতুন জামা প্যান্ট পরিয়ে সস্নেহে বাঁহাত দিয়ে থুতনি ধরে ডান হাত দিয়ে ছোট্টুর এলোমেলো চুলগুলো ঠিক করে দেয়। ন্যাড়ার এই দৃশ্যটা খুবই ভাল লাগে, তার মা এখন কেবল তার নিজের মা নয়। সবার মা, মা জগদ্ধাত্রী।

ন্যাড়া শরৎচন্দ্রের গল্পের মত প্লট পেয়ে গেল।

কাল মহালয়া। ভোর বেলা রেডিওতে মহালয়ার গান শুনে, সকালবেলা থেকেই গল্পটা লিখতে আরম্ভ করলে ন্যাড়া। গল্পে ছোট্টুর নাম দিল ভানু। ভানুর সৎমা আছে নবাবগঞ্জ গ্রামে, মহিলা খুব নিষ্ঠুর। ভানুকে খেতে দেয় না পরতে দেয় না।

এই ভাবে ভানুর নাম দিয়ে ছোট্টুর গল্প লিখে যায় ন্যাড়া। নিজের টেবিলটার সামনে একটা চেয়ার টেনে কলমের পেছনটা ঠোঁটের ওপর টিপে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে গল্পটাকে কিভাবে শেষের দিকে নিয়ে যাবে, ভাবতে থাকে। সামনের ছোট্ট গাছটার ডালে দুটো বুলবুলি ঘাড় কাত করে কি দেখছে। ওধারে পাঁচিলে একটা সাদা বেড়াল হেঁটে আসছে। সামনে রাস্তায় একটা ছাগল খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে। নীল আকাশে সাদা সাদা মেঘ ভাসছে। দূরে কোথায় একটা ঘুঘু ডাকছে।

'শোনপাপড়ি চাই, শোনপাপড়ি।' একটা ফেরিওলা হেঁকে গেল। দুটো উদম ল্যাংটো বস্তির ছেলে সেই ফেরিওলাটার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে চলে গেল। তাই দেখে বুলবুলি পাখি দুটো উড়ে গেল। এই সব নানান দৃশ্য দেখতে দেখতে ন্যাড়ার মাথায় গল্পটার শেষ ক্লাইমেক্সটা চমৎকার ভাবে এসে গেল।

ভানু ওরফে ছোট্টুর বাবা আর সৎমা জোর করে ভানুকে ন্যাড়াদের বাড়ি থেকে নিয়ে যাচ্ছে। ভানু চিৎকার করে কেঁদে কেঁদে বলছে—'না আমি মাকে ছেড়ে যাব না।' ন্যাড়ার মা সদর দরজার একটা পাট ধরে নীরবে চোখের জল ফেলছে। ভানুর মা বিচ্ছিরি ভাষায় বলছে—'হারামজাদা, যে তোকে চাকর করে রাখে সেই তোর মা, আর আমি হলাম শত্তুর।' বলে চড়াস করে এক চড় মারে। ভানু মাথা ঘুরে রাস্তায় পড়ে যায়, ন্যাড়ার মা আর থাকতে পারে না, ছুটে গিয়ে ভানুকে কোলে তুলে নিয়ে বলে, 'না ওকে যেতে দেব না, আমি তোমাদের পুলিসে দোব।' ভানু মায়ের বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

ন্যাড়া এইভাবে গল্পটা লিখে রাত্রি এগারোটার সময় শেষ করে টেবিলের উপর রেখে, নিজের খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে দেখে ছোট্টু অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ন্যাড়াও আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল। সকাল বেলা রবির ডাকে ঘুম ভাঙল। রবি মুচকি হেসে বলল—'ন্যাড়া, ছোট্টু পালিয়েছে।' ন্যাড়া ধড়মড়িয়ে উঠে দেখে ছোট্টুর সেই বড় কাঠের বাক্সটা নেই। 'কখন গেল?' ন্যাড়া আহত হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'ভোর বেলা, কেউ জানে না।' রবি বলে যায়। 'মায়ের দুটো ভাল শাড়ি, তোর সেই টেরিলিনের প্যাণ্টটা আর বাবার ঘড়িটাও চুরি করে নিয়ে গেছে।'

'সেকি!' ন্যাড়ার রবির কথাগুলোকে আগুনের টুকরোর মতন অসহ্য মনে হয়। ন্যাড়া শুনতে পায় মা বাবাকে বলছে—'পুলিসে খবর দিয়ে আর কি হবে?'

ন্যাড়া নির্বাক্ হয়ে ঘুম-ভাঙ্গা চোখে জানলার দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে থাকে। ন্যাড়ার মা এসে বলে, 'ন্যাড়া শুনেছিস তো, ছোট্টু, চুরি করে পালিয়েছে।'

মা এখন কেবল তার নিজের মা নয়, সবার মা, মা জগদ্ধাত্রী। [পৃ. ২২৮

হঠাৎ ন্যাড়া ছুটে নিজের টেবিলের কাছে গিয়ে গত রাত্রে ছোট্টুকে নিয়ে লেখা গল্পটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ছোট ছেলের মতন ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল। মা সান্ত্বনা দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, 'কাঁদছিস কেন?' রবিও বলে—'ঐ চোর চাকরটার জন্যে কেউ কাঁদে।' ন্যাড়ার কিন্তু চোখের জলের বাঁধ ভেঙে হুহু করে অশ্রুনদী বয়ে চলেছে। বাবাও সবিস্ময়ে এসে জিজ্ঞেস করে—'ন্যাড়া কাঁদছে কেন?'

এরা কেউ বুঝবে না ন্যাড়ার কান্নার মানে। ন্যাড়ার কান্না ছোট্টু শরৎচন্দ্রের রামের সুমতির রামের মতন হল না কেন? এই কেনর উত্তর আজকের সংসারে কেউ দিতে পারে না দেওয়াও যায় না।

মণ্ডূক

—অন্নদাশঙ্কর রায়

এক যে ছিল ব্যাং
সরু সরু ঠ্যাং
হাতীর পায়ে লাথি মারে
লাথি তো নয়, ল্যাং।

ভাবে কেমন মজা হবে
হাতী হলে কাত
হাতীর পিঠে নাচবে তখন
খেলা হবে মাত।

হাতী যদি কাত-ই হতো
মজা হতো একটা
হাতীর ভারে চাপা পড়ে
ব্যাংই হতো চ্যাপটা।

হাতী চলে আপন চালে
ফিরে তাকায় নাকো
ব্যাঙের লাথি ব্যাঙের হাসি
তাকে রাগায় নাকো।

আমার জ্বালায় হাতী পালায়,
ছাতি ফোলায় ব্যাং
মকমকিয়ে টিটকারী দেয়,
কেমন আমার ল্যাং।

আমার মারে হাতী হারে,
গর্জে কোলাব্যাং
দু'গালফোলা ব্যাং
ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ঘ্যাং।
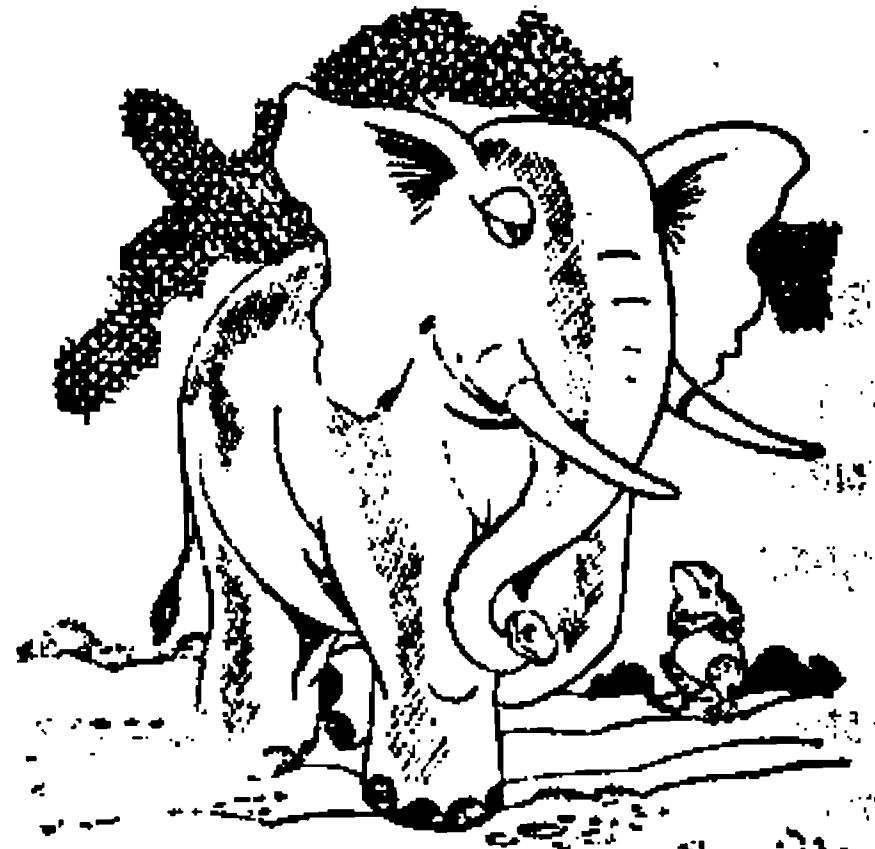
নীলমানুষের দুঃখ

—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

রণজয় একটা গাছের তলায় ঘুমিয়েছিল, একটা গাড়ির শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। সে উঠে বসে অবাক্ হয়ে তাকালো। এই জঙ্গলের মধ্যে গাড়ি আসবে কি করে?

সে দেখলো, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এবড়ো খেবড়ো রাস্তা দিয়ে একটা জিপ গাড়ি খুব আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। দেখলেই বোঝা যায় পুলিসের জিপ। রণজয় একটা মোটা বটগাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। পুলিসরা কি তাকেই খুঁজতে আসছে? রণজয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

এই রকম ভাবে আর কতদিন কাটানো যায়? কতদিন সে কোনো মানুষের সঙ্গে কথা বলেনি! তাকে দেখলে সবাই ভয় পায়। তার মা বাবা পর্যন্ত তাকে চিনতে পারে না। সে এখন সাধারণ মানুষের প্রায় দ্বিগুণ লম্বা, তার গায়ের রং গাঢ় নীল। তার মাথার চুল নীল। হাত পায়ের নোখগুলোও নীল। কেন যে সে নদীর ধারে সেই অদ্ভুত ধাতুর বলটা ছুঁতে গিয়েছিল। তারপর থেকেই তো তার এই অবস্থা! এবার তাকে যে দেখে সেই ভাবে যে সে বুঝি একটা দৈত্য। কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে সেই আগেকার রণজয়ই আছে, তা কেউ জানে না।

পুলিসের জিপটা একটু দূরে থামলো। তার থেকে নামলো পাঁচজন লোক। এদের মধ্যে দু'জনের কোমরে রিভলবার গোঁজা, আর তিনজনের মধ্যে হাতে লাঠি। নিজেদের কি সব কথা বলে তারা পাঁচজন পাঁচ দিকে ছড়িয়ে পড়লো।

রণজয় নিজের জায়গা ছেড়ে নড়লো না। সে যদি পালাবার ইচ্ছে করে, তা হলে সে এত জোর দৌড়তে পারে যে জিপগাড়িটাও তাকে ধরতে পারবে না। কিন্তু তার তখন দৌড়োতে ভালো লাগছিল না। দেখাই যাক না কী হয়।

একজন পুলিসের লোক খুঁজতে খুঁজতে এদিকেই আসছে। একটু বাদেই রণজয়কে দেখতে পাবে। লোকটা একটা চিউয়িংগাম চিবুচ্ছে।

লোকটা এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে হাঁটছে আর আস্তে আস্তে শিস দিচ্ছে। ভালো শিস দিতে পারে না। রণজয় খুব জোরে একবার শিস দিল। লোকটা চমকে উঠলো একেবারে। পাখি মনে করে ওপরের দিকে তাকালো।

সেই রকম ওপরের দিকে তাকাতে তাকাতে গাছের এদিকটায় এলো বলেই সে রণজয়কে প্রথমে দেখতে পায় নি। রণজয় নিজেই লোকটির কাঁধে হাত রাখলো।

লোকটি আঁ আঁ করে চেঁচিয়ে উঠলো।

রণজয় ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললো, চুপ!

পুলিসটা তবু চুপ করলো না। চেঁচিয়ে বললো, ভূত! দৈত্য! মেরে ফেললো!

পুলিসটি কোমর থেকে রিভলবারটা বার করতে যেতেই রণজয় সেটা হ্যাঁচকা টানে ছিনিয়ে নিল। সেই ছুড়ে ফেলে দিল দূরে। তারপর লোকটাকে ভয় দেখাবার জন্য একটা চড় তুললো।

চড় মারবার দরকার হলো না। তার আগেই লোকটা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

রণজয়ের অদ্ভুত লাগলো। এক সময় সেই পুলিস দেখলে ভয় পেত। এখন পুলিসই তাকে দেখলে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়।

রণজয় পুলিসটির জামার বুক পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা চিউয়িংগামের প্যাকেট পেয়ে গেল। চারটে রয়েছে তার মধ্যে। কতদিন রণজয় চিউয়িংগাম খায় নি। রণজয় চারটেই এক সঙ্গে মুখে পুরে দিল।

—সাবধান! এক পা নড়লে গুলি করবো!

রণজয় চমকে পেছনে তাকিয়ে দেখলে আর চারজন পুলিস এসে তাকে ঘিরে ফেলেছে। একজন পুলিস চেঁচিয়ে বললো, ওরে বাবারে! এ কোন্ আজব প্রাণী!

রণজয় বললো, আমি মানুষ!

কিন্তু তার গলাটা এমন গম্ভীর আর অন্যরকম হয়ে গেছে যে তার কথা ঠিক বোঝা গেল না। তাছাড়া মুখে চিউয়িংগাম! সেইজন্য তার কথাটা শোনালো যেন, 'আম্ হুঁস্!'

তার কথা শুনেই দুজন পুলিস ভয়ে পিছিয়ে গেল। যার হাতে রিভলবার সে শুধু রণজয়ের কপাল টিপ করে আবার বললো, সাবধান!

রণজয়ের একবার মনে হলো, ধরা দেওয়াই ভালো। এই রকমভাবে বনে জঙ্গলে আর কতদিন বা পালিয়ে পালিয়ে থাকা যায়! খাবার দাবার নেই, কথা বলার কেউ নেই।

তারপরেই ভাবলো, কিন্তু এরা তাকে ধরে বন্দী করে রাখবে। হয়তো চিড়িয়াখানায় একটা খাঁচায় পুরবে। সে ওরকম ভাবে থাকবে কেন? সে তো মানুষ। তার চেহারাটা বদলে গেলেই বা, তার মনটা তো এখনো মানুষের মতন।

তখন তার খুব দুঃখ হলো। এই রকম ভাবে আর কতদিন বেঁচে থাকা যায়! তার চেহারাটা

লোকটি আঁ আঁ করে চেঁচিয়ে উঠলো। [পৃ. ২৩৩

যে বদলে গেছে, সেটা কি তার দোষ? অন্য কোন্ গ্রহ থেকে অদ্ভুত সব প্রাণী এসেছিল পৃথিবীতে, তাদের একটা বল ছুঁয়েই তো রণজয়ের এই দশা।

রণজয় দুহাত ছড়িয়ে পুলিসটির দিকে এগোতে এগোতে বললো, মারুন। গুলি করুন! আমাকে মেরে ফেলুন!

পেছন থেকে আর একজন পুলিস বললো, সাবধান স্যার! ও গোরিলার মতন এগিয়ে আসছে। খপ করে ধরবে।

যার হাতে রিভলবার, সে কিন্তু তখনো রণজয়কে গুলি করলো না। পুলিসের ওপর হুকুম আছে রণজয়কে জ্যান্ত ধরে নিয়ে যাওয়ার। দেশ-বিদেশে রণজয়ের কথা ছড়িয়ে গেছে। বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা রণজয়কে পরীক্ষা করে দেখতে চায়।

সেই পুলিসটি অন্যদের বললো, দড়ি বার করো। একে বাঁধো!

কেউ সাহস করে বাঁধতে এলো না।

রণজয় আরও এগিয়ে এসে নিজেই হাত দুটো জোড় করে বললো, না, বাঁধতে হবে না। আমাকে মেরে ফেল! আমি বাঁচতে চাই না আর।

কিন্তু রণজয়ের কথা ওরা কেউ বুঝতে পারছে না। মেঘের গর্জনের মত শোনাচ্ছে। পুলিসদের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

এমন সময় আকাশে একটা কড় কড় শব্দ হলো। সবাই ওপরের দিকে তাকালো। একটা বিরাট গোল বলের মতন জিনিস খুব তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আসছে। সেটাকে দেখেই রণজয় লাফিয়ে উঠলো। তারপর বললো, সবাই মরবে! পালাও, পালাও!

কথা বলে নিজেই সে ছুটলো প্রথমে। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে। সেই অন্য গ্রহের প্রাণীরা রণজয়কে ধরতে আসছে।

ওদের হাত থেকে বাঁচবার একটাই উপায় আছে, রণজয় জানে। ওরা জলকে ভয় পায়। এখান থেকে নদীটা বেশ খানিকটা দূর। রণজয়কে শীগগির সেখানে পৌঁছোতে হবে।

গোল জিনিসটা খুব কাছে নেমে এসেছে। টর্চের আলোর মতন খুব উজ্জ্বল কয়েকটা আলোর রেখা তার থেকে নেমে আসছে নীচে। ঐ আলোর মধ্যে একবার পড়লে আর রক্ষে নেই—সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে হবে। এর মধ্যেই কয়েকটা গাছ একেবারে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

লুকোচুরি খেলার মতন রণজয় এঁকে বেঁকে, সামনে পেছনে ঘুরে দৌড়োতে লাগলো। আলোর রেখাগুলো যেন কিছুতেই গায়ে না লাগে। তারপর নদীটার কাছে এসেই দূর থেকে এক লাফ মারলো।

অন্য গ্রহের এই সব প্রাণীরা জল চেনে না, তারা জলের কাছেও আসে না। রণজয় খুব ভালো সাঁতার জানে। নদীর মধ্যে সে ডুব সাঁতার কেটে কেটে পালাতে লাগলো। এখন সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলে থাকতে পারবে।

গোল বলটা এবারও রণজয়কে ধরতে পারলো না। কিছুক্ষণ শূন্যে ঘোরাঘুরি করে তারপর আবার মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল।

মাঝ রাত্রে রণজয় উঠে এলো নদী থেকে। এবার তাকে খাবার যোগাড় করতে হবে। রাত্রিবেলা লোকজন ঘুমিয়ে থাকে। এই সময় তবু তার খানিকটা স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরার সুবিধে আছে।

নদীর পাশেই একটা বাজার। এখন সব দোকান বন্ধ। কয়েকটা দোকানের ভেতরে দোকানদারেরা ঘুমোয়, কয়েকটা দোকান বাইরে থেকে তালা বন্ধ। রণজয় ঘুরে ঘুরে একটা দোকানের সাইনবোর্ড দেখে বুঝলো সেটা একটা মিষ্টির দোকান। সে হাত দিয়ে একটু জোরে চাপ দিতেই ভেতর থেকে খিল আর ছিটকিনি ভেঙে পড়লো।

রণজয় দেখলো, দোকানের মধ্যে দুটো লোক ঘুমোচ্ছে কিন্তু এই শব্দে তাদের ঘুম ভাঙেনি। সে আর কোনো রকম শব্দ না করে কাচের আলমারি থেকে সন্দেশের থালাটা বার করে নিল। এক থালা সন্দেশ খেয়েও তার পেট ভরলো না। তখন সে রসগোল্লার গামলাটাও বার করে আনলো। তার নিজেরই অবাক লাগতে লাগলো। আগে দু'টো তিনটের বেশী সন্দেশ রসগোল্লা খায় নি কখনো। নেমন্তন্ন বাড়িতেও পাঁচটার বেশী রসগোল্লা খেতে পারেনি কোনোদিন। আর এখন সে কত সহজে এক থালা সন্দেশ আর এক গামলা রসগোল্লা খেয়ে ফেললো! সে কি সত্যিই বকরাক্কস হয়ে যাবে নাকি?.

এই সব খেয়ে তার খুব জল তেষ্টা পেল। একটা বালতি ভরতি জল রাখা ছিল। এক চুমুকে খেয়ে ফেললো সবটা। তারপর মিষ্টির দোকানটার দরজা ভেজিয়ে দিয়ে সে চলে এলো।

একটা রকের ওপর সে একটুক্ষণ ভাবতে বসলো। এরপর কী করা যায়? তাকে পুলিসের লোক ধরতে আসছে, আবার আকাশ থেকে অন্য গ্রহের প্রাণীরাও ধরতে আসছে। সে কতদিন পালিয়ে পালিয়ে থাকবে? বনে জঙ্গলে বেশীদিন পালিয়ে থাকা যাবে না। খিদের সময় তার প্রচুর খাবার লাগে। এত খাবার রোজ রোজ সে কী ভাবে যোগাড় করবে? নাঃ এ ভাবে আর চলে না!

সে আবার উঠে দাঁড়ালো। সাইনবোর্ড দেখে দেখে সে আবার একটা দোকানের সামনে দাঁড়ালো। এটা একটা জামা-কাপড়ের দোকান। বাইরে থেকে তালা দেওয়া। দুটো বড় বড় তালা সে মট মট করে ভেঙে ফেললো। তারপর ভেতরে ঢুকলো।

আলমারিতে অনেক তৈরি জামা-প্যান্ট রয়েছে। কিন্তু একটাও তার গায়ে লাগবে না। রণজয় হঠাৎ লম্বা হয়ে যাওয়ায় তার প্যান্টটার তলাটা উঠে আছে হাঁটুর কাছে—জামাটা ছিঁড়েই গেছে।

একটা গোল বলের মত জিনিস নীচে নেমে আসছে। [পৃ. ২৩৪

সেই ভিজে জামা প্যান্ট খুলে ফেলে সে একটা ধুতি পরলো। সেই ধুতিও তার হাঁটুর বেশী নামে না। আর দুটো চাদর নিয়ে গায়ে জড়ালো। আর একটা চাদর দিয়ে পাগড়ি বানিয়ে এমনভাবে মাথায় দিল, যাতে তার মুখের অনেকখানি ঢাকা পড়ে যায়।

দেয়ালের গায়ে একটা আলমারি আছে। রণজয় সেটাকেও ভেঙে ফেললো। তার মধ্যে টাকা পয়সা রয়েছে কিছু। খুব বেশী নয়। রণজয় গুনে দেখলো সাতশো পঞ্চাশ টাকা। সব টাকাটাই নিয়ে সে কোমরে গুঁজলো।

সে কোনোদিন চুরি ডাকাতি করে নি। কারুর দোকান ভেঙে সন্দেশ রসগোল্লা খাওয়া কিংবা ধুতি-চাদর টাকা চুরি করা তার স্বভাব নয়। কিন্তু এখন তার উপায় কী? তাকে বাঁচতে হবে তো। সে তো আর এমনি এমনি মরে যেতে পারে না? ঠিক আছে, যদি পরে আবার সব কিছু বদলে যায়, তাহলে রণজয় নিশ্চয়ই ঐ মিষ্টির দোকানদার আর এই জামা-কাপড়ের দোকানদারদের সব টাকা ফেরত দিয়ে যাবে।

বাজারে ঢোকার সময়েই সে দেখেছিল, এক জায়গায় দু'তিনটে সাইকেল চেন দিয়ে বাঁধা আছে। রণজয় সেখানে এসে এক হ্যাঁচকা টানে লোহার চেন ছিঁড়ে ফেললো। তারপর একটা সাইকেল নিয়ে চড়তে গেল।

সে যেই সাইকেলটায় উঠে বসলো, অমনি সেটা দুমড়ে বেঁকে পড়ে গেল মাটিতে। তার এত বড় দেহের ভার সাইকেলটা সহ্য করতে পারে নি।

রণজয়ের আবার খুব মন খারাপ হয়ে গেল। এক সময় সে সাইকেল চালাতে খুব ভালোবাসতো। আর কি কোনোদিন সে সাইকেল চাপতে পারবে না?

যাই হোক, সাইকেলটা ফেলে রেখে সে হাঁটতে লাগলো। বড় রাস্তা ধরে সে খুব জোরে এগিয়ে চললো সামনের দিকে। মাঝে মাঝে দু একটা গাড়ি আসছে—তখন রণজয় রাস্তার পাশে অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ছে। গাড়িগুলোকে থামিয়ে কোনো লাভ নেই। কারণ গাড়ির লোকেরা রণজয়কে দেখে হয় অজ্ঞান হয়ে যাবে, নয়তো পালাবে! রণজয় নিজেও গাড়ি চালাতে জানে না।

প্রায় ভোর হবার একটু আগে রণজয় এসে পৌঁছোলো একটা ছোট শহরে। লোকজন উঠে পড়ার আগেই তাকে একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে।

লং জাম্পের পর লং জাম্প মেরে একেবারে উধাও।

সে একটা হোটেল দেখে তার মধ্যে ঢুকে পড়লো। একটা ছোটখাটো দোতলা হোটেল, দেখে মনে হয় নতুন তৈরী হয়েছে। হোটেলের অফিস ঘরে একটা লোক ঘুমিয়ে আছে। ঘরের ভেতরটা আবছা অন্ধকার।

রণজয় ঝুঁকে দাঁড়ালো, যাতে হঠাৎ না বোঝা যায় সে লম্বা। অন্ধকারে তার গায়ের রংও বোঝা যাবে না। সে লোকটাকে খুব আস্তে ঠেলা দিয়ে গলার আওয়াজ যতদূর সম্ভব সরু করে বললো, ঘর পাওয়া যাবে?

লোকটা ঘুমের মধ্যেই বললো, এখন হবে না! এখন হবে না!

রণজয় বললো, আমার খুব দরকার?

লোকটা বললো, সকালে আসবেন। এত রাত্তিরে ঘরভাড়া হয় না।

রণজয় আর কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। লোকটা ঘুমিয়ে পড়লো আবার।

অফিস ঘরের দেয়ালে একটা কাঠের বোর্ডে কয়েকটা চাবি ঝুলছে! পাশে পাশে লেখা আছে একতলা, দোতলা। রণজয় একটা চাবি তুলে নিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে এসে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এলো। কয়েকটা ঘরই বাইরে থেকে তালা বন্ধ। দু'তিনটে তালায় চাবি লাগিয়ে চেষ্টা করতেই একটা তালা খুলে গেল। রণজয় সেই ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

ঘরে একটা বড় খাট, একটা টেবিল চেয়ার, একটা আয়না। পাশেই বাথরুম।

রণজয় আর একটুও দেরি না করে শুয়ে পড়লো খাটে। উঃ, কতদিন বাদে সে বিছানায় শুচ্ছে! সে ভদ্র পরিবারের ছেলে, লেখাপড়া জানে—সে কেন দিনের পর দিন বনে জঙ্গলে মাঠে ঘাটে শুয়ে থাকতে যাবে!

বিছানায় শুয়ে তার দারুণ আরাম হলো। যদিও খাটটা তার তুলনায় অনেক ছোট, তার পা অনেকখানি বেরিয়ে রইলো—তবু সে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লো।

কয়েক ঘণ্টা বাদে দরজায় খট্ খট্ শব্দে তার ঘুম ভাঙলো। হোটেলের কোনো লোক তাকে ডাকছে। এবার তো দরজা খুললেই তার চেহারা দেখে ফেলবে!

এক মিনিট চিন্তা করে সে বললো, একটু বাদে। দশ মিনিট ঘুরে এসো—

তার গলার আওয়াজ মোটা হয়ে গেছে, লোকেরা তার কথা বুঝতে পারে না, তাই সে খুব সাবধানে সরু গলায় স্পষ্ট উচ্চারণ করে কথা বলছে।

এবার সে উঠে দরজার ছিটকিনিটা খুলে রাখলো। টেবিলের ওপর রাখলো কুড়িটা টাকা। তারপর বাথরুমে ঢুকে পড়লো।

খানিকটা বাদে আবার একজন কেউ ডাকতে এলে সে বাথরুম থেকেই বললো, টেবিলের ওপর টাকা আছে, ডিম টোস্ট, চা নিয়ে এসো। সারাদিন যেন আমায় কেউ বিরক্ত না করে।

লোকটা যখন চা জলখাবার নিয়ে এলো, তখনও রণজয় বাথরুমে। লোকটি জিজ্ঞেস করলো, আর কিছু চাই, আপনার?

রণজয় বললো, হ্যাঁ, একটা খবরের কাগজ!

লোকটি খবরের কাগজও দিয়ে যাবার পর রণজয় বাথরুম থেকে বেরিয়ে জলখাবার খেয়ে নিল। কতদিন পরে যে সে চা খাচ্ছে!

দেয়ালের আয়নায় সে নিজের মুখটা দেখলো। নিজেই সে খুব চমকে গেল। প্রতিদিনই চেহারা যেন একটু করে বদলে যাচ্ছে। তার গায়ের নীল রংটা এখন এমন চকচকে যে মনে হয় যেন তেল মাখা। হাত দিলে লেগে যাবে। রণজয় নিজের কপালে হাত বুলোলো। হাতে রং লাগে না অবশ্য। মানুষের চোখের যে সাদা অংশটুকু থাকে, সে টুকুও যেন নীল হয়ে আসছে। রণজয় নিজেকে দেখে নিজেই ভয় পেয়ে গেল, অন্য লোক তো পাবেই।

দরজা জানালা বন্ধ করে রণজয় আবার খবরের কাগজটা নিয়ে শুয়ে পড়লো। খবরের কাগজের বেশির ভাগ খবরই তার সম্পর্কে। কালকের পুলিসের দল যে তার দেখা পেয়েও তাকে ধরতে পারে নি, সে খবরও বেরিয়েছে। একজন পুলিসের লোক নাকি এখনো কোনো কথা বলতে পারছে না। মহাকাশ থেকে যে একটা বিরাট গোল জিনিস মাঝে মাঝে নেমে আসছে—সে কথাও আছে। সেই গোল জিনিসটার ওপর একবার কামানের গোলা চালানো হয়েছিল, তাও সেটার কিছুই হয় নি।

আর এক জায়গায় লিখেছে যে রাশিয়া আর আমেরিকা থেকে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক এসেছে তার খোঁজে। তাঁরা এখনো সব কথা বিশ্বাস করছেন না। তাঁরা বলছেন, এরকম নীল রঙের মানুষ হতেই পারে না। তা ছাড়া তার কোনো ছবি পর্যন্ত নেই। এক একজন এক এক রকম কথা বলছে। কেউ বললে, নীল মানুষের দাঁতগুলো মুলোর মতন, কেউ বলছে মুখটা শুয়োরের মতন এইসব। আমেরিকান বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন তাঁরা এই নীল মানুষকে ধরতে পারলে হুস্টনের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখবেন।

সন্ধ্যের দিকে রণজয় সব ঠিক করে ফেললো। সে ধরা দেবে। অনেকদিন থেকেই তার শখ ছিল বিদেশে বেড়াতে যাবার। এই ভাবে তো সে সহজেই রাশিয়া—আমেরিকা যেতে পারে। তা ছাড়া বৈজ্ঞানিকরা যদি তাকে আবার সারিয়ে দিতে পারে—তাকে আবার সাধারণ মানুষ করে দিতে পারে, তাহলে তো দারুণ হবে! তা হলে রণজয় আবার নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে পারবে!

টেবিলের ড্রয়ারে কয়েকটা কাগজ আর একটা পেনসিল ছিল। তাতে রণজয় একটা চিঠি লিখে ফেললো। চিঠিটা এই রকম ঃ

পুলিসের বড়বাবু মহাশয়,

আপনারা যে নীল মানুষের খোঁজ করছেন, আমি সেই নীল মানুষ। কোনো এক অদ্ভুত কারণে আমি হঠাৎ খুব লম্বা হয়ে গেছি, আর আমার গায়ের রং একেবারে নীল হয়ে গেছে। কিন্তু আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি এখনো মানুষ আছি। আমি মানুষই থাকতে চাই, আমি দৈত্য হতে চাই না। আমি বৈজ্ঞানিকদের কাছে যেতে রাজী আছি। কিন্তু আমি লোকের সামনে বেরুতে পারি না, সবাই আমাকে দেখলেই ভয় পায়। কিন্তু আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি কারুকে মারবো না। আমি কারুকে কামড়াই না। বৈজ্ঞানিকদের কাছে গিয়ে আমি সব কথা বলবো।

আমি এখন এই আদর্শ হোটেলের ১২ নম্বর ঘরে আছি। আপনি কয়েকজন পুলিস নিয়ে এসে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। খুব সাহসী দেখে লোকদের আনবেন। আর তাদের আগেই বলে দেবেন, আমাকে দেখে ভয় লাগলেও আমি কারুর কোনো ক্ষতি করবো না।

আমি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকবো। আজই যে-কোনো সময় আসুন।

ইতি—

নীল মানুষ

চারজন নীল রঙের প্রাণী নেমে এলো রণজয়ের কাছে। [পৃ. ২৪০

চিঠিখানা ভাঁজ করে তার ওপর একটা দশ টাকার নোট চাপা দিয়ে রাখলো রণজয়। তারপর সন্ধ্যেবেলা যখন হোটেলের বেয়ারা জিজ্ঞেস করতে এলো যে তার রাত্তিরে কী খাবার লাগবে, তখন রণজয় আবার বাথরুমে ঢুকে পড়ে ভেতর থেকে বললো, রাত্তিরে ভাত আর মাংস আনবে। তার আগে এক কাজ করো তো! টেবিলের ওপর যে চিঠিটা আছে, সেটা থানার বড়বাবুকে এক্ষুণি দিয়ে এসো। খুব জরুরি। এ দশ টাকা তোমার বখশিশ।

বেয়ারা চিঠিখানা নিয়ে চলে গেল। তখনো রণজয় বাথরুম থেকে বেরোয় নি, অমনি আকাশে কড়্‌কড়্‌ শব্দ শুনলো। বাথরুমের জানলা দিয়ে সে উঁকি মেরে দেখলো আকাশ থেকে সেই রকম গোল বল নেমে আসছে—এবার একটা নয় দুটো।

রণজয় যেখানেই পালাক, কি করে ওরা ঠিক টের পেয়ে যায়! ওরা কি এই হোটেলের ঘর থেকে রণজয়কে ধরতে পারবে?

শব্দ শুনেই রণজয় টের পেল গোল জিনিস দুটো এখন ঠিক হোটেলের মাথার ওপর এসেছে। ওদের কাছে যে-রকম আগুনে-আলো আছে, তাতে এই হোটেল বাড়িটাকে ওরা এক নিমিষে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে। এখন উপায়?

রণজয়ের মনে পড়লো, হোটেলে আসবার আগে সে লক্ষ্য করেছিল, এই বাড়িটার ঠিক পেছনেই একটা পুকুর আছে। ওদের হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় সেই পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়া।

রণজয় বুঝতে পারলো, হোটেলের এই ঘরে আর লুকিয়ে থেকে লাভ নেই। ওরা যখন এই হোটেল পর্যন্ত চিনে আসতে পেরেছে, আজ এই ঘরেও আসবে।

রণজয় দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লো। হোটেলের বেয়ারাটা ঠিক সেই সময় সেদিকে আসছিল, সে হঠাৎ দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, ওরে বাবারে! একি!

রণজয় গ্রাহ্য করলো না। সে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে হোটেলের পেছন দিকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো পুকুরে।

এবারে সেই গোল বল দুটি পুকুরের ওপরে এসে ঘুরতে লাগলো। তারপর দুটোর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো দুটো নীল আলোর শিখা। সেই আলো পড়ামাত্র পুকুরের জল টগবগ করে ফুটতে লাগলো।

রণজয় একটা জিনিস জানে। এই অদ্ভুত প্রাণীগুলো তাকে ঠিক মারতে চায় না। এরাও তাকে ধরে নিয়ে যেতে চায়। এবার তারা রণজয়কে জলের মধ্য থেকেও ধরে আনার কায়দা শিখে এসেছে।

হোটেলের অনেক লোকও শব্দ শুনে বাইরে বেরিয়ে এসেছে—কিন্তু তারা কেউ কাছে আসতে পারছে না। তাদের সাংঘাতিক গরম লাগছে।

রণজয় দেখলো, নীল আলোতে পুকুরের জল আস্তে আস্তে ধোঁয়া হয়ে চলে যাচ্ছে। একটু বাদেই পুকুরের সবটা জল শুকিয়ে গেল। পুকুরের মাছগুলো কাদায় ছটফট করছে। তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে রণজয়। তার আর পালাবার উপায় নেই। কয়েকটা আলো বারবার তার চারপাশে ঘুরছে। সেই আলো পেরুতে গেলেই গা পুড়ে যাবে।

একটা গোল বলের দরজা খুলে গেল। তার মধ্য থেকে চারজন নীল রঙের প্রাণী নেমে এলো রণজয়ের কাছে। তাদের চেহারা মানুষেরই মতন, কিন্তু মাথায় কোনো চুল নেই, ভুরু নেই। তারা রণজয়কে চেপে ধরে তুলে নিয়ে গেল। পরের মুহূর্তেই ওদের নিয়ে গোল বল দুটো সাঁ করে উড়ে গেল আকাশে।

রণজয়ের হাত যারা চেপে ধরে আছে, তাদের হাত লোহার মতন শক্ত। রণজয় বুঝলো, টানাটানি করে লাভ নেই। ভেতরে ঢুকেও তারা রণজয়কে তুলোর মতন নরম কিছু একটা জিনিসের ওপর বসিয়ে হাত চেপে ধরেই রইলো। এরা কেউ কোনো কথা বলে না। শুধু এক একবার এক একজন অন্য কারুর চোখের দিকে তাকায়। তাতেই কথা হয়ে যায়।

গোল জিনিসটার ভেতর থেকে বসে বাইরের সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়। রণজয় দেখলো, সেটা সাঁ সাঁ করে ক্রমেই অনেক ওপরে উঠে যাচ্ছে। নীচে এখনো পৃথিবীকে দেখা যায়—কিন্তু এর মধ্যেই অস্পষ্ট হয়ে আসছে, একটু পরে আর দেখা যাবে না।

পৃথিবীর লোক রণজয়কে ধরতে পারলো না, তার আগেই এরা তাকে চুরি করে নিয়ে গেল। আর কি কোনো দিন সে এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবে। এত সুন্দর পৃথিবী, একে ছেড়ে কি যেতে ইচ্ছে হয়! রণজয়ের বুকের মধ্যে খুব কষ্ট হতে লাগলো।

হঠাৎ একজন প্রহরী গোঁ গোঁ শব্দ করে রণজয়ের হাত ছেড়ে দিল। সে উঠে প্রায় লাফাতে

লাগলো আর একটা হাত নাড়তে লাগলো মুখের সামনে। বোঝা গেল, তার হাতটায় সাংঘাতিক যন্ত্রণা হচ্ছে। কী করে এমন হলো? রণজয় নিজেই বুঝতে পারলো না প্রথমে।

অন্যরাও এসে ঐ লোকটির হাতটা পরীক্ষা করতে লাগলো। লোকটির হাতের এক জায়গায় একটা গোল গর্ত মতন হয়ে গেছে, যেন আগুনে পুড়ে গেছে। লোকটি আঙুল দিয়ে রণজয়ের দিকে দেখালো। সঙ্গে সঙ্গে অন্য যে লোকটা রণজয়কে ধরে ছিল, সেও যেন ভয় পেয়ে হাত ছেড়ে দিল।

রণজয় এবার বুঝলো। তার কান্না এসে গিয়েছিল, সেই চোখের জল এক ফোঁটা এ লোকটার হাতে পড়েছে। তাতেই এই কাণ্ড? ওরা জল সহ্য করতে পারে না! সামান্য জলের ছোঁয়াতেই ওদের এই রকম কষ্ট হয়?

এখন রণজয়কে ওরা কেউ ধরে নেই। এখন সে ইচ্ছে করলে লাফিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু এই মহাশূন্যে সে কোথায় লাফিয়ে পড়বে? তাকে ওদের সঙ্গেই যেতে হবে। ওরা কোথায় যাচ্ছে সে জানে না। এখন চুপ করে বসে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

তবু, রণজয় টের পেল, তার কাছে একটা অস্ত্র আছে। চোখের জল। চোখের জলকেও যে কেউ এত ভয় পেতে পারে, রণজয় আগে সে কথা স্বপ্নেও ভাবে নি!

● কেমন জব্দ!
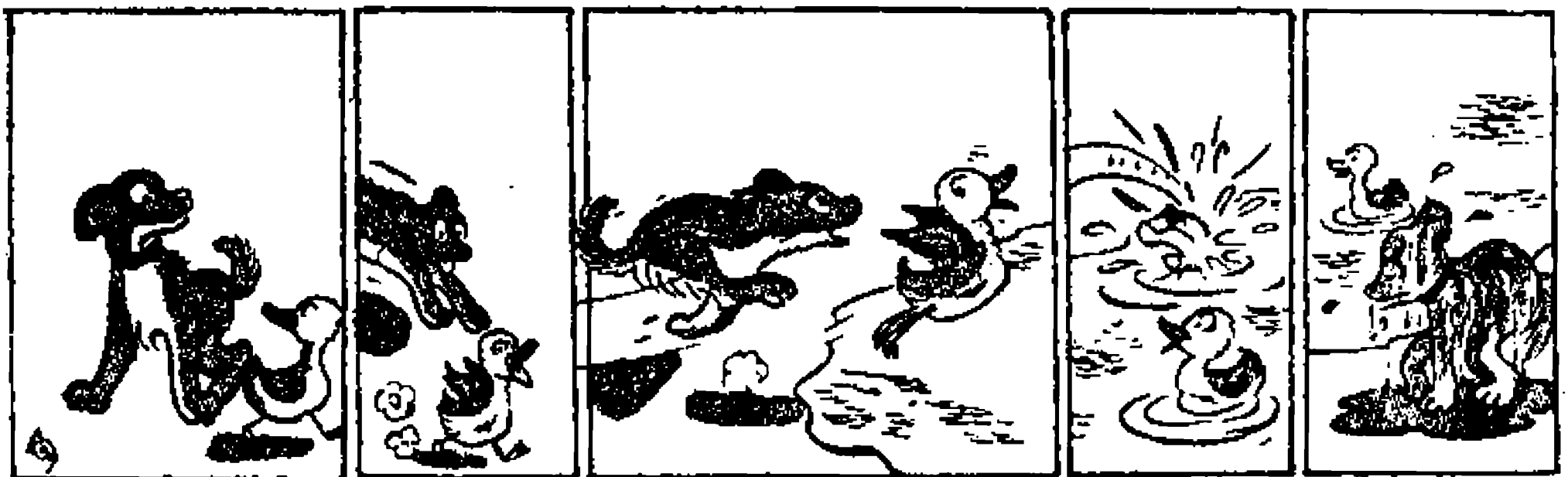
—শৈল চক্রবর্তী

না, এরা ভাই নয়। তবে বলা যেতে পারে জাতভাই। মানে, পেশার দিক থেকে দুজনে সমান।

না, চেহারাতেও মিলমিশ নেই। কমলাক্ষের হিপি-সুলভ ঝোলা গোঁফ। কপিলাক্ষের কুতকুতে চোখ আর লম্বা নাক।

গোয়েন্দারা সময়ে সময়ে নাকি লেখকে পর্যবসিত হয়ে পড়ে এমন শোনা গেছে। ঠিক এমনি হয়েছিল কমলাক্ষ ও কপিলাক্ষর বেলায়।

কমলাক্ষ লিখত গোয়েন্দা গল্প, ছাপা হত 'রোমহর্ষ' কাগজে। আর কপিলাক্ষও লিখত গোয়েন্দা গল্প, ছেপে বেরুত 'রম্যরহস্য' পত্রিকায়।

দু'জনেই শক্তিধর লিখিয়ে। আলাপও আছে দু'জনের মধ্যে কিন্তু মনে মনে কেউ কাউকে দেখতে পারে না। তাহলেও একজনের লেখা আর একজন সাগ্রহে না পড়ে স্বস্তি পায় না।

একদিন কপিহাউসে চেকশার্ট পরিহিত কমলাক্ষ ঝোলা গোঁফ নিয়ে বসে কফি পেয়ালায় চামচ নাড়ছে আর মনে মনে প্লট ভাঁজছে। এমন সময় কপিলাক্ষের আবির্ভাব হল। কফির অর্ডার দিয়ে সে বসল একই টেবিলে।

আলাপটা শুরু করাই হল শক্ত। তাই কমলাক্ষ একটু হেসে বলল, একটা গল্প সদ্য শেষ করলুম।

কি নাম?

অতলান্ত অটবী।

তার মানে, জঙ্গলের গল্প। কপিলাক্ষের মুখে ঈষৎ হাসি।

আরে না না, কমলাক্ষ কফিতে চুমুক দিয়ে একটু গম্ভীর হয়ে বলল, শুনবে নাকি?

মৌন সম্মতি পেয়ে সে শুরু করল, খুব সংক্ষেপে বলছি। যাচ্ছি রাস্তা দিয়ে...হঠাৎ কয়েকজনের জটলা...দাঁড়ালুম...ডেড় বডি পড়ে আছে...লোকারণ্য হয়ে গেল। আই-গ্লাস বার করলুম...পরীক্ষা করলুম...কিছু পেলুম না। নাকে এল একটা গন্ধ...এক অদ্ভুত গন্ধ...একটা গাছের পাতার গন্ধ...সেই গাছের খোঁজে গেলাম জঙ্গলে...

কপিলাক্ষ এবার সশব্দে হাসল, বলল, ও ত শুনেছি হে। বার দশেক বলেছ এটা। সেই জঙ্গলে পেলে একটা ঘড়ির চেন...ও ত শোনা। তার চেয়ে যদি শোন ত বলি আমার একটা? সদ্য লেখা?

বলতে পার, কমলাক্ষ সিগ্রেট ধরিয়েছে।

কপিলাক্ষ শুরু করে।

ল্যাণ্ডরোভারে যাচ্ছি...ফিফ্‌টি মাইলস স্পীড...হঠাৎ ক্র্যাশ্ করল একটা গাছে...গাছ ভেঙ্গে গেল...তার ফোকরে পেলুম একটা চিঠি...সেই চিঠির সূত্র ধরে গেলুম এক ভাঙ্গা বাড়িতে...

কমলাক্ষ হাত নেড়ে থামাল ওকে। তারপর বলল, সেই ভাঙ্গা বাড়িতে থাকত এক বার্মিজ স্মাগ্‌লার আর মাটিতে পোঁতা গাদা গাদা মোহর—তাই না? আরে ও গল্প আর কতবার শোনাবে? কমসে কম উনিশ বার শুনেছি; যত সব বানিয়ে বানিয়ে লেখা। আমার গল্প সে রকম নয়। রীতিমত সত্যি ঘটনা, বুঝলে?

বুঝেছি, ঢের বুঝেছি। তোমার গুপ্তধন উদ্ধারের যত প্লট সব ছকে আঁটা ফরমূলায় ফেলা একথা সবাই জানে।

বটে! কমলাক্ষ টেবিলে ঘুষি মেরে বলল, বানানো? দস্তুরমত রিয়্যাল স্টোরি। ওটা হয়েছিল উনিশ শো পঞ্চাশ কি বাহান্ন সালে...সেই গোবিন্দপুরে—

হা হা করে হেসে ওঠে কপিলাক্ষ, সেই ধাধ্‌ধাড়া গোবিন্দপুর না? আমি বাজি রাখতে পারি ও সব তোমার গেঁজানো।

দেখা গেছে, কোন্ মিয়া গাঁজা ছাড়া গল্প লেখে, আস্তিন গুটিয়ে কমলাক্ষ এবার মারমুখী হয়ে পড়ে যেন। তোমার সেই 'আশমানের আতঙ্ক', সেটা কি হে চাঁদ? রিয়েল স্টোরি না রিয়েল গাঁজা?

কপিলাক্ষ বলে, ওটা রিয়্যাল স্টোরি, ওটা হয়েছিল আন্দামানে।

বটে! আন্দামানে মরুভূমি কোথায় হে চাঁদবদন? সেই যে পাথর সরিয়ে বালির মধ্যে থেকে রাশি রাশি টাকা বেরুল!

কমলাক্ষ বলল, মনে থাকে যেন বাজি রইল...

বেরুলই ত। তোমার মত নিন্দুকের সঙ্গে আমি তর্ক করতে রাজী নই। তোমার মত যত সব নিন্দুকের ঘাড় ধরে বের করে দেওয়া উচিত দেশ থেকে। কপিলাক্ষর উত্তেজিত কণ্ঠ।

তাই নাকি? ঘাড় ধর না একবার। কমলাক্ষর ঝোলা গোঁফ কাঁপতে থাকে। দেশ থেকে বের করে দেওয়া উচিত ওই কুলি বেগুনের মত নাকওলাদের, এই যে—বলেই সে খামচে ধরল কপিলাক্ষর জুতসই নাকটা।

ছাড়বার পাত্র নয় কপিলাক্ষর। সেও দুহাতে ধরল তার প্রতিদ্বন্দ্বীর ঝোলা গোঁফ জোড়া।

আহাহা, করেন কি? কফি বালক ভয়ে ভয়ে পেয়ালা প্লেট সরিয়ে নিয়ে গেল টেবিল থেকে।

কপিলাক্ষ বলে, বেশ, প্রমাণ করতে হবে, তবে কথা। হাতেনাতে দেখাতে হবে।

কমলাক্ষ বলে, তোমাকেও প্রমাণ করতে হবে, তবে কথা। হাতেনাতে দেখাতে হবে।

কপিলাক্ষ বলে, গুপ্তধন ত অনেক বার করেছ, দেখি কিছু টাকা বা মোহর চোখের সামনে হাজির কর দেখি। সিন্দুক ভরতি না হলেও অন্ততঃ একটা থলি।

ঠিক আছে, গোঁফ ছাড়ো!

এই ছাড়লুম। তুমি নাক ছাড়ো।

দু'জনেরই মুখ লাল। কমলাক্ষ বলল, মনে থাকে যেন বাজি রইল, তোমাকে দেখাতে হবে। তবে বুঝব গাঁজা নয়।

কপিলাক্ষ নাকে হাত বুলিয়ে বলল, তোমাকেও দেখাতে হবে, তবে বুঝব 'রিয়্যাল স্টোরি'!

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন সকালের কাগজ পড়ছিল কপিলাক্ষ। হঠাৎ এক জায়গায় তার চোখ আটকে গেল। কাগজের এক কোণে একটা ছোট খবর। কর্পোরেশনের নোটিশও বলা যায়। খবরটি এই রকম ঃ

"প্রাচীন ইমারত বিপজ্জনক বিধায়ে কয়েকটি পুরাতন বাড়ি ভাঙ্গিবার আদেশ জারি হইয়াছে। ৩৩নং গুজরিমল লেনের জরাগ্রস্ত বিল্ডিংটি অনতিবিলম্বে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। শুনা যায় বাড়িটির বয়স দুইশত বৎসরেরও অধিক এবং ওটি টিলাপতিয়ার জমিদার তৈরি করিয়া এককালে ওখানে বাস করিতেন—ইত্যাদি।"

কপিলাক্ষ স্থির করল বাড়িটা একবার দেখবে। পুরানো জমিদারের বাড়ি, তার ধ্বংসাবশেষ—কে জানে তার মধ্যে কিছু লুকিয়ে আছে কিনা। যদি পায় তাহলে কমলাক্ষের নাকের ডগায় এনে ধরবে।

ও গেল খুঁজে খুঁজে। যা ভেবেছিল সত্যিই তাই। পঙ্কের কাজ করা দেয়ালের চটা আর থামের ভগ্নাংশ দেখেই মনে হল এর গর্ভে ধনরত্ন লুকানো থাকা অসম্ভব নয়। আজ রাত্রেই কাজ করতে হবে।

শাবোল হাতে গভীর রাতের অন্ধকারে চলল কপিলাক্ষ। টর্চটা পকেটে নিতে ভোলেনি।

আধভাঙ্গা দরজা অবারিত। সুতরাং প্রবেশের বাধা কোথা? এদিক ওদিক সন্ধানী দৃষ্টি চালিয়ে সে সিঁড়ির নীচে একটা গোপন কক্ষের সন্ধান পেল। ইট দিয়ে গাঁথা বস্তু। চৌবাচ্চার মত।

কপিলাক্ষ ভাবল, এটা নিশ্চয়ই ধনরত্ন রাখার ঘর। এখনকার ব্যাঙ্কের ভল্টের প্রাচীন সংস্করণ। সে সেই ঘরের দেয়ালে শাবোল চালাল। অতিকষ্টে একখানা ইট খসাল সে। তারপরের ইটগুলো সে দেখল সহজেই গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। ইটেরা পুরনো হলেই খাস্তা ঝুরঝুরে হয়ে যায়। এমনকি ধুলোর মত গুঁড়িয়ে ঝরে পড়ে। ইটেদের এই ব্যবহারে কপিলাক্ষ খুশী হয়ে ভগবানকে ধন্যবাদ দিল।

ইতোমধ্যে সে দেখল একটা ফোকর সে বানিয়ে ফেলেছে। আর কি, এখন প্রবেশ করলেই হয়। দেহ গলাবার মত আয়তন হতেই কপিলাক্ষ আর বিলম্ব করল না। নিজেকে সে গলিয়ে দিল। সেই ক্ষুদ্র কক্ষের অন্তর্গত হতেই তার নাকে লাগল একটা ভ্যাপসা গন্ধ। কি আর করবে এটা তাকে মেনে নিতেই হবে।

ঠিক এই সময়েই কপিলাক্ষর মনে হল যেন কোথায় কি শব্দ হচ্ছে। কিসের শব্দ? শব্দটা ঠুক্ ঠুক্ জাতীয়। চোর টোর নয়ত? ক্রমে শব্দটা কাছে আসতে লাগল। এইখানকারই কোনো পাঁচিলে কিংবা দেয়ালে যেন কে কি ঠুকছে।

যাক্। ওদিকে মন না দিয়ে কপিলাক্ষ টর্চের আলো সহকারে আশপাশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করল। ভাঙ্গা টিন ক্যানেস্তারা জাতীয় কিছু কিছু আবর্জনা যা চোখে পড়ল তার চেয়ে বেশী দেখল সে আরশোলা। ঝাঁক ঝাঁক আরশোলা নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে।

এরই মধ্যে প্রবল একটা ধাক্কার আওয়াজের সঙ্গে তার পিছনের দেয়ালে কয়েকখানা ইট খসে পড়েছে।

কপিলাক্ষ ত্বরিৎহস্তে টর্চের আলো ফেলল সেইদিকে। কে যেন ঢোকবার চেষ্টা করছে মনে হল।

দেখল সত্যি একজন ফোকরের ফাঁকের মধ্যে একখানা মুখ। তাতে একজোড়া ঝোলা গোঁফ।

কে? কমলাক্ষ?

কে? কপিলাক্ষ? নন্‌সেন্‌স্! তুমি এখানে কেন?

তুমিই বা এখানে কেন? এটা আমার এলাকা। আমি কাগজ পড়ে এসেছি।

আমিও দস্তুরমত কাগজ পড়ে এসেছি—হঠাও এখান থেকে।

কে? কপিলাক্ষ? নন্‌সেন্‌স্! তুমি এখানে কেন? [পৃ. ২৪৫

দু'জনেই হঠেছে। ওখান থেকে হঠে গিয়ে দু'জন দু'দিকের পথে হাঁটা দিয়েছে।

কফিহাউসের মালিক কুঞ্জলাল এই দুই মূর্তিকে চিনত। সেদিন ওদের কথাবার্তাও কিছু কিছু তার কর্ণগোচর হয়েছিল।

তাই একদিন সকালে যখন কমলাক্ষ কফি হাউসে পদার্পণ করেছে আর কুঞ্জলালেরও হাতে রয়েছে সময়, আর খদ্দেরের স্বল্পতা, সে আস্তে আস্তে তার কাছে এসে বসল গল্প করতে।

দেখুন স্যার, একটা বাড়ি কিনেছি।—বলে ফেলল কুঞ্জলাল।

তাই নাকি? কমলাক্ষ ব্যবসাদার লোকদের দেখতে পারে না। বিশেষ করে তার মনে পড়ল কফিতে যত জল থাকে সে পরিমাণ দুধ পড়ে না। তাছাড়া স্যাণ্ডউইচগুলো নিয়মিতভাবেই শীর্ণতা প্রাপ্ত হচ্ছে। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, বেশ টু'পাইস করেছেন তাহলে!

আরে মশাই, পুরাতন বাড়ি। তাছাড়া, শহর থেকে দূরে। একটু ঘেঞ্জি এলাকায়।

যাই হোক বাড়ি ত!

তা বটে, কিন্তু অনেকদিনের পুরনো বলেই জলের দামে পেয়েছি, তা না হলে—

কুঞ্জলাল আড়চোখে কমলাক্ষের মুখপত্র পাঠ করতে চায়। কথাটা ঠিক ছাড়া হচ্ছে কিনা বুঝে নিতে চায় সে।

তবে জলের দামে পেলেও জল পাচ্ছি কই? আবার একটা চাল দিল কুঞ্জলাল।

তার মানে? কমলাক্ষ একটু উদ্দীপ্ত।

ওপরের কলে ত জলই উঠছে না। যেটুকু আসে ফোঁটা ফোঁটা, তাতে কি কাজ চলে? বলুন। বাঙালী সংসারে ধোওয়া মাজা চান কত কি কাজ—

প্লাম্বার মিস্ত্রীরা কি বলে?

আরে মশাই, সব বেটা চোর। তারা ত এক লম্বা ফর্দ ঝেড়ে দিয়েছে। পাইপ সব খুলতে হবে, হেনো চাই তেনো চাই—ইলাহি ব্যাপার!

তা ত করতেই হবে। ইলাহি ভাবে থাকতে গেলে ইলাহি ভাবে টাকা ঢালতে ত হবেই। বলে কমলাক্ষ তার কবজি ঘড়ির দিকে তাকাল।

আপনি যা বললেন, এটা সবাই বলবে। আমিও বুঝি। কিন্তু আর একটা কথা আছে। সেটা সকলকে বলা যায় না। তাই আপনাকে বলছি। ওরে সতীশ, এক পেয়ালা ভাল করে স্পেশাল কপি দিয়ে যা রে—

কফি খেতে খেতে কমলাক্ষ যে কথাগুলো শুনল সেগুলো একটু নিম্নগ্রামে উচ্চারিত। কতকটা ফিসফিস সুরে।

বাড়িটা কেনবার পরে শুনলুম ওটা অনেকদিন পড়েছিল।—বলে চলল কুঞ্জলাল। বিক্রি হয়নি। ভাড়াও হত না। মালিকদের মধ্যে মামলা, ভাগাভাগির সম্পত্তি হলে যা হয়। যাই হোক ওখানে ঐ পড়ো বাড়ি কিন্তু খালি থাকত না। থাকত গুণ্ডা আর স্মাগলার। তারা বেশ বাসা বেঁধে থাকত। আর ওরা বসেও থাকত না। ওরা হংকং থেকে মাল আনত আর পাচার করত চেনা খদ্দেরকে। একবার ওরা কিছু জুয়েলারী এনেছিল। সেগুলো পাচার করার আগেই এক কাণ্ড হল।

কি কাণ্ড? কমলাক্ষের চোখের ভুরু কুঁচকে নেমে গেছে। দৃষ্টি প্রখর।

কাণ্ড মানে, ওদের মধ্যে ঝগড়া বাধে, যা হয় আর কি। আর ঠিক সেই সময় খবরটা লিক করে পুলিসের কানে যায়।

তারপর?

পুলিস একদিন হানা দিল। চলল বুলেট ফাইট। কিন্তু আত্মরক্ষা করতে পারল না। একজন হল ধরাশায়ী, আর একজন পড়ল ধরা। এখনো তিনি জেলে পচছেন।

তারপর? সেই জুয়েলারী, মানে, হীরে মুক্তো?

তন্নতন্ন করে খুঁজেছে পুলিস, কিন্তু কোথাও পায়নি। ওরা ভাবল, হীরে মুক্তো সব অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু আমি যদ্দুর জানি ওরা কোথাও সরাতে পারেনি।

তাহলে, তাহলে খুঁজে পাওয়া গেল না কেন?

ঐ ত মজা। এমন জায়গায় আছে, যেখানে ওরা হয়ত হাত দিতে পারেনি। এবং আজ পর্যন্ত কেউ পারেনি।

কমলাক্ষ নড়েচড়ে বসে। সে অন্তরঙ্গ সুরে জিগ্যেস করে, এ কথা কাউকে বলেছেন নাকি?

রামোঃ! কুঞ্জলাল অগাধ অশ্রদ্ধা মিশিয়ে দুনিয়ার দিকে তাকায়। গোলা-লোক এসবের কি বুঝবে মশাই? এই শুধু আপনাকেই বলছি। কার মাথায় কি খ্যালে তা কি জানতে বাকী আছে আমার! আমরা ত তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি। এমন কি দেয়ালের সন্দেহজনক জায়গায় ইট খুলে দেখতেও ছাড়িনি—

মেঝের নীচে যদি পোঁতা থাকে, কমলাক্ষ খেই ধরিয়ে দেয়।

হ্যাঁ, তাও খুঁড়ে দেখেছি মশাই, কোথাও একটুকরো কাচও পেলুম না।

তাহলে? কমলাক্ষ বার বার ঝোলা গোঁফে আঙুল চালিয়ে চিন্তাশক্তিকে প্রখর করে নিতে চায়।

এ সব ত একমাত্র আপনার মাথাতেই মশাই।

গোলা-লোক এসবের কি বুঝবে মশাই? এই শুধু আপনাকেই বলছি। [পৃ. ২৪৭

কুঞ্জলাল আবার একবার হাঁক ছাড়ল সতীশ নামক বয়ের উদ্দেশে। আর এক কাপ কফির আদেশ।

এদিকে দেখুন, আবার সে বলে চলে, আমি ওপরে জল পাচ্ছি না। যেটুকু আসছে তা নিতান্তই ছিটে ফোঁটা।

আরে মশাই, চুলোয় যাক আপনার জল। চোটপাট বলে উঠল কমলাক্ষ। জলের জন্যে আমার মাথাব্যথা নেই। আমি ভাবছি জুয়েলারীগুলোর কথা। মুঠো মুঠো চুনী পান্না হীরে সে সব রাখল কোথা?

আমিও ত তাই ভাবছি, কদ্দিন ধরেই ভাবছি, নিন, কফি এসে গেছে। ভাবছি, কিন্তু আপনাদের মত কি আর ভাবতে পারব। তবে একটা কথা মনের মধ্যে মাঝে মাঝে উঁকি মারে, আমরা ত আর গোয়েন্দা নই। যদি অভয় দেন ত বলি—

কি বলুন না, কমলাক্ষ উৎসুক চোখে চাইল তার দিকে।

কি জানেন, লোকে বলে 'জলেই জল বাধে'। আমি ভাবি তা নয়, জুয়েলারীতে জল বাধছে না ত?

আঁ্যা! দাঁড়ান, দাঁড়ান, উচ্চকিত কমলাক্ষ, হয়েছে—পাইপ...ফোঁটা ফোঁটা জল। পাইপ... জুয়েলারী...ফোঁটা ফোঁটা জল...

কমলাক্ষ টলতে টলতে বাড়ি এল।

পরদিনই প্লাম্বিং যন্ত্রপাতি নিয়ে ধাওয়া করল কুঞ্জলালের বাড়ি, টালিগঞ্জ পেরিয়ে রাইচরণ বোস লেনে।

হ্যাঁ, ভগ্ন দশাই বটে। নীচে পড়ো বাড়ি, ওপরে বাহারে পর্দা টাঙিয়ে বাস করে কুঞ্জলাল। লোকটার শখ বটে।

জংধরা পাইপ আঁটা নাটগুলোর ওপর র‍্যাঞ্চ লাগাল কমলাক্ষ। অনেক চেষ্টা করল খোলবার, কিন্তু পারল না। তবে কি? না, দমবার পাত্র সে নয়।

মিস্ত্রীর বিদ্যেও তার কিছু জানা ছিল। সে চাড় মেরে একটা পাইপকে বাঁকাল। পুরনো সেকেলে মিস্ত্রীদের নোংরা কাজ। ঘরের মধ্যে দিয়েই জলের পাইপ এবং তা আছে দেওয়াল বিলম্বিত হয়ে। দেয়াল বেয়ে ছাদে উঠেছে।

কমলাক্ষকে উঁচুতে উঠতে হবে। বাক্স গামলা ইত্যাদি উপর্যুপরি জড়ো করে তার ওপর উঠে দাঁড়াল কমলাক্ষ। দেয়ালে চাড় দিয়ে পাইপটাকে টানতেই একটা জোড় খুলে গেল। আর সেই নীচের মুখ থেকে সরু ধারায় জল বেরুতে লাগল। মনে হল ঠিক মত জল আসছে না। যেন বাধা পাচ্ছে কোথায়।

কেন আসছে না জল? পাইপে নিশ্চয়ই কিছু আটকাচ্ছে। কি আটকাচ্ছে? কিসের মধ্যে কি অনুপ্রবিষ্ট হয়ে থাকতে পারে এ তত্ত্ব কমলাক্ষের সূক্ষ্মবুদ্ধি ছাড়া কেই বা ধরবে! সেই মুঠো মুঠো হীরে পান্না এদের মধ্যে অন্তর্নিহিত হয়ে থাকতে আটকায় কিসে? গোপনীয়তার এমন নিরাপদ আশ্রয় আর পাবে কোথায়? হ্যাঁ, চোরেদের বুদ্ধির তারিফ করতে হয় বটে।

সে ঠিক করল ঐ পাইপটা খুলে তাকে অন্তঃসারশূন্য করে দেখতে হবে। গুপ্তধনের আবিষ্কার কাকে বলে শিখে যাক কপিলাক্ষ। হীরে মতির পুঁটুলি তুলে ধরব তার বেগুনে নাকের ডগায়।

উচ্চাসন থেকে নামল কমলাক্ষ। অনেক মেহনত করে পাইপগুলোকে দেয়ালছাড়া করল সে।

হঠাৎ তার চোখে পড়ল নর্দামা দিয়ে সেই ঘরে হুহু করে জল ঢুকছে। এ আবার কি উৎপাত!

জলের গতি লক্ষ্য করে সে এগুল। জলপ্লাবনের উৎসমুখে যে ঘর সেই ঘরে ঢুকতেই তার মনে হল সূর্যটা আকাশ থেকে যেন খসে পড়েছে। তার চোখ কপালে উঠে আটকে গেল।

এ কি অন্যায়! এখানেও তুমি?

কপিলাক্ষের এক হাতে ইয়া বড় এক র‍্যাঞ্চ অন্য হাত দিয়ে তার বৃহৎ নাসিকা মুছছিল সে। জলের তোড়ে তার জামা প্যান্ট সর্বাঙ্গ হাপুরসুটি ভেজা। তার ঘরেও দেয়ালমুক্ত পাইপের বাহার।

কপিলাক্ষ বলে ওঠে, তুমি এখানে কেন হ্যাঁ? এটা আমার এলাকা নয় কি?

খবরদার! কমলাক্ষের চোটপাট উত্তর—মালিকের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। জুয়েলারীর অর্ধেক পাব আমি।

কখ্খনো না! সে কথা হয়েছে আমার সঙ্গে।

কয়েক মিনিট উত্তেজিত তর্কযুদ্ধ চলবার পর ওরা প্রকৃতিস্থ হল।

কপিলাক্ষ বলল, এখন দেখছি দু'জনকে একই কথা বলেছে কুঞ্জলাল। শোনো, আমাদের ঝগড়া করে কোন লাভ নেই। তার চেয়ে এসো একটা প্যাক্ট করা যাক।

কমলাক্ষ বলল, তবে তাই হোক, কিন্তু গুপ্তধনের আধাআধি। কেমন?

ঠিক আছে, তাই হবে।

এমন সময় কুঞ্জলাল এসে হাজির। ঘরের বন্যাবিধ্বস্ত অবস্থা দেখে সে বলল, একি? এ যে জলে ঘর ভেসে গেল। পাইপ ত খুলছেন। পাইপের ভেতরগুলো দেখেছেন। আসল কাজটাই ত বাকী।

অত্যন্ত রাগে মানুষ গুম হয়ে যায়। ওদেরও মুখ দিয়ে তখন কথা বেরুল না।

পাইপগুলো ঠুকে ঠুকে সাফ করা হল। তাদের গর্ভ থেকে হীরে মতির বদলে বেরুল খানিকটা আবর্জনা আর বেশ কতকগুলো পাথরের নুড়ি।

কুঞ্জলাল হাতে করে পরীক্ষা করে দেখে বলল, ওহ্। ব্রেন বটে ব্যাটাদের। এর মধ্যেও ত নেই। এখন দেখছি ব্যাটারা অন্য কোথাও সরিয়েছে জুয়েলারীগুলো। যাক এবার আর জল আটকাবে না। নিন, এই হুকগুলো দিয়ে পাইপগুলো যেমন ছিল বসিয়ে দিন—

কমলাক্ষ আর কপিলাক্ষ সীসের গুলি আর পাথরের নুড়িগুলোই কুড়িয়ে জড়ো করল আর তাই ভাগ করে নিল দু'জনে। আহা, হীরে মুক্তোর থেকে কম কিসে ওরা? রুমালে বাঁধা ছোট্ট পুঁটলি দুটি উঁচুতে তুলে ধরে পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা।

কমলাক্ষ বলল, বাজি মাৎ হল ত?

কপিলাক্ষ বলল, রিয়েল স্টোরি।

এরপর এই দু'জনের মধ্যে কোনোদিন দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়েছে বলে শোনা যায়নি। অন্ততঃ আমি শুনিনি।

● বক্তৃতার জোর—
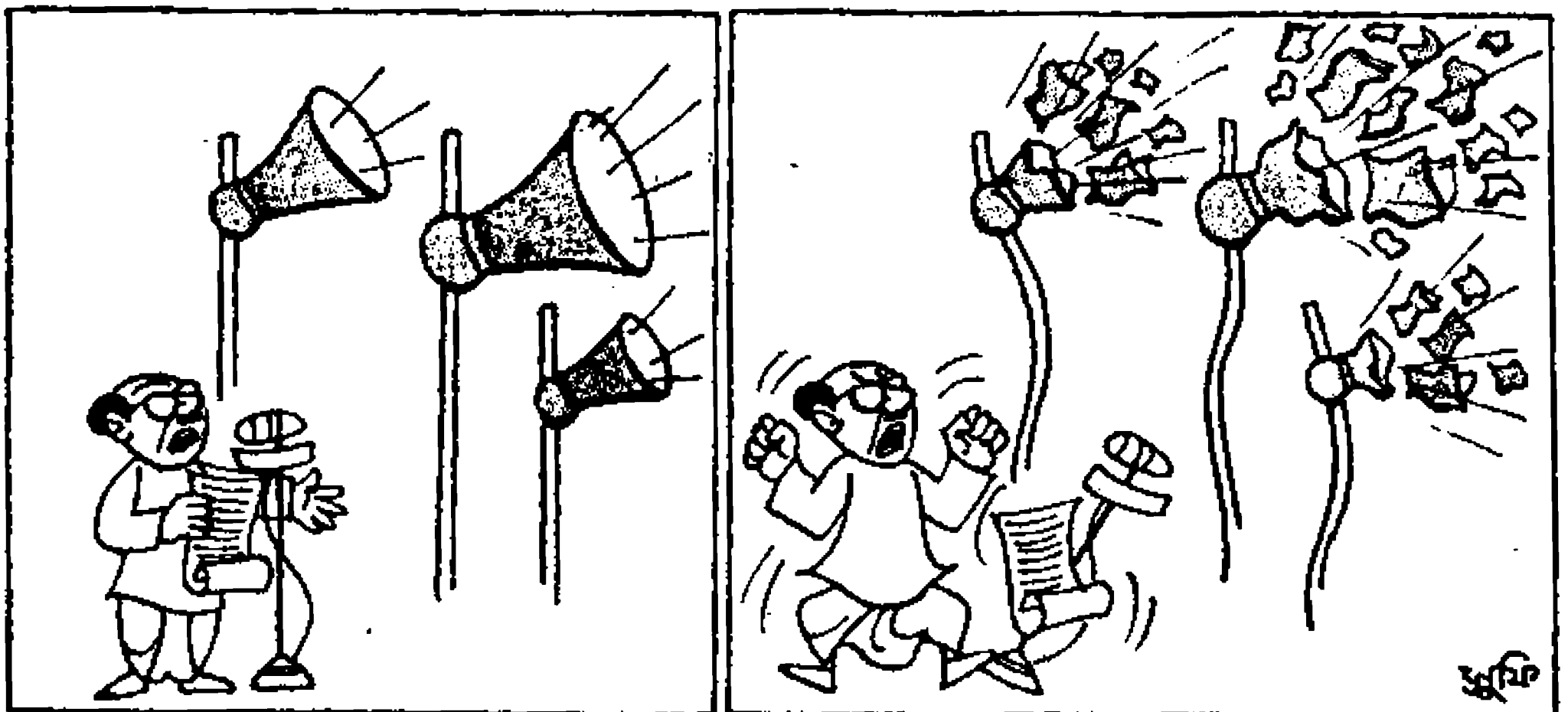
রবি বলে টু-কি

—নারায়ণ সান্যাল

'রবি বলে টু-কি!'

বলেই ঝোপের মধ্যে বসে পড়ে মৌ। তারপর পাতার ফাঁক দিয়ে দেখে রবির কাণ্ডকারখানা। রবি তার লেন্স-চোখের উপর থেকে হাতটা সরায়। ইতি-উতি চাইতে থাকে। খুঁজছে মৌকে। বাড়ির পিছনে মস্ত বাগান, বড় বড় গাছ—ছয় বছরের ছোট্ট মৌ কোথায় লুকিয়ে বসে আছে তা খুঁজে বার করা সোজা কথা নাকি? কিন্তু রবি হচ্ছে রবি! যেমন প্রকাণ্ড তার দেহ, তেমনি অসাধারণ বুদ্ধি! বড় বড় আঁক সে নিমেষমধ্যে কষে দেয়! শুধু গুণ-ভাগ-বর্গমূল-ভগ্নাংশই নয়—বীজগণিত-জ্যামিতি পর্যন্ত সে গুলে খেয়েছে! কী জানি কেমন করে অঙ্ক কষে সে বুঝে নেয়—কোন্ ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে মৌ। গোদা গোদা পা ফেলে আট ফুট উঁচু প্রকাণ্ড দেহটা নিয়ে রবি সোজা এগিয়ে আসে সেই ঝোপটার দিকে। আর লুকিয়ে থাকায় লাভ নেই। এক লাফে বেরিয়ে আসে মৌ। ছুট-ছুট-ছুট—কিন্তু পুঁচকে মৌ রবির সাথে পারবে কেন? দৈত্যের মত পা ফেলে রবি ছুটে আসে তার আগেই। মৌ ধমক লাগায় দৌড়াতে দৌড়াতেই—'বা-রে। তুমি অত জোরে ছুটলে আমি খেলব না কিন্তু!'

কে কার কথা শোনে! ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে রবি। যে আমগাছটা ওদের লুকোচুরি খেলার 'বুড়ি' সেটা এখনও অনেকটা দূরে। বাধ্য হয়ে এবার মৌ তার ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে—'রবি! স্টে! থেমে যাও।'

ঝড়াং-ঝং! একটা যান্ত্রিক শব্দ করে রবি মুহূর্তমধ্যে স্ট্যাচু! ব্যাস! সেই অবকাশে মৌ গিয়ে 'বুড়ি' ছুঁয়ে দেয়। আর তৎক্ষণাৎ হাততালি দিয়ে সে নাচতে থাকে, 'এ রাম। হেরে গেলো! হে-রো! দুয়ো! দুয়ো।'

তোমরা হলে নিশ্চয় বলতে, 'খেলব না! এ তো জোচ্চুরি!'

রবি কিন্তু তা বলল না। বেচারি মুখটা কাচুমাচু করল। গো-হারা হেরে যাবার ভঙ্গিতে ঘাড়টা কাত করে দাঁড়িয়ে থাকে। আবার তাকে 'চোর' দিতে হবে। কিন্তু তাতেও শান্তি নেই। ইতিমধ্যে মৌয়ের মত বদলেছে। বললে, 'এই রবি! আর লুকোচুরি নয়। এবার ঘোড়া-ঘোড়া খেলব।'

রবি তাতেও রাজী। চার হাতে-পায়ে সে ঘোড়া সাজে। মৌ চড়ে বসে তার পিঠের উপর। রবির পিঠটা স্টেনলেস্ স্টিলের। কিন্তু মৌয়ের বাবা তার উপর একটা ডানলোপিলোর হাওদা বানিয়ে দিয়েছেন। তাই মৌয়ের কোন অসুবিধা হল না। দিব্যি ছপাট মারতে মারতে সে হুকুম চালায়—'হেট ঘোড়া হেট!'

গরিলার মত প্রকাণ্ড দেহটা নিয়ে রবি এবার হামাগুড়ি দিতে থাকে। সূর্যের আলোয় তার লোহায় গড়া দেহ চকচক করছে।

তোমরা বোধহয় রবিকে চিনতে পারছ না, নয়? সেটাই স্বাভাবিক, কারণ রবির মত জীব তোমরা দেখনি। রবি একজন রোবট। গল্পটা আগামী যুগের। ২০১৬ খ্রীস্টাব্দের। ব্যাপারটা বুঝলে তো? আজ থেকে চল্লিশ বছর পরের কথা। শুধু মৌ নয়, তোমাদের সকলেরই তখন হয় মাথা-ভরা ধবধবে পাকা চুল, নয় চকচকে টাক। রবির জন্ম জাপানে। 'হিতাচি গ্রুপ অব রোবটিক্স' কারখানায়। মৌয়ের বাবা নরেনবাবু তাকে জাপান থেকে নিয়ে এসেছিলেন অনেক টাকা খরচ করে। আসলে রবি হচ্ছে প্রথম যুগের রোবট—যন্ত্রমানুষ। জাপানী কারখানায় সে বড় বড় আঁক কষত। তারপর রোবট-শিল্প উন্নততর হল। নতুন জাতের রোবট কথা বলতে শিখল। তখন কারখানার কর্তাব্যক্তিরা এই পুরানো মডেলের বোবা রোবটটিকে ভেঙে ফেলতে চাইলেন। মৌয়ের বাবা এঞ্জিনিয়ার, তিনি 'রোবাটিক্স-বিজ্ঞান' শিখতে অর্থাৎ যন্ত্রমানব তৈরির কায়দা শিখতে জাপানে গিয়েছিলেন। তাঁর অনুরোধে শেষ পর্যন্ত কারখানার কর্মকর্তারা ঐ রোবটটিকে ভেঙে না ফেলে সেটা নরেনবাবুকেই বেচে দেন। নরেন্দ্রনাথ দেশে ফেরার সময় ওকে নিয়ে আসেন। এতদিনে কলকাতার কাছাকাছি ভারত সরকার রোবট-তৈরির একটা কারখানা খুলেছেন। নরেনবাবু সেই কারখানার প্রডাকশন ম্যানেজার। রবিকে কিন্তু তিনি কারখানায় রাখেন নি। রেখেছেন বাড়িতে, মৌয়ের খেলার সাথী বানিয়ে।

রবির ওজন এক টন। প্রকাণ্ড বড় দেহ তার। হাত-পা-মাথা সবই আছে, তবে পুতুলের মত, মানুষের মত নয়। চোখ আছে লেন্সের—সে দেখতে পায়। নাক নেই, সে নিঃশ্বাস নেয় না। মুখও নেই—কারণ সে না বলে কথা, না খায় খাবার। তবে নাকের কাছে একটা 'ভোল্টমিটার' থাকায় নাক-মুখের একটা আদল আছে। মোট কথা ওর চেহারাখানা কিম্ভূত! যেন কারখানায় নয়, 'হযবরল' অথবা 'আবোল তাবোল'-এর পাতায় ওর জন্ম! ওর পেটে স্ক্রু দিয়ে আঁটা একটা লোহার

পাত আছে। টাঙ্গিস্টারের মত সেই প্লেটটা খুলে ওর পেটে ব্যাটারি ভরে দিতে হয়। কথা বলতে না পারলেও সে বুঝমান, কথা বোঝে। হাত পা নেড়ে সায় দেয়। খুশী হলে হাততালি দিয়ে ধেই ধেই নাচে। দুঃখ হলে দু হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে বসে—চোখ দিয়ে জল বার হয় না, তবে ফুঁপিয়ে কাঁদার অঙ্গভঙ্গি করতে জানে। অঙ্কে ওর খুব মাথা! ঘরের নানান কাজকর্ম জানে, করেও। বাজারেও যেতে পারে। কিন্তু বাজারের লোকেরা ওকে ভয় পায়। তাই তাকে ঘরের বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। মারলে সে ব্যথা পায় কিনা? তা জানি না বাপু। চল্লিশ বছর পরে আমি তো থাকব না, তোমরা তখন রবিকেই জিজ্ঞাসা করে জেনে নিও বরং।

রবি ওদের বাড়িতে আছে বছর খানেক। মৌ তো ওকে নিয়েই মেতে আছে। রবি ওর জ্যান্ত পুতুল। তার সঙ্গেই ওর খেলা, গল্প, সব কিছু। মৌয়ের বন্ধুরা রবিকে ভয় পায়। তারা ওদের বাড়িতে আর আসে না। না আসুক, তাতে ভারী বয়েই গেল মৌয়ের। রবি থাকতে তার ভাবনা কি? রবির সঙ্গেই সে লুকোচুরি খেলে, পুতুল খেলে—রবি কখনও ওর বাড়ির চাকর, কখনও ড্রাইভার, কখনও ওর ছেলে। এমন বুদ্ধিমান জ্যান্ত পুতুল থাকতে কে আর বন্ধুর পরোয়া করে?

এটা কিন্তু পছন্দ হত না সরমার, মানে মৌয়ের মায়ের। তিনি লক্ষ্য করে দেখেছেন—রবি আসার পর থেকে মৌ তার বন্ধু-বান্ধবদের একেবারে পাত্তাই দেয় না। একা একাই থাকে। দু'একবার এ নিয়ে তিনি অনুযোগও করেছেন নরেন্দ্রনাথের কাছে। কিন্তু তিনি কান দেন নি। বলতেন, 'আরে বাপু, একটা কুকুর বেড়াল পুষলেও বাচ্চারা ঐ রকম করে। বড় হক, তখন মৌ নিজেই বুঝবে—রবি একটা যন্ত্র। কলের পুতুল। মানুষ নয়।'

হয়তো তাই হত, কিন্তু ভাগ্যের তা নির্দেশ নয়। ঘটনাচক্রে ঐ সময় কলকাতায় একটা সিনেমা শুরু হল—'যন্ত্রদানব'। তাই নিয়ে শহরে সে কী হইচই! সিনেমার গল্পটা একটা রোবটকে নিয়ে। তার কী একটা যন্ত্র বিকল হয়ে যাওয়ায় সে নাকি 'দানব' হয়ে গেল। 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন'-এর মত। তিনি চারটি বাচ্চাকে সে নৃশংসভাবে হত্যা করল। শেষ বেশ, সিনেমার নায়ক ঐ যন্ত্রদানবের সঙ্গে লড়াই করে তার গায়ের একটা ইলেকট্রিক তার ছিঁড়ে দিতেই যন্ত্রটা বিকল হয়ে গেল। একেবারে আষাঢ়ে গল্প, কিন্তু সেই সিনেমাটাকে উপলক্ষ্য করেই মৌদের সংসারে শুরু হল নানান জাতের অশান্তি।

নিতান্ত নিরুপায় হয়ে সরমা একদিন নরেনবাবুকে বললেন, 'আর তো পারা যায় না। তুমি এবার আপদটাকে বিদায় করে দাও। রবিকে বিক্রি করে দাও।'

নরেন্দ্রনাথ অবাক্ হয়ে বলেন, 'কেন? কি হল? রবির কি দোষ?'

'দোষের কথা নয়, কিন্তু দেখছ তো, ঐ 'যন্ত্রদানব' সিনেমাটা আসার পর থেকে আত্মীয়বন্ধুরা আমাদের বাড়ি আসা বন্ধ করেছে। সবাই রবিকে ভয় পায়। কাল টেলিভিশানে ছবিটা দেখিয়েছে। আর আজ সকালে দুধওয়ালা, ধোপা, খবরের কাগজওয়ালা সবাই আমাকে জবাব দিয়ে গেছে। ওরা আর কেউ আমাদের গেটের ভিতর ঢুকবে না।

নরেন্দ্রনাথ বিরক্ত হয়ে বলেন, 'কী আশ্চর্য! গল্প গল্পই?'

'সে কথা কে শুনছে বল? তাছাড়া মৌ যে ঐ রোবটটাকে দিনরাত অমন আঁকড়ে পড়ে আছে সেটাও আমার ভাল লাগে না। ওর সমবয়সী ছেলেমেয়েরা কেউ ওর সঙ্গে খেলতে আসে না। এটা কি ভাল? আমার ভয় হয়, রবির কোন কলকবজা বিগড়ে সেও যদি ঐ ভাবে মৌয়ের গলা—

কথাটা তাঁর শেষ হয় না। সিনেমায় দেখা কোন দৃশ্যের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় সরমা শিউরে ওঠেন। নরেন্দ্রনাথ বলেন, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ সরমা, আমি ঐ রোবট-বিজ্ঞান নিয়েই রিসার্চ করেছি। প্রতি মাসে আমি রবির অয়েলিং-ক্লিনিং করি। আমি জানি—সে কোনদিনই অমন পাগলামি করবে না। সে মৌকে ভালবাসে।'

'ভালবাসে! তুমি কি পাগল। যন্ত্র কখনও ভালবাসতে পারে?'

নরেন্দ্রনাথ হতাশ হয়ে মাথা নাড়েন। এ প্রশ্নের জবাব তাঁর জানা নেই। বিজ্ঞান এখনও ওটা প্রমাণ করতে পারেনি।

'আমি কোন কথা শুনতে চাই না। ওটাকে আজই বিদায় কর তুমি!'

নরেন্দ্রনাথ এবার অন্যদিক থেকে চেষ্টা করেন। তিনি জানেন, রবিই হচ্ছে মৌয়ের প্রাণ। রূপকথার সেই প্রাণ-ভোমরার মত। তাকে হারালে মৌ কেঁদে কেটে অনর্থ করবে। হয়তো মনের দুঃখে—

কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় তাঁকে রাজী হতে হল। সরমার এক বান্ধবী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। রবির কথা তিনি জানতেন না। কলিং বেল বাজাতে রবিই দরজা খুলে দেয়। ভদ্রমহিলা ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠেন। 'যন্ত্রদানব' সিনেমাটা তিনি সম্প্রতি দেখেছেন। সিঁড়ির মুখে অমন একটি বিচিত্র-দর্শন আপ্যায়নকারীকে দেখতে পেয়ে তিনি ছুটে পালাতে যান, এবং হুমড়ি খেয়ে পড়েন। বেচারি রবি। সে আবার যত্ন করে ভদ্রমহিলাকে ধরে তুলতে যায়। ফলে তিনি একেবারে ফ্ল্যাট! অজ্ঞান। রবি তো অপ্রস্তুতের এক শেষ! সেদিনই সরমা নরেন্দ্রনাথকে রাজী করালেন।

দিন সাতেক পরে নরেনবাবু অফিস থেকে ফিরে এসে বললেন, ব্যবস্থা করা গেছে। কাল সন্ধ্যায় একটা লরি এসে রবিকে নিয়ে যাবে। কিন্তু মৌ-কে—'

সরমা বাধা দিয়ে বলেন, 'না। ওর চোখের সামনে ঐ আপদটাকে বিদায় করা যাবে না। তুমি বরং কায়দা করে কাল বিকালে মৌকে সরিয়ে নিয়ে যেও।'

সেই মতই ব্যবস্থা হল। পরদিন সন্ধ্যায় নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'চল্ মৌ, আজ আমরা সার্কাস দেখতে যাব।'

সার্কাসের নামে মৌ তো একপায়ে খাড়া। বলে, 'রবিকেও নিয়ে যাব বাপি?'

'না রে। রবিকে ওরা ঢুকতে দেবে না।'

মৌয়ের মুখ ভার হয়। বলে, 'তবে থাক। রবি তাহলে সারাটা সন্ধ্যা কার সাথে খেলবে?'

সরমা অনেক বুঝিয়ে-শুঝিয়ে মৌকে রাজী করালেন। বাবার সঙ্গে মৌ গেল সার্কাস দেখতে।

বেচারি জানতেও পারল না—জোকারের ভাঁড়ামি দেখে সে যখন খিলখিল করে হাসছে ঠিক তখনই ওদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো একটা ট্রাক, বোবা রবিকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে।

সার্কাস দেখে মৌ ফিরে এল নাচতে নাচতে। রবিকে এখন সব খেলার গল্পগুলো শোনাতে হবে—ঘোড়া-হাতি-বাঘ-ট্রাপিজের খেলা, জোকারের বারে বারে আছাড় খাওয়ার গল্প। গাড়ি থেকে নেমেই মৌ চিৎকার করতে থাকে—'রবি! রবি!'

রবির সাড়া নেই। মৌ দেখে মা দাঁড়িয়ে আছেন সদর দরজার কাছে। তাঁর কোলে কী সুন্দর ফুটফুটে একটা কুকুরছানা। মৌ তো অবাক্। ওর মা বলেন, 'এই দ্যাখ্ মৌ। তোরা সার্কাস দেখতে গেলে, আর এদিকে এই কুকুরছানা এসে হাজির!'

বুদ্ধিটা নরেন্দ্রনাথের। কুকুরছানাটা তিনিই কিনেছেন মৌয়ের জন্যে। কথা ছিল, লরিটা যখন রোবটটাকে নিয়ে যাবে তখন কুকুরবাচ্চাকেও ওদের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যাবে। মৌ অবাক্ হয়ে বলে, 'ওমা! কী সুন্দর! মা, এটাকে আমি পুষব!'

'পুষবেই তো! ও তোমার নতুন বন্ধু!'

মৌয়ের আজ কী ভাগ্য। একে সার্কাস, তায় নতুন বন্ধু! সে চিৎকার করে ডাকতে থাকে—'রবি! শীগ্‌গির আয়! দেখ্ কে এসেছে!'

কোথায় রবি! তার সাড়াশব্দ নেই। মৌ বলে, 'রবি নিশ্চয় আমার ওপর রাগ করেছে বাপি! ওকে সার্কাসে নিয়ে যাইনি বলে। তাই লুকিয়ে বসে আছে দুষ্টুটা!'

নরেন্দ্রনাথ জুতার ফিতে খুলতে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়েন। মুখটা আর তুলতে পারেন না। মৌ সারাটা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজে এসে বললে, 'রবি কোথায় বাপি? কোথাও নেই?'

নরেন্দ্রনাথ এবার নীরব। সরমা বলেন, 'রবি নেই মৌ; রবি চলে গেছে!'

'চলে গেছে! মানে! কোথায় চলে গেছে? কেন?'

'কি জানি কেন। তোমরা সার্কাস দেখতে যাওয়ার পরই সে কোথায় যেন চলে গেল। আমরা তারপর অনেক খুঁজেছি; কিন্তু তাকে পাওয়া যায়নি।'

ছোট্ট মৌয়ের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে যায়। কথাটা তার বিশ্বাস হয় না। এ কী সম্ভব! রবি—তার রবি তাকে কিছু না জানিয়ে এভাবে চলে যাবে! দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে কোনক্রমে বলে, 'ওকি...ওকি...আমার উপর রাগ করেছে?'

কেউ কোন জবাব দেয় না। দুরন্ত অভিমানে মৌয়ের চোখের কোণে জল টলটল করছে। বললে, 'সেকি আর কোনদিনই ফিরে আসবে না?'

নরেন্দ্রনাথের বুকের ভিতর মুচড়ে ওঠে। নিজের মেয়ের সঙ্গে এ কী মিথ্যা ছলনা করতে হচ্ছে তাঁকে। সরমাই জবাবে বলেন, 'হয়তো খেয়াল হলে সে নিজে থেকেই ফিরে আসবে। ততক্ষণ তুমি বরং এই কুকুরছানাটার সঙ্গে খেলা কর। দেখেছ মৌ—কী সুন্দর ওর গায়ের লোম! ওর নাম কি জান? জ্যাকি!'

মৌ তার কোল থেকে জ্যাকিকে নামিয়ে দেয়। দু-হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠে—'চাই না,

কাঁদতে কাঁদতে মৌ ছুটে চলে যায়।

চাই না ঐ বিচ্ছিরি কুকুরটাকে! তোমরা যেখান থেকে পার আমার রবিকে খুঁজে এনে দাও।'

কাঁদতে কাঁদতে মৌ ছুটে চলে যায়। নরেন্দ্রনাথ চোখ থেকে চশমাটা খুললেন। কাচটা মুছতে গিয়ে চোখটাও মুছে নিলেন। সরমা ঠাট্টা করে বলেন, 'রবির দুঃখে তোমার চোখেও জল এসে গেল নাকি?'

ম্লান হাসলেন নরেন্দ্রনাথ। বলেন, 'না রবি নয়, মৌয়ের জন্য দুঃখে।'

'ওর দুঃখ আর কদিন? দুদিনেই ও রবিকে ভুলে যাবে।'
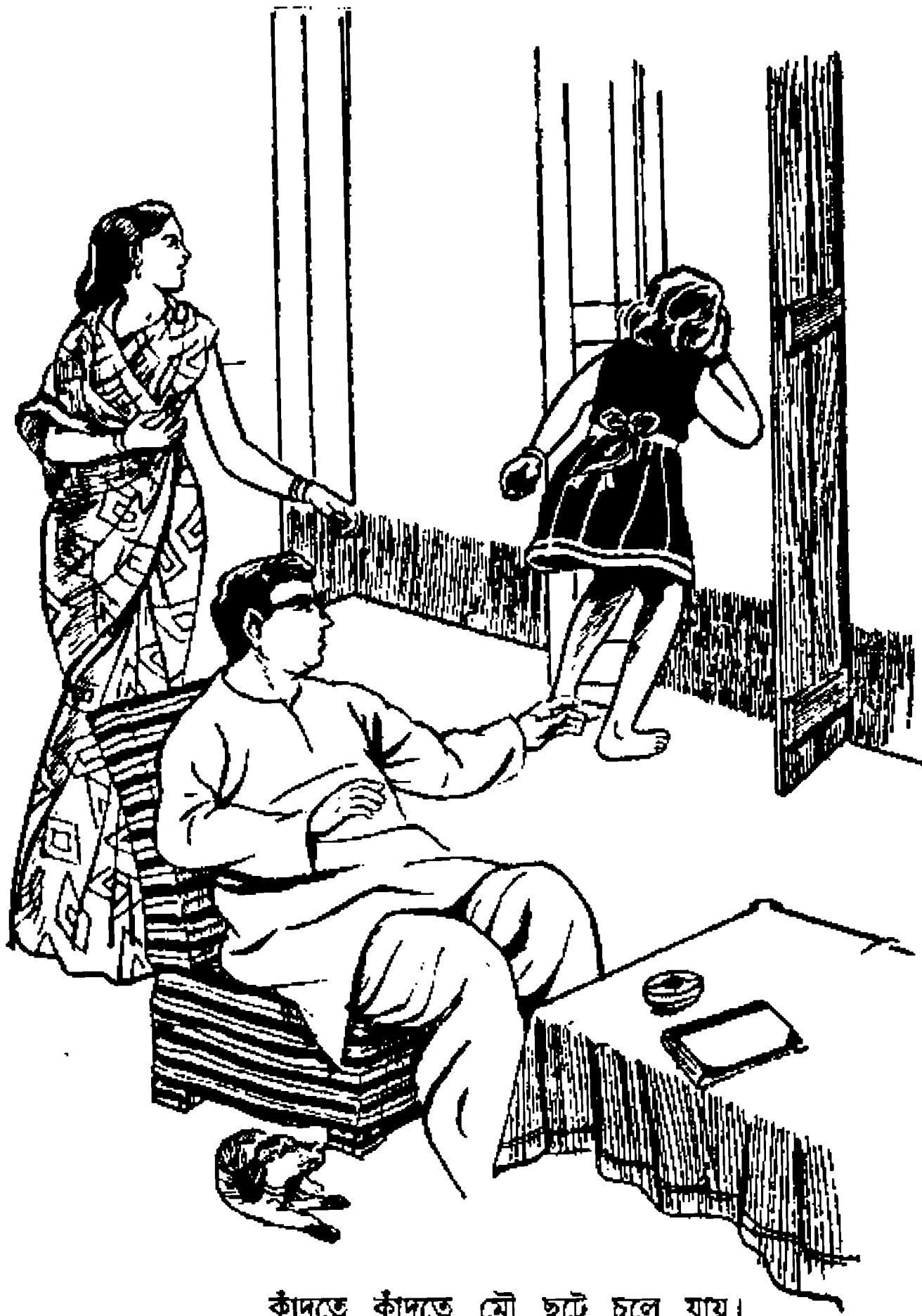
দেখা গেল—সরমার হিসাবে কিছু ভুল হয়েছে। দুদিন পরে মৌ কান্না থামালো বটে কিন্তু হাসতেও ভুলল। জ্যাকির সঙ্গে ওর আদৌ বন্ধুত্ব হল না। রবি বিদায় হবার পর মৌয়ের বন্ধুরা ওর সাথে খেলতে এল—মৌ কিন্তু তাদের পাত্তা দিল না। দিনরাত সে চুপ করে বসে থাকে। আগে বেসুরো গান গাওয়ার জন্যে মায়ের কাছে ধমক খেত—এখন সে গান গায় না। ছড়া বলে না। মাস খানেকের ভিতরেই সে রীতিমত রোগা হয়ে গেল।

সরমা ভয় পেয়ে গেলেন। স্বামীকে বললেন, 'তুমি ছুটি নাও। চল, আমরা কোথাও বেড়াতে যাই। নতুন জায়গায় গেলেই মৌয়ের মন ভাল হয়ে যাবে।'

নরেন্দ্রনাথ বিরক্ত হয়ে বলেন, 'ছুটি কি চাইলেই পাওয়া যায়? এখন আমাদের অফিসে ভীষণ কাজের চাপ। দিন সাতেক পরে আমাকে দিল্লী যেতে হতে পারে। হয় তো দিন-দশেক সেখানে থাকতেও হবে।'

'দিল্লী! দিল্লীতে কেন? সেখানে তোমার কী কাজ?'

'সেখানে একটা এক্‌জিবিশন হবে। আমাদের একটা স্টল নেওয়া হয়েছে।'

'তবে তো ভালই হল। তাহলে আমরা দুজনেও তোমার সঙ্গে যাব।'

সেই মতই ব্যবস্থা হল। দিল্লী বেড়াতে যাওয়া হবে শুনে মৌ খুশী হল। এত দিন পরে প্রথম হাসল। সরমার বুকের উপর থেকে একটা পাষাণ ভার নেমে গেল যেন। কিন্তু যাবার

দিনে মৌ এমন একটা কথা বলে বসল, যাতে বোঝা গেল—সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে! রবিকে সে আজও ভোলেনি। যাবার দিনে বাপের গলা জড়িয়ে ধরে মৌ বললে, 'আমি জানি বাপি—কেন আমরা দিল্লী যাচ্ছি।'

—'কেন রে?'

'তুমি নিশ্চয়ই খোঁজ পেয়েছ—রবি দিল্লীতে আছে। তাই নয়?'

অবিনাশ কী জবাব দেবেন ভেবে পান না।

দিল্লীতে ওরা অনেক কিছু দেখল। নতুন তৈরী 'ওশেনিয়ামে' ডলফিন্-এর খেলা, মিনি রকেটে চড়ে আকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখা—আরও কত কি? মৌ অভিভূত। না হবে কেন? মাত্র ছয় বছরের বাচ্চা সে। দিল্লীতে এসে রবির নাম সে একবারও করেনি। তবে বোধহয় এত দিনে সে রবির কথা ভুলেছে। নরেন্দ্রনাথ সরমা আর মৌকে প্রদর্শনীতেও নিয়ে গেলেন। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখালেন। নিজের স্টলে মৌকে নিয়ে ঢুকলেন না। সেখানে দু-একটি রোবটকে দেখানো হচ্ছে। এগুলি অবশ্য নতুন মডেলের কথা-বলতে-পারা ছোট রোবট; রবির মত জবড়জঙ্গ বোবা নয়। তবু পাছে তাদের দেখেও রবির কথা মৌয়ের মনে পড়ে যায় তাই নরেন্দ্রনাথ একবারও তাকে ঐ স্টলে নিয়ে গেলেন না।

একদিন এক কাণ্ড হল। হঠাৎ এক্জিবিশন গ্রাউণ্ডে মৌ গেল হারিয়ে। ঠিক ওঁদের স্টলটার সামনে। খোঁজ-খোঁজ-খোঁজ! মৌয়ের পাত্তা নেই। নরেন্দ্রনাথ হন্তদন্ত হয়ে নিজের স্টলে ঢুকলেন একটা টেলিফোন করতে—'হারানো প্রাপ্তি অফিসে' খবর দিতে। কিন্তু সেসব কিছুই করতে হল না। ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে ওঁরা দেখতে পেলেন একটা অদ্ভুত দৃশ্য। একটা কথা-বলা রোবটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মৌ। তাকে প্রশ্ন করছে, 'না, মিস্টার রোবট স্যার, রবিকে দেখতে আপনার মত মোটেই নয়। সে কথা বলতে পারে না। আপনি তাকে চেনেন না? কী আশ্চর্য। সে তো আপনারই জাতভাই স্যার। বলুন না! চেনেন না তাকে?'

সেদিনই ওঁরা ফিরে এলেন কলকাতায়, সরমা প্রশ্ন করছিলেন, 'আমাদের না বলে কেন পালিয়ে গিয়েছিলে? যদি হারিয়ে যেতে?'

মৌ বলেছিল, 'হারাব কেন? আমি তো বাপির দোকানে গেছিলাম। রবির খোঁজে!'—তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলে—'ওরা কেউ তাকে চেনে না!'

শেষ পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে বলেন, 'দেখ সরমা, আমি অনেক ভেবে দেখলাম, মৌ হয়তো এবার একটা কঠিন অসুখে পড়বে। দেখছ না, কী ভীষণ মনমরা হয়ে থাকে মেয়েটা! আমি বরং রবিকে—'

'না!'—রুখে ওঠেন সরমা! তাঁর কেমন যেন রোখ চেপে গেছে। ঐ এক ফোঁটা মেয়েটার কাছে এভাবে হেরে যেতে হবে! তাছাড়া এ কি বিশ্বাসযোগ্য! আর কিছুদিনের মধ্যে মৌ নিশ্চয় ভুলে যাবে সেই সর্বনেশে পুতুলটাকে। রবিকে নিয়ে এতদিন তিনি তো বড় কম অশান্তি ভোগ করেন নি। বাজার উজাড় করে তিনি নানান জাতের খেলনা কিনে আনেন। কিন্তু মৌ সেই যে

কে সেই। কাঁদে না; কিন্তু হাসেও না। রবির নাম সে ভুলেও উচ্চারণ করে না। চুপচাপ বসে থাকে জানালার ধারে। নরেন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন, মিঠু দিনরাত রবির কথাই ভাবে। সে কি এতদিনে অনুমান করেছে যে, অভিমান করে রবি বিবাগী হয়ে যায়নি—তার বাপিই তাকে সরিয়ে দিয়েছে! তাই কি মৌ এত মনমরা! তাই কি সে আজকাল তার বাপির সঙ্গেও মন খুলে কথা বলে না?

একদিন নরেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'শোন, কাল তোমাদের দুজনকে আমি আমার কারখানা দেখাতে নিয়ে যাব।'

সরমা আঁতকে ওঠেন, 'কী বকছ পাগলের মত? বেচারি হয়তো এতদিনে সেই বিশ্রী রোবটটাকে ভুলতে শুরু করেছে। আর তুমি চাইছ খুঁচিয়ে ঘা করতে?'

নরেন্দ্রনাথ বলেন, 'তুমি ভুল করছ সরমা। রবিকে সে একটুও ভোলেনি। ও দিবারাত্র শুধু তার কথাই ভাবে, আমি জানি। শোন, রবি যে একটা প্রাণহীন যন্ত্র, তার যে বোধশক্তি ছিল না, সে যে ভালবাসতে জানে না—এটা যতদিন না মৌকে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে ততদিন তার মনটা ঘুরবে না। আমার মনে হয়—কারখানায় কী ভাবে রোবট তৈরী হয় এটা স্বচক্ষে দেখলে হয়তো ওর ভুলটা ভাঙবে।'

সরমা বুঝলেন, কথাটার যুক্তি আছে। তিনি রাজী হলেন।

পরদিন নরেন্দ্রনাথ ওদের দুজনকে কারখানা দেখাতে নিয়ে এলেন। নরেনবাবুর সহকারী ডক্টর শ্রীনিবাসন ওদের ফ্যাকটারিটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে থাকেন। নানা যন্ত্রপাতি—ডাইনামো, মোটার, ক্রেন—কারখানা যেমন হয়। দেখালেন, রোবটের হাত-পা-বুক-মাথা কীভাবে তৈরী হয়। সরমা প্রশ্ন করেন, 'আচ্ছা ডক্টর শ্রীনিবাসন, ওদের স্মৃতিশক্তি কেমন? ধরুন একটা রোবট আমাকে চিনত; অনেকদিন পরে হঠাৎ আমাকে দেখলে সে চিনতে পারবে?'

শ্রীনিবাসন বলেন, 'ওদের স্মৃতিশক্তি খুবই প্রখর। ওদের মাথায় একটা করে মেমারি সার্কিট থাকে, মানে স্মৃতিকোষ। কিন্তু তাতে জমা থাকে শুধু অঙ্কের হিসাব। সংখ্যাতত্ত্বের বড় বড় রাশি। নানান জাতের ফর্মুলা। পোষা কুকুর-ঘোড়া-হাতি তাদের প্রভুকে চিনতে পারে গন্ধ শুঁকে। রোবটের ঘ্রাণশক্তি নেই। ফলে ওরা মানুষকে চিনতে পারে না।'

সরমা বলেন, 'আচ্ছা, ওরা কি ভালবাসতে পারে?'

শ্রীনিবাসন হো হো করে হেসে ওঠেন। বলেন, 'না, মিসেস সান্যাল! রোবটের প্রাণ নেই। তারা ভালবাসতে পারে না।'

ওঁরা কথা বলছিলেন একটা প্রকাণ্ড বড় 'প্রডাকশন-শেড'এর সরু গলিপথে দাঁড়িয়ে। আশে-পাশে নানান যন্ত্রপাতি। বড় বড় চাকা ঘুরছে। মাথার উপর চলছে ক্রেন। ওঁরা যে রেলিং-ঘেরা গলি-পথে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন তার হাতখানেক নীচ দিয়েই একজোড়া রেল লাইন। কিছুক্ষণ বাদে বাদে সেখান দিয়ে স্বয়ংক্রিয় ঠেলাগাড়ি মাল নিয়ে যাতায়াত করছে। মৌ অবাক্ বিস্ময়ে সব কিছু দেখছে। সরমা ইচ্ছা করেই শ্রীনিবাসনকে ঐ ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিলেন, যাতে মৌ বুঝে নেয়—রোবট আসলে যন্ত্র-পুতুল। তারা হাসে না, ভালবাসে না, তাদের প্রাণ নেই।

এক হাতে তিনি ধরে রেখেছিলেন মৌয়ের হাতটা। কারখানার এই অংশে মানুষ-কর্মী খুব কম; রোবট-কর্মীরাই নানান কাজ করছে। মৌ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাদের দেখছিল—না! এরা রবির চেয়ে আকারে অনেক ছোট। এদের মুখ আছে, এরা সব কথা-বলা-রোবট। রবির মত জবড়জঙ্গ গরিলা একটাও নেই। থাকবে কোথা থেকে? রবি ছিল পুরানো মডেলের রোবট। এখন ঐ মডেলের বোবা রোবট তৈরীই হয় না।

হঠাৎ কোথাও কিছু নেই মায়ের হাত ছাড়িয়ে লাফিয়ে ওঠে মৌ—'ঐ তো!'

দ্যাখ্ দ্যাখ্ ধর্ ধর্ করতে করতেই ঘটে গেল কাণ্ডটা। রেলিঙের ফাঁক দিয়ে রেল-লাইনের গলিপথে মৌ দিল এক লাফ। দেখতে পেয়েছে! এতক্ষণ ধরে যাকে খুঁজছিল, তাকেই সে দেখতে পেয়েছে! পিছন ফিরে একটা প্রকাণ্ড রোবট কি যেন করছিল! মৌ নিঃসন্দেহ। ও আর কেউ নয়—রবি!

মৌ তো আর রোবট নয়। সে ভালবাসতে জানে, হারানো বন্ধুকে চিনতে পারে। ঘ্রাণশক্তিতে নয়, প্রাণশক্তিতে! রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে থাকে মৌ—'রবি! রবি!'

লেন্সি-চোখ পিটপিট করতে করতে রবি যেভাবে মৌয়ের গালে... [পৃ. ২৬০

মুহূর্তের বিহ্বলতা। পরমুহূর্তেই সবাই সংবিৎ ফিরে পান। কিন্তু ও কী! সর্বনাশ! শ্রীনিবাসন দেখতে পান যে সরু গলিপথ দিয়ে পাগলের মত মৌ ছুটে চলেছে। সেই রেল-লাইন ধরেই বিপরীত দিক থেকে এগিয়ে আসছে প্রকাণ্ড একটা রেলগাড়ি। মৌয়ের সেদিকে নজরই নেই! রেল-লাইনের গলিপথটা এতই সরু যে বড়রা কেউ সেই পথে নামতে পারে না। পরমুহূর্তেই একটা বীভৎস দৃশ্যের অনিবার্য পরিণামে সবাই হায় হায় করে ওঠে। সরমার মাথার ভিতর টলে ওঠে। চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। মূর্ছিত হয়ে পড়ে যান তিনি। নরেন্দ্রনাথ রেলিং ধরে ঝুঁকে পড়েন। চিৎকার করে ওঠেন, 'মৌ! যাস্‌নে! ফিরে আয়!'

সে ডাক শুনতে পায়নি মৌ। তার মাথার রিবন খুলে গেছে। ফ্রকে লেগেছে কালির দাগ। সে-সবে ভ্রূক্ষেপ নাই তার। সে শুধু ছুটতে থাকে অনিবার্য মৃত্যুর দিকে—'রবি! রবি! রবি!'

হঠাৎ শুনতে পেল রবি। ঘুরে দাঁড়ালো। যে কথা বুঝতে কোন মানুষের পুরো দু-মিনিট
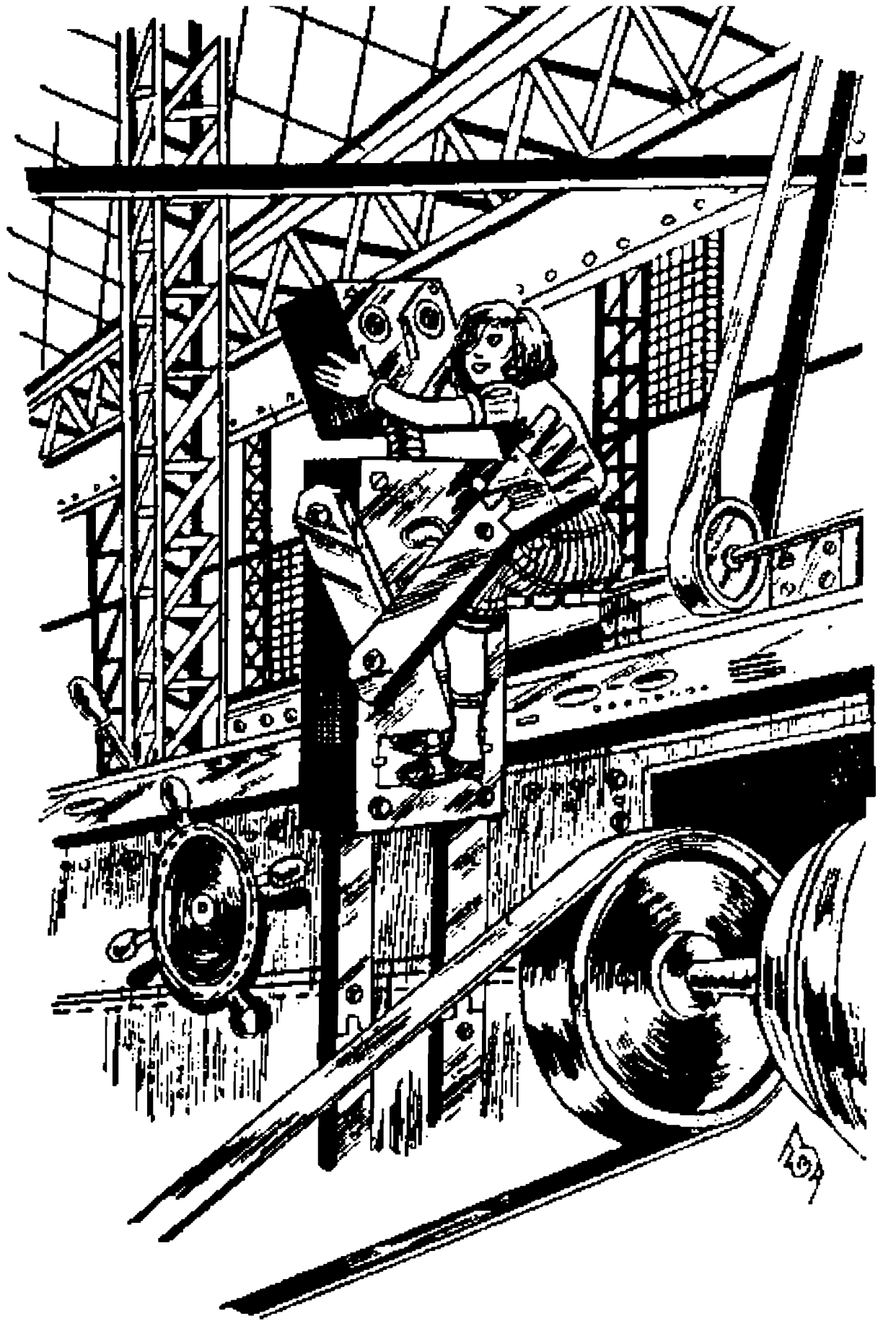
সময় লাগে ওর উন্নতবুদ্ধিতে ও সেটা নিমেষমধ্যে বুঝে নেয়। চরম বিপদের সামনে মানুষ দিশেহারা হয়ে যায়, কী করা উচিত বুঝে উঠতে পারে না। রবির কখনও তা হয় না। রবি এক লহমায় বুঝে নিল এ সমস্যার কী সমাধান হতে পারে। বিদ্যুৎ বেগে সে এগিয়ে আসে, ঝুপ করে বসে পড়ে রেলিঙের ধারে—আর মাছরাঙা যেভাবে ছোঁ মারে ঠিক সেই ভাবে টুপ করে শূন্যে তুলে ফেলে মৌকে। পরমুহূর্তেই শীকার ফসকে যাওয়ার আক্রোশে, গজরাতে গজরাতে ট্রেনটা চলে গেল রেললাইন দিয়ে। ততক্ষণে যন্ত্র-দানবটা তার স্টেন-লেস-স্টীলে গড়া বুকে জড়িয়ে ধরেছে একরত্তি ছোট্ট মেয়েটাকে!

কে বলবে বোবা রোবটটার প্রাণ নেই! লেন্স-চোখ পিটপিট করতে করতে রবি যেভাবে মৌয়ের গালে গাল ঘষছে তাতে মনে হয় সে যেন মনে মনে বলছে, 'মিঠু! আমার ছোট্ট মিঠু। কোথায় লুকিয়ে ছিলিরে এতদিন? কই একবারও টু-কি দিস্‌নি তো!'

পরদিন সন্ধ্যায় শ্রীনিবাসন ওদের বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ রাখতে এলেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন, 'কালকে আমি বোধহয় ভুল বলেছিলাম মিসেস সান্যাল। রোবটের প্রাণ আছে কিনা জানি না, কিন্তু তারা বোধহয় ভালবাসতে জানে!'

নরেন্দ্রনাথ বলেন, 'নিশ্চয়ই জানে, শ্রীনিবাসন। গাছের যে প্রাণ আছে এটা এক সময় মানুষ তার অনুন্নত বুদ্ধিতে বুঝতে পারত না। আজ সে সত্যটা আমরা বুঝেছি। তেমনি আজ আমরা প্রমাণ করতে পারছি না যে, রোবটেরও প্রাণ আছে—তারা আনন্দে হাসে, দুঃখে কাঁদে, তারা প্রাণভরে ভালবাসতে জানে। আগামী যুগে হয়তো সেটা প্রমাণ হবে।'

ডক্টর শ্রীনিবাসন বলেন, 'কিন্তু যাঁর পুনর্জন্ম লাভে এই চায়ের নিমন্ত্রণ। তিনি কোথায়? মিস্ মৌ সান্যাল?''

সরমা হেসে বলেন, 'আপনি তার দেখা কি করে পাবেন? আপনি তো যন্ত্র নন, মানুষ। কাল থেকে সে মেতে আছে তার হারানো বন্ধুকে ফিরে পেয়ে। ঐ দেখুন—'

ওঁরা জানালার ধারে সরে আসেন। দেখতে পান পিছনের বাগানটা। একটা বিরাট আমগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রবি। দুই গোদা গোদা হাতের আঙুলে ঢেকে রেখেছে তার লেন্স-চোখ। আর মৌ? তার পাত্তাই নেই। দেখা না যাক, তার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। যুঁই-ঝোপের পিছন থেকে ভেসে আসছে 'রবি বলে টু-কি!'

---

* আমেরিকা প্রবাসী প্রখ্যাত রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক আইজাক আজিমভ অনুসরণে।

—শৈলেন দত্ত

কি হয়েছে? চেঁচাস কেন? কাঁদিস কেন ভ্যাক্ করে?
তড়বড়িয়ে উঠতে গিয়ে খাট থেকে কি যাস্ পড়ে?
কলতলাতে ছুটতে গিয়ে পা-টা কি তোর পিছলেছে?
পেয়ারাগাছে চড়তে গিয়ে হাতখানা কি মুচ্‌কেছে?
চোখে কি তোর পড়ল ধুলো, মাথায় কি কেউ ছুড়ল ঢিল?
আচার চুরি করতে গিয়ে হাতে কি তোর পড়ল খিল?
কেউ কি তোকে বকল এখন, কেউ কি দিল কান মুলে?
কেউ কি মাথায় মারল চাঁটি, টান দিয়েছে তোর চুলে?
চুপ করেছিস, লক্ষ্মী ছেলে, হয়েছে কি এবার বল?
এখনো তো ঠোঁট ফুলছে, দু'চোখে তোর গড়ায় জল!
মুচকি হেসে বলল ডাকুঃ হয় নি আমার কিচ্ছুটি
হঠাৎ কেন বলল মামাঃ কর তো দেখি গুণ দুটি।

ঘুড়ি-লাটাই নিয়ে যখন প্যাঁচ খেলছি ঐ ছাদে—
মামা এসে হাজির হ'য়ে আমার খেলায় বাদ সাধে।
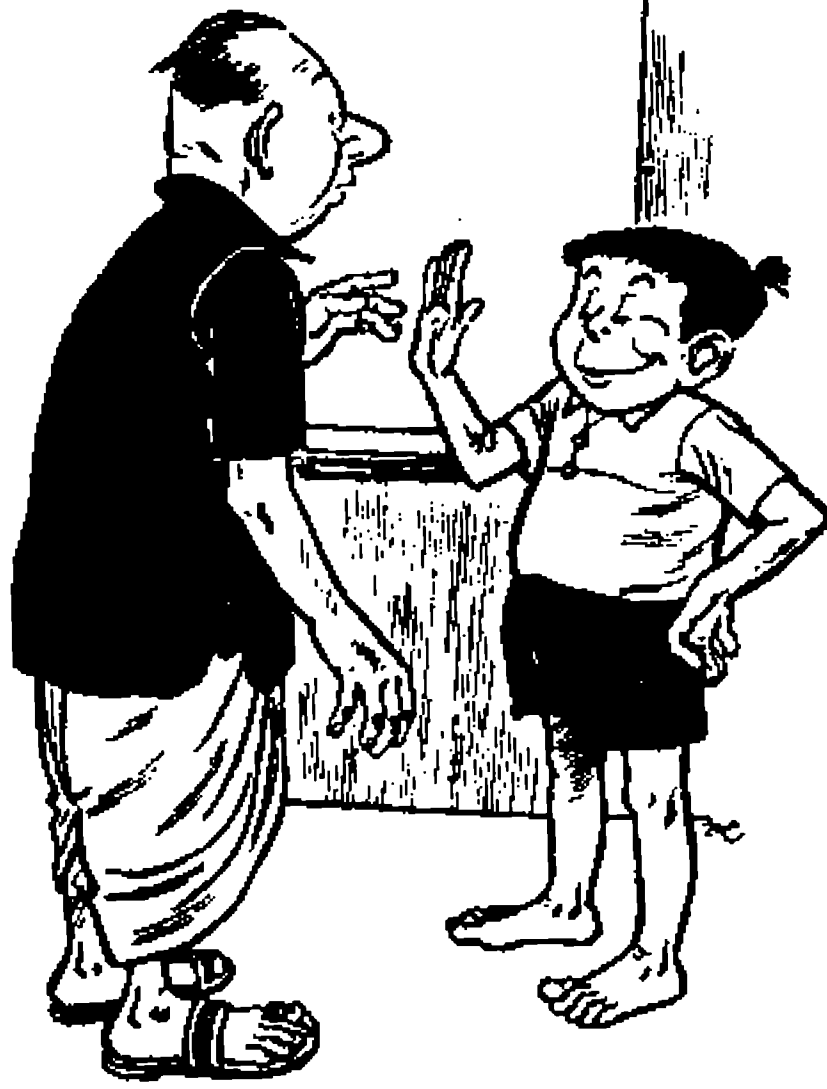
প্যাঁচটা অমন মাটি হ'ল তাইতে আমার কান্না পায়
তাই কেঁদেছি, হাড় ভাঙে নি, লাগেনিও একটু গায়!

● মৎস ধরিব, খাইব সুখে—

লেখাপড়া সহজ ব্যাপার নয়
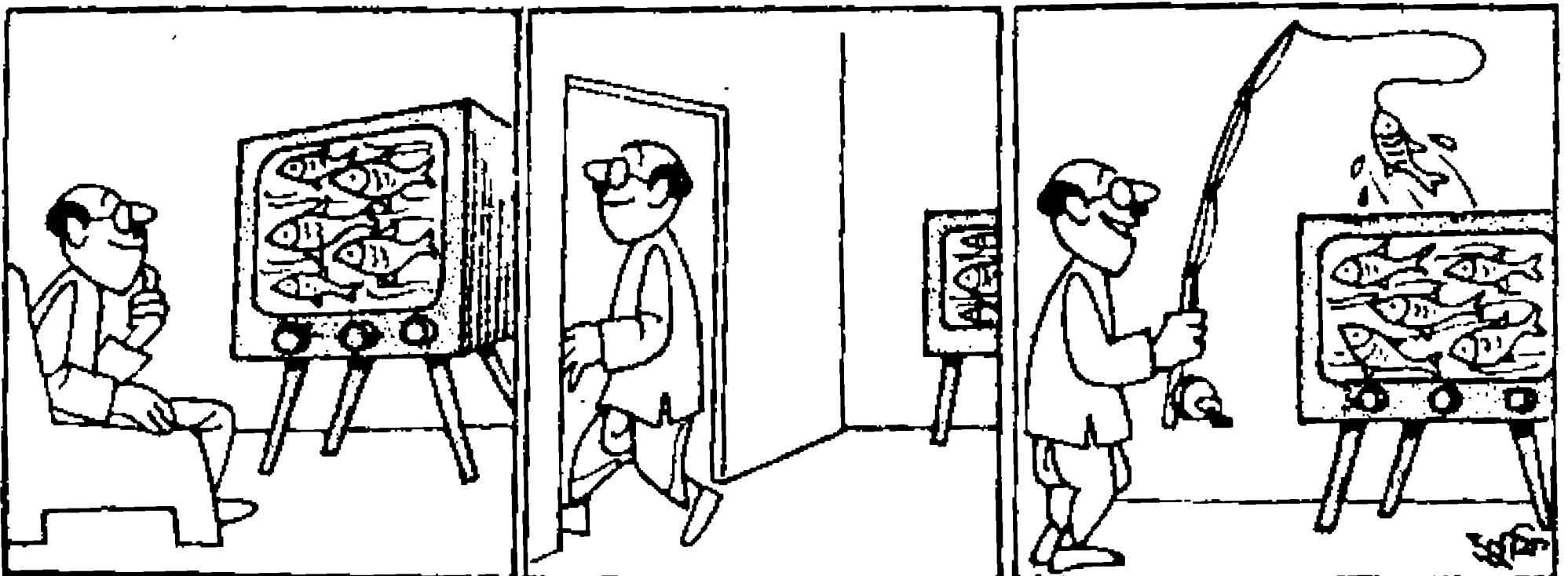
—প্রফুল্ল রায়

গেল বছর তোমাদের বাঘ-শিকারের গল্প শুনিয়েছি। এবারের গল্পটা কিন্তু লেখাপড়া নিয়ে। লেখাপড়ার নাম শুনেই আঁতকে উঠলে তো! ভয় নেই, এ গল্পে লেখাপড়ার গন্ধ যত আছে তার চাইতে ঢের বেশী রয়েছে মজা আর হাসি। কতটা মজা আর কতটা হাসি তা কিন্তু বলতে পারব না।

যে তিনজনকে নিয়ে এবারের গল্প তারা হল কাবুল, টাবুল আর তাদের বাড়ির মাস্টারমশাই ধুরন্ধর সামন্ত। আরো কয়েকজন অবশ্য এতে আছে, তবে ওই তিনজনই আসল।

গল্পটা শুরু করার আগে দু-একটা ছোটখাটো দরকারী কথা তোমাদের বলে নিচ্ছি।

কাবুল আর টাবুল আমার দুই ভাগনে। ওরা থাকে কলকাতা থেকে তিরিশ চল্লিশ মাইল, দূরে একটা প্রকাণ্ড কারখানা শহরের বিরাট এক বাংলো বাড়িতে। জায়গাটার নাম হীরাপুর।

হীরাপুর ভারী সুন্দর জায়গা। তার একদিকে উঁচু পাঁচিল-ঘেরা কারখানা; আরেক দিকে শহর। চওড়া চওড়া ঝকঝকে পীচের রাস্তা শহরের ভেতর দিয়ে চলে গেছে। কারখানায় যারা কাজ করে তাদের জন্য রাস্তার দু-ধারে রয়েছে ছবির মতো কোয়ার্টার, অফিসারদের জন্য বড় বড় বাংলো-বাড়ি। সবগুলো কোয়ার্টারের সামনেই ফুলের বাগান। রাস্তাগুলোর পাশে রয়েছে সারি সারি কৃষ্ণচূড়া গাছ আর মার্কারি আলোর থাম। এ ছাড়া আছে স্কুল, কলেজ, সিনেমা হল, খেলাধুলোর জন্য ছোট স্টেডিয়াম, কলকাতার নিউ মার্কেটের মতো চমৎকার একটা বাজারে ঝলমলে সব দোকান, বাচ্চাদের জন্য সাজানো পার্ক—এমনি অনেক কিছু। শহরটার গা ঘেঁষে একটু উঁচু আর লম্বা

পুলও আছে। সেটার ওপর দিয়ে বাসটাস কি অন্য গাড়ি যায়, তলা দিয়ে যায় ইলেকট্রিক ট্রেন। আরো একটা জিনিস এখানে খুব বেশী চোখে পড়ে, তা হল নারকোল গাছ। হীরাপুরের চারিদিকে নারকোল গাছের মেলা বসে আছে যেন।

আমার জামাইবাবু মানে কাবুল-টাবুলের বাবা হীরাপুরের কারখানায় মস্ত অফিসার। এমনিতে দারুণ গম্ভীর আর রাশভারী মানুষ; কথা বললে চারদিক গমগম করে। চেহারাটাও সেইরকম। সাড়ে ছ'ফুট লম্বা; বেয়াল্লিশ ইঞ্চি বুক; চওড়া কাঁধ, নাকের নীচে চৌকো গোঁফ। সারাদিনে একটুও ফুরসত পান না, সব সময় তাঁর খালি কাজ আর কাজ। সকালবেলা স্নানটি সেরে একটু কিছু খেয়েই কারখানায় চলে যান জামাইবাবু; ফিরতে রাত ন'টা দশটা। দুপুরে চাকর সীয়াশরণ টিফিন কেরিয়ারে করে ভাত-টাত দিয়ে আসে। রবিবারেও তাঁর ছুটি নেই। সেদিনও তাঁকে কারখানায় যেতে হয়।

আমার দিদি মানে কাবুল-টাবুলের মা কিন্তু বাড়ি থেকে বেরুতেই পারে না। বারোমাস নানারকম অসুখবিসুখে ভোগে, দিনরাত্ত খাটে শুয়ে থাকে আর ছুঁচের মতো সরু গলায় ঝি-চাকর আর কাবুল-টাবুলের পেছনে চেঁচিয়ে যায়। ভুগে ভুগে তার মেজাজ ভীষণ খিটখিটে হয়ে গেছে।

এবার কাবুল-টাবুলের কথা। কাবুলের বয়স চোদ্দ বছর। ক্লাস সিক্সে পড়ে সে। সরু প্যাঁকাটির মতো চেহারা তার; লিকলিকে গলার ওপর পাঁচ নম্বরী ফুটবলের মতো প্রকাণ্ড মাথা। মাথার ওপর আলপিনের মতো চোখা চোখা চুল খাড়া হয়ে আছে। জামাইবাবু বলেন, 'ওর ওই মাথাটা সব রকম বজ্জাতির কারখানা।' কথাটা ঠিকই বলেন জামাইবাবু। সে যাক গে, কাবুলের কপালের দুধারে টল গুলির মতো উঁচু উঁচু আর ভীষণ শক্ত দুটো টিবি রয়েছে; হঠাৎ দেখলে মনে হয় শিং গজিয়েছে। রেগে গেলে এই টিবি দুটো দিয়ে সে খুব জোরে ঢুঁ মারে। আর সেই ঢুঁ-য়ে এত জোর যে দারা সিং থেকে মহম্মদ আলি পর্যন্ত সব বড় বড় বক্সার আর কুস্তিগীর পনের হাত দূরে ছিটকে পড়বে। তার চোখ দুটো একেবারে গোল; নাকের ফুটোদুটো মস্ত। সবসময় কাবুলের পরনে থাকে হাফ প্যান্ট আর হাফ শার্ট। প্যান্টটা এমন ঢলঢলে যে যখন তখন হড়কে নীচের দিকে নেমে যায়; তক্ষুণি বাঁ হাতের হ্যাঁচকা টানে সেটাকে ওপরে টেনে তোলে সে। ডান হাতের দুটো আঙুল সারাক্ষণই তার মুখে পোরা থাকে। কাবুল আঙুল খায়। আঙুল খেতে খেতে তার মাথায় হাজার গণ্ডা দুষ্টুমির প্ল্যান গজাতে থাকে।

কাবুলকে যতই মারধোর করা যাক কেউ তার চোখ থেকে এক ফোঁটা জল বেরুতে দ্যাখে নি। বকলে বা মারলে গোল গোল চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে এমনভাবে সে তাকিয়ে থাকবে যেন খুব অবাক্ হয়ে গেছে। তাতে যারা তাকে মারে বা বকে তাদের রাগ হয়ে যায় কিনা তোমরাই বল।

টাবুলের বয়স বারো বছর। সে পড়ে ক্লাস ফোরে। বয়সে ছোট হলেও মাথায় সে কাবুলের চাইতে দেড় ইঞ্চি লম্বা। তার মাথায় নরম সিল্কের মতো কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। চোখদুটো ভাসা ভাসা। তার পোশাক-টোশাকও ভীষণ ফিটফাট। সে আঙুল খায় না।

চেহারা দুরকম হলেও কাবুল আর টাবুলের মধ্যে ভীষণ ভাব। অন্য সব দিকেও তাদের খুব মিল। দু-জনেই হরিণের মতো দৌড়ুতে পারে; চোখের পাতা পড়তে না পড়তেই কাঠবেড়ালীর

মতো তরতর করে পঞ্চাশ ষাট ফুট উঁচু নারকোল গাছে উঠে যায়; ডুব সাঁতার দিয়ে বড় বড় পুকুর পার হয়। গুলতির টিপও তাদের দুর্দান্ত। প্রায় সারাক্ষণই দুজনে একসঙ্গে থাকে। আগেই বলেছি কাবুলের মাথায় নানারকম দুষ্টুমি গিসগিস করছে। সে বুদ্ধি খাটিয়ে প্ল্যান বার করে; আর তার কথামতো মুখটি বুজে টাবুল কাজ করে যায়। কাবুল হচ্ছে জেনারেল আর টাবুল তার বিশ্বাসী সোলজার।

আরো একটা দিকে দুই ভাইয়ের মিল আছে। একবারে তারা নতুন ক্লাসে উঠতে পারে না। এক একটা ক্লাসে তারা দু বছর করে থাকে। ফেল করে করে একজন সিক্সে, আরেকজন ফোরে এসে দু বছর ধরে আটকে আছে।

দিদি চেঁচামেচি শুরু করে দেয়, 'কোথায় পড়তে যাচ্ছিস, অ্যাঁ—'

আসলে পড়াশোনা করতে একদম ভালো লাগে না ওদের। জামাইবাবু যতক্ষণ বাড়ি থাকেন দুই ভাই সুর করে চেঁচিয়ে যেতে থাকে, 'আকবর দিল্লীর সম্রাট ছিলেন—' কিংবা 'এ-বি-সি একটি ত্রিভুজ।' একই কথা তারা বার বার বলে যায়।

তারপর জামাইবাবু যেই কারখানায় বেরিয়ে গেলেন অমনি কাবুল-টাবুলও দিদির চোখে ধুলো দিয়ে সুট সুট করে বাংলো থেকে বেরিয়ে পড়ল। রোজ রোজ তো আর ধুলো দেওয়া যায় না; এক-আধদিন দিদির কাছে তারা ধরাও পড়ে যায়। দিদি তখন বলে, 'কোথায় যাচ্ছিস তোরা?'

টাবুলটা বেশি কথা বলে না। সে সোলজার। সোলজারের মুখ বুজে থাকাই তো নিয়ম। টাবুল চুপ করে থাকে। আর কাবুল মুখ থেকে জোড়া আঙুল বার করে বলে, 'আমরা পড়াশোনা করতে যাচ্ছি।' বলেই আঙুল দুটো আবার মুখের ভেতর পুরে ফেলে।

দিদি চেঁচামেচি শুরু করে দেয়, 'কোথায় পড়তে যাচ্ছিস, অ্যাঁ—কোথায় পড়তে যাচ্ছিস?' রেগে গেলে দিদি একটা কথা দু-বার করে বলে।

কাবুল মুখ থেকে আবার আঙুল খুলে বলে, 'হেড মাস্টারমশাই বলেছে আকাশ-বাতাস-গাছপালা, গরু-ছাগল, ব্যাঙ-গুগলি, সবার কাছ থেকেই আমাদের অনেক শিখবার আছে। আমরা তাদের কাছে শিখতে যাচ্ছি।'

দিদি গলার স্বরটাকে এবার দশগুণ চড়িয়ে দেয়, 'ওরে ঝিকমিকিয়া, ওরে সীয়াশরণ, ওরে যুধিষ্ঠির বাঁদর দুটোকে ধর, বাঁদর দুটোকে ধর—'
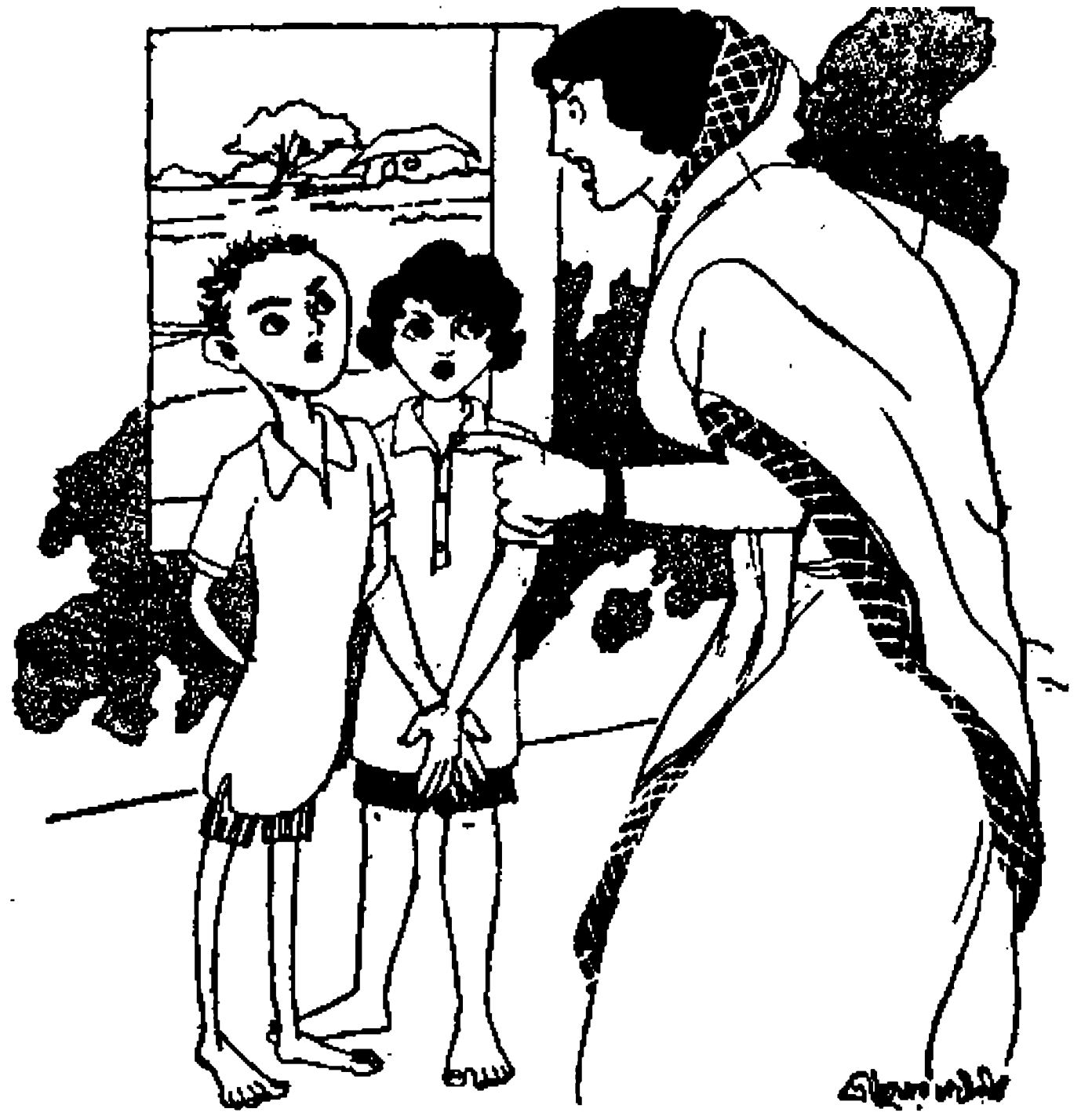
সীয়াশরণ আর ঝিকমিকিয়ার দেশ বিহারে; অনেকদিন ধরে তারা দিদির কাছে কাজ করছে। যুধিষ্ঠির মেদিনীপুর জেলার লোক; সে এ বাড়ির রান্নার ঠাকুর।

দিদি ডাকাডাকি করে মরে গেলেও কেউ আসবে না। আগে আগে দিদির কথামতো ওরা কাবুল-টাবুলকে ধরত। কিন্তু দু-চারবার ধরবার পর একদিন দেখা গেল গুলতির পাথর লেগে সীয়াশরণের কপাল ফুটো হয়ে গেছে। আরেক দিন দেখা গেল ঝিকমিকিয়া ঘুমিয়ে ছিল তখন তার চুলগুলো কেউ খুবলে কেটে নিয়েছে। আরেক দিন যুধিষ্ঠির তার টিনের স্যুটকেশ খুলে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে ফেলল। কে যেন তার সব কাপড়-চোপড় ফুটো ফুটো করে পুড়িয়ে রেখেছে। তারপর থেকে ওরা আর কাবুল-টাবুলের কাছে ঘেঁষে না।

যাই হোক কাবুল বলে, 'মা, তুমি আমাদের বাঁদর বললে? আমরা না তোমার ছেলে।'

দিদি সমানে চেঁচাতে থাকে, 'হ্যাঁ বললাম। আবার বলব—বাঁদর, বাঁদর, বাঁদর। মর তোরা, মর্—মর্—'

গোল চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে কাবুল। যেন ভীষণ অবাক হয়ে গেছে। তারপর বলে, 'মা হয়ে তুমি আমাদের মরতে বলছ!'

'হ্যাঁ, বলছি। তোরা মরলে আমার হাড় জুড়োয়, হাড় জুড়োয়—'

'আমরা কিন্তু মরব না মা; মরলে বাবা আর তুমি ভীষণ কাঁদবে।'

দিদির সরু গলা আরো চড়তে থাকে, 'দূর হ, দূর হ—চোখের সামনে থেকে এক্ষুণি বেরিয়ে যা,—বেরিয়ে যা—'

জোড়া আঙুল ফের মুখে পুরে ফ্যাল ফ্যাল করে মাকে দেখতে দেখতে টাবুলকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে চলে যায় কাবুল।

বাইরে গিয়ে ওরা কী করে জানো? প্রথমে কিছুক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ ওদের হয়ত চোখে পড়ল টেলিগ্রাফের তারে ঘুঘু কি শালিক বসে আছে। দু'জনের সঙ্গেই সবসময় গুলতি থাকে। তক্ষুণি সেগুলো বার করে ওরা পাখিগুলোকে তাক করে।

শালিক-টালিকদের পেছনে কিছুক্ষণ লেগে থাকার পর ওরা এবার চলে যায় 'হীরাপুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে'। সেখানে চারটে করে বড় বড় রাজভোগ্ আর দুটো করে তালশাঁস সন্দেশ খেয়ে দোকানদারকে বলে, 'দামটা বাবার কাছ থেকে চেয়ে নেবেন।'

মিষ্টির দোকান থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ওরা গিয়ে হাজির হয় 'গ্রেট ন্যাশনাল স্টোর্সে'। সেখান থেকে দু'জনে কাজু বাদাম কি বড় ক্যাডবেরি চকোলেট নিয়ে বলে, 'দামটা বাবা দিয়ে দেবে।'

জামাইবাবু হীরাপুরের নামকরা লোক। প্রত্যেক মাসে দুই ছেলের জন্য মিষ্টির দোকান, রেস্তোরাঁ, মনিহারি দোকান—মানে হীরাপুরে যত রকম খাবারের দোকান আছে সব জায়গায় কত টাকার বিল যে তাঁকে মেটাতে হয়।

যাই হোক চকোলেট চুষতে চুষতে দুই ভাই হয়ত চলে গেল সিনেমা হলের কাছে। সেখানে

মালীরা তাড়া করে আসে, 'ভাগো—ভাগো—'

এর মধ্যে আরো অনেক ছেলে জুটে গেছে। তাদের সঙ্গে দু'জনে হয়ত কিছুক্ষণ ডাংগুলি খেলল। এই করতে করতে স্কুলের সময় হয়ে যায়। যেদিন ইচ্ছা হয় বাড়ি ফিরে খেয়ে দেয়ে স্কুলে যায়। বেশির ভাগ দিন স্কুলে যেতে ইচ্ছে করে না। দুপুর পর্যন্ত ডাংগুলি খেলে বাড়ির পেছন দিকের পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢোকে। তখন সবার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে। ঝি ঝিকমিকিয়া, চাকর সীয়াশরণ আর ঠাকুর যুধিষ্ঠির নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। দুই ভাই কারোকে না জাগিয়ে সরু সিক দিয়ে রান্নাঘরের তালা খুলে ফেলে। তারপর ভাত-মাছ-ডাল-তরকারি-দুধ যা থাকে সব খেয়ে আবার পাঁচিল টপকে বেরিয়ে যায়।

দুপুরে বেরিয়ে কোনদিন তারা হয়ত চলে যায় মজুমদার সাহেবের বাংলোয়। জামাইবাবু যে কোম্পানিতে কাজ করেন মজুমদার সাহেব তার জেনারেল ম্যানেজার। তাঁর ভীষণ গোলাপ ফুলের শখ। কলকাতা থেকে দুজন মালী আনিয়ে বাড়ির সামনে সুন্দর একখানা গোলাপ-বাগান করিয়েছেন।

কাবুল মালীদের বলে, 'বাঃ, বিউটিফুল গোলাপ ফুটেছে তো। আমাদের ক'টা দাও না—'

মালীরা তাড়া করে আসে, 'ভাগো—ভাগো—'

'ফুল তা হলে দেবে না?'

'না। ভাগো বলছি—'

কাবুল আর কিছু বলে না। আঙুল চুষতে চুষতে তখন তার মাথায় একটা প্ল্যান এসে গেছে। প্ল্যানটা টাবুলের কানে ফিসফিস করে বলে দুটো লম্বা লাঠি যোগাড় করে আনে। তারপর সেই লাঠির মাথায় চকচকে ছুরি বেশ শক্ত করে বেঁধে দূর থেকে গোলাপ-বাগানের দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর যেই মালী দুটো একটু এদিক-ওদিক গেছে, অমনি বাগানের পাঁচিলে উঠে লাঠি বাড়িয়ে কচাকচ গোলাপ গাছগুলো কেটে পালিয়ে যায়।

একেক দিন তাদের ইচ্ছা হয় কলকাতায় বেড়াতে যাবে। যেই ইচ্ছাটি হল অমনি হীরাপুর স্টেশনে গিয়ে ইলেকট্রিক ট্রেনে চড়ে বসে। তোমাদের চুপিচুপি জানিয়ে রাখি, টিকিট-ফিকিট কাটার ধার তারা ধারে না।

এই রকম বেড়াতে গিয়ে একবার কাবুল-টাবুল ভীষণ মুশকিলে পড়ে গিয়েছিল। ট্রেনে যেতে যেতে হঠাৎ তারা খবর পেল পরের স্টেশনে 'মোবাইল চেক' বসেছে। 'মোবাইল চেক' ব্যাপারটা কী জানো? রেলের অনেক লোক আর পুলিস-টুলিস আগে ভাগে কিছু না জানিয়ে আচমকা এক

একটা স্টেশনে হানা দেয়। তারপর যেই ট্রেন থামে অমনি বিনা টিকিটের প্যাসেঞ্জারদের ধরে নিয়ে ফাইন করে। ফাইনের টাকা দিতে না পারলে জেল।

তখন বর্ষাকাল। রেললাইনের দুধার জলে থইথই করছে। কাবুল টাবুলের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কি একটা প্ল্যান দিল। তারপর দুজনেই সীট থেকে উঠে চলে গেল দরজার কাছে। ট্রেনের স্পীড যখন কমে এসেছে অমনি সেখান থেকে পাশের জলে ডাইভ দিয়ে পড়ল।

এইভাবে সারাদিন ঘুরে ঘুরে রাত্রিবেলা দুই ভাই বাড়ি ফিরে আসে। আর বাড়িতে ফিরলেই ওদের মা চিলের মতো চিৎকার শুরু করে দেয়, 'ওরে তোরা এখনও মরিস নি? কোথায় ছিলি সারাদিন? কোথায় ছিলি সারাদিন?' একদমে দুবার দুবার করে এক কথা সে বলে যেতে থাকে।

আর এই চেঁচামেচির মধ্যে জামাইবাবু কারখানা থেকে ফিরে আসেন। একবার দিদির দিকে আরেকবার কাবুল-টাবুলের দিকে তাকিয়ে ফ্যাক্টরির পোশাক না ছেড়েই গটগটিয়ে সোজা চলে যান পাশের একটা ঘরে। তিনি ফ্যাক্টরি থেকে ফেরার পথেই রোজ কাবুল-টাবুলের গোলাপ গাছ কাটা, মিষ্টির দোকানে রাজভোগ সন্দেশ খাওয়া, ট্রেনে করে কলকাতায় যাওয়া—এমনি যাবতীয় খবর পেয়ে যান।

পাশের ঘরটায় আছে তেল-পাকানো একজোড়া লিকলিকে বেত। সে দুটো এনে একটি কথাও না বলে সপাং সপাং করে কাবুলকে মারতে শুরু করে দেন; তার পিঠে দাগড়া দাগড়া বেতের দাগ ফুটে উঠতে থাকে।

আগেই তোমাদের বলেছি মারলে একটুও কাঁদে না কাবুল। জামাইবাবু যখন মারেন ফ্যাল ফ্যাল করে গোল চোখে সে তাকিয়ে থাকে। তাতে জামাইবাবুর রাগ আরো বেড়ে যায়।

কাবুলকে মারার পর টাবুলের পালা। কিন্তু টাবুলকে কোনদিন মারতে পারেন না জামাইবাবু। তার দিকে বেত তুললেই টাবুল গলা ফাটিয়ে চেঁচানি শুরু করে দেয়, 'মেরে ফেলল, মেরে ফেলল। পুলিস—পুলিস—'

তার চিৎকারে চারপাশের কোয়ার্টার আর বাংলো থেকে সব লোক দৌড়ে আসে। কাজেই মারটা আর হয়ে ওঠে না।

এইভাবে দিদি-জামাইবাবু কাবুল আর টাবুলের দিন কাটছে।

॥ দুই॥

তোমরা হয়ত পড়তে পড়তে ভাবছ আসল গল্পটা কখন শুরু হবে? ধুরন্ধর মাস্টারই বা আসছে না কেন?

আরেকটা দরকারী কথা আছে। সেটা বলেই গল্প আরম্ভ করব। এই দরকারী কথাটা না জানলে গল্পটা ভালো লাগবে না; তাই বলে নিচ্ছি।

তোমরা নিশ্চয়ই জানো, সব মা-বাবাই চান তাঁদের ছেলেরা অনেক—অনেক লেখাপড়া শিখুক। আমার দিদি-জামাইবাবুও তাই চান। কিন্তু দিদিটা ভীষণ ভোগে আর জামাইবাবুর একটুও সময়

নেই। তাই ওঁরা কেউ ছেলেদের পড়াশোনা দেখাতে পারেন না। কিন্তু ওদের মানুষ তো করতে হবে। কাবুল-টাবুল যখন বেশ ছোট তখন ওদের তিন বার তিন জায়গায় বোর্ডিং-এ পাঠিয়েছিলেন জামাইবাবু। একবার কার্শিয়াং-এ, একবার পুরুলিয়ায়, একবার কুচবিহারে। কার্শিয়াং-এ মাসখানেক থাকার পর রাত্রিবেলা পাঁচিল টপকে ওরা হীরাপুর পালিয়ে এসেছিল। পুরুলিয়ায় থাকার সময় ওখানকার রান্নার ঠাকুরকে এমন ভূতের ভয় দেখিয়েছিল যে আরেকটু হলে সে মরেই যেত। ধরা পড়ার পর কাবুল-টাবুলকে ওই বোর্ডিং-এর প্রিন্সিপ্যাল আর রাখেন নি। পুরুলিয়া থেকে ওরা কিভাবে এসেছিল জানো! ওখানকার হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্টকে রাত্রিবেলা ঘরে তালা আটকে দুই ভাই যাত্রা শুনতে গিয়েছিল। ফলে পরের দিনই ওদের হীরাপুর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

তিন জায়গা থেকে চলে আসার পর জামাইবাবু ওদের আবার ফেরত পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রত্যেকটা বোর্ডিং জানিয়ে দিয়েছে, 'আপনার ছেলে দুটি দাগী আম। এরা বোর্ডিং-এ থাকলে ঝুড়ির অন্য আমগুলোতে দাগ ধরিয়ে ছাড়বে। অতএব আমাদের ক্ষমা করুন।'

কেমন করে যেন কাবুল-টাবুলের ব্যাপারটা চারদিকে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। কোন বোর্ডিং-এ আর তাদের নিত না। এই ছেলেদের দায়িত্ব নিতে কেউ রাজী নয়।

তখন জামাইবাবু কি আর করেন, হীরাপুরের ইস্কুলেই কাবুল-টাবুলকে ভরতি করে দিয়েছেন আর বাড়িতে পড়াবার জন্য মাস্টারও ঠিক করে দিয়েছেন!

সে কি একটা-দুটো মাস্টার। এই ক'বছরে তিনশো মাস্টার এসেছে কাবুল-টাবুলকে পড়াতে। কিন্তু সাতদিনের বেশী কেউ টিকে থাকতে পারে নি।

তিনশো জনের মধ্যে দুশো পঁচাত্তর জনই পড়াতে এসে দেখেছে কাবুল বা টাবুল কেউ বাড়ি নেই। ছাত্রের সঙ্গেই যদি দেখা-টেখা না হয় কাকে পড়াবে? দিন সাতেক করে ঘোরাঘুরির পর ছাত্রদের মুখ যখন তারা দেখতে পেল না তখন নিজেরাই আসা ছেড়ে দিল। তবে ওদের মধ্যে বাকী পঁচিশ জন ছিল ভয়ানক নাছোড়বান্দা। তারা সারাদিন জোঁকের মতো বসে থেকে থেকে এক সময় না এক সময় কাবুল-টাবুলকে ধরে ফেলত। কিন্তু ধরলে হবে কি. তারাও সাত দিনের বেশী টিকে থাকতে পারে নি।

কাবুল মুখের ভেতর থেকে আঙুল বার করে কোন মাস্টারমশাইকে বলত, 'স্যার আপনি কতক্ষণ আমাদের জন্যে বসে আছেন?'

মাস্টারমশাই বলত, 'অনেকক্ষণ।'

'আপনি কিছু বুঝতে পারেন নি?'

'কি বুঝব?'

'আমরা পড়ব না।'

'পড়ব না মানে?'

'পড়াশোনা করতে আমাদের ভালো লাগে না।'

'কি করে ভালো লাগাতে হয়, আমি জানি। যাও বই নিয়ে এসো।'

গোল গোল চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কাবুল বই নিয়ে আসত। তার সঙ্গে টাবুলও।

দশ মিনিট পড়ার পর কাবুল হয়ত বলত, 'মাস্টারমশাই থুথু ফেলতে যাব?'

'যাও—'

থুথু ফেলে লক্ষ্মী ছেলের মতোই ফিরে আসত কাবুল। তারপর পড়াশোনা শেষ হলে মাস্টারমশাই যেই জুতো পরতে গিয়ে দেখতে পেত ব্লেড দিয়ে সেটা কেটেকুটে শেষ করে রাখা হয়েছে। কাটা জুতো হাতে নিয়ে সেই যে সে চলে যেত আর কখনও ফিরত না।

আরেক জন নাছোড় মাস্টার ছিল; তাকে কিছুতেই তাড়াতে পারছিল না কাবুলরা। তখন দূর থেকে দুই ভাই ঠাঁট ঠাঁই করে দুবার গুলতি ছুড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারের শিরদাঁড়ার দু জায়গায় আট্রিল গুলির মতো ফুলে উঠেছিল। সেই গুলিদুটো পিঠে নিয়ে সেই যে মাস্টার ছুটল, আর কখনো কাবুল-টাবুলের বাড়ি আসে নি।

একজন মাস্টার ছিল ভীষণ রাগী। একদিন কাবুল-টাবুলকে ধরে পড়াতে পড়াতে কি জন্য যেন খুব রেগে গিয়েছিল। ডান হাতটা তুলে যেই সে বলেছে, 'মারব এক চড়—' অমনি গোল চোখে তার দিকে তাকিয়ে থেকে কাবুল কপালের সেই উঁচু ঢিবিদুটো দিয়ে মেরেছিল এক ঢুঁ। তক্ষুণি মাস্টার দরজার ভেতর দিয়ে উড়ে গিয়ে পড়েছিল বাংলোর বাইরে। ভয়ে চোখদুটো মালপোর মতো করে একবার কাবুলদের দেখেই দিয়েছিল পেল্লায় লং জাম্প। তারপর লং জাম্পের পর লং জাম্প মেরে একেবারে উধাও হয়ে গেছে।

এইভাবে কাবুল আর টাবুল বাকী মাস্টারদেরও ভাগিয়েছে।

যে মাস্টার একবার পালায় সে গিয়ে কাবুল-টাবুল যে কি ভয়ংকর শয়তান ছেলে সে খবরটা আরো দশজন মাস্টারকে জানিয়ে দেয়। ফলে পরের দিকে আর মাস্টার পাওয়া যাচ্ছিল না। ওদের নাম শুনলেই মাস্টাররা ঘুমের ঘোরে আঁতকে আঁতকে উঠত।

বাড়িতে পড়াবার লোক নেই; স্কুলে একদিন গেলে সাত দিন যায় না। দুই ভাই মনের আনন্দে রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছিল।

দিদি খুবই চেঁচামেচি করে। জামাইবাবু রাত্তিরে বাংলোয় ফিরে সপাং সপাং করে কাবুলকে রোজকার বরাদ্দ দশ ঘা করে বেত মারেন। কিন্তু এসব তারা গ্রাহ্য করে না।

॥ তিন ॥

শেষ পর্যন্ত কী হত বলা যায় না। কিন্তু এবার হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষার পর সব গোলমাল হয়ে গেল।

প্রত্যেক বার পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুলে স্কুলের মাস্টারমশাইরা কাবুল-টাবুলকে প্রগ্রেস রিপোর্ট দিয়ে দেন। এবার কিন্তু দেওয়া হল না। হেডমাস্টারমশাই নিজে দুই ভাইয়ের প্রগ্রেস রিপোর্ট নিয়ে রাত দশটার সময় এসে জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা করলেন। কেননা দশটার আগে এলে তাঁকে ধরা যাবে না।

প্রগ্রেস রিপোর্ট দুটো জামাইবাবুর হাতে দিয়ে হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'দেখুন আপনার ছেলেরা কী রেজাল্ট করেছে।'

জামাইবাবু দেখলেন দুই ছেলে বাঙলা, অঙ্ক, ইংরেজি, ইতিহাস—সবগুলো সাবজেক্টেই গোল্লা পেয়েছে। দুই ভাইয়েরই টোটাল নম্বর হল শূন্য।

হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'কুড়ি বছর হেড মাস্টারি করছি কিন্তু কেউ টোটালে শূন্য পেয়েছে এই প্রথম দেখলাম। আপনার ছেলেদের মতো প্রতিভাবান ছেলে আগে আর কখনও চোখে পড়েনি। দেশের মুখ ওরা উজ্জ্বল করবে।'

শুনতে শুনতে জামাইবাবুর গম্ভীর মুখ আরো গম্ভীর হয়ে যেতে লাগল।

হেডমাস্টারমশাই আবার বললেন, 'আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি।'

জামাইবাবু জানতে চাইলেন, 'কী কথা?'

'হাফ ইয়ার্লিতে যা হবার হয়ে গেছে। কিন্তু অ্যানুয়াল পরীক্ষায় পাস করতে না পারলে ওদের স্কুলে রাখা যাবে না। একেক ক্লাসে দু-বছর তিন বছর করে থাকছে। অন্য ছেলেদের কাছে এটা একটা খারাপ দৃষ্টান্ত। আমার কথা জানিয়ে দিয়ে গেলাম। এবার ছেলেদের সম্বন্ধে কী করবেন, সেটা আপনি ভেবে দেখুন।'

হেডমাস্টারমশাই চলে যাবার পর পুরো দেড় ঘণ্টা আগুনের মতো মুখ করে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন জামাইবাবু। প্রথমে ভাবলেন কাবুলটার বেতের বরাদ্দ আজ থেকেই বাড়িয়ে ডবল করে দেবেন; টাবুলটা 'পুলিস পুলিস' বলে চেঁচালেও এবার থেকে তার জন্যও বেতের দাওয়াই শুরু করতে হবে। কিন্তু পরে ঠিক করে ফেললেন, না, মার নয়। একজন ভালো বাড়িতে পড়াবার মাস্টার যোগাড় করতে হবে। আগের তিনশো মাস্টারও ভালোই ছিল, কিন্তু সে শুধু ভালো হলে চলবে না, জবরদস্ত মাস্টার চাই। বাড়িতে পড়াবার কড়া লোক না থাকলে ছেলে দুটো কিছুতেই পাস করতে পারবে না। আর পাস না করলে হেডমাস্টারমশাই তাড়িয়ে দেবেন। তখন ওদের কোথায় ভরতি করবেন?

কিন্তু কাবুল-টাবুল যা সব দারুণ দারুণ কীর্তি করে রেখেছে তাতে হীরাপুরের দশ মাইলের ভেতরকার কোন মাস্টার পাওয়া যাবে না। মাস্টার আনতে হবে বাইরে থেকে।

অনেক ভেবেচিন্তে জামাইবাবু ঠিক করলেন, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। তক্ষুণি বিজ্ঞাপনটা লিখে ফেললেন। ক্লাস সিক্স এবং ক্লাস ফোরের দুটি ছাত্রের জন্য একজন দুঃসাহসী, দুর্দান্ত এবং প্রচণ্ড গৃহশিক্ষক চাই। ছেলে দুটি এবারকার হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষায় সব বিষয়ে গোল্লা পাইয়াছে। তাহাদের অ্যানুয়েল পরীক্ষায় পাস করাইতে হবে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে ছেলে দুটি অতীব বিচ্ছু এবং হাড়ে হাড়ে বজ্জাত। তাহারা বেশির ভাগ সময় বাড়ির বাহিরে থাকে। তাহাদের ধরিয়া আনিয়া পড়াইতে হবে। এ জন্য গৃহশিক্ষকের দৌড়, লং জাম্প, হাই জাম্প ইত্যাদি ব্যাপারে যথেষ্ট পারদর্শী হওয়া চাই। আরো একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, ছেলে দুটিকে পড়াইতে হইলে প্রাণের ভয় আছে। এর আগে তিনশো জন

মাস্টার তাহাদের হাতে ঘায়েল হইয়া পলাইয়া গিয়াছে। জীবন মৃত্যুকে যাঁহারা পায়ের ভৃত্য করিতে পারেন তাঁহারাই শুধু আবেদন করিবেন। আমার চিঠি পাইলে আগামী দোসরা আগস্ট হইতে আটই আগস্টের মধ্যে বিকাল চারটা হইতে ছ'টার ভিতর নীচের ঠিকানায় দেখা করিতে হইবে। পারিশ্রমিক যোগ্যতা অনুযায়ী। ভবদীয়, যোগেশচন্দ্র মজুমদার। কোয়ার্টার নম্বর-আট, হীরাপুর।

বিজ্ঞাপনটা পরের দিনই কলকাতায় খবরের কাগজে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তার পরের দিন সেটা ছাপা হয়ে গেল। আর ছাপা হতে না হতেই ঝাঁকে ঝাঁকে দরখাস্ত আসতে লাগল। বাঙলাদেশে এত লোক যে প্রাণের ভয় করে না, এটা জেনে জামাইবাবু ভারী খুশী হলেন।

কিন্তু মাস্টার দরকার একজন। এই সব দরখাস্ত থেকে পছন্দমতো লোকটিকে খুঁজে বার করতে হবে। বুঝতেই পারছ, সেটা খুব সোজা কাজ নয়।

জামাইবাবু জুলাই মাসের কুড়ি তারিখ থেকে আগস্টের আট তারিখ পর্যন্ত ছুটি নিলেন। আগে আর কখনও একসঙ্গে এত লম্বা ছুটি তিনি নেন নি।

ছুটি নিয়ে দরখাস্তগুলো তিনি পড়ে ফেললেন। তাদের ভেতর দশজনকে তাঁর পছন্দ হল। জামাইবাবু যা যা চেয়েছেন, দরখাস্ত পড়ে মনে হল সেই সব গুণ ওই দশ জনের মধ্যে রয়েছে।

তবে অনেকে নিজের কথা তো বাড়িয়ে বলে। তাই জামাইবাবু ভাবলেন ওদের সঙ্গে কথা বলে, নানারকম পরীক্ষা নিয়ে যাকে সব চাইতে সেরা মনে হবে তাকেই কাবুল-টাবুলের জন্য মাস্টার রাখবেন। দশ জনের নামে তিনি চিঠি পাঠিয়ে দিলেন। তারপর ওদের পরীক্ষা নেবার জন্য তৈরী হতে লাগলেন।

এ ব্যাপারে বাড়িতে যেন একটা সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। ঝি-চাকর-ঠাকুর, এমন কি আমার বারো মাস অসুখে-ভোগা দিদিও ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। শুধু কি এ বাড়িরই, গোটা হীরাপুরেই সাড়া পড়ে গেছে।

কাবুল-টাবুলদের বাড়ির সামনে একটা ছোট মাঠ আছে। জামাইবাবু আর চাকর সীয়াশরণ চক খড়ি দিয়ে সেখানে দুশো মিটার দৌড়ের ট্রাক বানালেন। মাটি কুপিয়ে লং জাম্পের জমি তৈরি করা হল। পোল ভল্ট আর হাই জাম্পের জন্য পোস্ট পোঁতা হল, ওয়েট লিফটিং-এর জন্য আনা হল ভারী ভারী চাকতি।

খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে মুখে আঙুল পুরে গোল গোল চোখে বাবার কাণ্ডকারখানা দেখে যায় কাবুল। তার পাশে টাবুলও। টাবুল একটু ভয় পেয়েছিল। সে বলে, 'কী হবে রে দাদা?'

মুখে আঙুল রেখেই জড়িয়ে জড়িয়ে কাবুল বলে, 'আসুক না নতুন মাস্টার, ঠিক উড়িয়ে দেব। তুই ভয় পাস না টেবলো।'

দাদার ওপর টাবুলের অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু এবার তার ভয়টা পুরোপুরি কাটতে চায় না।

যাই হোক আগস্ট মাসের দু তারিখ এসে গেল। জামাইবাবু যাদের চিঠি পাঠিয়েছেন তাদের দুজন আজ আসবে।

ঠিক হয়েছে কথাবার্তা যা বলার সামনের ওই মাঠে বসেই হবে; পরীক্ষা-টরীক্ষাও নেওয়া হবে ওখানেই।

চারটে থেকে কাজ শুরু হওয়ার কথা। তার এক ঘণ্টা আগে ঝিকিমিকিয়া জায়গাটা পরিষ্কার করে দিল; সীয়াশরণ চেয়ার টেবল পেতে রাখল। জামাইবাবু খাকি হাফ প্যান্ট আর শার্ট পরে, পায়ে সাদা স্পোর্টিং শু লাগিয়ে, পকেটে হুইসিল নোট বুক আর স্টপ ওয়াচ নিয়ে একটা চেয়ারে গিয়ে বসে রইলেন। দিনরাত যে দিদি খাটে পড়ে চেঁচায় তাকেও আজ আর ঘরে রাখা গেল না; একটা ইজি চেয়ারে শুইয়ে মাঠে নিয়ে যাওয়া হল।

কি করে যেন খবরটা হীরাপুরে ছড়িয়ে গিয়েছিল। গাদা গাদা লোক চারপাশে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। সেই তিনশো মাস্টারের কানেও খবরটা পৌঁছেছিল; তারাও সব কাজকর্ম ফেলে চলে এসেছে। সবারই দারুণ উৎসাহ।

বেশ কিছুটা দূরে কাবুল আর টাবুল পাশাপাশি দুটো নারকোল গাছে চড়ে এদিকে তাকিয়ে রয়েছে।

ঠিক চারটের সময় জামাইবাবুর চিঠি নিয়ে দুজন এসে হাজির হল। একজনের নাম রণদুর্মদ সিংহ, আরেক জন কার্তবীর্যার্জুন চট্টরাজ। রণদুর্মদের চেহারাটা প্রকাণ্ড। মহাভারতে ঘটোৎকচের ছবি তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো; অনেকটা সেই রকম। কার্তবীর্যার্জুন লম্বা সিড়িঙ্গে; তার গলা জিরাফের মতো।

জামাইবাবু প্রথমে রণদুর্মদকে ধরলেন। বললেন, 'আপনি তো গ্র্যাজুয়েট—'

রণদুর্মদ বাজখাঁই গলায় বললেন, 'নিশ্চয়ই। এই যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট।'

'ঠিক আছে। আপনার বুকের ছাতি ক' ইঞ্চি?'

'আটচল্লিশ—'

জামাইবাবু নোট বই বার করে রণদুর্মদের নাম লিখে তার তলায় টুকতে টুকতে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাইসেপ?'

রণদুর্মদ বলল, 'বাইশ।'

'উরু?'

'আটত্রিশ।'

ফিতে দিয়ে বুকটুক মেপে জামাইবাবু বললেন, 'প্রাণে ভয় নেই তো?'

কথাটা শুনে যেন অবাক্ হয়ে গেল রণদুর্মদ, 'ভয়! জানেন একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে শুধু দুটো আছাড় দিয়ে ভবলীলা শেষ করে দিয়েছিলাম।'

'আমার ছেলে দুটো কিন্তু ভয়ানক হারামজাদা।'

'চিন্তার কিছু নেই। আমার হাতে ছেড়ে দিন; চিবিয়ে খেয়ে ফেলব।'

নারকেল গাছে বসে টাবুল বলল, 'দাদা, আমাদের চিবিয়ে খাবে বলছে।'

কাবুল বলল, 'বলুক; উড়িয়ে দেব।'

এধারে আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর জামাইবাবু বললেন, 'এবার মাঠে চলুন; দু-একটা পরীক্ষা দিতে হবে।'

রণদুর্মদ বলল, 'চলুন—'

মাঠে এসে প্রথমে ওয়েট লিফটিং দিয়ে শুরু হল। জামা জুতো খুলে স্রেফ মালকোচা মেরে হালকা একটা পালকের মতো সাড়ে তিন মণ লোহার চাকতি তুলে ঘুরে ঘুরে চারদিকের জনতাকে দেখাতে লাগল রণদুর্মদ। সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের ভিতর থেকে সবাই চটর পটর করে হাততালি দিয়ে উঠল।

ওয়েট লিফটিং-এর পর রণদুর্মদকে নিয়ে আসা হল দৌড়ের জায়গায়। যেখান থেকে দৌড় শুরু হবে সেখানে রণদুর্মদ রেডি হয়ে দাঁড়াল; যেখানে শেষ হবে সেখানে মুখে হুইসিল আর হাতে স্টপ ওয়াচ নিয়ে দাঁড়ালেন জামাইবাবু।

একটু পর হুইসিলের শব্দ হতেই রণদুর্মদ ছুটতে শুরু করল। অত বড় শরীর নিয়ে দৌড়ুনো সোজা কথা নয়; দুশো মিটার পেরুতে তার আট মিনিট লেগে গেল। চারপাশের লোকেরা কিন্তু এবার হাততালি দিল না।

দৌড়ের পর লং জাম্প। রণদুর্মদ রেগে গিয়ে বলল, 'আমি কি ক্যাঙারু যে লাফাব? আমি সিংহ—'

জামাইবাবু বললেন, 'কিন্তু বিজ্ঞাপনে লং জাম্পের কথা লেখা আছে।'

'থাক লেখা—'

অতএব বুঝতেই পারছ রণদুর্মদ নাকচ হয়ে গেল।

এবার কার্তবীর্যার্জুনের পালা। তার বুক, বাইসেপ ইত্যাদি মেপে মাঠে নিয়ে আসা হল। দারুণ দৌড়ুতে পারে সে। দু মিনিটে দুশো মিটার পার হয়ে গেল। লং জাম্প দিল উনিশ ফুট, হাই জাম্প সাড়ে ছ'ফুট, পোল ভল্ট ষোল ফুট। কিন্তু দেড় মণ ওয়েট তুলতে গিয়ে কোমরের হাড় গেল পটাস করে ভেঙে। সে-ও নাকচ হয়ে গেল।

পরের দিন থেকে সাতই আগস্ট পর্যন্ত আরো সাত জন এল। তাদের কেউ ভালো দৌড়ুতে পারে তো লং জাম্প পারে না, লং জাম্প পারে তো ওয়েট লিফটিং-এ গোলমাল করে ফেলে। এই করে করে মোট ন'জনই বাতিল হয়ে গেল।

জামাইবাবু ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। সবাই যদি নাকচ হয়ে যায় কাবুল-টাবুলের জন্য কাকে রাখবেন? এখন একজনই শুধু বাকী। দেখা যাক সে কী করে। জামাইবাবুর মতো দিদি, সীয়াশরণ, ঝিকমিকিয়া আর যুধিষ্ঠিরও একই কথা ভাবতে লাগল। শুধু কি ওরাই, হীরাপুরের সব লোকও তা-ই ভাবছে।

শেষ দিনে মানে আগস্ট মাসের আট তারিখে জামাইবাবুর বাংলোর সামনের মাঠটায় ভীষণ ভিড় হল। গোটা হীরাপুর এবং তার চারপাশের যত লোকজন সবাই সেখানে ভেঙে পড়েছে। কাবুল-টাবুলদের আগের তিনশো মাস্টারও এসেছে। এ ক'দিন নারকোল গাছে চড়ে কাবুল-টাবুল

সব কাণ্ড-কারখানা দেখে গিয়েছিল। আজও তারা সেই গাছ দুটোতে উঠেই বসে আছে।

বেলা দুটো থেকে সবাই দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছিল। কাঁটায় কাঁটায় যখন চারটে বাজল তখন শেষ লোকটি এল। তার নাম ধুরন্ধর সামন্ত।

ধুরন্ধরের চেহারাখানা দেখবার মতো। ছ ফুট লম্বা, চৌকো মুখে লাল করমচার মতো চোখ, ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ান বক্সার মহম্মদ আলির মতো কদমছাঁট চুল। হাতে-পায়ে লোহার গুলির মতো মাস্‌ল্‌!

সে পরে এসেছে একটা টাইট হাফ প্যাণ্ট আর হাতাওলা একটা গেঞ্জি। পায়ে মোজা এবং সাদা ধবধবে কেডস। তার বুকে আর পিঠে আটাত্তরটা মেডেল ঝুলছে। ধুরন্ধরের দু হাতে ছিল দুটো ঢাউস সুটকেস।

জামাইবাবু খুব খাতির করে ধুরন্ধরকে একটা চেয়ারে বসালেন। তারপর বললেন, 'আপনার কদ্দুর পড়াশোনা?'

ধুরন্ধর বলল, 'বি-কম পাস।' বলেই একটা সুটকেস খুলে তাড়াতাড়ি সার্টিফিকেট বার করে দেখাল।

জামাইবাবু খুশী হয়ে বললেন, 'গুড!' তারপর ধুরন্ধরের বুক আর পিঠের দিকে আঙুল বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এই মেডেলগুলো কিসের?'

ধুরন্ধর বলতে লাগল, 'নানারকম কম্পিটিসনে জিতে এগুলো পেয়েছি। দশটা পেয়েছি দৌড়ের জন্য, বারোটা পোল ভল্টের জন্য, আটটা লং জাম্পের জন্য, আঠারোটা হাই জাম্পের জন্য, পনেরটা ওয়েট লিফটিং-এর জন্য, ছ'টা প্যারালাল বারের কসরতের জন্য, চারটে রাইফেল সুটিং-এর জন্য, পাঁচটা সাঁতারের জন্য।' নামতা পড়ার মতো গড়গড়িয়ে বলে গিয়ে একটু থামল সে। তারপর দম নিয়ে আবার শুরু করল, 'এ ছাড়া এই দেখুন—' যে সুটকেসটা থেকে বি-কমের সার্টিফিকেট বার করেছিল সেটা থেকে একশো সাঁইত্রিশটা মানপত্রও বার করল। সেগুলো দেখাতে দেখাতে ধুরন্ধর বলতে লাগল, 'মেডেল ছাড়া এগুলোও পেয়েছি—'

জামাইবাবু দেখলেন, পুরুলিয়া থেকে পশ্চিম দিনাজপুর, দার্জিলিং থেকে মেদিনীপুরের মধ্যে যত ক্লাব আর সংঘ আছে সব জায়গা থেকে বক্সিং লড়ে, দৌড়ে, সাঁতরে ঐ মেডেলগুলো বাদেও এই সব মানপত্র বাগিয়েছে ধুরন্ধর। তাঁর মন বলতে লাগল, এত দিনে আসল লোককে পেয়েছি।

ওদিকে চারপাশের ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন আচমকা চেচিয়ে উঠল, 'ধুরন্ধর সামন্ত—'

সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার গলায় চিৎকার উঠল, 'জিন্দাবাদ!'

'ধুরন্ধর সামন্ত—'

'জিন্দাবাদ!'

নারকোল গাছের মাথায় বসে টাবুল বলল, 'কত মেডেল আর মানপত্র দেখেছিস দাদা! এবার আমরা গেছি।'

মুখ থেকে আঙুল বার করে কাবুল বলল, 'থাক মেডেল আর মানপত্র; উড়িয়ে দেব।'

এধারে মনে মনে জামাইবাবু যা-ই ভেবে থাকুন সব রকম পরীক্ষা না নিয়ে ছাড়বেন না। তিনি বললেন, 'আপনার মাস্‌ল্‌গুলো একটু দেখব ধুরন্ধরবাবু।'

ধুরন্ধর সামন্ত উঠে দাঁড়িয়ে সারা গায়ের মাস্‌ল্‌ ফুলিয়ে দাঁড়াল। জামাইবাবু টিপে টিপে ভারী খুশী হলেন। চটপট ফিতে দিয়ে বুকের ছাতি, বাইসেপ ইত্যাদির মাপ নিয়ে টকাটক নোট বইতে টুকে নিলেন। তারপর বললেন, 'আমার ইচ্ছে, দুশো মিটার দৌড়টা যদি আমাদের একটু দেখান—'

'নিশ্চয়ই।' মেডেলগুলো খুলে রেখে ধুরন্ধর জামাইবাবুর সঙ্গে দৌড়ের জায়গায় এল।

জামাইবাবু স্টপওয়াচ রেডি রেখে হুইসিল বাজাতেই বন্দুকের গুলির মতো ধুরন্ধর দুশো মিটার দৌড়ে পার হয়ে গেল। ঘড়িতে দেখা গেল মোটে দেড় মিনিট সময় লেগেছে। জামাইবাবুর মতো গম্ভীর রাশভারী লোকও চারদিকের জনতার দিকে ঘুরে ঘুরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'শুনুন আপনারা, ধুরন্ধরবাবু দেড় মিনিটে দুশো মিটার ক্রস করেছেন।'

অমনি চিৎকার উঠল, 'ধুরন্ধর সামন্ত—'

'জিন্দাবাদ—'

এরপর পোল ভল্টে আঠার ফুট ডিঙিয়ে গেল ধুরন্ধর, লং জাম্পে পেরুল বাইশ ফুট আর হাই জাম্পে ছ' ফুট দু ইঞ্চি।

একেকটা পরীক্ষা শেষ হয় অমনি চারদিক থেকে সবাই জয়ধ্বনি দিতে থাকে, 'ধুরন্ধর সামন্ত—'

'জিন্দাবাদ।'

নারকোল গাছের মাথায় বসে টাবুল ভয়ে ভয়ে বলল, 'এবার আমরা গেছি রে দাদা—'

মুখ থেকে আঙুল বার করে কাবুল বলল, 'যতই মেডেল দেখাক আর হাই জাম্প লং জাম্প করুক—উড়িয়ে দেব।'

এধারে পরীক্ষা টরীক্ষা হয়ে যাবার পর ধুরন্ধর বলল, 'আর কী টেস্ট দিতে হবে বলুন—'

জামাইবাবু বললেন, 'আর কিছু নয়। এতেই আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি।'

'কিন্তু আমার আরো অনেক কোয়ালিফিকেসন রয়েছে যে।'

'আর দরকার নেই।'

আসলে এত গুণওলা মানুষ আগে আর কখনও দ্যাখেন নি জামাইবাবু। খুব সম্মান করে ধুরন্ধরকে কাছে বসিয়ে গদগদ গলায় তিনি বললেন, 'আপনার ব্যাপার-ট্যাপার দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। মনে হচ্ছে এতদিন আপনার মতো একজনকেই চাইছিলাম। শুধু আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

ধুরন্ধর বলল, 'করুন।'

'আপনার প্রাণের ভয় নেই তো?'

ধুরন্ধর গম্ভীর চালে একটু হাসল। তারপর বলল, 'আপনাকে একটা খবর দিতেই ভুলে গেছি।

আমি একসময় সার্কাসের দলে ছিলাম। চারটে সিংহ নিয়ে দু-হাতে খেলা করেছি। এর থেকে কি মনে হয় আমার প্রাণের ভয় আছে! হুঁ-হুঁ—'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

'আপনাকে আরেকটা কথা জানিয়ে রাখছি।'

'কী?'

'নিজেকে বাঁচাতে আমি জানি।' বলেই দু নম্বর সুটকেসটা খুলে পুরু চামড়ার একটা জামা বার করল, আর বার করল ঐ মাপেরই লোহার একটা জামা। তোমরা নিশ্চয়ই জানো, আগেকার দিনে যোদ্ধারা লড়াই করবার জন্য বর্ম পরত! এ দুটো সেই রকম বর্ম। এ ছাড়া মাউন্টেড পুলিসরা

জামাইবাবু বললেন, 'আমি চমৎকৃত হয়ে গেছি মশাই।'

যেরকম হেলমেট মানে লোহার টুপি পরে সেই রকম একটা টুপিও এনেছে ধুরন্ধর। আর এনেছে লোহার নাল বসানো জুতো, চামড়ার দস্তানা ইত্যাদি ইত্যাদি নানারকম সরঞ্জাম।

জামাইবাবু এত সব ব্যাপার দেখে অবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন।

ধুরন্ধর প্রথমে চামড়ার জামাটা তুলে বলল, 'ছেলেটা যদি তীর কি বর্শা চালায় তা হলে আমাকে এটা পরে নিতে হবে।' লোহার জামা আর টুপিটা দেখিয়ে বলল, 'ওরা যদি বন্দুক চালায় এগুলো পরে নেব। আশা করি কিছুরই দরকার হবে না। আমার নাম ধুরন্ধর সামন্ত। হুঁ—হুঁ—' নাকের ভেতর ঘুঁত ঘুঁত শব্দ করে সে হাসল।

জামাইবাবু বললেন, 'আমি চমৎকৃত হয়ে গেছি মশাই। আপনার হাতে ছেলে দুটোকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব; ওদের মা'র হাড় জুড়োবে।' বলেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে সবাইকে জানিয়ে দিলেন, 'আজ থেকে শ্রীধুরন্ধর সামন্তর হাতে আমার দুই ছেলে কাবুল এবং টাবুলের লেখাপড়ার দায়িত্ব দিলাম।'

অমনি সবাই চেঁচিয়ে উঠল, 'ধুরন্ধর সামন্ত—'

'জিন্দাবাদ!'

'ধুরন্ধর সামন্ত—'

'জিন্দাবাদ।'

আজ আট বছর অসুখে ভুগছে দিদি। এর মধ্যে কেউ তার হাসি দ্যাখে নি। এতদিন পর দিদির মুখে হাসি ফুটল। আর জামাইবাবু এরকম একজন মাস্টার পেয়ে এত খুশী হয়েছেন যে

সীয়াশরণকে বাজারে পাঠিয়ে পঞ্চাশ টাকার তুবড়ি, উড়ন তুবড়ি, দোদমা, হাউই, এমন কি ছুঁচো বাজি পর্যন্ত আনালেন। সন্ধ্যের পর এই উপলক্ষে বাজি পোড়ানো হবে।

চারপাশের লোক হইচই করছে; সবার মুখে ধুরন্ধরের প্রশংসা। এরকম গুণের মাস্টার কেউ কখনও দ্যাখেনি। কাবুল-টাবুলদের আগে যারা পড়াত সেই তিনশো জন মাস্টার একে একে ধুরন্ধরকে অভিনন্দন জানিয়ে গেল। তারা প্রত্যেকে বলল, 'আমরা পারিনি, কিন্তু বুঝতে পারছি আপনি পারবেন। না পারার জন্য লজ্জায় আমরা এতদিন মুখ লুকিয়ে থাকতাম। আপনি মাস্টার কুলের মুখ উজ্জ্বল করুন, তাদের সম্মান বাঁচান—'

বর দেবার মতো করে ধুরন্ধর বলল, 'আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।' বলেই হঠাৎ কী মনে পড়তে জামাইবাবুর দিকে ফিরে বলল, 'ভালো কথা, আমার ছাত্রদুটিকে তো দেখালেন না? তারা কোথায়?'

তক্ষুণি কাবুল-টাবুলের খোঁজ পড়ল। সবাই মিলে চারদিকে খোঁজাখুঁজি করতে করতে আচমকা ঝিকমিকিয়ার চোখে পড়ে গেল। আঙুল বাড়িয়ে দূরের নারকোল গাছ দুটো দেখিয়ে সে বলল, 'ওই যে—'

জামাইবাবু তাদের নামিয়ে আনতে যাচ্ছিলেন, ধুরন্ধর হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, 'নামাতে হবে না। আমি এখান থেকেই দেখে নিচ্ছি।' বলে পুরো পাঁচ মিনিট কাবুল-টাবুলের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মুগ্ধ গলায় বলল, 'আমি এইরকম ছাত্রই পছন্দ করি।'

দেখতে দেখতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জামাইবাবু নিজের হাতে বাজি পোড়াতে শুরু করলেন।

বাজিটাজি পোড়াবার পর সবাই এক এক করে চলে গেল। ধুরন্ধরও গেল। ঠিক হল পরের দিন থেকে সে পড়াতে আসবে। রোজ বিকেল পাঁচটায় আসবে সে।

।। চার ।।

কাবুল যতই সাহস দিক টাবুল কিন্তু ধুরন্ধরের কাণ্ডকারখানা দেখে ভেতরে ভেতরে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। পরের দিন সে কাবুলকে বলল, 'কী হবে রে দাদা? এই মাস্টারটাকে তুই তাড়াতে পারবি না। এবার থেকে আমাদের পড়তেই হবে।'

কাবুল আঙুল চুষছিল। মুখ থেকে আঙুল বার করে বলল, 'দ্যাখ না কী করি। তিনশো মাস্টারকে তাড়িয়েছি; এটাকে কি আর পারব না! খুব পারব।'

'ধুরন্ধর মাস্টার আসবে পাঁচটার সময়। আমরা তখন কি বাড়ি থাকব, না পালাব?'

'না, পালাব না। বাড়িতে থেকেই ওকে চ্যালেঞ্জ করব।'

ঠিক পাঁচটার সময় ধুরন্ধর এল। কাবুল-টাবুল বাড়িতেই ছিল। ছেলেদের বাড়িতে দেখে দিদি ভীষণ খুশী। সে ভাবল, ধুরন্ধরের ভয়েই ওরা লক্ষ্মী ছেলে হয়ে বাড়িতে বসে আছে। ভাবল, নতুন মাস্টারের কাছে ট্যাঁ-ফোঁ চলবে না।

যাই হোক পড়ার টেবলে বসে প্রথমে ছাত্রদের নাম, কে কোন ক্লাসে পড়ে, এইসব জেনে

নিল ধুরন্ধর। তারপর বলল, 'প্রথমেই বলে রাখছি তোমরা যেরকম ইচ্ছে বজ্জাতি করতে পার কিন্তু আমার সঙ্গে পারবে না। তোমরা যদি ডালে ডালে যাও আমি যাব পাতায় পাতায়। হুঁ—হুঁ, আমার নাম ধুরন্ধর সামন্ত—' বলেই করমচার মতো চোখ দুটো বনবন করে ঘুরিয়ে কাবুল আর টাবুলকে মোট বাইশ বার করে দেখে নিল।

কাবুল টাবুল কিছু বলল না।

ধুরন্ধর এবার বলল, 'তা হলে লেখাপড়ার শুরু করা যাক।'

আঙুল খেতে খেতে গোল চোখে তাকিয়েছিল কাবুল। আঙুল বার করে সে বলল, 'মাস্টারমশাই একটা কথা বলব।'

'একটা কথাই বলবে। তার বেশী নয়।'

'আমাদের লেখাপড়া করতে ইচ্ছে করে না।'

'কেন?'

'অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস—এইসব বাজে জিনিস মাথায় ঢুকিয়ে কী লাভ?'

মেঘডাকা গলায় ধুরন্ধর বলল, 'ঢোকাতে হবে। বই খোল—'

গোল চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কাবুল বই খুলল। খানিকক্ষণ পর তার মাথায় একটা প্ল্যান এসে গেল। ধুরন্ধরের জুতোটাকে কেটে রেখে আসবে। এভাবে আগেও সে একটা মাস্টারকে তাড়িয়েছিল। সে বলল, 'মাস্টারমশাই একটু জল খেয়ে আসব।'

ধুরন্ধর কি বুঝল সে-ই জানে। বলল, 'যেতে হবে না।' সীয়াশরণ কাছেই ছিল, তাকে এক গেলাস জল এনে দিতে বলল ধুরন্ধর।

প্রকাণ্ড গেলাসে করে জল এনেছিল সীয়াশরণ। ধুরন্ধর বলল, 'খাও—'

জল তেষ্টা সত্যি সত্যি পায় নি কাবুলের। গোল চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে জলটা কষ্ট করেই তাকে খেয়ে ফেলতে হল।

বাইরে বেরুবার প্রথম প্ল্যানটা নষ্ট হবার কিছুক্ষণ পর কাবুলের মাথায় আরেকটা মতলব এসে গেল। সে এবার বলল, 'মাস্টারমশাই বাথরুমে যাব।'

ধুরন্ধর বলল, 'ঠিক আছে চল।' বলে টাবুলের দিকে ফিরল, 'তুমিও চল।' দুজনকে সঙ্গে নিয়েই বাথরুমের কাছে এল।

কাবুল ভাবতে পারেনি, ধুরন্ধর তার সঙ্গে আসবে। মনমরা হয়ে সে বাথরুমের ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

টাবুল খুব অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। সে বলল, 'আমাকে নিয়ে এলেন কেন স্যার?'

'কাবুলের সঙ্গে আমি এলাম। সেই ফাঁকে তুমি যদি পালাতে! হুঁ-হুঁ, আমি ধুরন্ধর সামন্ত।'

এরপর কেউ আর কিছু করল না; রাত ন'টা পর্যন্ত ঘাড় গুঁজে দুই ভাইকে পড়তে হল।

পরের দিন ধুরন্ধর আসবার আগে টাবুল আবার বলল, 'চল দাদা, মাস্টারটা আসবার আগে পালাই।'

বাঘের মতো গর্জন করে উঠল সে, 'দাঁড়াও—' [পৃ. ২৮১

কাবুলের কেমন গোঁ চেপে গিয়েছিল। সে বলল, 'উঁহু চ্যালেঞ্জ দিয়েছি না—'

ঠিক পাঁচটার সময় ধুরন্ধর এসে আজ পড়াতে বসালে কাবুল বলল, 'মাস্টারমশাই সত্যি সত্যি বলছি আমাদের পড়তে ভালো লাগে না।'

ধুরন্ধর বলল, 'একটি কথা নয়; বই বার কর।'

কাবুল বই বার করল না; গোল চোখে তাকিয়ে আঙুল চুষতে লাগল। কাবুল কী ভাবছে, তার চোখমুখের দিকে তাকিয়েই বলে দিতে পারে টাবুল। টাবুল আচমকা চেঁচিয়ে উঠল, 'মাস্টারমশাই—'

ধুরন্ধর জিজ্ঞেস করল, 'কী হল?'

'দাদার ভীষণ রাগ; ও কিন্তু ঢুঁ মারে।' বলেই টাবুল কাবুলের কপালে শিং-এর মতো টিবি দুটো দেখিয়ে দিল।

আড়চোখে একবার টিবি দুটো দেখে ধুরন্ধর হুংকার ছাড়ল, 'বই বার কর—'

তার কথা শেষ হতে না হতেই গায়ের সবটুকু জোর দিয়ে ধুরন্ধরের মাথায় ঢুঁ মারল কাবুল। কিন্তু কী আশ্চর্য, ধুরন্ধরকে এক চুল নড়ানো গেল না।

এদিকে টাবুল চেঁচিয়ে উঠল, 'দাদা তোর শিং দুটো কোথায় রে?'

তাড়াতাড়ি কপালে হাত দিয়ে চমকে উঠল কাবুল। ধুরন্ধরকে গুঁতো মেরে তার লাভ হয়েছে এই, শিং দুটো মাথার ভেতর ঢুকে গেছে। এরকম ব্যাপার আগে আর কখনও ঘটেনি; এবার সে বেশ ভয় পেয়ে গেল। গোল চোখে এক পলক তাকিয়ে থেকে খুব তাড়াতাড়ি বই বার করে ফেলল।

ঘুঁত ঘুঁত করে একটু হেসে ধুরন্ধর বলল, 'হুঁ-হুঁ বাবা, আমার নাম ধুরন্ধর সামন্ত।'

তার পরের দিন কাবুল আর টাবুল ঠিক করে ফেলল, ধুরন্ধর যখন তাদের পড়াতে আসবে, রাস্তায় কোথাও তারা লুকিয়ে থাকবে। তারপর ধুরন্ধরকে দেখলেই গুলতি ছুড়বে।

প্ল্যান ঠিক করে পাঁচটার একটু আগে আগে কাবুল আর টাবুল রাস্তার ধারের একটা ঝাঁকড়া গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইল। তারপর যেই ধুরন্ধরকে আসতে দেখা গেল অমনি তার মাথায় টিপ করে দুই ভাই গুলতি ছুড়ল।

গুলতির পাথর দুটো লাগলও ঠিক। কিন্তু দুই ভাই যা দেখল তাতে ভয়ে তাদের চোখ একেবারে ছানাবড়া হয়ে গেল। গুলতির পাথর দুটো ধুরন্ধরের মাথায় লেগে ভেঙে একেবারে

গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। আবার তারা গুলতি ছুড়ল। পাথরগুলো আবার ধুলো হয়ে গেল। তখন তারা ঠিক করল আর দাঁড়ানো ঠিক হবে না; পালাতে হবে।

কিন্তু পালাতে গিয়েও পালানো গেল না। ধুরন্ধর তাদের দেখতে পেয়েছে। বাঘের মতো গর্জন করে উঠল সে, 'দাঁড়াও—'

কাবুল-টাবুল আর পা তুলতে পারল না; পাথরের স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে রইল।

একটু পর কাবুল-টাবুলকে নিয়ে বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে ঘুঁত ঘুঁত করে তার মার্কামারা হাসিটা হাসল ধুরন্ধর, 'হুঁ-হুঁ, আমার নাম হল ধুরন্ধর সামন্ত। আমার সঙ্গে কোন চালাকি চলবে না।'

॥ পাঁচ ॥

আগেই বলেছি গুলতির পাথর গুঁড়ো হতে দেখে কাবুল ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিল। পরের দিন সে ভাবল আর চ্যালেঞ্জে দরকার নেই; ধুরন্ধর যখন আসবে তখন বাড়িতেই থাকবে না।

প্ল্যানটা মাথায় আসার পরই তারা বাড়ি থেকে হাওয়া হয়ে গেল।

ঠিক পাঁচটার সময় আজ ধুরন্ধর এসে দেখল কাবুল-টাবুল নেই। সে দিদিকে জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কোথায়?'

দিদি সরু গলায় চিৎকার জুড়ে দিল, 'বোধহয় পালিয়েছে। ক'টা দিন ঠিক ঠিক পড়ছিল। তারপর আজ সকাল থেকে দুটোতে কি যে গুজগুজ করে পরামর্শ করল; তারপর বেরিয়ে গেল। আমার মনে হচ্ছে আপদ দুটো পড়ার সময় আর ফিরবে না।'

'ঠিক আছে, আপনি ভাববেন না।' বলেই বেরিয়ে গেল ধুরন্ধর। আধ ঘণ্টা খোঁজাখুঁজি করে সে দেখল একটা প্রকাণ্ড পুকুরের পাড়ের মস্ত উঁচু দুটো নারকোল গাছের ডগায় দুই ভাই বসে আছে।

কাবুল-টাবুলও ধুরন্ধরকে দেখতে পেয়েছিল। তারা ওপর থেকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দেখিয়ে বলল, 'আমরা আজ আর নামছি না। এবার থেকে পড়ার সময় আমরা এখানে বসে থাকব।'

ধুরন্ধর কিছুক্ষণ ওদের দেখল। তারপর বাংলোয় ফিরে সট সট করে চাবি দুটো আর শার্টটা খুলে মালকোঁচা মেরে আবার নারকোল গাছের তলায় ফিরে এল।

কাবুল-টাবুল ভেবেছিল ধুরন্ধর আর ফিরবে না। তাকে আবার দেখে ওরা অবাক্ হল কিন্তু ঘাবড়াল না। বুড়ো আঙুল নাচিয়ে দেখাতে লাগল।

কিন্তু দুজনের চারটে বুড়ো আঙুল নাচতে নাচতে হঠাৎ থেমে গেল। তারা দেখল ধুরন্ধর কাঠবেড়ালীর মতো নারকোল গাছ বেয়ে ওপরে উঠে আসছে। দেখতে দেখতে কাবুল-টাবুলের চোখ এক টাকা সাইজের রাজভোগের মতো হয়ে গেল।

যখন দেখা গেল ধুরন্ধর তাদের কাছাকাছি এসে গেছে তখন দুজনেই নারকোল গাছের ডগা থেকে পাশের পুকুরটায় দিল লাফ। ধুরন্ধরও এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল না। সেও চ্যাম্পিয়ন সাঁতারুদের মতো ডাইভ মারল।

জলে লাফ দিয়ে কাবুল আর টাবুল এক ডুব সাঁতারে একেবারে পুকুরের ওপারে গিয়ে উঠল।

ভুস করে দুজনেই এক জায়গায় মাথা তুলেছে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে জলের ভেতর দিয়ে এতটা আসার জন্য তারা হাঁপিয়ে গিয়েছিল। জোরে জোরে হাঁপাতে হাঁপাতে তারা চারদিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু ধুরন্ধরকে কোথাও দেখা গেল না।

টাবুল জিজ্ঞেস করল, 'মাস্টারমশাইও তো জলে লাফ দিয়েছিল। কোথায় গেল রে?'

কাবুল বলল, 'বোধহয় পাঁকের ভেতর ঢুকে গেছে।'

কাবুলের কথা শেষ হল কি হল না, সেই সময় তাদের দুজনের মাঝখানে শুশুকের মতো মাথা তুলে দাঁড়াল ধুরন্ধর। চোখের কোণ দিয়ে একবার একে একবার ওকে দেখে নিয়ে ঘুঁত ঘুঁত করে একটু হাসল, 'হুঁ-হুঁ, আমার নাম ধুরন্ধর সামন্ত।' বলেই দুজনের হাত ধরে একরকম উড়িয়েই বাড়িতে নিয়ে এল।

এরপর কাবুল-টাবুলের মনে আর শান্তি নেই। কে জানত ধুরন্ধর তাদের মতেই গাছ বাইতে পারে!

কিন্তু ধুরন্ধর যতই ওস্তাদ হোক পড়াশোনা করা তো আর চলতে পারে না।

পরের দিনও কাবুল-টাবুল পাঁচটার সময় বাড়ি থাকল না। ওরা প্ল্যান করল, বাইরে গিয়ে গাছের মাথায় না পুকুরেও না, মাটির ওপরেই ঘুরে বেড়াবে। জলে বা অন্তরীক্ষে ধুরন্ধরের সঙ্গে পারা যাবে না। ডাঙায় থাকলে ওকে দেখলেই দৌড়ে পালানো যাবে।

এদিকে পাঁচটার সময় ধুরন্ধর এসে দিদিকে জিজ্ঞেস করল, 'আছে?' আছে মানে কাবুল-টাবুল বাড়িতে রয়েছে কিনা।

দিদি সরু গলায় চেঁচিয়ে গেল, 'ও দুটো কি পড়ার সময় বাড়িতে থাকে?'

ধুরন্ধর আর কিছু বলল না। সট সট করে চটি খুলে পাঞ্জাবি খুলে মালকোঁচা মেরে বেরিয়ে পড়ল। তারপর এধার ওধার খোঁজাখুঁজি করতেই সিনেমা হলের কাছে দু'জনকে দেখতে পেল। ধুরন্ধরকে দেখেই দু'জনে লাগালো ছুট। ধুরন্ধর কাকে ধরবে প্রথমটা ঠিক করতে পারল না। তারপর কি ভেবে কাবুলের পেছনে দৌড়ল। রাস্তা আর মাঠ পেরিয়ে দুজনে ছুটছে তো ছুটছেই। ডগ রেসের মতো দৌড় চলছে তো চলছেই। এদিকে চারদিকে লোকজন জমা হয়ে গেছে। তারাও সঙ্গে সঙ্গে চলেছে আর চিৎকার করছে, 'চীয়ার আপ ধুরন্ধর সামন্ত, চীয়ার আপ—'

উৎসাহ দেবার জন্য কেউ কেউ কাবুলকেও বলছে, 'চীয়ার আপ কাবুল, চীয়ার আপ—'

মিনিট পনের দৌড়বার পর কাবুলকে ক্যাঁক করে ধরে ফেলল ধুরন্ধর। তারপর হিড়হিড় করে বাড়িতে টেনে এনে জিভ বার করে আধ ঘণ্টা হাঁপাল। তারপর কাবুলকে বসিয়ে রেখে টাবুলের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণের মধ্যে হীরাপুরের লোকেরা দেখল, উঁচু পুলের ওদিকটায় টাবুল আগে আগে দৌড়চ্ছে, তার পেছন পেছন ধুরন্ধর। হাজার হাজার লোক তাদের সঙ্গে দৌড়তে দৌড়তে বলতে লাগল, 'চীয়ার আপ ধুরন্ধর সামন্ত—'

'চীয়ার আপ টাবুল—'

আধ ঘন্টা ডগ রেসের পর টাবুলকেও ধরে ফেলল ধুরন্দর। তাকে টানতে টানতে বাড়ি নিয়ে

এসে দেখল এই ফাঁকে কাবুল পালিয়ে গেছে। একটু কি ভেবে নিয়ে ধুরন্ধর টাবুলকে বলল, 'ঠিক আছে। একলা তোমাকে আর পড়াব না; আজ তোমার ছুটি। কাল কী করা যায় দেখা যাক।'

পরের দিন একটা বড় চটের ব্যাগে করে ভারীমতো কি যেন নিয়ে পড়াতে এল ধুরন্ধর। ব্যাগটা রেখে সে দিদিকে জিজ্ঞেস করল, 'আছে?'

দিদিও সরু গলায় সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'ওই আপদ দুটো পড়ার সময় কি আজকাল বাড়ি থাকে?'

সটাসট চটি আর পাঞ্জাবি খুলে মালকোঁচা মেরে বেরিয়ে গেল ধুরন্ধর। একটু পর আগের দিনের মতোই সিনেমা হলের কাছে ডগ রেস শুরু হয়ে গেল। আগে কাবুল, পেছনে ধুরন্ধর। তাদের পেছনে হীরাপুরের কয়েক হাজার লোক। কিছুক্ষণ পর তাকে ধরে বাড়িতে নিয়ে এল ধুরন্ধর। চটের ব্যাগটা থেকে তিরিশ ফুট লম্বা একটা লোহার শেকল বার করে একটা দিকের আংটা কাবুলের পায়ে আটকে দিল, আরেকটা দিক জানালার সঙ্গে জড়িয়ে তালা মারল। তারপর কিছুক্ষণ জিরিয়ে চলে গেল টাবুলের খোঁজে। কালকের মতো আজও উঁচু পুলের দিকে কিছুক্ষণের মধ্যে দৌড়-কম্পিটিশন শুরু হল। আগে আগে টাবুল, পেছনে ধুরন্ধর, তাদের পেছনে জনতা।

একসময় টাবুলকে ধরে এনে চটের থলে থেকে আরেকটা লোহার শেকল বার করে তাকেও কাবুলের মতো বেঁধে ফেলল ধুরন্ধর। চোখের কোণ দিয়ে একবার একে একবার ওকে দেখে নিয়ে গম্ভীর চালে ঘুঁত ঘুঁত করে একটু হেসে বলল, 'হুঁ-হুঁ আমার নাম ধুরন্ধর সামন্ত।' তারপর আধ ঘণ্টা জিরিয়ে বাথরুমে চলে গেল। তারপর স্নান-টান করে ফিটফাট হয়ে চা-টা খেয়ে দুজনকে পড়াতে বসাল।

এরপর থেকে এভাবেই কাবুল-টাবুলকে ধরে এনে দিনের পর দিন শেকলে আটকে পড়াশোনা চলছে।

কেউ যদি ধুরন্ধরকে জিজ্ঞেস করে, 'কিরকম মাইনে টাইনে পান?'

ধুরন্ধর বলে, 'তিনশো টাকা।'

অবাক হয়ে সেই লোকটা বলে, 'ক্লাস সিক্স আর ক্লাস ফোরের দুটো ছেলেকে পড়াতে তিনশো টাকা নেন?'

'শুধু পড়াবার জন্যে তো না।'

'তবে?'

ধুরন্ধর তখন বলে, 'ধরবার জন্য আড়াইশো আর পড়াবার জন্য মাত্র পঞ্চাশ।'

তোমরা যারা এই গল্পটা পড়লে, তারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝতে পেরেছ লেখাপড়া ব্যাপারটা খুব সহজ নয়।

প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্ অর্জুন মিত্র মিশরের এক পার্বত্য গুহার অভ্যন্তর থেকে আবিষ্কার করলেন একটি কফিনে রক্ষিত প্রাচীন মিশরীয়দের মমি –
আশ্চর্য্য! এযে দেখছি একটা মমির আধার!
দিলীপ দাস
মমি রহস্য

স্থানীয় লোকেরা বাধা দিয়ে বলল
ওটা নিয়ে যাবেন না স্যার! আপনার আগে অনেকে অনেক চেষ্টা করেও কফিনটা স্থানচ্যুত করতে পারেনি।
কিন্তু আমি ওটা নিয়ে যাবই

সকলের কথায় কর্ণপাত না করে মমি শুদ্ধ কফিনটা বাইরে নিয়ে আসেন

ঠিক এমন সময় হঠাৎ শুরু হল প্রচণ্ড ভূমিকম্প
পালাও জীন খেপেছে!

মুহূর্তে সব ওলটপালট করে দিয়ে আবার সব শান্ত হয়ে গেল। এতে দলের লোকেরা বেশ ভীত হয়ে পড়ল
উফ্ না:, আমরা এ কাজ করতে পারব না।
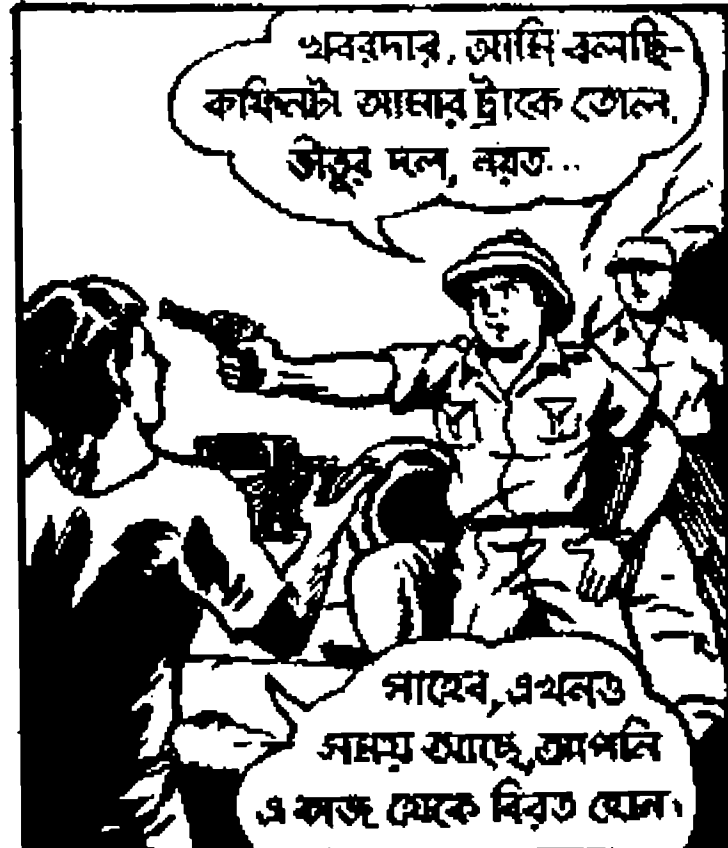
খবরদার, আমি বলছি- কফিনটা আমার ট্রাকে তোল, ভীতুর দল, নয়ত...
সাহেব, এখনও সময় আছে, আপনি এ কাজ থেকে বিরত হোন।

অবশেষে কফিনটা নিয়ে স্বদেশাভিমুখে রওনা দিল অর্জুন —

কিছুদূর অগ্রসর হবার পর
স্যার, দেখুন!
গরিলা!

সারা পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে, এক বিশালাকায় গরিলা

মিশরের এই পার্বত্য প্রদেশে গরিলা এলো কোথা থেকে!

একি, রিভলবারের গুলিতে ওর কিছুই হচ্ছে না!

আমাদের পিছু হটা ছাড়া কোন উপায় নেই!

সাবধান! পিছনে খাদ...!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খাদে গড়িয়ে পড়ে ট্রাকটা—

তোমার কি খুব বেশী লেগেছে?
না স্যার, ঠিক আছি

স্যার কফিনটা নেই!
সেই সঙ্গে গরিলাটাও বেপাত্তা
আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে কেউ কি এই ঘটনাটিকে বিশ্বাস করবে?
শেষ

আগমনী

—শ্রীরাজারাম চৌধুরী

আজিকে শারদ প্রভাতে
আগমনী তার ডঙ্কা বাজায়
শিউলি ফুলের শোভাতে।
আকাশে তার পরশ লাগে
বাতাস মোহময়
ফসল ক্ষেতের সোনার হাসি
সদাই জেগে রয়।

এমন দিনে আসছে মাগো
সবাই মোরা খুশী
ভাবছি বসে কেমন করে
তোমায় যাব তুষি
জানি না ত মন্ত্র তোমার
কিসে পূরবে আশা
দশ হাতে পারব দিতে
নিছক ভালবাসা।

● যার কাজ তারে সাজে—
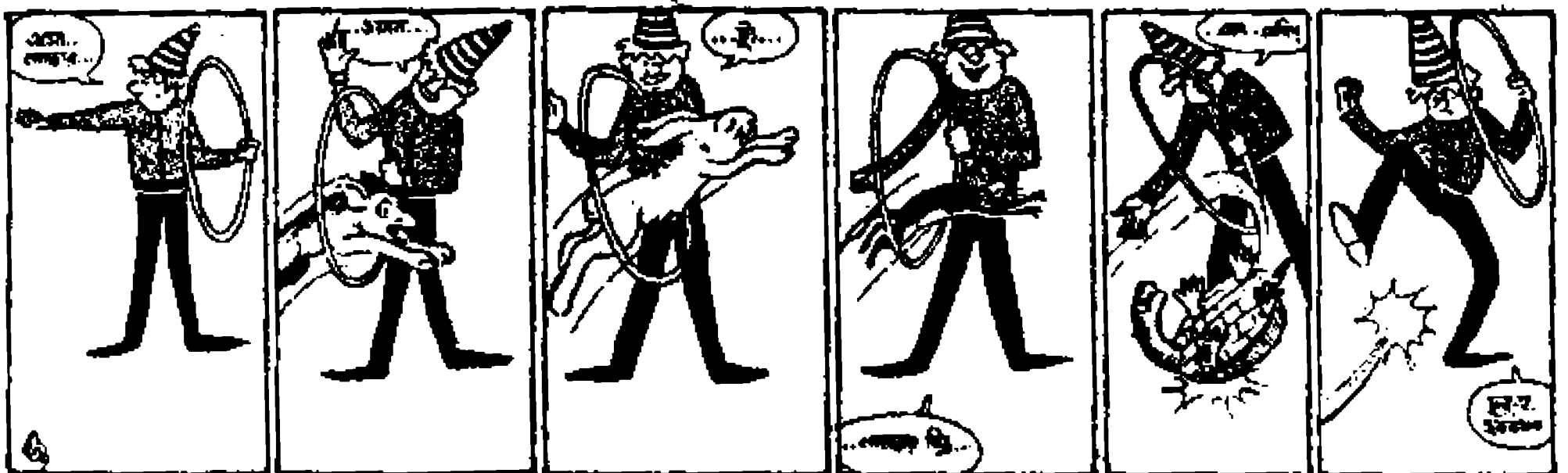
মহারাজের দরবার

—বনফুল

মহারাজের দরবারের কথা বেশী লোকে জানে না। আমার বাবা তাঁর ঠাকুরদার কাছে এ দরবারের কথা শুনেছিলেন। আমি শুনেছি আমার বাবার কাছ থেকে। বাবা বলেছিলেন তাঁর ঠাকুরদা নাকি স্বচক্ষে এ দরবার দেখেছিলেন। ঘনা গ্রামে আগে আমাদের বাড়ি ছিল। তার পাশে প্রকাণ্ড মাঠ ছিল একটা। সেখানে মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে মহারাজের দরবার বসত। জমজমাট দরবার। বহু মশাল জ্বলত। মখমলের বিরাট গালিচা পাতা হোত। গালিচার উপর পাতা হোত মহারাজের সিংহাসন। স্বর্ণ-খচিত সিংহাসন। তার উপর থাকত বিরাট রাজছত্র। মহারাজের দাড়ি ছিল, গোঁফ তো ছিলই। মুখখানা সিংহের মতো। তিনি কিন্তু রাজার মতো পোশাক পরতেন না। একটা ধপধপে সাদা উড়ুনি গায় দিয়ে সিংহাসনে বসতেন। বাবার ঠাকুরদা বলেছিলেন উড়ুনিও হয়তো গায়ে দিতেন না তিনি, কিন্তু তাঁর সমস্ত বুকে ছিল লোমের জঙ্গল। বাবার ঠাকুরদা বলতেন সেইটে ঢাকবার জন্যে উড়ুনি গায়ে দিতেন তিনি। দামী কাপড়-চোপড়ের দিকে মোটেই ঝোঁক ছিল না। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন ও অঞ্চলে। সবাই তাঁর ভয়ে থরথর করে কাঁপত। দেখতেও যেমন সিংহের মতো, গলার স্বরও সিংহের মতো। এক দাবড়ানিতে কাঁপিয়ে দিতেন চারদিক। খুব রাশভারী লোক ছিলেন। কিন্তু যেদিন তিনি দরবার করতেন সেদিন তিনি দয়ার অবতার। যে যা চাইত তাই দিতেন তাকে।

দরিদ্ররা টাকা পেত, প্রচুর খেতে পেত, কাপড়-জামা পেত। দরবারের পাশেই দরিদ্র ভোজনের বিরাট আয়োজন থাকত। গুণীরাও সম্মানিত হতেন। দরবারে বড় বড় ওস্তাদরা আসতেন, বাইজীরা আসতেন, কবিরাও আসতেন। সকলকে পুরস্কৃত করতেন মহারাজা। বাবার ঠাকুরদা বড় সেতারী ছিলেন, তাঁর তবলচী ছিলেন তুফান আলী। দুজনেই মহারাজের দরবারে বাজিয়ে ছিলেন। বাজিয়ে দুজনেই দুটো দামী শাল আর একশো এক মোহর উপহার পেয়েছিলেন নাকি।

এসব অনেকদিন আগেকার কথা। মহারাজের অনেক দিন আগে মৃত্যু হয়েছে। আমরাও ঘনা গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছি অনেকদিন আগে। আমি সেখানে যাই নি কখনও। আমাদের এক দূরসম্পর্কের আত্মীয় থাকতেন সেখানে। বাবা তাদের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন মাঝে মাঝে।

বাবা একটা আশ্চর্য কথা বলেছিলেন। এখনও নাকি মহারাজের দরবার বসে। একবার তিনি অন্ধকার রাতে ঘনা গ্রামে তাঁর আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। নৌকো থেকে নেমে পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে ঘনা গ্রামে পৌঁছতে হয়। বাবা অন্ধকারে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল গ্রামের একটি লোক। বাবা জিজ্ঞেস করলেন—'ওখানে কি হচ্ছে?'

মহারাজের দরবার বসেছে। ওদিকে যাবেন না। ও দরবার মাঝে মাঝে বসে। তারপর আপনি মিলিয়ে যায়।

বাবা বললেন—'চল না, একটু এগিয়ে দেখি—'

'ও ভুতুড়ে কাণ্ড মশাই। যাবেন না—'

'দেখিই না—'

'তবে আপনি যান, আমি চললাম।'

বাবা সেই আলোকিত দরবারের দিকে এগুতে লাগলেন। কিন্তু সরে সরে যেতে লাগল সেটা। কিছুতেই তার কাছে আর পৌঁছতে পারলেন না বাবা। শেষে মিলিয়ে গেল সেটা।

এ গল্প বাবার মুখ থেকে শুনেছিলাম। এও অনেকদিন আগেকার কথা। আমার বাবা ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে মারা গেছেন। আমি ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের কথা বলছি। তখন আমার বয়স বত্রিশ বছর। এম. এ. পাস করে ভ্যারাণ্ডা ভেজে বেড়াচ্ছি। চারটি বোনের বিয়ে দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছি। কলকাতায় বাবা যে বাড়িটি করেছিলেন সেটি বিক্রি করতে হয়েছে। আমি নিঃস্ব অবস্থায় এক দূরসম্পর্কের পিসীর বাড়িতে আছি। তাঁর এক বোম্বেটে ছেলেকে পড়াই। আর দিনরাত চেষ্টা করি কি করে একটা চাকরি জোটে। কিছুতেই জুটছিল না। আমার মুরুব্বি আমার বাবার বন্ধু সনাতনবাবু। তিনি মাড়োয়ারি মহলে ফাটকা খেলে বেড়ান। মাড়োয়ারি বন্ধুও আছে অনেক। তিনি হঠাৎ একদিন বললেন—'তুই যদি পাঁচ হাজার টাকা যোগাড় করতে পারিস তাহলে রামঅওতারবাবুর গদিতে তোকে কেশিয়ার (Cashier) করে দিতে পারি। পাঁচ হাজার টাকা জমা না দিলে ও চাকরি তাঁরা দেবেন না। তাঁদের কেশিয়ারটি মারা গেছেন। তাঁরা একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজছেন। আমি বললে তোর চাকরিটি হয়ে যাবে। তুই পাঁচ হাজার টাকা যোগাড় কর—। মাইনে দুশো টাকা। ভালো চাকরি। রামঅওতার সুতোর ব্যবসা করে। খুব ভালো লোক।'

স্বপ্নে খেরোর থলি দেখেছিলাম ঠিক সেই রকম থলি সনাতনবাবুর হাতে। [পৃ. ২৯০

আমার হাতে তখন পাঁচটি টাকাও নেই। পাঁচ হাজার টাকা কোথায় পাবো। ধারের চেষ্টা করতে লাগলাম। আমাকে ধারই বা দেবে কে। অত টাকা ধার দেবার মত বন্ধুও আমার ছিল না। একজন ছিল। তাকে বললাম, মাসে একশ টাকা করে দিয়ে শোধ করে ফেলব। সে মিছে কথা বলল—এখন আমার হাতে অত টাকা নেই। একজন কুশীদজীবী বললেন, গহনা বন্ধক না রাখলে তিনি টাকা দেবেন না। বাবার বন্ধু সনাতনবাবুকে বললাম। তিনি বললেন—'মহারাজের দরবার থাকলে পেতিস টাকা। কিন্তু সেসব দরবার আর নেই। মহারাজের দরবারের গল্পটা জানিস তো?'

'জানি।'

সেদিন রাতে যখন শুলাম তখন

মহারাজের দরবারের কথাই বারবার মনে পড়তে লাগল। বাবার কাছে যে সব গল্প শুনেছিলাম, তাই মনে পড়তে লাগল। মনে হোল সত্যি কি মহারাজের দরবার ছিল?

ভোরের দিকে স্বপ্ন দেখলাম একটা—যেন আমি মহারাজের দরবারে গেছি। চারিদিকে মশালের আলো। কোথাও অন্ধকার নেই। রাজছত্রের তলায় বসে আছেন সিংহ-প্রতিম মহারাজ। তাঁর সামনে একজন ওস্তাদ দরবারী কানাড়া আলাপ করছেন। অনেক লোক নিস্তব্ধ হয়ে শুনছে। মাঠের একধারে ভুরিভোজন হচ্ছে। সারি সারি লোক খাচ্ছে। দীয়তাং ভুজ্যতাং কাণ্ড। আর একটু দূরে দুজন পালোয়ান কুস্তি লড়ছে। চারদিক কিন্তু নীরব নিস্তব্ধ। ওস্তাদজির ডানদিকে সারি সারি বসে আছে প্রার্থীর দল। তাদের মধ্যে আমিও আছি। ওস্তাদজির আলাপ যখন শেষ হল, তখন আমি এগিয়ে গিয়ে অভিবাদন করে বললাম—আমার পাঁচ হাজার টাকার নিতান্ত প্রয়োজন। টাকা জমা না দিলে চাকরি হবে না। মহারাজ ইঙ্গিত করলেন। তাঁর নায়েব প্রকাণ্ড একটা খেরোর থলি আমার হাতে এনে দিলেন। খুব ভারী।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল সনাতনবাবুর ডাকে।

'উঠে পড়। বেরালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে গেছে। তোমার নামে একটা লটারির টিকিট কিনেছিলাম। পেয়ে গেছি পাঁচ হাজার টাকা। নিয়ে এসেছি টাকাটা। চল রামঅওতারের কাছে যাই।'

সবিস্ময়ে দেখলাম স্বপ্নে যে খেরোর থলি দেখেছিলাম ঠিক সেই রকম থলি সনাতনবাবুর হাতে। তিনি আমার বিমূঢ় দৃষ্টি দেখে বললেন—'পরশু দিন চেক পেয়েছিলাম। কাল ক্যাশ করিয়ে নগদ টাকা এনেছি। রামঅওতার নগদ টাকাই পছন্দ করে। চল—'

আমার মনে হল এ টাকা মহারাজের দরবার থেকেই এসেছে।

● **কাজের ছেলে—**
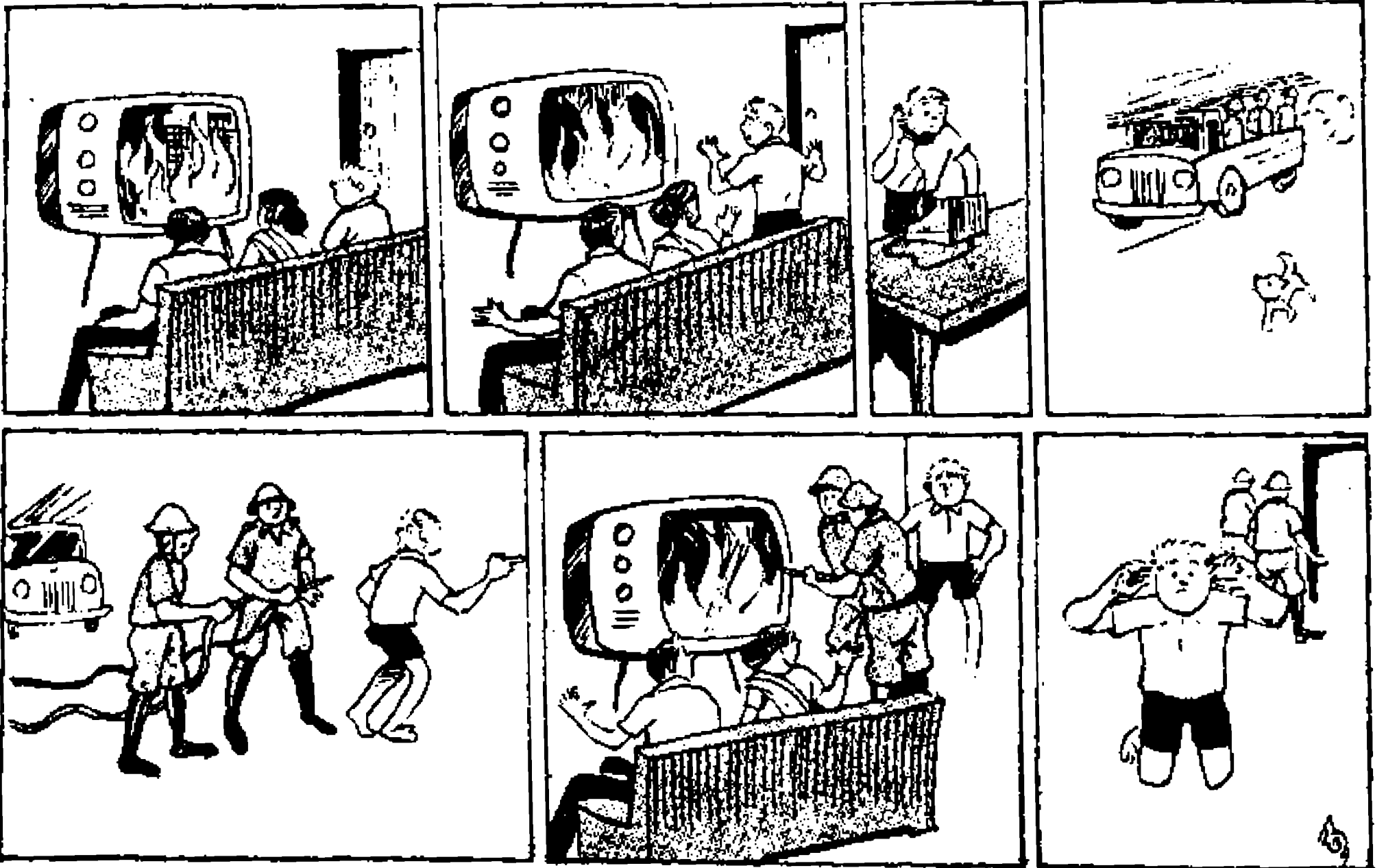
—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

কথায় বলে দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বোঝে না। আমাদেরও সেই দশা এখন। যে দাঁতের জোরে আমাদের এত কড়কড়ানি সেটা যে নিজেদের দোষে এভাবে উপড়ে যাবে, কেউ ভাবিনি। টুপ করে খসেই পড়ল যে একেবারে।

আজ চৌদ্দ পনের দিন হয়ে গেল আমাদের সামনের ওই উঁচু টিপির আসন খালি। ওখানে একজনেরই বসার অধিকার সেটা নিজেদের অগোচরেই মেনে নিয়েছি আমরা। বলাবাহুল্য সে-অধিকার পিন্‌ডিদার। পিন্‌ডিদা অনায়াসে একদিন যেমন ওই উঁচু আসনটি দখল করেছিল তেমনি অনায়াসেই অর্থাৎ কোনরকম পিছু-টান না রেখেই যেন ওটা ছেড়ে চলে গেল। পূর্ণিমার আকাশে চাঁদ নেই আর বর্ধমানের বাবুগঞ্জের মাঠের ওই টিপির আসনে পিন্‌ডিদা নেই—তফাৎ নেই খুব। এ-যেন আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি এখন।

ব্রেজিল ফুটবলে একদা বিশ্ব-একাদশের সব থেকে সেরা বাছাই ফরওয়ার্ড প্রদীপনারায়ণ দত্ত, অন্যথায় পি-এন্-ডি—এককথায় শতসহস্র উল্লসিত শ্বেতাঙ্গ-কণ্ঠের 'পিন্‌ডি' হাঁটুর মালাই-চাকি ভেঙে সমস্ত ব্রেজিলকে কানা করে দিয়ে এমনি নিঃশব্দেই উধাও হয়ে ভারতের মাটিতে এসে পা ফেলেছিল। আর তারপর আমাদেরই বরাত জোরে পশ্চিম বাংলার এই বর্ধমানের বাবুগঞ্জের পাকা বাসিন্দা হয়েছিল। কিন্তু অতবড় ভাগ্যের কতটুকু দাম আমরা দিলাম? পিন্‌ডিবিহীন সেই ব্রেজিল শহরের হাহাকারের গল্প শুনে মুচকি হেসেছিলাম আমরা। তার আসার নামেই গোটা ব্রেজিল নাকি শোকের

মেঘে ঢেকে গেছল। আর তারপর দিকে দিকে হাজার হাজার মেয়ে পুরুষের শ্লোগান উঠেছিল, নো পিন্‌ডি, নো ফুটবল, নো ব্রেজিল! পিন্‌ডি ছাড়া চলবে না—চলবে না! ফুটবল জাদুকরকে জাতীয় সম্মান দিয়ে ধরে রাখতে হবে, রাখতেই হবে! আকাশ-ফাটা সেই শ্লোগানে কানের পর্দা ঝাঁজরা হবার ভয়ে সেখানকার সর্বস্তরের হোমরাচোমরারা এসে পিন্‌ডিদার হাতে পায়ে ধরাধরি।—পিন্‌ডি তুমি ব্রেজিলের গৌরব, ব্রেজিলের গর্ব—তোমার হাঁটুর মালাই-চাকি ভেঙেছে, কিন্তু তুমি তো আস্ত আছ—আর যতদিন আস্ত আছ ততদিন তুমি আমাদের—তোমার সমস্ত দায়-দায়িত্ব ব্রেজিলের!

শেষ পর্যন্ত আস্ত ফেরা আর সম্ভব নয় বুঝে সকলের চোখে ধুলো দিয়েই নিঃশব্দে ব্রেজিল থেকে খসে পড়তে হয়েছিল পিন্‌ডিদাকে। তারপর সেখানকার সেই উত্তাল হাহাকারের খবর কাগজে পড়েছে। শোকে ব্রেজিলের আকাশ ছেয়ে গেছল। হাজার হাজার ছেলেমেয়েরা এসে বেসরকারী তল্লাশী দলে নাম লিখিয়েছে। সরকারী মিসিং স্কোয়াড আকাশ চুঁড়েছে, সমুদ্র ফুঁড়েছে, পাহাড় উড়িয়েছে, জঙ্গল পুড়িয়েছে। ব্রেজিলের সেই হাহাকারের খবর পড়ে ক'রাত যে পিন্‌ডিদার ঘুম হয়নি সে কেবল সে-ই জানে।

এটুকু শুনে তার তোয়াজের দোসর হোঁতকা হাবুল মোটা শরীর দুলিয়ে চুকচুক করে বলেছিল, আ-হা, পিন্‌ডিদা, পরে একবার অন্ততঃ তোমার সেখানে যাওয়া উচিত।

ওই ঢিপির আসনে বসে পিন্‌ডিদা উদাস চোখে দূরের আকাশের উড়ো-চিলটাকে দেখছিল আর মুখরোচক বেলেহাঁস কল্পনা করছিল ওটাকে। বিমনাভাবে বলেছিল, যেতে তো পারি, কিন্তু গেলে আবার কি হবে জানিস তো...।

এটুকুতেই সম্মানিত বোধ করে বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়েছিল হেবো, তাও তো বটে, কি করেই বা আবার সেখানে যাও তুমি।

কিন্তু কেবলুর কৌতূহল একবার চাড়িয়ে উঠলে সে সেটা সহজে হজম করতে পারে না। উসখুস করে প্রশ্নের সঙ্গে একটু সংস্কৃতের জ্ঞানও ঝাড়তে গেছল।—গেলে কি হবে পিন্‌ডিদা, আকাশের চাঁদ পেয়ে একেবারে 'ভোগস্য দাসঃ' বানিয়ে ফেলবে তোমাকে?

আকাশ থেকে পিন্‌ডিদার দু'চোখ সামনের রাস্তার দিকে নেমে এসেছিল। বিড়বিড় করে বলেছিল, কুড়মুড় ভাজা—

তখনো নতুন আলাপই বলা চলে, পিন্‌ডিদার কথাবার্তার সাদাসাপটা অর্থ ভালো বুঝতাম না। হঠাৎ কুড়মুড় ভাজা শুনে আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছিলাম। অন্যমনস্কের মতো আঙুল তুলে পিন্‌ডিদা সামনের রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়েছিল।

হ্যাঁ, কুড়মুড় ভাজা মানে কুড়মুড় ভাজাই, সংস্কৃতয় তেরো পাওয়া কেবলুর ভাষায় পিন্‌ডি-প্রত্যয় কিছু নেই ওতে। চেনা-মুখ কুড়মুড়ভাজা-অলা হন্তদন্ত হয়ে খেলার মাঠের দিকে যাচ্ছিল। একটু বাদে খেলা শুরু হয়ে যাবে। পিন্‌ডিদা তাকেই দেখিয়েছিল আর তার কথাই বলছিল।

আমার ইশারা পেয়ে কেবলুই ছুটে গিয়ে ও-ব্যাটাকে ধরে আনল। কিন্তু পিন্‌ডিদার মন তখনো

হোঁতকা হাবুল মোটা শরীর দুলিয়ে চুকচুক করে বলেছিল,— [পৃ. ২৯২

ব্রেজিলেই উধাও বোধহয়। কুড়মুড় ভাজা-অলার কাছ থেকে পর পর তিনবার হাত বাড়িয়ে তিন ঠোঙা নিয়ে পাশে রেখে চিবুতে শুরু করেছে খেয়ালও নেই।

কুড়মুড়ভাজা-অলা চলে যেতে হোঁতকা হেবো আড়চোখে একবার আমাকে দেখে নিয়ে হেসে হেসে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিল, ব্রেজিলে ফিরে গেলে কি হবে সেটা কিন্তু কেউ এরা বুঝতেও পারছে না পিন্‌ডিদা—

পিন্‌ডিদা এখানে এসে ওই টিপির আসনে কায়েম হয়ে বসার আগে আমি ছিলাম এই দলের পাণ্ডাগোছের একজন—যাকে বলে ব্রেন। ওই হোঁতকার সঙ্গে আমার প্রায়ই লেগে যেত তখন। হাতির মাথা আর বাঘের মাথা যে এক নয় সেটা ও বুঝতেই চাইত না। পিন্‌ডিদাকে তার উঁচু আসন আমি সসম্মানেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। তবু হোঁতকার ধারণা, ভিতরে ভিতরে আমার সেই কারণে একটু জ্বলুনি আছে। নইলে পিন্‌ডিদার সব কথা সর্বদা আমি বেদবাক্য বলে মেনে নিই না কেন? তাই আমার পয়সায় কুড়মুড় ভাজা চিবুলেও ফাঁক পেলে ঠাসতে ছাড়ে না।

কিন্তু আমার সহ্যগুণ থাকলেও ও মুখ খুললে চটপটি একটুতেই চিড়বিড় করে ওঠে। ও

বলেছিল, তুই তো বুঝে মাত করে দিয়েছিস একেবারে। কি আবার হবে, পিন্‌ডিদা ব্রেজিলে ফিরে গেলে সেখানকার সকলে মিলে দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা নজরবন্দী করে রাখবে—এটুকু বুঝতে আর কষ্ট কি! এ-ভাবে স্বাধীনতা খোয়ানোর জন্যে পিন্‌ডিদা আর সেখানে ফিরে যেতে পারে!

—হুঁঃ! গলা দিয়ে বিরক্তিকর একটা শব্দ করে পিন্‌ডিদা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। যেন কুড়মুড় ভাজার সঙ্গে দাঁতে লোহার দানা পড়েছে একটা। আর ওইটুকু শুনেই বেচারা চটপটি একেবারে চুপসে গেছল। ওই গাধার মাথা হেবো-হোঁতকার কাছেও আর মান-ইজ্জত থাকল না।

যা-ই হোক, ফের ব্রেজিলে ফিরে গেলে পিনডিদার কি হবে, এই কৌতূহলটাই বেশ দানা বেঁধে উঠেছিল এরপর। কিন্তু পিন্‌ডিদার ভিতরটা যেন সাত-সমুদ্দুরের ওপারেই বসে আছে তখনো। কুড়মুড় ভাজা চিবুচ্ছে আর শব্দ না করে বড় নিঃশ্বাস ছাড়ছে।

এমনিতেই একসঙ্গে পাঁচটা কথা বলতে বাধো-বাধো ঠেকে কার্তিকের। তা বলে ভিতরটা কি ওতেই চুপ করে থাকে নাকি? বিশেষ করে একটা সম্ভাবনা মাথায় যখন এসেই গেছে। পরীক্ষার পর ও আবার কবিতা লেখা শুরু করেছে। যাকে বলে সরব চিন্তা—সেইরকম করে বলেছিল, বোধহয় সেখানকার মস্ত কারো মেয়ে-টেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে পিন্‌ডিদাকে একেবারে আটকে ফেলা হবে—সংসারের খাঁচা পিন্‌ডিদার কি কক্ষণো ভালো লাগতে পারে?

বিমনার মতোই পিন্‌ডিদা আস্তে আস্তে ঘুরে তাকিয়েছিল ওর দিকে। তারপর সব ছেড়ে শুধু ওর মাথাটার দিকেই হাঁ করে চেয়েছিল খানিক। এর বেশী আর কিছু দরকার হয়নি, ওটুকুতেই কার্তিক কুপোকাত।

বাতাস জমে উঠতে হাবুল হোঁতকা চাপা আনন্দে জুলজুল করে আমার দিকে তাকাতে লাগল। ভাবখানা, কি গো সোনামণি, সবাই তো তল, এখনো মুখ সেলাই কেন—বুদ্ধির দৌড় দেখাও?

না, পিন্‌ডিদার ওপর রাগ হয় না, তার হাব-ভাবই ওই রকম উঁচু দরের। হাবুলটার এরকম মোসাহেবিপনা দেখলে পিত্তি জ্বলে যায়। কিন্তু আমার টিপ্পনীটা যে পিন্‌ডিদা এ-ভাবে মাথা পেতে নেবে কল্পনাও করিনি। হাবুলকে আর সেই সঙ্গে পিন্‌ডিদাকেও হয়তো একটু তাতিয়ে তোলার জন্য বলে ফেলেছিলাম, কি আবার হবে, ব্রেজিলের লোকেরা পিন্‌ডিদার হাঁটুর ভাঙা মালাইচাকতিতে পেরেক ঠুকে আবার তাকে ফুটবলের মাঠে নামিয়ে দেবে—

জবাব শুনে দশাসই হাবুল রেগে উঠবে কি হেসে গড়াবে ভেবে না পেয়ে কুতকুত করে পিন্‌ডিদার দিকে চেয়ে রইল।

কিন্তু সকলকে, এমন কি আমাকেও অবাক্ করে পিন্‌ডিদা সাদামাটা মন্তব্য করেছিল, সোনা তবু কাছাকাছি গেছে—

এবারে আমার তাকানোর পালা হাবুলের দিকে। চটপটি কার্তিক আর কেবলুও খুশি খানিকটা। কিন্তু তার আগেই ফের পিন্‌ডিদার গলা শুনে সকলে সচকিত। কুড়মুড় ভাজার শেষটুকু ভিতরে চালান দিয়ে পিন্‌ডিদা কথার সুতো ধরে থেকে বলল কেবল—

আশান্বিত হয়ে হাবুলই তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করল, কেবল কি পিন্‌ডিদা?

—বলছিলাম, সোনা কেবল বোর্নিও যেতে গিয়ে বর্ধমানে নেমে পড়েছে।

হাবুল হোঁতকার সেই হি-হি হাসি হাড়পিত্তি জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। ওর ওই পেল্লায় ভুঁড়ি কেঁপে-কেঁপে ফেঁপে-ফেঁপে উঠছিল।

ব্রেজিলে ফিরে গেলে কি হবে তিক্তবিরক্ত হয়ে পিন্‌ডিদা অবশ্য এর পর বলেই দিয়েছিল।—এত কি-যে মাথা ঘামাস তোরা বুঝি না। ওদের প্রেম বা ভালবাসায় ভেজাল নেই আমাদের মতো এতো। ব্রেজিলে ফিরে গেলে ওরা স্রেফ আমাকে মেরে মমি বানিয়ে সব থেকে বড় আর বিজ্‌ই চার রাস্তার মাঝখানে উঁচু বেদীর ওপরে দাঁড় করিয়ে রাখবে। ব্যস ফুরিয়ে গেল।

ব্রেজিলে ফিরে গেলে ওরা স্রেফ আমাকে
মেরে মমি বানিয়ে...

শোনার পর সকলেই আমরা একদিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম, পিন্‌ডিদা আমাদের ছেড়ে কখনো কোথাও যাচ্ছে না। সেই পিন্‌ডিদা কোথাও না গিয়েও আমাদের বর্জন করেছে। চৌদ্দ পনের দিন হয়ে গেল তার টিপির আসন খালি। এমন যদি হত, কোনো বড় রকমের ঝগড়া-ঝাঁটি করে সরে গেছে তাহলেও বোঝা যেত। কিন্তু পিন্‌ডিদা স্রেফ নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে মনের জগতে বিরাগী হয়ে গেছে। বর্ধমানের এই বাবুগঞ্জের মামা বাড়িতে থেকেও সে যেন ব্রেজিল ছাড়িয়ে আরো ঢের দূরে চলে গেছে।

রোজই বিকেলের রোদ না পড়তে মাঠের এই জায়গাটাতে এসে বসছি আমরা। ঠাকুমার হাত-বাক্স হাতড়ে কিছু টাকাও পকেটে মজুত রেখেছি। রোজই ভাবি, কত কি তো আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে দুনিয়ায়। মনে যা আছে সব ঝেড়ে ফেলে পিন্‌ডিদা আজ হয়তো আসবে। আমি আর চটপটি এক সঙ্গেই আসি। ওদিক থেকে কেবলুকে নিয়ে কার্তিকও হাজিরা দেয়। মাঠে আসার ব্যাপারে কেমন করে আমরা যেন একটু বেশী পাংচুয়াল হয়ে গেছি। একটু আধটু দেরি হলেও হাবুলেরও আসার কামাই নেই। ও ভেবেছিল পিন্‌ডিদার অনুপস্থিতির সুযোগে আমরা বোধহয় কথায় কথায় ঠাসব ওকে। কিন্তু সে-রকম লক্ষণ না দেখে সে-ও এসে বেজার মুখ করে বসে থাকে। পিন্‌ডিদার সব থেকে অনুগত ভক্ত যে ও, তাতে তো কারো সন্দেহ নেই। ওর দুঃখ আমাদের থেকে বেশী

ছাড়া কম নয়। তাছাড়া পিন্‌ডিদার সম্পর্কে টুক-টাক দুই একটা খবর ও-ই এনে দেয়।

ভিতরে ভিতরে এরা এরপর আমাকেই দুষবে জানি। ভিতরে ভিতরে কেন, এখনই শুরু হয়ে গেছে। হাবুল আসার আগে চটপটি তো সেদিন বলেই ফেলল, পিন্‌ডিদা তো আর হেঁজিপেঁজি কেউ নয়, মানীর মানে, এমন একটা ঘা না দিলেই পারতিস।

কেবলু আর কার্তিকও চুপ করে থাকল। অর্থাৎ চটপটির কথাতেই ঘুরিয়ে সায় দিল। আমি রেগে গিয়ে বললাম, তোরা আমার সঙ্গে ছিলি কি ছিলি না? তখন তো দিব্বি সায় দিয়ে মজা লুটেছিস! তাছাড়া পিন্‌ডিদা কি আমাদের কারো ওপর রাগ করেছে এক-ফোঁটা? তার ভিতরে ভিতরে এরকম একটা পরিবর্তন এসেছে বলেই না আমরা তাকে হারাতে বসেছি!

যুক্তির দিক থেকে সবই ঠিক। চটপটি আর পালটা জবাব কিছু দিয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু নিজেকে যে আমি দোষী ভাবছি একটু তাও ঠিক। পিন্‌ডিদা দোষের মধ্যে একটু খেতে ভালবাসে। তা দুনিয়ায় কত বড় বড় লোকই তো খেতে ভালবাসে। আমরাও কম ভালবাসি না। কিন্তু পিন্‌ডিদার এই খাওয়ার ব্যাপারটাকে নিয়ে আমি কি একটু বেশী কচলে ফেলিনি?

খুলেই বলি।

দু'মাস হল একটা ভোজনপর্বের ব্যাপার চলছিল নিজেদের মধ্যে। ব্যাপারটা শুরু করেছিল হাবুল। পিন্‌ডিদা বাদে বাকী সকলকে অবাক্ করে দিয়ে হাবুল একদিন ওর বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্ন করে বসল। লজ্জা লজ্জা মুখ করে গৌরবটা হাবুল পিন্‌ডিদার দিকেই চালান করে দিল। বলল, এটা পিন্‌ডিদার সাজেশান।

হাবুলের নেমন্তন্ন পেয়ে শুধু পিন্‌ডিদার অবাক্ না হওয়ার কারণ বোঝা গেল। কিন্তু এ-কথা শোনার পর আমরা বেশী অবাক্। পিন্‌ডিদাকে তো হাবুলের ওপরেই সব থেকে বেশি সদয় জানতাম! তার ওপরেই পিন্‌ডিদার এমন অকরুণ হামলা কেন?

তাও বোঝা গেল। হাবুল অনেকদিন ধরেই তার বাবার বন্ধুর ফোটোগ্রাফির দোকানে কাজ শিখছিল। বাবার বন্ধু গেল মাস থেকে হাবুলের মাসে একশ টাকা অ্যালাওয়েন্স বরাদ্দ করেছে। বর্ধমান শহরে ওটাই সব থেকে জমজমাট ফোটোগ্রাফির দোকান। হাবুল নাকি স্টিল ক্যামেরায় হাত পাকিয়ে এখন মুভি ক্যামেরায় (বিজ্ঞাপনের জন্য) কাজ শিখছে।

হাবুলটা রাতারাতি অন্য মানুষ হয়ে গেল আমাদের চোখে। বরাত বটে! এই বরাতের খবর নিয়ে হাবুল পিন্‌ডিদাকে প্রণাম করতে গেছল। শোনার পর আশীর্বাদস্বরূপ পিন্‌ডিদা ওকে এই ফতোয়া দিয়েছে। মেনুও সেই করে দিয়েছিল। বিকেলের জল-খাবার হলেও ভর-পেট ব্যবস্থাই হয়েছিল। বেগুন ভাজা, লুচি, মাংস, চাটনি আর শেষে দুটো করে বড় সাইজের মিষ্টি।

মনের আনন্দে খেতে খেতে কেবলুটা একটু বেশি উল্লাস করে ফেলেছিল। বলেছিল, ফি বছর এই দিনটায় আমাদের নিয়ে হাবুলের সেলিব্রেট করা উচিত—অস্মাকম্ তুষ্টে হাবলুঃ পরিতুষ্টম্।

পিন্‌ডিদা পিটপিট করে কেবলুর দিকে তাকাতে লাগল। কেবলুর সেদিকে খেয়াল নেই, মাংসের কচি হাড়ের সঙ্গে সংস্কৃত চিবুতে পেরে দু'চোখ আধ-বোজা।

পিন্ডিদা আলতো করে জিজ্ঞাসা করল, টানা একটা বছর অপেক্ষা করতে তোর ভালো লাগবে?

পিন্ডিদার কাছ থেকে এ-রকম সমর্থন পেয়ে আনন্দে মুখের হাড় চিবুতে ভুলে গেল কেবলু।—তবে কি মাসে একদিন বলছ?

পিন্ডিদা বলল, সে-ও তো তিরিশটা দিন, আমার অত ধৈর্য নেই, সামনের রবিবারেই ভালো।

হাবুলের থলথলে মুখে যেন কালি লেপা হল এক প্রস্থ। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই পিন্ডিদা কেবলুর দিকে চেয়ে কোর্টের বিচারকের মতো রায় দিল, সামনের রবিবারে তুই খাওয়াচ্ছিস।

হাড় কামড়াতে গিয়ে কেবলু নিজের আঙুল কামড়ে বসল। তারপর আঁতকে উঠে বলল, আমি! বা রে আমি খাওয়াতে যাব কেন, আমি কি চাকরি পেয়েছি!

পিন্ডিদা ভুরু কুঁচকে তাকালো ওর দিকে। একবার যখন রায় দিয়ে ফেলেছে আর রক্ষা নেই। বলল, কেন, তুই এবারে হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা দিস নি?

কেবলু ফাঁড়া কাটাবার আশায় তড়বড় করে জবাব দিল, দিচ্ছিলাম, কিন্তু সংস্কৃত পরীক্ষা তো না দিয়েই কোশ্চেন পেপার হাতে নিয়ে উঠে এসেছি—আমার ফেল্ল করা ঠেকাবে কে? সোনার বরং ভালো রেজাল্টের আশা, ও খাওয়াতে পারে।

বিপাকে পড়লে এইভাবেই পার পেতে চায় কেবলুটা। কিন্তু আজ পিন্ডিদা শনি হয়ে ওর কাঁধেই ভর করেছে। খেঁকিয়ে উঠল, সোনা সোনাই—তাই বলে তুই চিরটা কাল কয়লা হয়ে থাকবি? সংস্কৃত পরীক্ষা না দিয়ে উঠে এসেছিলি কেন—বেশী ফুর্তি হয়েছিল বলে?

বিপদনাশের আশায় কাঁদ কাঁদ মুখ করে কেবলু বলল, না, ভয়ানক দুঃখু হয়েছিল বলে, চোখ বুজে নম্বর দিলেও ষোল সতেরর বেশী পেতাম না।

—তবে? পিন্ডিদা আরো নির্মম কঠিন।—সামনের বার সেটা একষট্টি বা একাত্তর করতে হবে না? আমাদের খাইয়ে তুষ্ট করলে তোর সংস্কৃত সরস্বতীও তুষ্ট হবে বলে দিলাম, যা—।

কেবলুর সর্বনাশ, কিন্তু হাবুলের এখন পৌষ মাস। মাংসের ঝোলে ডোবানো হাত চাটতে চাটতে সে এবার উঠেই দাঁড়াল। কেবলুর ওপর ছোট ছোট চোখের সমস্ত স্নেহ উজাড় করে বলল, পিন্ডিদার আশীর্বাদের জোর জানিস না, আমাকে মনে মনে কত আশীর্বাদ করেছে বলেই না এমনটা হল—নইলে একশ টাকা ছেড়ে দশ টাকা রোজগারের মুরোদ ছিল আমার? পিন্ডিদা যা বলল চোখ কান বুজে করে ফেল, সামনের বার সংস্কৃতের জ্বালা-পোড়ার হাত থেকে তুই ঠিক বেঁচে যাবি দেখে নিস—

কেবলু আমার ঘাড়ে চাপতে চেয়েছিল বলে এবারে আমি আর একটু উসকে দিলাম।—তাহলে এই মেনুই তো ঠিক থাকল পিন্ডিদা?

পিন্ডিদার ডিশের বড় রসগোল্লা দুটোও উদরস্থ হয়ে গেছে ততক্ষণে। হাবুল তাড়াতাড়ি নিজের ডিশের রসগোল্লা দুটোও তার সামনে এগিয়ে দিল। পিন্ডিদা সস্নেহে তাকালো একবার ওর দিকে, বলল, তুই দিনকে দিন যা মোটা হচ্ছিস, তোর বেশী মিষ্টি খাওয়া ভালো নয় আমিও ভাবছিলাম। তারপর আমার দিকে ফিরে জবাবটা দিল।—হ্যাঁ এই মেনুও থাকতে পারে, আর কেবলু চাইলে

বেগুন ভাজা আর চাটনির বদলে আলুর চপ আর টোমাটো সস্‌ও দিতে পারে। ওর যেমন সুবিধে, কারো ওপর জোর করা ঠিক নয়।

বাইরে এসে কেবলু আমার ওপরেই অভিমানে ফেটে পড়ল একেবারে।— শেষ পর্যন্ত তুইও তাল ঠুকে এ-ভাবে ডোবালি আমাকে।

আমি মুখ মুচকে জবাব দিলাম, কেন, তুমি আমার ঘাড়ে চাপতে চাওনি? সোনা ভালো পাস করবে, ও খাওয়াক—বলিসনি?

কাঁদ কাঁদ মুখ করে কেবলু বলল, তোর তো ঠাকুমা আছে, ঠাকুমার হাতবাক্স আছে—আমার কি আছে বল্‌। সংস্কৃত কোশ্চেন পেপার হাতে করে পরীক্ষার হল্‌ থেকে উঠে এসেছিলাম বলে বাবা গায়ের ছাল ছাড়াতে বাকী রেখেছে—এখন এ-জন্যে টাকা চাইলে আর আস্ত রাখবে? আমি ভাই সামনের রোববারে আগেই বাড়ি ছেড়ে পালাব।

এবারে এই কেবলুটার জন্যেই মায়া হতে লাগল আমাদের। আমাদের বলতে আমার চটপটির আর কার্তিকের। কিছু চাঁদা তুলে কেবুলকে দেবার নামে চটপটির গোল মাথা বনবন করে চক্কর খেল, ক্ষেপেছিস, কলেজে ঢোকার আগে পাঁচসিকে হাপিস করার উপায় নেই। জবাব না দিয়ে কার্তিকও কার্তিকমুখো হয়ে বসে থাকল।

কিন্তু এদিকে কথা যখন হয়ে গেছে, উপায় তো একটা বার করতেই হবে। এই সামান্য ব্যাপারে পিছু হটলে পিন্‌ডিদার কাছে আমাদের মান ইজ্জত থাকবে? চিরটা কাল খোঁটা দেবে না? খোঁটা দেবার সময় পিন্‌ডিদার আবার সকলকে জড়িয়ে নেওয়া স্বভাব। ঠিক বলবে, তোদের মুরোদ জানা আছে। খাতির-কদর এরপর যা একটু ওই হেবোটাই পাবে। কেবলুটার জন্য আমাদের সকলকেই নস্যি হয়ে যেতে হবে পিন্‌ডিদার কাছে—মাঠের আসরও আর হয়তো তেমন জমবে না।

সমস্যাই বটে একখানা।

কিন্তু এ-সব ব্যাপারে আমার মাথা এত চটপট খোলে যে নিজেই মাঝে মাঝে অবাক্‌ হয়ে যাই। ভাবতে গিয়ে এমন একখানা বুদ্ধি মাথায় এলো যে আনন্দে আত্মহারা আমি। বলে উঠলাম, হয়েছে—কাউকে খরচা করতে হবে না, সব খরচ কেবলুই করবে।

কেবলু ঝাঁজিয়ে উঠল, তার মানে?

—তার মানে সব খরচ তোর বাবা করবে, মা করবে আর তোর হাত দিয়ে করাবে।

কেবলু বললে, তুই ক্ষেপেছিস্‌?

—সবুর বৎস, সবুর। তোর বাবা তো আচার-অনুষ্ঠান-মানা পণ্ডিত মানুষ—তোর মা কেমন, ধম্মে-কম্মে মতি আছে?

—বাবার থেকে বেশী ছাড়া কম নয়।

—ওয়াণ্ডারফুল!

জবর কিছু প্ল্যান মাথায় এসেছে সেটা ওরা বুঝে নিয়েছে। অধীর হয়ে চটপটি তাড়া দিল, ব্যাপারখানা কি ভেবেছিস তাই বল্‌ না?

বললাম, আমাদের ক্লাসের হেপো ভোলাকে মনে আছে তোদের নাকি, না এর মধ্যেই ভুলে মেরে দিয়েছিস?

সন্ধ্যে পেরোবার সঙ্গে সঙ্গে এই নাম শুনে খুব স্বস্তি বোধ করল না ওরা কেউ। কার্তিক বলল, সে তো গেল বছরেই মরে ভূত হয়ে গেছে, তাকে আবার টানছিস কেন?

বললাম, সে এখন কাঁধে না চাপলে কেবলুর পরিত্রাণের উপায় নেই। ভোলা আমাদের সকলেরই বাড়ি আসত, তার মধ্যে সংস্কৃত পড়ার ঝোঁকে কেবলুর বাবার কাছে বেশী যেত। হাইক্লাস! রোগে ভুগে ভুগে বেচারা ভোলা গত বছর মরেই গেল। সেই ভোলা এতদিন বাদে মুশকিল আসান কি করে করতে পারে কেউ এখনো ভেবে পাচ্ছে না দেখে আমার মজাই লাগছিল।

প্ল্যানটা এবার খোলসা করে বললাম ওদের। মন দিয়ে শোনার পর কেবলুর হতাশ মুখে পর্যন্ত আশার আলো জাগল। বাবা মায়ের কাছে একটু মিথ্যে বলতে হবে এই যা—কিন্তু বিপাকে পড়লে কেউ যে আমরা ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির নই কে না জানে। আনন্দের চোটে চটপটি বলে উঠল, তোর কি মাথা রে সোনা—অ্যাঁ?

কার্তিকও উদার খুশিতে ঘোষণা করল, প্ল্যান সাকসেসফুল হলে তোকে নিয়েই একটা কবিতা লিখব আমি।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে নিখুঁত ভাবেই কাজটুকু সেরে ফেলল কেবলু। অবাক-অবাক মুখ করে মায়ের কাছে গিয়ে বলল, কাল রাতে কি একটা স্বপ্ন দেখলাম গো মা, একেবারে জলজ্যান্ত যেন—

শুনেই ওর মা বলে উঠল, থাক থাক স্বপ্নের কথা বলে কাজ নেই।

—শোনোই না মা, একই জনকে দু'বার দেখলাম, একবার রাতে আর একবার ভোর রাতে! ভালো স্বপ্ন না মন্দ, ভেবে না পেয়ে মা উতলা একটু।—কাকে দেখলি আবার?

—আমাদের ক্লাসের সেই ভোলাকে মনে আছে তোমার? বাড়িতে বাবার কাছে পড়তে আসত, তুমি মাঝে মাঝে খেতেটেতে দিতে—মনে নেই?

মায়ের খুব মনে আছে, কারণ এটুকু শুনেই ঘাবড়েছে।

—প্রায় এক বছর আগে মারা গেছে তো, এতদিন বাদে একেবারে সামনে বসে থাকতে দেখলাম তাকে—মুখখানা কি-যে শুকনো কি বলব মা, একেবারে যেন কত দিনের উপোসী মূর্তি একখানা। আবার ভোর রাতের দিকে ফের স্বপ্ন দেখলাম, ছুটির দিনের বিকেলে আমরা জনাকতক বন্ধু মিলে ওকে নিয়ে বসে লুচি মাংস আলুর চপ টোমাটো সস্ এ-সব খাচ্ছি, আর ভোলাটার তখন কি যে হাসি খুশি মুখ মা—কি বলব!

স্বপ্নের কথা শুনে মা বিরস মুখে সোজা বাবার ঘরের দিকে চলে গেল। আর কেবলু তক্ষুণি তার পড়ার ঘরে বসে চেঁচিয়ে শব্দরূপ আর ধাতুরূপ পড়া শুরু করে দিল। এক ফাঁকে উঠে দেখে এলো বাবা গম্ভীর মুখে পঞ্জিকা দেখছে আর মা তার সামনে দাঁড়িয়ে।

সেদিন আর কোনো কথা হল না। পরদিন মা নিজে থেকে এসে জিজ্ঞাসা করল, স্বপ্নে ভোলার

সঙ্গে বসে যে বন্ধুদের নিয়ে খাচ্ছিলি তাদের মুখ মনে আছে?

—সে তো আছেই, আমরা ছ'জন আর ভোলা—কেন মা?

—তাদের সব রোববার বিকেলে এখানে এসে খেতে বলে দে। আমি টাকা দিয়ে দেব, যা-যা খেতে দেখেছিস সে সবই ব্যবস্থা করবি—ভুলিস না যেন, একটা কাগজে লিখে রাখ্।

কেবলুর আকাশ থেকে পড়ার মুখ একেবারে।

মা বলল, হাঁ করে চেয়ে আছিস কি? স্বপ্নে মৃতজনকে দেখলে লোক খাওয়াতে হয়—এ তো নিজেই খেতে চেয়েছে।

রোববারের খাওয়াটা হাবুলের বাড়ির খাওয়া থেকেও বেশী জমজমাট হয়েছে। কেবলুর মা নিজে জুলুম করেই খাইয়েছে সকলকে। কেবলু মা-কে আগেই বলে রেখেছিল, তুমি স্বপ্নের কথাটা ওদের কাউকে বোলো না যেন মা, ওরা পরে হাসি-ঠাট্টা করবে—মরা মানুষকে নিয়ে ইয়ারকি আমার ভালো লাগবে না।

ভয় পিন্‌ডিদা আর হাবুলের জন্যে। মা কিছুই বলেনি।

কিন্তু খাওয়া শেষ হতে পরিতৃপ্ত একটা ঢেঁকুর তুলে পিন্‌ডিদা আবার আচমকা একটা বোমা ফেলল যেন। বলল, কার্তিক, সামনের রোববার তাহলে তোর ওখানে ব্যবস্থা।

কার্তিক বিষম একটা আছাড় খেয়ে উঠল যেন।—আ-আ আমার ওখানে কি ব্যবস্থা?

পিন্‌ডিদা বিরক্ত।—এক কথা কেন যে একবারে বুঝতে পারিস না, বুঝি না। কি ব্যবস্থা আবার—এখানে যা হল সেই ব্যবস্থা। একবার যখন শুরু হয়েছে, মাঝখানে থেমে আর লাভ কি, কলেজে ঢুকতে যাচ্ছিস সব, তার আগে একটা রিইউনিয়ন গোছের হয়ে যাওয়া ভালো না?

শুনে শুধু কার্তিক নয়, আমার আর চটপটির চোখও ছানাবড়া। সাদা কথায় এরপর চটপটি আর আমার পালা। কি কুক্ষণে যে হাবুল হতভাগাটা ওর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে প্রথম খাইয়েছিল আমাদের।

পিন্‌ডিদা আবার বলল, ছোট-ছোট এই ব্যাপারগুলোর মধ্যে আনন্দ পেতে শেখ, সেই আনন্দ আখেরে কত কাজ দেয় দেখিস। ব্রেজিলে তিন বেলা খাওয়া নিয়ে সব এমন কাণ্ড করত যে এক একসময় মনে হত বনে জঙ্গলে চলে যাই। কিন্তু ওদের ওই আনন্দটুকুর কথা ভেবে এড়ানও যেত না। একটা জাত কি এমনিতে বড় হয় রে।

হাবুলের থলথলে মুখে হাসি চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে। সে জিজ্ঞাসা করল, কার্তিকের বাড়ির মেনু কি এক রকমই হবে পিন্‌ডিদা?

পিন্‌ডিদা জবাব দিল, লুচি মাংস আর রাজভোগের আইটেম তো থাকবেই, তারপর কার্তিকের যেমন সুবিধে। কারো ওপর জোর করতে নেই বলেছি না!

রাগে সর্বাঙ্গ রি-রি করছে আমাদের। কেবলুর অতটা নয় বোধহয়, কারণ তার ফাঁড়া কেটে গেছে।

এর পর একে একে আরো তিনবার ভোলাকে স্বর্গ থেকে স্বপ্নে টেনে নিয়ে আসতে হল।

পিনডিদা আমাদের দেখে মহা খুশী।
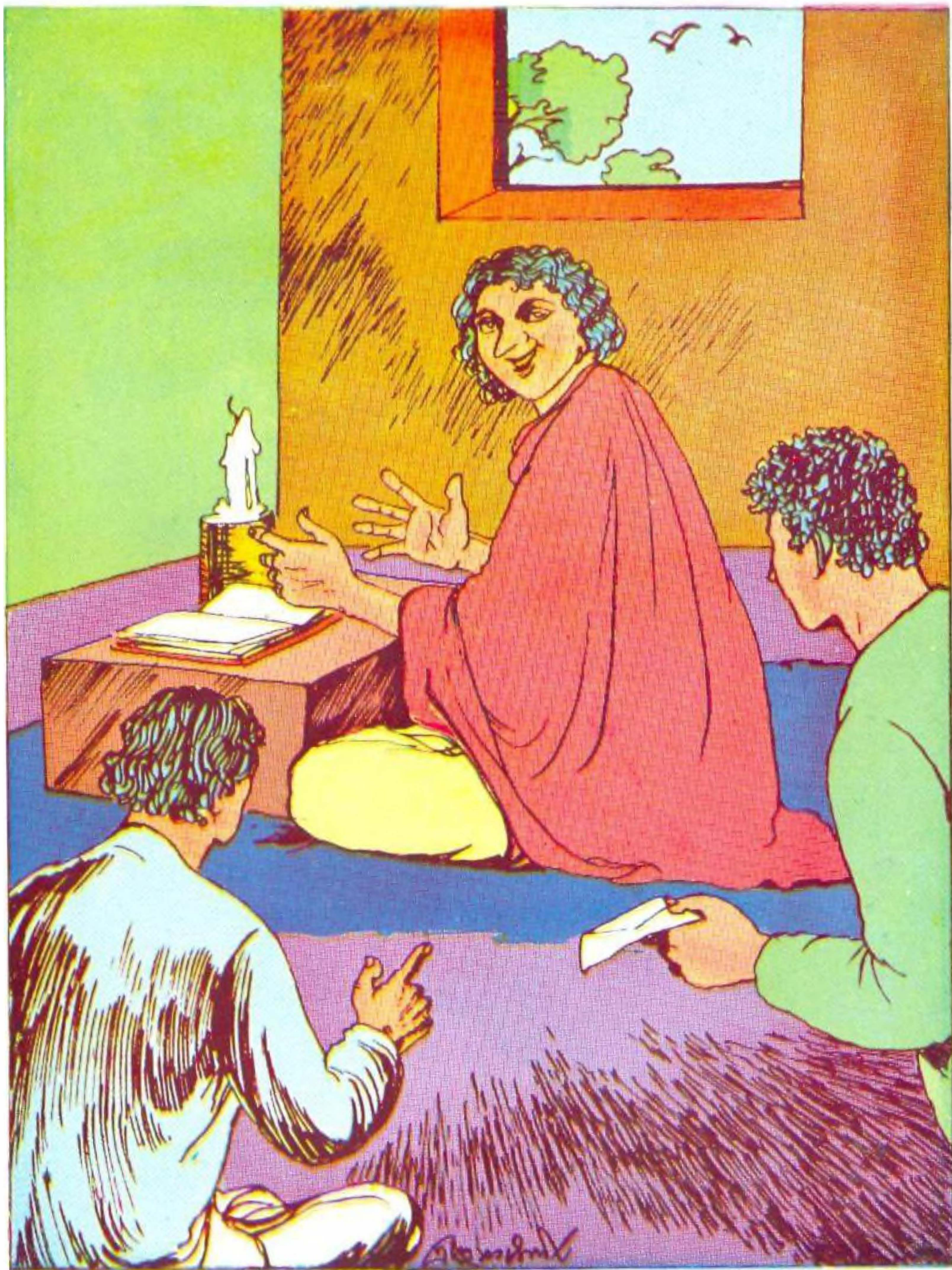
আর দরকার নেই টেনে মার লাফ।
সব শখ মিটে গেছে বাপ! ওরে বাপ।

একবার তার শুকনো মুখ দেখা যায়, আর একবার খাওয়ার আনন্দে হাসিখুশি মুখ। ছেলের কল্যাণ ভেবে কোন্ মা আর ব্যবস্থা না করে স্বপ্নের ইঙ্গিত উড়িয়ে দিতে পারে।

কিন্তু আমরা ঠিক করেছি, পিন্‌ডিদাকে এবারে আর কিছুতে ছাড়া হবে না। সব শেষে তার কাছ থেকেও একটা খাওয়া আদায় করতে হবে। আর তা যদি না পারা যায়, আমাদের মনের ভাবটা তাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে। চটপটি কার্তিক আর কেবলু আমার সঙ্গে এক মত। ঘা খেয়ে সকলেই এবারে চনমনে হয়ে উঠেছে।

কার্তিক আর চটপটির পালা শেষ হতে পিন্‌ডিদা যখন আমার দিকে তাকালো, আমি নিজেই বললাম, ঠিক আছে, পরের রোববারে আমার বাড়িতে। কিন্তু তারপরের রোববার তোমার ওখানে—তুমি আমাদের লিডার, এই আনন্দটুকু থেকে নিশ্চয় আমাদের বঞ্চিত করবে না।

পিন্‌ডিদা পিটপিট করে খানিক চেয়ে রইল আমার দিকে।—

মহাভারত পড়েছিস?

আমি বেপরোয়া।—হ্যাঁ পড়েছি।

—পড়েইছিস শুধু, শিখিস নি কিছু। এক সঙ্গে দুই চিন্তা করলে লক্ষ্যভেদ হয় না। এখন নিজের চরকায় তেল দিয়ে নিজের কর্তব্য ভাবো।

পরের রোববার নিজের চরকায় তেল দেওয়া বা নিজের কর্তব্য সারা হতে পিন্‌ডিদাকে চেপে ধরলাম—এবারে আর দুই চিন্তা করছি না, এখন একটাই চিন্তা। সামনের রোববারে তোমার ওখানে!

আমার সঙ্গে সঙ্গে শুধু হাবুল ছাড়া আর সকলেই সায় দিল।

পিন্‌ডিদা বলল, ক'সপ্তাহ ধরে খেয়ে খেয়ে কেমন অরুচি ধরে গেছে।

আমি বললাম, ব্রেজিলে দিনে রাতে তিন বেলা নেমন্তন্ন খেতে তুমি, এ তো মাঝখানে ছ'দিনের ফারাক—ফাঁসির খাওয়া খেলেও তার মধ্যে রুচি ফিরে আসবে। অন্য সকলকে বললাম, তাহলে সামনের রোববারের জন্য রেডি হ তোরা।

হাবুলের মুখখানা এমন যেন সে-ই বিপাকে পড়েছে। পিন্‌ডিদা অন্যমনস্কের মতো বলল, সামনের রোববারে হবে না, মামীর অশ্লেষা না মঘা কি একটা পড়েছে। দেখি—

হাবুলকে নিয়ে উঠে চলে গেল।

আমি মরিয়া এবার। পিন্‌ডিদার থেকে খাওয়া আদায় করতেই হবে। আর তা না পারলে পিণ্ডি চটকেই ছাড়ব তার। কি আর হবে। ব্রেজিলে তো আর ফিরে যেতে পারবে না—সেখানে গেলেই তো মেরে মমি বানিয়ে রাখবে।

একে একে তিন রোববার চলে গেল। কিন্তু আমার তাগিদের কামাই নেই। পিন্‌ডিদা কিছু একটা অজুহাত দেখিয়ে ঠিক এড়িয়ে যায়। একদিন তার মামার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হতে পায়ের ধুলো নিয়ে বললাম, সামনের রোববার বিকেলে পিন্‌ডিদা আমাদের তার ওখানে খাবার কথা বলেছিল...কিন্তু আমাদের সকলেরই আবার সেদিন আর এক বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন—পিন্‌ডিদাকে বলে দেবেন, পরের রোববারে হলে আমাদের আপত্তি নেই।

ভদ্রলোক খানিক হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে রইল। তারপর খেঁকিয়ে উঠল, কে পিন্‌ডিদা?

আমি মুখ কাঁচুমাচু করে বললাম, আজ্ঞে আপনার ভাগ্নে প্র-প্রদীপদা।

—সে তোমাদের খাবার নেমন্তন্ন করেছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমার বাড়িতে?

—ইয়ে কথায়-কথায় বলছিল।

হঠাৎ চোখ পাকিয়ে যেন মারতেই এলো ভদ্রলোক। রেগে গিয়ে দু'হাতের দুই বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, যাও, বন্ধুদের বলে দাও বাড়িতে এলে কাঁচকলা খেতে পাবে তোমরা—কাঁচকলা—বুঝলে?

এই অপমানও সহ্য করতে হবে আমাদের? চটপটি ওরা সকলে এক বাক্যে বলল, কক্ষণো না!

এরপর আমাদের আচরণও দ্রুত বদলাতে লাগল। পিন্‌ডিদা এলেই রোববারের তাগিদ দিতে ছাড়ি না। এদিকে সে আসার আগে ডালমুট, কুড়মুড় ভাজার ঠোঙা আর ঘুগনির পাতা আমাদের পাশে ছড়িয়ে থাকে। পিন্‌ডিদা সেগুলোর দিকে জুলজুল করে তাকায়, আবার আমাদের দিকেও। শেষে দূরের আকাশ দেখতে থাকে। আমরা তাগিদ দিই, ব্রেজিলের কিছু গল্প বলো না পিন্‌ডিদা, অনেক দিন কি-চ্ছু বলছ না।

পিন্‌ডিদা ফোঁস করে বলে, ব্রেজিল দূরে সরে যাচ্ছে, কিছু ভালো লাগে না।

মওকা পেয়ে আমরা ভাবছি, আরো একটু আক্কেল তাকে দিতে হবে। মামার বাড়িতে সুবিধে না হোক, বিনোদের দোকান আছে। সেখানে তো অনায়াসে খাওয়াতে পারে আমাদের। ব্রেজিলের রোজগারের সব টাকা তো এরই মধ্যে শেষ হয়ে যায়নি। শেষ হবে কি করে, কোনদিন হাতের আঙুল ফাঁক হতে দেখা যায়নি তার।

এক টাকা দু'টাকার অনেক খুচরো নোট জমিয়েছি। পিন্‌ডিদার সামনেই সেগুলো বার করে মন দিয়ে গুনি, তারপর মনে মনে কিছু হিসেব করে সেগুলো আবার পকেটে রেখে দিই। চটপটি কেবলু কার্তিকও দু'চার টাকা দেখায় আবার পকেটে রাখে।

পিন্‌ডিদা চোখ বেঁকিয়ে দেখে। উদাস চোখে দূরের দিকে চেয়ে খানিক বসে থাকে। তারপর উঠে চলে যায়। তখন অবশ্য ঠিক ভালো লাগে না আমাদের। তবু ভাবি, মজুত হোক আর একটু। এরপর পিন্‌ডিদার মাঠে আসায় কামাই হতে লাগল একদিন দু'দিন করে। দু'দিন আসে তো একদিন আসে না। হাবুলের ফটোগ্রাফির দোকানের কাজের চাপ বেড়েছে। তার আসতে বিকেল গড়ায়। আড্ডা নীরস হয়ে উঠতে একদিন সে বলল, পকেটে একটা টাকা আছে পিন্‌ডিদা, কি খাবে বলো?

রাগ করে আমাদের জব্দ করার জন্য সে পিন্‌ডিদাকে একলাই খাইয়ে আমাদের আক্কেল দিতে চায়।

বন্ধুদের বলে দাও বাড়িতে এলে কাঁচকলা খেতে পাবে তোমরা— [পৃ. ৩০২

পিন্‌ডিদা যেন কত দূরে কোথায় চলে গেছ্‌ল। জিজ্ঞাসা করল, কি বললি?

হাবুল জবাব দিল, পকেটে একটা মাত্র টাকা আছে, সকলের কুলোবে না, তোমার জন্য কি আনব?

পিন্‌ডিদা আবারও তেমনি বিমনার মতো চেয়ে থেকে হঠাৎ সাগ্রহে বলল, একটু গঙ্গা জল এনে দিতে পারিস?

আমরা হাঁ সকলে।

কি ভাবতে ভাবতে পিন্‌ডিদা উঠে চলে গেল। আমরা যে যার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। হাবুল রাগের চোটে আমাদের মুখগুলো ঝলসে দিয়ে উঠে চলে গেল। হাবুল টাকা বার করল, খাওয়াতে চাইল—আর তা কানে না শুনে পিন্‌ডিদা উঠে চলে গেল—এ চোখে দেখেও বিশ্বাস করি কি করে?

দু'দিন এরপর পিন্‌ডিদা এলোই না। আমরা মুষড়ে পড়তে লাগলাম। হাবুলও এসেই তাকে না দেখে রাগ করে চলে গেল। তৃতীয় দিন পিন্‌ডিদা আসতে এবারে রাগ ভুলে আমিই পকেট থেকে তিনটে টাকা বার করে হাবুলের দিকে বাড়িয়ে দিলাম। অনেক কচলানো হয়েছে, আর না। হাবুলকে বললাম, বিনোদের দোকান থেকে তিন টাকার মাংসের ঘুগনি নিয়ে আয়।

পিন্‌ডিদা উদাস মুখ করে উঠে দাঁড়াল। —তোরা খা, আমি একটু কাজ সারি গে।

এবারে একসঙ্গে আমরা হাঁ হাঁ করে উঠলাম। —সে কি পিন্‌ডিদা, মাংসের ঘুগনিটা খেয়ে যাও!

জবাবে পিন্‌ডিদা হাসল আমাদের দিকে চেয়ে। এমন স্নেহমাখা হাসি পিনডিদার মুখে সত্যিই আর দেখিনি। বলল, তোরা খেলেই আমার খাওয়া হবে রে।

সত্যি চলে গেল। আমাদের মুখে আর রা নেই কারো। টাকা তিনটে ছুড়ে ফেলে দিয়ে হাবুলও চলে গেল।

তার পর একদিন দু'দিন করে সাত দিন যায় পিন্‌ডিদার আর দেখা নেই। কি যে কাণ্ড হয়ে গেল মাঝখান থেকে কিছুই বুঝছি না। অথচ পিন্‌ডিদা যে রাগ করে এ-রকম করছে তাতো মোটেই নয়! তার তো দরদ-ভরা মুখ উলটে! এ কি পরিবর্তন রে বাবা!

ঘাবড়ে গেছে হাবুলও। সেদিন সে এসে বলল, পিন্‌ডিদার বাড়ি গেছলাম, নিজের তিন তলার চিলে কোঠায় বসে সে দিন-রাত চণ্ডীপাঠ করছে।

আমরা আঁতকে উঠলাম, চণ্ডীপাঠ! চণ্ডীপাঠ কি রে?

—হ্যাঁ চণ্ডীপাঠ। আমাকে দেখে খুব খুশী হয়ে তোদের সক্কলের খবর নিল। বিশেষ করে সোনা তোর। বলল, তোরা জানিস না—ওটা সোনার ছেলে।

আমার পিঠে যেন চাবুক পড়ল একটা। জিজ্ঞাসা করলাম, মাঠে আসবে না আর?

হাবুল জবাব দিল, কিছু বুঝছি না, বললে শুধু হাসে। বলে, সময় বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে রে, কিছু ভালো লাগে না।

আরো সাতদিন কেটে যেতে আমরা হেজেই গেলাম একেবারে। চটপটি ওরা স্বার্থপরের মতো আমার দোষ দিতে লাগল। পারলে হাতে পায়ে ধরেও তাকে আবার ফেরানো যায় কিনা ভাবছি। শেষে সকলে মিলে এক বিকেলে তার বাড়ির তিনতলা চিলে কোঠায় গিয়ে হাজির হলাম আমরা। দোতলায় উঠতে পিন্‌ডিদার মামী বলল, ওটার কি হয়েছে হঠাৎ বলো তো, দিন-রাত তিন তলার ওই ঘরে চণ্ডী নিয়ে পড়ে আছে।

শুনে বুকের তলায় মোচড় পড়তে লাগল আমাদের।

পিন্‌ডিদা কিন্তু আমাদের দেখে মহা খুশী। রুক্ষ মেজাজের সেই পিন্‌ডিদাই নয় যেন আর। হাতের চণ্ডী কোলের ওপর রেখে সানন্দে বলল, এসেছিস তোরা—আয় আয়—সব ছাড়লুম কিন্তু তোদের আর ছাড়তে পারছি না।

আমি কাঁদ কাঁদ সুরে বললাম, আমাদের ছাড়বে কেন পিন্‌ডিদা?

—সব মায়া রে, সব মায়া। যাক তোরা আসবি আমি জানতাম। এই দেখ, তোর জন্যে খামে করে কিছু কথা লিখে রেখেছি, সামনের শুক্ল পক্ষের প্রথম রবিবারের সন্ধ্যায় এটা খুলে মন দিয়ে পড়িস। তোর ভালো হবে—এদেরও ভালো হবে।

খামটা হাতে নিয়ে আমি অবাক্। মুখবন্ধ খাম। ওপরে আমারই নাম লেখা। বললাম, এখনই পড়ে ফেলি না?

—না না না! কি পাগল ছেলেরে তুই—যা লিখেছি আমার গুরুর আদেশে লিখেছি—আমার গুরু হল গিয়ে আমার আত্মা—নির্দেশ অমান্য করলে ক্ষতি হবে, সামনের শুক্ল পক্ষের রোববারে হল গিয়ে আমার নিয়মভঙ্গের দিন—সেই দিন খুলে পড়বি, এদেরও পড়াবি।

খাম পকেটে রেখে অভিমানের সুরে বললাম, তুমি আর তাহলে মাঠে আসবে না?

চুপচাপ খানিক মুখের দিকে চেয়ে থেকে পিন্‌ডিদা জিজ্ঞাসা করল, আমাকে খুব চাস তোরা?

আমরা এক বাক্যে বললাম, খুব চাই, তোমাকে ছেড়ে আমরা থাকতে পারছি না।

—ঠিক আছে, রোববারের ওই নিয়মভঙ্গের দিনই যাব—সেদিন তো আর কিছু বাদ বিচার নেই।

আমরা তাইতেই খুশী আপাততঃ। কেবলু জিজ্ঞাসা করল, নিয়মভঙ্গ কি পিন্‌ডিদা?

—নিয়মভঙ্গ মানে আগের জীবনে ফিরে আসা। সেখানে গিয়েও আবার মা চণ্ডীর আশ্রয়ে ফিরে আসা চাই। ওই রকম করে বাসনার শেষ করতে হয়।

কার্তিক জিজ্ঞাসা করল, মাত্র একদিনের জন্য নিয়মভঙ্গ?

হেসে পিন্‌ডিদা বলল, নিয়ম তো একদিনেই ভঙ্গ হয় রে। তারপর কবে আবার এই জীবনে ফিরে আসব সেটা আমার বিবেচনা আর সাধনার ব্যাপার।

আমি বললাম, নিয়মভঙ্গের দিন তাহলে আমাদের সঙ্গে বসে খেতেও হবে তোমাকে—তাতে তো আর বাধা নেই?

—না, নিয়মভঙ্গ যখন তাতে আর বাধা কি।

চটপটি বলল, তাহলে সেদিন তো আমিষ মানে মাংসটাংসও চলতে পারে তোমার?

পিন্‌ডিদা বলল, তোদের যা খুশি করগে বাপু, আমার কাছে আমিষ নিরামিষ সব এক—মুরগি পাঁটা বাঘ ভালুক সব সমান।

এক ধরনের উত্তেজনা নিয়েই উঠে এলাম আমরা। তারপর ঠিক করলাম, পিন্‌ডিদার নিয়মভঙ্গের দিন দস্তুরমতো ঘটাই করব আমরা। যদি এর ফলে পিন্‌ডিদা তার সাধক জীবনে ফিরে যেতে কিছুদিন দেরি করে। এবারে সকলেই, এমন কি হাবুলও ভালো চাঁদা দিতে রাজী হয়ে গেল। অবশ্য মোট খরচ যা হবে তার অর্ধেকই আমি দেব বলে কবুল করলাম।

সামনের শুক্ল পক্ষের রোববারের তিন দিন আগেই বিনোদের দোকানে অর্ডার চলে গেল। পোলাউ, মাংসের চপ, মাছের ফ্রাই আর মুরগির কালিয়া। শেষে আইসক্রিম। পিন্‌ডিদাকে আমাদের দিকে ফেরানোর চেষ্টা তো করতে হবে।

সেই দিন এলো।

বিনোদ তার রেস্তোরাঁর একটা দিকই খালি করে দিয়েছে আমাদের ছজনের জন্য। রাত সাড়ে আটটায় পিন্‌ডিদাকে নিয়ে আমরা এসে জড়ো হয়েছি। বিনোদের দোকান ফাঁকা তখন, খদ্দের নেই।

পিন্‌ডিদাকে অবাক্ করে দেবার মতোই ব্যবস্থা। খাবার আসতে লাগল। পিন্‌ডিদা দেখছে আর অল্প অল্প হাসছে, কিন্তু অবাক্ আদৌ হচ্ছে না। প্রথম কোর্স অথাৎ পোলাউর সঙ্গে ফ্রাই এবং মাংসের চপ আসতে হাবুল বলে উঠল, হাত লাগাও পিন্‌ডিদা!

টেনে টেনে পিন্‌ডিদা বলল, যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধা রূপেন সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ। বুঝলি কিছু? যে দেবী সকলের মধ্যে ক্ষুধারূপে বসে আছেন, তাঁকে প্রণাম। যাক, এবার নিয়মভঙ্গ শুরু হোক।

খাওয়া শুরু হল। আমরা দেখলাম পিন্‌ডিদা দেখতে দেখতে আগের মতো হয়ে যাচ্ছে। মুখের হাসি কমছে, তেরছা চাউনি ফিরে আসছে। সেই সঙ্গে একাগ্র মনেই খাচ্ছে। আমাদের আনন্দ বাড়ছে—নিয়মভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে পিন্‌ডিদা যেন আগের মানুষ। খুশী হয়ে আমরা পিন্‌ডিদার ডিশে এটা-সেটা চালান দিচ্ছি। পিন্‌ডিদা নির্লিপ্ত মুখে খেয়ে চলেছে।

প্রায় ঘন্টা দুই ধরে চলল এই খাওয়ার পর্ব। পিন্‌ডিদাকে খাইয়ে অত আনন্দ আর বোধহয় কখনো পাইনি আমরা।

খাওয়া শেষ হতে পিন্‌ডিদা সেই আগের মতোই বাঁকা চোখে তাকালো আমার দিকে। মোলায়েম স্বরে জিজ্ঞাসা করল, তোর নামের সেই খামটা এনেছিস? আজই তো পড়ার কথা ছিল—

খাম আমার পকেটে, খাওয়ার আনন্দে অতক্ষণ ভুলেই গেছলাম। আমার নাম লেখা খামে পিন্‌ডিদা কি লিখেছে জানার জন্য আমাদের কৌতূহলের অন্ত ছিল না।

তাড়াতাড়ি খামটা ছিঁড়ে ভিতর থেকে একটা কাগজ বার করলাম। আমার এ-পাশে ও-পাশে পিছনে চটপটি, হাবুল, কার্তিক, কেবলুও ঝুঁকে পড়ল। আমার নাম লেখা চিঠি একখানা। সকলে একসঙ্গে রুদ্ধশ্বাসে পড়তে লাগলাম। কিন্তু পড়তে পড়তে আমার চোখ মুখ অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে টের পাচ্ছি। চিঠিতে বড় বড় হরফে লেখা ঃ

—বৎস সোনা, তুই সত্যিকারের সোনার ছেলে একটা! খাঁটি শিষ্য তার গুরুকে ভালো করে যাচাই করে নিয়ে তবে ক্ষান্ত হয়। তুইও তাই করেছিস। সেজন্য আমি পরম তুষ্ট তোর ওপর। শিষ্যরাই চিরকাল তাদের গুরু সেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে থাকে, চর্ব্যচোষ্য ভোজন করিয়ে নিজেরা সার্থক হয়। গুরু সে-সব খেলেও উদাসীনই থাকে। কিন্তু তুই খাঁটি শিষ্য বলেই আমাকে উলটো পরীক্ষার মধ্যে ফেলতে চেয়েছিলি। আমার কাঁধে খেতে চেয়ে দেখতে চেয়েছিলি আমিও তোদের মতো সাধারণ একজন কিনা।

কিন্তু এবারে বোধহয় চোখ খুলেছে তোর। তাই খুশী হয়ে আমি তোকে একটু বেশী গুরুসেবার সুযোগ দিচ্ছি। নিয়মভঙ্গের দিনে যা খরচ হবে (আমার ধারণা বিনোদের দোকানেই হবে) তার সব টাকা তুই-ই দিয়ে দিবি। চটপটি হাবুল কার্তিক আর কেবলুর কাছে কিছু-কিছু যা আছে, সেই টাকা এখনকার মতো মাঠের খরচের জন্য ওদের পকেটেই জমা থাক্‌।—তোদের পিন্‌ডিদা।

এক হাবুল ছাড়া আমাদের বাকী সকলের মুখে যেন কালি লেপে দেওয়া হল এক এক প্রস্থ। সব থেকে বেশী বোধহয় আমার মুখে।

বড় ঢেঁকুর তোলার সঙ্গে আমার দিকে কঠিন একটা তির্যক দৃষ্টি হেনে পিন্‌ডিদা তার চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল। তারপর বিনোদের দেওয়া এক মুঠ মৌরি ভাজা মুখে ফেলে দোকান থেকে নেমে চলে গেল।
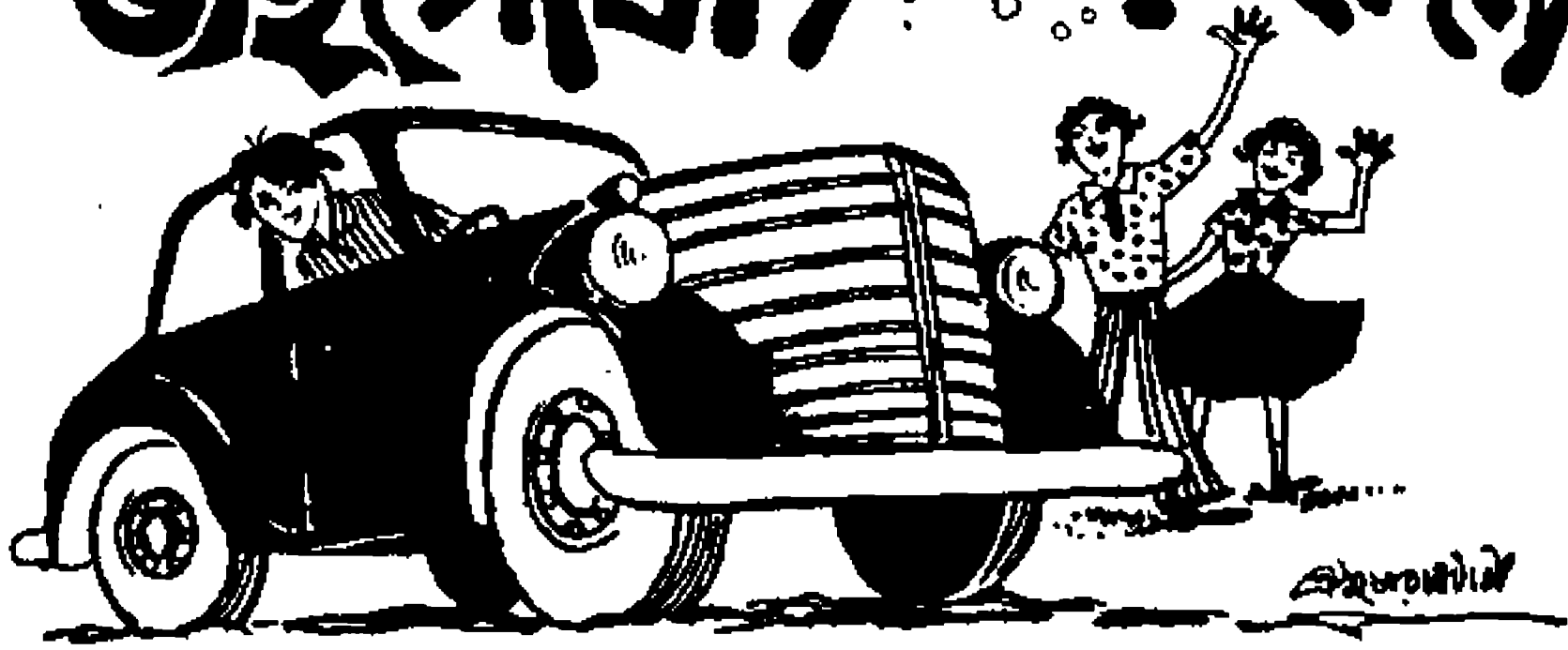
—ধনঞ্জয় বৈরাগী

কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি ঠিক আমাদের বাড়ির সামনে ফুটপাথের ওপর একটা হাড়জিরজিরে পুরোন গাড়ি প্রায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। কি আপদ। একে তো কলকাতার ফুটপাথে আজকাল হাঁটা যায় না, খানা খোন্দলে ভরা। কোথাও উনুন জ্বলছে, কোথাও ফলের খোসা, কোথাও চায়ের ভাঁড়ের স্তূপ। অনেক সাবধানে ডিঙ্গি মেরে মেরে চলতে হয়, নয়ত কখন যে নেড়ী কুকুরের লেজের ওপর পা পড়ে যাবে, কিংবা শিং বাঁকানো গরুর সঙ্গে ধাক্কা লাগবে কে বলতে পারে। এইসব গোদের ওপর বিষফোঁড়া ঐ গাড়ি।

সকালে উঠে দাঁত মাজতে মাজতে কলঘর থেকে গাড়িটা দেখতে পাই। খাবার ঘরের টেবিলে বসলেও নজরে পড়ে। তাছাড়া অফিসে যেতে আসতে তো দু'বেলা ঠোকাঠুকি লাগছেই। বিরক্ত হয়ে যাকেই জিজ্ঞেস করি, এটা কাদের বাড়ির গাড়ি? আমাদের দরজা আটকে পড়ে থাকে কেন? কেউ তার জবাব দেয় না। সবাই কেমন যেন এড়িয়ে যায়।

খুকীকে একটা চকোলেট ঘুষ দিয়ে ওর পেটের থেকে কথা বার করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধে হল না। খুকী ঠোঁট উলটিয়ে বলল, জানি না তো।

বড়, মেজো, ছোট, তিন ছেলেই এ ওর মুখের দিকে তাকালো। চোখে চোখে উত্তরটা ঠিক করে নিয়ে জানাল, বোধ হয় পাশের বাড়ির পল্টুদের হবে।

আমি বললাম, তাহলে পল্টুদের বলে দিও ঐ ভাঙ্গা গাড়িটা আমাদের বাড়ির দরজার সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে।

ওরা বলল, বেশ, বলে দেব।

পল্টুদের ওরা বলেছিল কিনা জানি না, গাড়ি কিন্তু আমাদের দরজা ছেড়ে এক পাও নড়ল না। যেন দেবভাষায় প্রতিজ্ঞা করেছে, পাদমেকং ন গচ্ছামি।

এরই মধ্যে একদিন কিসের জন্যে যেন অফিস থেকে অন্য দিনের চেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছিলাম। ওমা, আশ্চর্য ব্যাপার, দেখি দোরগোড়ায় গাড়িটা দাঁড়িয়ে নেই। তবে কি আমি বাড়িতে না থাকলে উনি সচল হন। মনে মনে ঠিক করলাম আজ নজর রাখতে হবে। দেখতে হবে কখন গাড়ি ফেরে, সেই সঙ্গে গাড়ির মালিককেও চিনে নেওয়া যাবে। এবং তাকে সাফ জানিয়ে দিতে হবে তাঁর গাড়ি তিনি নিজের জায়গায় নিয়ে যান, আমার বাড়ির সামনের ফুটপাথকে বিনা পয়সার গ্যারাজ বানানো চলবে না।

কি জানি, বোধহয় একটু তন্দ্রাভাব এসেছিল। খবরের কাগজটা বুকের ওপর রেখে ইজিচেয়ারে ঢুলছিলাম। হঠাৎ পাড়া-চমকানো ঝড় ঝড়াৎ আওয়াজে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। চোখ কচলে দেখি নানারকম শব্দ বার করে সেই গাড়ি আমাদের রাস্তায় ঢুকল, আর অতি অভ্যস্ত গুটি গুটি পায়ে ফুটপাথের ওপর উঠে আমাদের দোরগোড়ায় প্রভুভক্ত কুকুরের মত জিব বার করে হাঁফিয়ে বসে পড়ল।

আমি তৎপর হই। দেখতে হবে কে বা কারা গাড়ি থেকে নামে, নিশ্চয় পাড়ারই কেউ হবে। বেপাড়ার লোক আর এখানে গাড়ি রেখে যাবে কেন। ওমা, একি ব্যাপার? দেখি একে একে গাড়ির পেছন থেকে বড়, মেজো, ছোট্ট খোকা নামল। ড্রাইভারের পাশের সিট থেকে খুকী আর তার মা। না দেখতে পেলেও বুঝতে আমার বাকী রইল না গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে নির্ঘাত আমার ভাইপো শ্রীমান বীরু।

নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে ওরা ওপরে উঠছিল, আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। খুকীর মা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি এত সকাল সকাল, কিছু হয়নি তো?

গম্ভীর গলায় বললাম, না, আমি বহাল তবিয়তে আছি।

—তাহলে?

—তাহলে আবার কি? এতদিনে বুঝতে পারলাম পল্টুরা তাদের গাড়ি আমাদের দরজায় রেখে যায় কেন।

দেখলাম তিন খোকাই একসঙ্গে জিভ কাটলো।

ওদের মা পরিস্থিতিটা সহজ করার জন্যে বলে, গাড়িটা কিন্তু বেশ, পুরোন হলে কি হবে, বিলিতী জিনিস তো। এখনও দিব্যি চলে।

আমি সে কথায় কান না দিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করি, গাড়িটা কার শুনি।

ছেলেমেয়েদের সগর্ব উত্তর, বীরুদার।

এবার আমার বিস্ময়ের পালা, বীরুর গাড়ি। গাড়ি কিনল কি করে, টাকা কোথায় পেল?

ঠিক এই সময় বীরুর আবির্ভাব এবং সঙ্গে সঙ্গে সপ্রতিভ উত্তর, গাড়িটা এখনও কেনা হয়নি কাকাবাবু, ইঁটের ওপর থেকে পেড়ে এনেছি।

আমি বিরক্ত হই, গাড়ি কি ফল, যে তুমি পেড়ে এনেছো? নাকি ডিম, যে তুমি হাঁস মুরগীর মত নিজে পেড়েছো।

বীরুর প্রাণ জল করা হাসি, তুমি বুঝতে পারছ না, আমার যে বন্ধুর বাবা, যাঁর ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি আছে—

বড় খোকা কথা যুগিয়ে দেয়, যাঁদের মিনিবাস নিয়ে আগের বার আমরা হাজারিবাগে বাঘ শিকার করতে গিয়েছিলাম—

—সেই তাদের ওখানেই এই গাড়িটা ইঁটের ওপর দাঁড়িয়ে থাকত। পুরোন হয়ে গেছে বলে ওরা ব্যবহার করত না। তাই আমি ওটা ইঁটের ওপর থেকে পেড়ে এনেছি।

খুকীর মা আমাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে নিজেই বীরুর হয়ে ওকালতী করে, বীরু তো ভালই করেছে। নিজেরা ক'দিন চালিয়ে গাড়িটা দেখে নেওয়া গেল, তারপর একটা দাম ঠিক করে নিলেই হবে। কি বল?

আমি ছাড়া সকলের সমর্থন। ইচ্ছে করে একটু গলা চড়িয়ে বললাম, তোমরা কি সবাই পাগল হয়েছ, ঐ ভাঙ্গা গাড়িটা পয়সা দিয়ে কিনবে?

—আহা কত আর দাম পড়বে, বীরু তো বলছে হাজার খানেক দিলেই হবে।

আমি দাবড়ে দিই, আজকের দিনে একটা গাড়ি পোষার মানে জান? হাতি পোষার সামিল, পেট্রল চাই, মোবিল চাই, বুড়ো হাড় মটমট করে ভাঙ্গলে তার জন্যে স্পেয়ার পার্টস্ চাই। ওরে বাপ্‌রে। দেউলিয়া হয়ে যেতে হবে।

বীরুর মজা হচ্ছে চট্ করে মাথা গরম করে না। মিষ্টি মিষ্টি হেসে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করে, একি আর আজকালকার দিশী গাড়ি যে গবগব করে তেল খাবে। আর রাস্তায় বেরলেই ব্রেক্‌ডাউন। এ হোল সেই রকম গরু, যে খায় কম অথচ দুধ দেয় বেশী। তুমি দু' লিটার তেল ভরে আমার ঐ মরিসে চড়ে সারা কলকাতা চক্কোর দিয়ে আসতে পারবে। অথচ ভেবে দেখো ট্যাক্সী করে ঘুরতে গেলে তোমার কত খরচা হবে।

আমি তর্ক না বাড়িয়ে দাঁড়ি টানার চেষ্টা করি, প্রথমতঃ কলকাতা চক্কোর দিয়ে বেড়াবার আমার দরকার নেই, দ্বিতীয়তঃ কলকাতার শহরে গাড়ি রাখে কারা, বোকারা। ট্রাম আছে, বাস আছে, কম পয়সায় যেখানে যেতে চাও চলে যেতে পার। তাড়াহুড়ো থাকলে মিনি বাসে চড়। মালপত্তর নিয়ে যেতে গেলে ট্যাক্সী আছে, পাড়ার মধ্যে রিকশা। অতএব গাড়িটাড়ি কেনার কথা একদম ভাববে না, যত তাড়াতাড়ি পার ওটাকে নিয়ে গিয়ে ইঁটের ওপর চাপিয়ে দিয়ে এস।

বীরু কিন্তু কথা না বাড়িয়ে মাথা নীচু করে বলল, তুমি যখন বলছ, তা হবে।

তারপর এক সপ্তাহ কেটে গেল। কিন্তু গাড়ির ইঁট স্থানে ফিরে যাবার কোন লক্ষণই দেখলাম না। সকাল বিকেল তার সঙ্গে আমার মাথা ঠোকাঠুকি হয়, অথচ বেশ বুঝতে পারি আমার অবর্তমানে শ্রীমান বীরু তার কাকীমা আর ভাই-বোনদের নিয়ে ঐ গাড়িতে চেপে অকারণে কলকাতা চক্কোর

দিয়ে বেড়ায়। তাই একদিন রাত্রে শুতে যাবার আগে খুকীর মাকে না বলে পারলাম না, সেদিন যে কথা হল গাড়িটা ফেরত দিয়ে আসা হবে—,

—তাতো হল।

—তবে? গাড়িটা এখান থেকে যাচ্ছে না কেন?

খুকীর মা আস্তে আস্তে কথা পাড়ে, আমি বলছিলাম কি তুমি একদিন গাড়িটা চেপে দ্যাখো না। আমি বলছি তোমার ভাল লাগবে। তাহলে আর তোমাকে ট্রামে বাসে অফিস যেতে হবে না। বীরু তোমায় গাড়িতে নিয়ে যাবে আবার নিয়ে আসবে। তাছাড়া গাড়িটা খুব লক্ষ্মীমন্ত। ওটা আসার পর থেকে কত কি হল দ্যাখো। খুকী ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে। খোকাদের ফুটবল টীম কাপ জিতেছে। বীরুর গল্প 'আগমনী' পত্রিকায় ছেপে বেরিয়েছে। এসব দেখে আমি একটা লটারীর টিকিটও কিনেছি। বলা তো যায় না,—

খুব ইচ্ছে না থাকলেও শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হল। বললাম, ঠিক আছে, সামনের রবিবার তোমাদের গাড়িটা চেপে দেখা যাবে। কিন্তু ভুলেও মনে কোর না, ঐ হাজার টাকা খরচা করে ভাঙ্গা গাড়িটা আমি কিনব।

—ঠিক আছে বাবা কিনতে হবে না। রোববার দিন চড়ে দেখ তো।

সেই কথামত রবিবার সকালে সপরিবারে গাড়িতে ওঠা হল। আমি আর বীরু সামনে, অন্যরা পিছনে। ওদের শলা-পরামর্শ শুনতে পাচ্ছি। বড় খোকার ইচ্ছে শিবপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাবার। ছোট খোকা আর খুকীর আবদার চিড়িয়াখানা, ওদের মার বাসনা বেলুড়-দক্ষিণেশ্বর, শুধু বেড়ানো নয় তার সঙ্গে পুণ্যলাভ!

গাড়ি চলেছে। সারা অঙ্গ দিয়ে বাজনা বাজছে। ঝড়ঝড়, ঝড়াৎ, ঢন্ ঢন্। আমি মন্তব্য করলাম এ গাড়িতে একটা সুবিধে আছে, হর্ন বাজাবার দরকার হবে না। আপনা থেকেই গাড়ির আওয়াজে লোকেরা সরে যায়।

বীরুর শুকনো উত্তর, পুরোন হয়েছে তো, বডিটা মেরামত করাতে হবে। কিন্তু ইঞ্জিনটা দেখেছ, এতটুকু শব্দ নেই।

বলার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা বার কয়েক ঘঙ্ ঘঙ্ করে কেশে দাঁড়িয়ে পড়ল। বীরু অবাক্ হয়, কি হোল?

ছেলেরা চটপট নেমে পড়ে গাড়ির বনেট খুলে ভেতরে কি সব দেখতে থাকে। খুকীর মা মুখে একটা পান ভরে নিজের মনেই বলে, কোনদিন কিন্তু এরকম হয়নি। আজ যে কেন এরকম হল।

আমি শুধু বললাম, হুম্।

বাইরে বেশ গরম। গাড়ির ভেতরটা আরও গরম। মনে মনে ভাবছি রোববারের সকালটা মাঠে মারা গেল। এর চাইতে বাড়িতে আরাম করে শুয়ে বই পড়া যেত।

দেখতে দেখতে বেশ কিছু লোক জড় হয়ে যায়। কথা শুনে মনে হয় সকলেই বুঝি মেকানিক।

কেউ বলে, প্লাগে জল উঠেছে। কেউ বলে, ডিস্ট্রিবিউটারে গোলমাল আছে। কেউ বলে, ময়লা জমেছে তাই তেল আসছে না। আরও কত রকম মন্তব্য। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধস্তাধস্তির পর গাড়ি ঠিক হল। ছেলেরা উঠে পড়ল সীটে।

আমি বললাম, আজ অনেক হয়েছে, চল বাড়ি ফেরা যাক।

সকলের আপত্তি, তাই কখনও হয়। তবে দেরি হয়ে গেছে বলে যদি দূরে কোথাও না যাও, চল আমরা চিড়িয়াখানাতেই ঘুরে আসি।

অগত্যা বললাম, চল।

গাড়ি আবার বাছুরের মত লাফাতে লাফাতে চলতে শুরু করল। সেই সঙ্গে ভেতরে আমরাও সকলে লাফাচ্ছি। আপনা থেকেই এক্‌সারসাইজ হয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ গলিঘুঁজি দিয়ে চলছিলাম, এবার ট্রামরাস্তা। বীরুর চালাবার হাত ভাল। ওর হাতে স্টিয়ারিং অনায়াসে ঘোরে। রিকশা, ঠেলাগাড়ি, গাড়ির মধ্যে দিয়ে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়।

দুটো অ্যাসপিরিন খাবে?

ক্রমশঃ চলার ছন্দ যেন ওকে পেয়ে বসে। ওদিক থেকে ট্রাম আসছে দেখেও ও সামনের ট্রামটাকে টপকে যেতে চায়। যাচ্ছিলও বেশ, কিন্তু গাড়িটা বোধহয় নার্ভাস হয়ে পড়ল। দুটো ট্রামের মাঝখানে গিয়ে হঠাৎ ফ্যাঁচাৎ করে হেঁচে ফেলে থেমে গেল। আমি ভয়ে চোখ বুজে ফেললাম। এই বুঝি ট্রাম দুটো গাড়িটাকে গুঁড়ো করে ফেলে, সেই সঙ্গে আমাদেরও। কিন্তু না। চিৎকার, চেঁচামেচির মধ্যে ভয়ে ভয়ে চোখ খুলে দেখি ট্রাম দুটোও থেমে গেছে যেন জাদুমন্ত্রে। তবে শ'খানেক লোক, ট্রামের কণ্ডাকটার, ড্রাইভার, সকলে মিলে গাড়ি এবং গাড়ির আরোহীদের যা তা গালাগাল করছে। কোনরকমে লজ্জায় নেমে পড়ে পিছনে গিয়ে গাড়ি ঠেলতে লাগলাম। অনেকে সাহায্য করল তাই রক্ষে। ট্রামলাইনের ওপর থেকে গাড়িটাকে কোনরকমে সরিয়ে আনা গেল। ভাগ্যিস পুলিসী হাঙ্গামায় পড়তে হয়নি, তাহলে বোধহয় থানায় ধরে নিয়ে যেত। ঠেলেঠুলে ঘেমে নেয়ে গাড়িটাকে একটা কারখানায় নিয়ে গিয়ে তুললাম। পঁচাত্তর টাকা দণ্ড দিয়ে তবে বাড়ি ফেরা গেল। রাগের চোটে আমি ওদের কারুর সঙ্গেই কথা বলিনি। ওরাও অবশ্য আমার কাছ থেকে দূরে দূরেই থেকেছে।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে বুঝতে পারলাম সারা গায়ে প্রচণ্ড ব্যথা। অফিস কামাই হল। খুকীর মা একবার জিজ্ঞেস করতে এসেছিল, দুটো অ্যাসপিরিন খাবে?

আমি ধমক দিয়ে বললাম, থামো।

ফলে পরের দিনও আমার অফিস যাওয়া হল না।

যাক, ভালর মধ্যে এইটুকু, এর পর গাড়িটাকে আর দেখতে পাই না। আমাদের দোরগোড়ায়

তো নয়ই, পাড়ায় এদিক ওদিক উঁকিঝুঁকি মেরেছিলাম, কোথাও তার টিকিটি দেখতে পাইনি। আপদ বিদেয় হয়েছে ভেবে নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু ওমা, দিন পনেরো বাদে দেখি আবার আমাদের দোরগোড়ায় তার পুনঃ আবির্ভাব। মিটমিট করে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। মনে পড়ল সেই কবিতার লাইনটা। দরজার পাশে দাঁড়ায়ে সে হাসে দেখে জ্বলে যায় পিত্ত। সে তো ছিল 'পুরাতন ভৃত্য'। তাই কবির চিত্ত জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু এ যে পুরাতন গাড়ি, তাই রাগে দাড়ি ওপড়াতে ইচ্ছে করল— আমার নয়, ঐ বীরুর।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। খুকী নিজেই এসে খবর দিয়ে গেল, গাড়িটা এতদিন হাসপাতালে গিয়েছিল, শরীর সারিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে।

বড় খোকা জানাল এ গাড়ি নিয়ে নাকি এখন অনায়াসে দিল্লী পর্যন্ত যাওয়া যায়।

মেজ খোকার বিস্ময়, গাড়িতে এতটুকু আওয়াজ নেই। এমন কি ইঞ্জিন যে চলছে তাই বোঝা যায় না।

ছোট খোকার মন্তব্য, গাড়ির সিটগুলো এখন যেন ডানলোপিলোর গদি। বসে কি আরাম।

ওদের মার গদগদ ব্যাখ্যা, আগে তো গাড়িটার কোন আলো জ্বলত না তাই সন্ধ্যের পর আর ও গাড়িতে বেরন যেত না। এখন সব আলোগুলো আকাশের তারার মত কটকট করে জ্বলছে। আর ভাবনা নেই, এখন থেকে বিয়ে বাড়ি কিংবা রাত্রের শোতে সিনেমা দেখতে যাবার কোন অসুবিধে হবে না।

আমি কোনরকম উৎসাহ প্রকাশ না করে শুধু জানতে চাইলাম, গাড়ি সারাতে নিশ্চয় অনেক খরচা হয়েছে, সে টাকাটা দিল কে?

—টাকা লাগেনি, সঙ্গে সঙ্গে তৈরী উত্তর, বীরুর বন্ধুর গ্যারেজেই সারিয়ে দিয়েছে। আসলে হয়েছিল কি জান, ওদের যে মিনিবাসটা রুটে চলছিল তাতে কনডাকটার টিকিটের টাকার হিসেবের গোলমাল করছিল। বীরু ঐ বাসে ক'দিন বেরিয়ে ওদের রোজগার ডবল করে দিয়েছে। তাই ওর বন্ধুর বাবা খুশী হয়ে গাড়িটা পুরো মেরামত করে দিয়েছেন।

এর পর আর কোন কথা চলে না, আমি চুপ করে গেলাম।

খুকীর মা এতে উৎসাহ পায়। বলে, তুমি এইবার একবার গাড়িটা চড়ে দেখ—

ওর কথা শেষ করতে না দিয়ে আমি চোখ কটমট করে তাকালাম, যেরকম আগেকার দিনে রেগে গেলে মুনি-ঋষিরা তাকাত।

কিন্তু এমনই কপাল সপ্তাহখানেক না যেতেই এ গাড়িটায় আমায় চড়তে হল। অফিসের কাজে ধানবাদ যেতে হবে, ভোরবেলা ট্রেন। ধারে কাছে কোথাও ট্যাক্সী পাওয়া গেল না। মাল নিয়ে ট্রামে বাসে যাওয়া মুশকিল। বীরু এসে বলল, গাড়িতে আমার তেল ভরা আছে, তুমি চল। নির্বিঘ্নে তোমায় স্টেশনে পৌঁছে দেব।

এতে অন্যদেরও উৎসাহ, সেই ভাল হবে, আমরা সবাই মিলে যাব। তোমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে হাত নেড়ে টা-টা করে বাড়ি ফিরে আসব।

অগত্যা রাজী হতে হল। তবে একথা সত্যি, ওরা একেবারে মিথ্যে বলেনি। আগের মত সেই ঝড়ঝড়ে আওয়াজ নেই। সিটের স্প্রিংগুলোও পেছনে ফুটছে না। ইলেকট্রিক হর্নটাও বাজছে। তার ওপর ভোরবেলা বলে রাস্তা ফাঁকা। মহাস্ফূর্তিতে গাড়ি চালাচ্ছে বীরু। কিন্তু ময়দানের কাছে গিয়ে গাড়িটা বাঁ হাতে মোড় নিতেই আমি অবাক্ হই, আরে হাওড়া স্টেশন তো ডান দিকে, বাঁ দিকে যাচ্ছিস কেন?

বীরুর মুরুব্বি চালের হাসি, আমাকে আর রাস্তা চিনিও না। এখনও হাতে অনেক সময় কিনা, তাই একটু ঘুরপথে যাচ্ছি। ঘোড়দৌড়ের মাঠ পেরিয়ে হেস্টিংস হয়ে সোজা স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে গঙ্গার ধার দিয়ে দিয়ে তোমায় হাওড়া ব্রীজে নিয়ে যাব। গঙ্গার ওপর জাহাজ ভাসছে দেখতে খুকী খুব ভালবাসে কিনা।

খুকী মার কোল থেকে সমর্থন জানায়, হাঁ বীরুদা গঙ্গার ধার দিয়ে চল—

সেই মতই চলা হল। আর সেই চলাই কাল হল। পেছনের একটা চাকা গেল ফেটে। গঙ্গার ধারে গাড়ি দাঁড় করাতে হল। আমি আশেপাশে তাকিয়ে দেখি কোথাও ট্যাক্সী পাওয়া যায় কি না। কোথায় ট্যাক্সী। ফাঁকা রাস্তা।

বীরু তখনও দমে না, ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমি দু'মিনিটে চাকা বদলে ফেলছি।

ওর সঙ্গে আমার তিন পল্টনও নেমে পড়ল। কিন্তু পিছনের বুথের ঢাকনা তুলতেই ওদের চক্ষু চড়কগাছ। সেখানে বাড়তি চাকাটা নেই।

বড় খোকার আর্তনাদ শোনা যায়, একি বীরুদা স্টেপনি চাকাটা কোথায় গেল?

বীরুর প্রায় কাঁদ কাঁদ জবাব, তাহলে বোধহয় সেই কারখানাতেই রয়ে গেছে। আনা হয়নি।

খুকীর মার অসহায় প্রশ্ন, তাহলে এখন কি হবে?

আমি ততক্ষণে ব্যাগটা কাঁধের ওপর তুলেছি, বললাম, যা করবার তোমরা কর, এখন হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনে যেতে হবে। ভোরবেলার গাড়ি তো আর ধরতে পারব না। দেখি গিয়ে কোন্ ট্রেন পাই। তবে ফিরে এসে যেন এ গাড়ির মুখদর্শন আমাকে না করতে হয়, এই কথাটা আমি তোমাদের পরিষ্কার বলে দিচ্ছি।

হনহন করে আমি স্টেশনের দিকে হাঁটতে লাগলাম।

সপ্তাহখানেক বাদে ধানবাদ থেকে ফিরে ট্যাক্সী থেকে নেমেই দেখি সেই মরিস গাড়ি এখনও বিদেয় হয়নি, যথাস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। তবে আগে যেমন মুখটা পূর্ব দিকে থাকত, এবার দেখলাম উনি পশ্চিমমুখী হয়েছেন। মনে পড়ল যাবার সময় বলেছিলাম মুখদর্শন করব না, তাই বোধহয় এই পিছন ফিরে থাকা। ঠিক যেন গোপালভাঁড়।

—দাদা কি কলকাতার বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন?

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি প্রশ্নকর্তা আমাদের প্রতিবেশী। ছেলে বুড়ো সবাই তাকে খুড়ো বলে ডাকে। গোলগাল হাসিখুশী মানুষ।

ফিরে এসে যেন এ গাড়ির মুখদর্শন আমাকে না করতে হয়— [পৃ. ৩১৩

বললাম, হ্যাঁ, অফিসের কাজে ধানবাদ গিয়েছিলাম।

—একটা কথা আপনাকে ক'দিন থেকে বলব বলব ভাবছিলাম, মানে আপনার এই গাড়িটা—

আমি তক্ষুণি শুধরে দিই। ওটা মোটেও আমার গাড়ি নয়, আমার ভাইপো কোত্থেকে নিয়ে এসেছে।

—ও, আচ্ছা, আচ্ছা। বউদির কাছে শুনেছেন বোধহয় আমার বড় ছেলের বিয়ে। বর্ষাকাল, ওপরের ছাদটা ঘিরছি, কিন্তু ফুটপাথে নিমন্ত্রিতদের বসবার ব্যবস্থা করতে হবে। পাড়ার সকলের অনুমতি আমি নিয়েছি—

আমিও অনুমতি দিই, —স্বচ্ছন্দে। এ আবার বলবার কি আছে।

খুড়ো তবু কিন্তু কিন্তু করে—মানে বলছিলাম, ঐ গাড়িটা, যদি কোথাও সরিয়ে রাখা যায় তাহলে ফুটপাথটা ব্যবহার করতে পারি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলি, আর কিছু বলতে হবে না। আমি ওপরে গিয়েই বীরুকে বলে দিচ্ছি যার গাড়ি তাকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে।

—অনেক ধন্যবাদ।

পাড়ায় কারুর বিয়ে হলে কদিন ধরেই খুব হইহই চলে। সমবয়সী ছেলেরা কে কি কাজ করবে তার দায়িত্ব ভাগ করে নেয়। মেয়েরা কে কবে কোন শাড়িটা পরবে তাই নিয়ে আলোচনা করে। কর্তারা বিয়েবাড়ির বৈঠকখানায় বসে নানারকম উপদেশ দেন, আর গিন্নীরা অন্দরমহলে কুটনো কোটেন। একঘেয়ে জীবনে এ ধরনের বৈচিত্র্য মন্দ লাগে না। আমারও ভাল লাগছিল। আরও ভাল লাগছিল এই জন্যে যে এই অজুহাতে ঐ গাড়িটা বিদেয় হয়েছে।

বর্ষাকালে বিয়ে দিতে লোকে যা ভয় পায় তাই হল। দুপুর থেকে নামল প্রচণ্ড বৃষ্টি! জলে জলময়। রাস্তা, ফুটপাথ, এমন কি নীচু বাড়ির বৈঠকখানাও জলে ভাসছে। ব্যবস্থা হয়েছিল বর যাবে তার মামার গাড়িতে। যে গাড়িটা কদিন ধরেই বিয়ে বাড়িতে খাটছে। ফুলপাতা দিয়ে তাকে

সাজিয়েও আনা হয়েছিল। আর বরযাত্রীদের জন্য চার পাঁচখানা ট্যাক্সী ডেকে নেওয়া হবে। কিন্তু বৃষ্টির তোড়ে সব ব্যবস্থাই ভেসে গেল। না পাওয়া গেল কোন ট্যাক্সী, না পাওয়া গেল অন্য কোন রকম যানবাহন। সকলে পরামর্শ দিল বরযাত্রীরা না হয় পরে যাবে, বৃষ্টি কমলে। এখন খুড়ো, বর, পুরুত আর নাপিত নিয়ে আগে শালার গাড়িতে চলে যাক। নয়ত লগ্ন পেরিয়ে যাবে, আজ আর বিয়েই হবে না।

বৃষ্টিতে শাঁখও ভাল বাজল না, রেকর্ডের সানাই মিইয়ে গেছে। কোন রকমে উলু উলু দিয়ে বর আর বরকর্তাদের গাড়িতে তুলে দেওয়া হল। কিন্তু কি আপদ, গাড়ি কিছুতেই স্টার্ট নেয় না। শেল্‌ফ্ মারলে কেমন যেন চিঁ চিঁ শব্দ করে। হ্যাণ্ডেল ঘোরালেও আওয়াজ বেরল ভকা ভকা ফস্।

শুধু খুড়োর নয়, পাড়ার সকলেরই মাথায় হাত। বর এখন যাবে কি করে। কনের বাড়ি তো এখানে নয়, সেই বাগবাজারে।

এমন সময় একটা গাড়ির হর্ন শুনে সবাই চমকে ওঠে। আমার চোখ দুটোও ঠিকরে বেরিয়ে যাবার যোগাড়। এ যে সেই গাড়িটা, দিব্যি স্প্যানিয়াল কুকুরের মত সাঁতার কাটতে কাটতে আসছে। সারথী শ্রীমান বীরু চিৎকার করে বরকে বলল, নাটুদা এই গাড়িতে উঠে পড়, খুড়ো আপনিও আসুন। আমি পৌঁছে দিচ্ছি।

মেয়েদের মধ্যে থেকে কারা যেন বলল, আবার শাঁখ বাজাও উলু দাও। শাঁখ আর উলুধ্বনির মধ্যে মামার নতুন গাড়ির পাত্ররা বীরুর ভাঙ্গা মরিসে গিয়ে উঠল। আমার তিন পল্টন যেন তৈরী হয়েই ছিল, বরের গাড়ির ফুলগুলো ফটাফট ছিঁড়ে মরিসের হাতে গলায় পরিয়ে দিল। আর নিমেষের মধ্যে বিজয়িনীর হাসি হেসে বীরুর গাড়ি বর নিয়ে উধাও হয়ে গেল।

আমরা, বরযাত্রীরা ঘণ্টা দুই বাদে জলে কাদায় ভিজে যখন কনের বাড়ি পৌঁছলাম তখন দেখি সম্প্রদান শেষ হয়ে গেছে।

অনেক দিন আগে থেকেই বীরু এ পাড়ার হীরো। এবার তার নাটুদার বিয়ের পর পদমর্যাদাটা যেন আরও বেড়ে গেছে মনে হল। সেই সঙ্গে তার পক্ষিরাজেরও কদর বেড়েছে খুব। বৌভাতের দিন তো দেখলাম বিয়ে বাড়ির সামনে বীরুর মরিস সাদা হাঁস সেজে দাঁড়িয়ে আছে। খুড়ো নাকি খুশী হয়ে দেদার খরচা করে হগ্ মার্কেট থেকে ফুল দিয়ে গাড়ি সাজিয়ে এনেছে। শুধু তাই নয় সেদিন থেকে মরিসকে আর ফুটপাথে পড়ে থাকতে হল না, কারণ খুড়ো তার বাড়ির খালি গ্যারাজখানা বীরুকে গাড়ি রাখার জন্যে ছেড়ে দিয়েছে।

আমাদের বাড়িতেও কথাবার্তার হাওয়া বদলে গেল। ছেলেরা বলল, এই বেলা বাবা গাড়িটা কিনে ফেল, নয় ত বেশী দাম দিয়ে কে কিনে নেবে আমরা পাব না। আমি কোন জবাব না দিয়ে মন দিয়ে কাগজ পড়তে লাগলাম।

ওদের মার গলায় অন্য সুর, তোমায় বলেছিলাম না বীরুর গাড়িটা খুব লক্ষ্মীমন্ত। ও না

থাকলে খুড়োদের শুভকাজটাই পণ্ড হত। আমাদের বাড়ির সামনে কেমন ফুটপাথ আলো করে দাঁড়িয়ে থাকত। এখন ঐ খালি জায়গাটাকে দেখলেই মনটা কেমন কেমন করে।

অরুণার শেষের দিকের কথাগুলো বেশ ছলছলে, চোখের কোণ দুটোও চিকচিক করে উঠল কিনা কে জানে। হাজার হোক মা তো। এ ত একরকম অপত্যস্নেহ।

বীরু ব্যবসায়ী টোপ দেয়, কাকাবাবু হাজার টাকা দিয়ে গাড়িটা কিনে যদি আর দু হাজার টাকা তুমি খরচা কর দেখতে হবে না। ফেলেছড়ে সাত হাজারে বিক্রি হয়ে যাবে। সাধাসাধি করে বাড়ি এসে কিনে নিয়ে যাবে।

এতেও আমি প্রলুব্ধ হলাম না। ফস ফস করে চুরুট খেতে লাগলাম। আমার এই নির্বিকার হবার চেষ্টা দেখে ভগবান বোধহয় অলক্ষ্যে হেসেছিলেন। জানি না বীরুর গাড়িটাও খুড়োর গ্যারেজের ভেতর খুকখুকিয়ে উঠেছিল কিনা।

ঘটনাটা ঘটল দিনকয়েক বাদে। এক শনিবার আমার এক বন্ধুর বাড়ি, ব্যাণ্ডেলে বেড়াতে গিয়েছিলাম সপরিবারে। গঙ্গার ওপরে বাড়ি। সারাদিনটাই বড় আনন্দে কাটল। প্রাকৃতিক শোভা দেখে আর ঘুরে বেড়িয়ে এবং খেয়ে দেয়ে তো বটেই। আমার বন্ধু ছাড়ল না। পরের দিন রবিবারের ছুটি। তাই সে রাতটা ওখানে কাটিয়ে আসতে হল। কিন্তু কলকাতার বাড়িতে ফিরে মাথায় হাত। বাড়িতে চুরি হয়ে গেছে। যে চাকরটা ছিল সে পালিয়েছে। কাজটা যে তারই বুঝতে বাকী রইল না। তবে বোধহয় সঙ্গী জুটিয়ে এনেছিল।

ওপর ওপর দেখেই বোঝা গেল খুকীর মার গয়নার বাক্স চুরি গেছে। সাধারণতঃ গয়না বাড়িতে রাখা হয় না, ব্যাঙ্কে থাকে। খুড়োর ছেলের বিয়ে উপলক্ষ্যে আনা হয়েছিল। গড়িমসি করে আর রেখে আসা হয় নি। কত টাকার গয়না বলা মুশকিল। কিন্তু খুকীর মা তো পা ছড়িয়ে বসে কাঁদতে লেগে গেল। বড় খোকা, মেজ খোকা, ছোট খোকার বউ এলে কাকে কোন গয়নাটা দেবে সব নাকি হিসেব করা ছিল। এমন কি খুকীর আশীর্বাদের জন্যে রাখা জড়োয়া টিক্‌লিটাও চোরেরা নিয়ে পালিয়েছে। সব দোষই নাকি আমার। কেন ব্যাণ্ডেলে রাত কাটাতে গেলাম। নইলে এ সর্বনাশ হত না। ওর দামী দামী শাড়ি আর আমার ভাল স্যুটগুলোও বোধহয় পোঁটলা বেঁধে নিয়ে গেছে।

পাড়ার লোকেরা বলল, চাকরটাকে কাল পর্যন্ত দেখেছে। কিন্তু আজ ভোর থেকে আর দেখেনি। বীরুর গাড়িটাও শনিবার রাত পর্যন্ত দোরগোড়ায় খাড়া ছিল। রোববার সকাল থেকে সেটাও বেপাত্তা।

ছেলেমেয়েদের গাড়ির শোক আর তাদের মার গয়নার শোক। কি আর করি, শেষ পর্যন্ত থানায় গিয়ে রিপোর্ট করে এলাম। তারা বললে কি কি হারিয়েছে তার ফর্দ দিতে, চাকরটার নামধাম, ছবি থাকলে ছবি। গাড়ির নম্বর, ব্লু বুক ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি ওদের বলে এলাম যদি কেউ চুরির মাল উদ্ধার করে দিতে পারে, আমি পুরস্কার দেব।

পুরস্কারের কথা পাড়াতেও ঘোষণা করলাম। আমার বাড়িতেও।

সে রাত্রে আর বাড়িতে রান্নাবান্না হল না। কেই বা করবে, সকলের মন খারাপ। কারুর নাকি খিদে নেই। অগত্যা আমি পাঞ্জাবীর দোকান থেকে তড়্‌কা আর রুটি আনিয়ে খেলাম।

রাত্রে শুতে যাবার তোড়জোড় করছি। তখন প্রায় সাড়ে দশটা হবে। থানা থেকে জানাল আমরা যে গাড়ির নম্বর দিয়েছি সেই গাড়ি হাওড়াতে এক থানায় আটক করা হয়েছে। আমরা যেন এক্ষুণি একবার সেখানে চলে যাই।

বাড়িতে তখনও একথা ভাঙ্গলাম না। শুধু বীরুকে চুপি চুপি ডেকে নিয়ে ট্যাক্সী করে বেরিয়ে পড়লাম।

হাওড়ার সে থানায় পৌঁছে দেখি আমাদের সেই চাকর আর তার দুই সাঙ্গাৎ পুলিসের হাতে মার খাচ্ছে। আমাকে দেখতে পেয়েই পায়ের ওপর পড়ে কাঁদতে লাগল, বাবু বড় অন্যায় হয়ে গেছে, আর কখনও করব না। এরা আমায় মেরে ফেলবে, দয়া করে ছাড়িয়ে দিন।

ওর মুখ থেকেই কাহিনীটা শোনা গেল। চুরি করার মতলব নাকি ওর ছিল না। বদ সঙ্গে পড়ে করে ফেলেছে। ওর সাঙ্গাৎ দুজন দাগী চোর। আমরা রাত্রে না ফেরায় সারারাত ধরে গয়না আর জামা-কাপড় সরিয়েছে। আমাদেরই খাটের ওপর ঘুমিয়েছে। ফ্রীজের মধ্যে যা খাবার ছিল খেয়েছে। তারপর ভোরবেলা গুটি গুটি পায়ে নীচে নেমে বীরুর গাড়িতে মালপত্তর চাপিয়ে ওখান থেকে সরে পড়েছে। মতলব ছিল ওদের আস্তানায় মালগুলো লুকিয়ে রেখে গাড়িটা দূরে কোথাও ফেলে দিয়ে আসবে। কিন্তু এমনই কপাল, হাওড়ার এক গলির মধ্যে ঢুকে ঐ গাড়িটা হঠাৎ ছুটতে লেগে গেল। যে গাড়ি চালাচ্ছিল সে সামলাতে পারে নি। সোজা গিয়ে ধাক্কা মেরেছে এক বুড়ীকে। রাস্তার লোকেরা হইহই করে চেঁচিয়ে উঠেছে তাই ভয়ে পালাতে গিয়ে আর এককাণ্ড। গাড়ি ফুটপাথে উঠে একটা দোকানের কাঁচের শো কেস্ ভেঙে দিয়েছে। আর যায় কোথায়! চারদিক থেকে লোক এসে গাড়ি আটক করল আর তিন সাঙ্গাৎকে নামিয়ে বেদম মেরে এই থানায় জমা দিয়ে দিল।

দেখলাম মালপত্র ওরা কিছু সরাতে পারে নি। শাড়ী, স্যুট, গয়না সবই রয়েছে। থানা অফিসার বললেন, খুব কপাল ভাল মশাই আপনাদের। আর একটু হলেই সব যেত। ভুল করে ওরা আপনাদের গাড়ি চড়ে পালাতে গিয়েই ধরা পড়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কি ঐ গাড়িই এযাত্রা চোর ধরে দিয়েছে।

কথায় বলে সব ভাল যার শেষ ভাল। জিনিসপত্র ফিরে পাওয়ায় বাড়ির সকলেরই আনন্দ। ভোর রাত্রে খুকীর মাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি খুশী তো?

একগাল হেসে খুকীর মা বললে, তুমি যে সবাইকে বলেছিলে, যে চোর ধরে দেবে তাকে পুরস্কার দেবে?

এবার আমিও না হেসে পারলাম না। ব্যাগের থেকে দশখানা একশ টাকার নোট বার করে এগিয়ে দিলাম। বললাম, বীরুর বন্ধুর গ্যারেজে পাঠিয়ে দিও।

এরই মধ্যে একদিন অফিস থেকে ফিরেছি। দেখছি বীরুর গাড়িটা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বনেটের ওপর হাত রাখতেই জল লেগে গেল, কেমন অদ্ভুত লাগল। চেটে দিল নাকি। ইচ্ছে করেই ঘুরে পেছন দিকে গেলাম, মনে হল ল্যাজ নাড়ছে। অদ্ভুত অনুভূতি। তবে বুঝলাম আমাদের পরিবারে আর একটি প্রাণী বাড়ল।

বাপ! ওরে বাপ!

—শ্রীতুষার চ্যাটার্জী

নানাদেশ ঘুরে এসে ফাই মাস্টার
এনাউন্স করে দিল করবেই বার!
অদ্ভুত যান এক চলে মজাদার!
শূন্যেতে ঝাপ্টায় দুটি ডানা তার!

জমিতেও চলে সেটা গড়গড় করে
ডানা মেলে উড়ে যায় আকাশের 'পরে!
হইহই পড়ে গেল দেশে দেশে তাই।
তাজ্জব কল করে মিস্টার ফাই!
লিং শুধু বয়ে আনে যা যা তার লাগে,
বিরাট এক চুপড়িটা বয়ে আনে আগে!
লালরঙ চার চাকা নীল ডাণ্ডায়।
দুজনেতে প্ল্যান কষে বসে ঠাণ্ডায়।
ঈগলের দুটো ডানা রেখেছে রে দূরে।
এনেছে সে বয়ে নিয়ে বহু দেশ ঘুরে!

পেরেক ঠুক ঠোকাঠুকি হাতুড়িটা দিয়ে!
নানাদেশ ঘুরে ফাই এসেছে তা নিয়ে।
বলল আজব কল তাজ্জব ভাই!
চারিদিকে কত প্যাঁচ বলিহারি যাই!
সরকারি টাকা দিয়ে বনল যে যান!
মিস্টার ফাই তার রাখবেই মান!
হাল দুটো নাড়লেই চাকা ঘোরে তার!
এগিয়ে চল্‌ছে গাড়ি দেখ কি বাহার।
ফাই বলে এইবার উড়বে এ যান।
লিং নেচে উঠে বসে ফুর্তির প্রাণ
ঠকাঠক্ ঘটাঘট্ কত কেরামতি!
নড়ে না চড়ে না যান নেই তার গতি?
ওড়ে না আজব যান ডানা নাড়ে খালি,
হায় হায়! শেষে কিরে হল গুড়ে বালি!

হায়! হায়! একি হ'ল প্রেস্টিজ ঢিলে!
এই যান না উড়লে চম্‌কাবে পিলে!
সরকারি টাকা নিয়ে তৈরী এ যান!
ঠিকমত না উড়লে রাখা দায় প্রাণ!
ভেবে ভেবে ফাইয়ের পাকল যে চুল
তৈরীতে হয়েছে কি সমস্ত ভুল।
কল তার ঠিক মত হয়েছে ত বাঁধা
ভেবে ভেবে খালি মনে লাগে তার ধাঁধা।
এত তার গবেষণা বিদেশেতে গিয়ে
বহু পড়ে শিখে এল ডিগ্রীটা নিয়ে!

তবু কেন ওড়ে নাকো অদ্ভুত কল!
ভেবেছিল হাতে নাতে দেখাবে সে ফল!
ডানা নাড়ে দড়ি নাড়ে লাঠি নাড়ে তার
কি হয়েছে যানটার করবেই বার!
লিং আজ ভ্যাবাচ্যাকা বসে আছে চুপ
কানে এল কি শব্দ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্!
ফাই যেই ডানা নাড়ে ঝুড়ি হল কাৎ!
যানখানা উড়ে গেল তাজ্জব বাৎ!
হু হু করে শূন্যেতে উড়ে চলে যান!
লিং ভাবে কি ব্যাপার ধুক্‌পুক্ প্রাণ!
ফাই বসে আনন্দে ফুঁকছে চুরুট!
আকাশেতে ওড়ে যান নেই কোন রুট্!
একমুখ ধোঁয়া ছাড়ে উজবুক গাধা!
বোঝে নাকো প্রাণটা যে দড়ি 'পরে বাঁধা!

উজবুক্! উল্লুক! হাঁদারাম ফাই!
বেঘোরেতে গেল বুঝি তোর প্রাণটাই!
বাঁচাও বাঁচাও বাপ্ উড়ব না আর!
হাঁড়িমুখ থেকে দেখি লালা ঝরে তার!
পিট্‌পিট্ চোখ মেলে দেখছে হেসে
তুলে নিয়ে মুখমাঝে ধরবে ঠেসে!
উজবুক চেয়ে দেখ আসল ব্যাপার!
কোনোদিকে হুঁশ আজ নেই যে খ্যাপার!
আর দরকার নেই টেনে মার লাফ!
সব শখ মিটে গেছে বাপ! ওরে বাপ!

—ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

আজকাল ভূতের গল্প কেউ লেখে না। তার কারণ এই বিজ্ঞানের যুগে ভূত বিশ্বাস করে না কেউ। যদিও বা কেউ লেখেন তো গল্পের শেষে এমন করে দেন যে আসলে ভূত বলে যেন কিছুই নেই, মানুষ মনের ভ্রমে অথবা উলটাপালটা কিছু দেখে অযথা ভয় পেয়ে ভূতের অস্তিত্ব কল্পনা করে নেয়।

আমার এ গল্পটি কিন্তু সেরকম নয়। কেউ বিশ্বাস করুক আর নাই করুক ঘটনাটি ঘটেছিল। আমার মায়ের যিনি বড়মামা তিনি সেকালের একজন নামকরা ডাক্তার ছিলেন। গল্পটা তাঁর মুখেই শুনেছিলাম। তিনি এখন বেঁচে নেই। কিন্তু তাঁর বলে যাওয়া গল্পটি আজও বেঁচে আছে আমার কাছে। তিনি গল্পটি যেভাবে বলেছিলেন ঠিক সেইভাবেই বলছি তোমাদের।

আমি তখন শিবানিপুরে থাকি। ডাক্তারি পাস করে কলকাতায় না গিয়ে গ্রামের মানুষের সেবাতেই জীবন উৎসর্গ করেছি। ভগবানের কৃপায় আমার হাতযশও খুব হয়েছিল তখন। আর বনগাঁয়ে শিয়ালরাজার মতো ঐ অঞ্চলে ডাক্তার বলতে তো আমিই ছিলাম।

তখনকার গ্রামও ছিল গ্রামের মতো গ্রাম।

একেবারে অজ গাঁ যাকে বলে ঠিক তাই ছিল। গ্রাম তখন এমনই ছিল যে এখনকার গ্রামের ছেলেরাও তখনকার সেই গ্রামকে কল্পনা করতে পারবে না।

ওগো আমার কি সর্বনাশ হয়ে গেল গো।

যাই হোক, এই সময় আমার গ্রামের প্রায় পনেরো মাইল দূরের এক গ্রাম থেকে কল এলো আমার। কলেরার কেস। না যাওয়া ছাড়া উপায়ও নেই। তাই যা যা সঙ্গে নেবার নিয়ে আমার একটা ঘোড়া ছিল সেই ঘোড়ায় চেপে রুগী দেখতে চললাম।

সন্ধ্যের মুখে গেছি। তাই যেতে যেতেই রাত হয়ে গেল। কাজেই রুগী দেখার পর ঐ গ্রামেই সে রাত্রে রয়ে গেলাম। রুগীর বাড়ির লোকেরা দুধ মুড়ি মুণ্ডা ও মর্তমান কলা যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়ালো। পেট ভরে তৃপ্তি করে খেয়ে দেয়ে শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। গাঢ় গভীর ঘুমে মগ্ন হয়ে গেলাম আমি।

রাত তখন কত তা জানি না। হঠাৎ একটা ডুকরে ওঠা কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। তারপরই শুনতে পেলাম একটা অস্পষ্ট কোলাহল। বুকটা ধড়াস করে উঠল। রুগী কি মরে গেল নাকি? কিন্তু যা ওষুধ দিয়েছি তাতে মরবার তো কথা নয়। বিশেষ করে রুগীর শারীরিক অবস্থা খুবই ভালো ছিল।

কান্না শুনে তাড়াতাড়ি টর্চ জ্বেলে দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম।

ঘর থেকে বেরিয়েই দেখি একটি অল্পবয়সী বউ উঠোনে শুয়ে আছাড় কাছাড় করে কাঁদছে। আর চেঁচাচ্ছে—ওগো আমার কি সর্বনাশ হয়ে গেল গো। আমার বাপুনকে খেয়ে ফেললে। আমি কোনরকমে আমার খোকাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি। তোমরা বলে দাও আমি এখন কি করবো গো।

বউটির কান্না দেখে বা তার কথা শুনে ভাবলাম হয়তো গো-বাঘা বা অন্য কিছুতে তার বাপুনকে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু আশপাশের লোকেদের মুখে যা শুনলাম তাতে তো নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারলাম না। এও আবার হয় নাকি?

বউটির স্বামী কলকাতায় কাজ করে। প্রতি শনিবার সে বাড়ি আসে। রবিবার থেকে সোমবার ভোরে সে চলে যায়। আজ শনিবার। লোকটি যথানিয়মেই রাত্রিবেলা এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা তার। চোখ দুটো লাল। মাথার চুল উস্কোখুস্কো।

বউটি স্বামীকে জিজ্ঞেস করে—কি ব্যাপার! তোমার শরীর খারাপ নাকি?

লোকটি কোনরকমে শুধু হুঁ বলে। আর কিছু না। রাতের খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত করে না। বিছানা করে দিলে গুম হয়ে শুয়ে থাকে চুপচাপ।

বউটি আর কি করে। মনমরা হয়ে কিছুই বুঝতে না পেরে সামান্য দুটি মুড়ি চিবিয়ে এক ঘটি জল খেয়ে শুয়ে পড়ে ছেলে দুটিকে নিয়ে। একটি ছেলে তিন বছরের। অপরটি ছমাসের।

দেখল ওর স্বামী শিশুটিকেই ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

বউটি শুয়ে থাকে। কিন্তু নানান চিন্তায় তার ঘুম আর আসে না। হঠাৎ একসময় চপাং চপাং শব্দে চমকে উঠে আড়চোখে তাকিয়েই শিউরে ওঠে সে। দেখে তার স্বামী মশারির বাইরে বসে কি যেন খাচ্ছে! দেখেই তো বুক শুকিয়ে গেল বউটির। পাশে হাত বাড়িয়ে দেখল কোলের ছেলেটি নেই। কচি ছেলে রাতভিত কান্নাকাটি করলে দুধ খাওয়াবার জন্য কাঁথা পালটাবার জন্য ছোট্ট চিমনি লণ্ঠনটা অল্প করে জ্বেলে রেখেই শুতো সে। তাতেই দেখল ওর স্বামী মশারির বাইরে বসে সেই শিশুটিকেই ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

বউটির মনে হল সে একবার চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। কিন্তু তা সে করল না। আবার অন্য ছেলেটিকে নিয়ে চুপি চুপি পালাবার মতো সাহসও হল না তার। কেননা পালাতে গেলেই ধরা পড়ে যাবে। তাই করল কি ইচ্ছে করেই ঘুমন্ত ছেলেটার গায়ে জোরে একটা চিমটি কেটে দিল।

যেই না দেয়া অমনি শুরু হয়ে গেল ম্যাজিক।

ছেলেটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। আর ওর স্বামী তাড়াতাড়ি মশারির ভেতরে ঢুকে আধখাওয়া শিশুটিকে যথাস্থানে শুইয়ে দিয়ে যেন কিছুই জানে না এমন ভাবে শুয়ে পড়ল।

বউটি দেখেও দেখল না। যেন ছেলের কান্নায় এই মাত্র ঘুম ভেঙে গেল এমন ভান করে ঢিপ ঢিপ করে ঘা কতক বসিয়ে দিল ছেলেটির পিঠে।

স্বামী বলল—কি হল? রাত দুপুরে শুধু শুধু মারছো কেন ওকে?

বউটি যেন খুবই বিরক্ত হয়েছে এমনভাবে বলল—না। মারবে না। পাপ কোথাকার। প্রত্যেকদিন রাত্রি হলেই ওনাকে মাঠে বসাতে নিয়ে যেতে হবে। ভালো লাগে?

—তা নিয়ে যাও। নাহলে ছেলেমানুষ। বিছানা নষ্ট করে ফেলবে তো।

বউটি এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিল।

ছেলের নড়া ধরে তাকে হিড়হিড় করে টেনে তুলে ঘরের বাইরে এসেই শিকল তুলে দিল দরজায়। দিয়ে এখানে এসে আছাড় কাছাড় করতে লাগল।

সব শুনে তো আমার মাথাটাই খারাপ হবার যোগাড়। আমি বেশ বুঝতে পারলাম বউটির স্বামী হঠাৎ উন্মাদ হয়ে গিয়ে এই কীর্তি করে ফেলেছে। তাই গ্রামের অন্যান্য লোকজন নিয়ে ঘটনাস্থলে গেলাম। গিয়ে দেখলাম গোটা বাড়িটাকে ঘিরে রেখেছে গ্রামের লোকেরা এবং অগ্নিসংযোগও করেছে। খড়ের চালায় একবার আগুন লাগলে সে আগুন থামায় কে? ঘরের ভেতরে বউটির উন্মত্ত স্বামী তখন লাথির পর লাথি মেরে চলেছে আর দরজা খুলে দেবার জন্য চিৎকার করছে।

আমি যেতে যেতে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। আমি প্রত্যেককে ভর্ৎসনা করলাম এই অগ্নিসংযোগের ব্যাপারে। সবাইকেই বললাম—একটা পাগলকে তোমরা এইভাবে পুড়িয়ে মারলে কেন? লোকটাকে বাইরে বার করে বেঁধে রাখতে পারতে।

কিন্তু কাকে কি বোঝাবো। গ্রামসুদ্ধ লোকের প্রত্যেকেরই ধারণা লোকটা মোটেই উন্মাদ নয়। এমন কি আসল লোকই নয়। এটা একটা পৈশাচিক ব্যাপার। পিশাচরা নাকি মাঝে মধ্যে এই রকম নকল মানুষের রূপ ধরে আসে।

যাই হোক। রাত্রি প্রভাত হলে আমি কয়েকজন লোককে পাঠালাম কলকাতায়। তাদের ভুল ভাঙাবার জন্য। কিন্তু তারা সন্ধ্যের পর কলকাতা থেকে ফিরে এসে যা বলল তা শুনে আমার গায়ের লোমসুদ্ধু খাড়া হয়ে উঠল। তারা বলল, লোকটি দিন দুই আগে কলকাতাতেই গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছে। মৃতদেহ মর্গে আছে। এখন ওর বউ ছেলেকে নিয়ে গেলেই লাশ ফেরত দেবে ওরা। দেহটা কলকাতাতেই দাহ করা হবে।

● চাচা আপন প্রাণ বাঁচা—

না নেই!

বাজখাঁই গলাটা শিশিরের। তবে শুধু আমাদের আড্ডাঘরের চার দেয়ালের মধ্যে থাকবার জন্যে নয়, বাহাত্তর নম্বরের সব কটা তলা ছাড়িয়ে বনমালী নস্কর লেনের বাঁক পর্যন্ত পৌঁছোবার মত।

গলাটা অত চড়াবার অবশ্য দরকার ছিল না। তেতালার টঙের ঘরে যাবার ন্যাড়া সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছোবার মত হলেই চলত। কারণ সেখানে তালতলার চটিজোড়ার পেটেন্ট আওয়াজ শোনামাত্রই পালাটা শুরু করা হয়েছে।

বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের টঙের ঘরে যাবার ন্যাড়া সিঁড়িতে তালতলার চটির আওয়াজটা যে কার পায়ের তা নিশ্চয় কাউকে বলে দিতে হবে না।

আওয়াজটা ঘনাদারই পায়ের, আর উঠতি নয় নামতি। মানে ঘনাদা তাঁর টঙের ঘর থেকে নেমে আসছেন। আসছেন মানে আসতে বাধ্য হচ্ছেন। না এসে যাবেন কোথায়? দুদিন ধরে প্ল্যান করে সেই ব্যবস্থাই করেছি। মাছের জন্যে যেমন চার ফেলা, তেমনি তাঁকে টঙের ঘর থেকে টেনে বার করে আনার জন্যে সকাল থেকেই গন্ধ ছড়ানো হচ্ছে বাতাসে।

প্রথমেই সকাল সাতটা না বাজতে বাজতে নীচের রসুই ঘরে রামভুজের তেলের কড়ায় ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে কি যেন ভাজার শব্দ।

সে শব্দ যদি তেতালা পর্যন্ত না পৌঁছোয়, যা ভাজা হচ্ছে তার সুবাস গোটা বাড়ি ত বটেই ছাদ ডিঙিয়ে পাশের বাড়ির মানুষের জিভেও জল না ঝরিয়ে ছাড়বে না।

সে হিঙের কচুরির মোহিনী সুরভিতে যদি কাত না হন, তার পরেই পাড়া আমোদ করা চাকাচাকা গঙ্গার ইলিশ ভাজার গন্ধ।

হিঙের কচুরির সঙ্গে ইলিশ ভাজা কি রসে রুচিতে মেলে?

মিলুক না মিলুক কার্যোদ্ধার হওয়া নিয়ে কথা। তা যে হয়েছে ন্যাড়া সিঁড়িতে চটির আওয়াজেই ত বোঝা যাচ্ছে। নীচে থেকে এসব গন্ধ তাঁর ঘরে গিয়ে পৌঁছোচ্ছে অথচ বনোয়ারীর চুলের টিকিও দেখা যাচ্ছে না ওপরের ছাদে, এ যন্ত্রণা কতক্ষণ আর সহ্য হয়!

আমাদের গণনা মত ঘনাদাকে নিজেই একবার তাই সরেজমিনে তদন্ত করবার জন্যে নামতে হচ্ছে।

তাঁর নেমে আসার খবর জানার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের দোসরা চাল শুরু। সে চাল হল শিশিরের ওই পাড়া কাঁপানো গলায়—না নেই।

নেই?—গৌরের পাল্লা দেওয়া গলার প্রতিবাদ,—মহাভারতে খাণ্ডবদাহের ঠিক বিবরণ নেই? শোন তাহলে,—

শতেক যোজন বন খাণ্ডব বিস্তার
লাগিল অনল, উঠে পর্বত আকার।
কৃষ্ণার্জুন দুই দিকে রহে দুই জন
নিঃশঙ্কে দহয়ে বন দেব হুতাশন
প্রলয়ের মেঘ যেন, শুনি গড়্‌গড়ি।
নানা জাতি বৃক্ষ পোড়ে শুনি চড়বড়ি।
নানাজাতি পশু পোড়ে নানা পক্ষিগণ।
নানাজাতি পুড়িয়া মরয়ে নাগগণ।

গৌর এ পর্যন্ত আওড়াবার মধ্যেই ঘনাদা আড্ডা ঘরে পৌঁছে যান। দরজা থেকে ভেতরে আসবার মধ্যেই সবাই আমরা দাঁড়িয়ে উঠে নিঃশব্দ অভ্যর্থনা জানাই তাঁর মৌরসী আরাম কেদারাটা ওরই মধ্যে একটু ঝাড়ামোছার ভান করে এগিয়ে দিয়ে।

ঘনাদা সে কেদারায় যথারীতি গা এলিয়ে দেওয়ার পরও আমাদের পালা-কীর্তন কিন্তু থামে না। এতক্ষণ ধরে সব কিছুর মধ্যে তা সমানে চলে এসেছে। গৌর তার আবৃত্তি শেষ করতে না করতে শিবু পয়ার থেকে ত্রিপদীতে নামার ভূমিকা করে বলেছে,—শুধু ওই খাণ্ডবদাহ ঠেকাবার জন্যে যুদ্ধটার কথা কি ভুলে যাব নাকি? সব কটি দেবতা আর চর অনুচর নিয়ে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র এসেছেন খাণ্ডব বন বাঁচাতে।—

এই মত গুটিগুটি দেবতা তেত্রিশ কোটি
গেল বন রক্ষার কারণে।
আইল গরুড় পক্ষী সঙ্গে লক্ষ লক্ষ পক্ষী
রক্ষা হেতু নিজ জ্ঞাতিগণে।

যক্ষরক্ষ ভূতদানা　　সহ নিজ নিজ সেনা
　　নানা অস্ত্র শেল শূল লৈয়া।
এমত লিখিব কত　　ত্রিভুবনে আছে যত
　　রহে সবে আকাশ জুড়িয়া।
তবে দেব পুরন্দরে　　আজ্ঞা দিল জলধরে
　　বৃষ্টি করি নিবায় অনল।
আজ্ঞামাত্র অতি বেগে　　সম্বর্তাদি চারি মেঘে
　　মূষল ধারায় ঢালে জল।
প্রলয় কালের বৃষ্টি　　যেন মজাইতে সৃষ্টি—
　　শিলা জলে ছাইল আকাশ।
মহাঘোর ডাক ছাড়ে　　ঝনঝনা ঘন পড়ে
　　তিন লোকে লাগিল তরাস।
দেখি পার্থ মহাবল　　না পড়িতে বৃষ্টি জল
　　শোষক বায়ব্য অস্ত্র এড়ে।
শূন্যে অস্ত্র উঠে রোষে　　শোষকে সলিল শোষে
　　বায়ব্যে সকল মেঘ ওড়ে॥

গৌর শিবুর চেয়ে আমি-ই বা কম যাই কেন? শিবু দম নিতে একটু থামতেই আমি একেবারে মূল মহাভারত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম,—আদি মহাভারতে স্বয়ং ব্যাসদেব কি বলে গেছেন জানিস? বলে গেছেন—ভগবান হুতাশন সপ্ত শিখা বিস্তার করিয়া চতুর্দিকে প্রজ্জ্বলিত হইয়া খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন, তৎকাল যুগান্ত কালের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।...

গুল!—শিশির বাধা দিয়ে মাতব্বরী চালে বললে,—গুল না হলে বেবাক ভুল!

শিশিরের এই টিপ্পনীই করবার কথা। কিন্তু আমাদের রিহার্সেল দেওয়া সিনেরিও মত আমায় কথাটা শেষ করতে দেওয়া উচিত ছিল না কি! আর দুটো লাইন মাত্র বলাটুকুর তর সইল না! তখখুনি ঘনাদার সামনে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে খাণ্ডবদাহ পালার ভুষ্টিনাশ করে দিতে ইচ্ছে করে কিনা?

তবু নিজের মহানুভবতায় রাগটা সামলে পরের সংলাপটা সিনেরিও মাফিক-ই বললাম।

গুল! গুল না হলে ভুল? মহাভারতের? কি বলছ কি?

ঠিক কথাই বলছি।—শিশির যেন তুরীয়লোক থেকে বললে,—মহাভারতে কি ভুল কোথাও নেই?

তুমি যখন বলছ তখন আছে হয়ত!—আড় চোখে একবার ঘনাদার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কিন্তু ভুল বা গুলটা কি জানতে পারি?

তা পারো বই কি—শিশির যেন বাণী বিতরণের ভঙ্গিতে ঘনাদাকেও টেক্কা দিয়ে বললে—

খাণ্ডব বন জ্বালাতে নয় তার আগুন নেভাতেই কৃষ্ণ আর অর্জুনকে লেজে গোবরে হতে হয়েছিল।

তার মানে খাণ্ডব বনে আগুন লাগাতে কৃষ্ণ আর অর্জুন সাহায্য করেন নি? তাঁরা আগুন নেভাবার জন্যেই অস্থির হয়েছিলেন?

একেবারে যেন হাঁ হয়ে প্রশ্নটা শিশিরকেই করলাম বটে, কিন্তু চোখগুলো আমাদের আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দেওয়া ঘনাদারই দিকে।

কি করছেন কি ঘনাদা? এত রকম টোপ ফেলে তাঁকে নামিয়ে আনা, তার ওপর তাঁর মুখের সামনে তাঁরই দেখানো চাল চেলে এই সব বাজে বুকনির বেয়াদবি করা, এতেও ঘনাদা ক্ষেপে উঠবেন না? তাঁকে একেবারে চিড়বিড়িয়ে তোলবার জন্যে আয়োজনের কোন ত্রুটি ত কোথাও রাখিনি। আমাদের এই গা-জ্বালানো বাজে-বুকনির সঙ্গে নীচের রসুইঘর থেকে হিঙের কচুরি আর ইলিশ ভাজার গন্ধটুকুই শুধু তাঁকে পেতে দিয়েছি, আসল মালের এখনো পর্যন্ত দেখাই মেলেনি।

এ সব জ্বালার ওপর খাণ্ডবদাহের এই নয়া ব্যাখ্যায় ঘনাদার ত নিজেরই আগুন হয়ে হুংকার দিয়ে ওঠবার কথা!

কিন্তু তার বদলে ঘরে ঢোকা মাত্র শিশিরের কৌটো খুলে বার করে ধরিয়ে দেওয়া সিগারেটটি মৌজ করে টানতে টানতে তিনি যেন নির্বিকার হয়ে আমাদের কথা শুনছেন মনে হচ্ছে।

এ দিকে আমাদের কথার প্যাঁচের পুঁজি যে ফুরিয়ে এসেছে।

এতদূর পর্যন্ত পৌঁছোবার আগেই ঘনাদা তেতে উঠতে উঠতে একেবারে দাউ দাউ করে জ্বলে আমাদের বেয়াদবির উচিত শিক্ষা দেবেন এই ছিল আমাদের হিসেব।

কিন্তু দাউ দাউ করে জ্বলা কোথায়, ঘনাদার একটু উষ্ম গরম হবার লক্ষণও যে নেই। শিশির ইতিমধ্যেই বেশ ফাঁপরে পড়েছে বোঝা যাচ্ছে।

রিহার্সেল মাফিক আমাদের তখন একটু বাঁকা সুরে শেষ প্রশ্নটা ঝুলি থেকে ছাড়তে হয়েছে।

—জ্বালাবার বদলে কৃষ্ণ আর অর্জুন ত আগুন নেভাতে হন্যে হয়েছিলেন। খাণ্ডব বনে আগুনটা তাহলে লেগেছিল কেন?

কেন লেগেছিল?—জবাবের পুঁজি ফুরিয়ে ফেলে শিশিরের অবস্থা তখন কাহিল। হালে পানি না পেয়ে আমাদের জিজ্ঞাসাটাই আবার আউড়ে বললে,—কেন লেগেছিল জিজ্ঞাসা করছ!

হ্যাঁ করছি।—কথার পিঠে খোঁচাটা দিতেই হল—অর্জুন শ্রীকৃষ্ণ ত আর বনের মধ্যে লুকিয়ে সিগারেট থুড়ি তামাক খাচ্ছিলেন না!

তামাক খাবেন কেন!—সুরটা চড়া হলেও শিশিরের গলায় তখন আর যেন জোর নেই—তামাক বলে কিছু তখন ছিল? ভারতে ত নয়ই ইউরোপে এশিয়াতেও কেউ এ জিনিস জানত না।

শিশিরের এ বিদ্যে জাহিরের চেষ্টাতেও কিন্তু আসল সমস্যার সুরাহা কিছু হল না। আমরা শিশিরকে নাকাল করতে চাই না। কিন্তু যেমন করে হোক তর্কটাকে গরম রাখবার জন্যে শিশিরকেই না খুঁচিয়ে আমাদের উপায় কি?

থাক, তামাক নিয়ে আর জ্ঞান দিতে হবে না!—বলতেই হল আমাদের,—খাণ্ডব বনে আগুন কি করে লাগল, সেইটেই আগে শোনাও।

আগুন লাগল মানে—শিশির এবার তোৎলা হতে শুরু করেছে,—আগুন, কি বলে...বনে আগুন কি কখনো লাগে না?

নিশ্চয়ই লাগে!—আমরাও তখন জুতসই জবাব খুঁজতে দিশাহারা।

কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে আলাদা।—বলে কোন রকমে খেইটা টেনে রেখে ঘনাদার দিকে চাইলাম। দৃষ্টিটা এবার সত্যিই অসহায় করুণ। সত্যি হল কি ঘনাদার?

ডজনখানেক হিঙের কচুরি আর প্রায় ততগুলি ইলিশ ভাজার সদ্‌গতির পর... [পৃ. ৩৩০

এখনো তিনি নির্বিকার! আমাদের বেয়াদবির শোধ নেবার এমন মৌকা পেয়েও মুখ বুজে থাকবেন! এ ভারত যুদ্ধে সত্যিই অস্ত্রগ্রহণ করবেন না একেবারে?

আমাদের ত তাহলে নাকে খৎ দিয়ে রণে ভঙ্গ দিতে হয়। নইলে ওদিকে হিঙের কচুরি আর ইলিশ ভাজা তপ্ত খোলা থেকে নেমে যে ক্রমশঃ জুড়িয়ে মিইয়ে যাবে।

মরিয়া হয়ে তাই সোজা ঘনাদাকেই মুরুব্বি মানলাম,—শুনেছেন ত ঘনাদা আজগুবী কথা! মহাভারতের গুল না ভুল বার করেছে শিশির!

কিন্তু কই তাঁর সাড়া কই। ঘনাদার চোখ দুটো যেন একটু কোঁচকানো। কিন্তু মুখ দিয়ে ত স্রেফ খানিকটা ধোঁয়াই ছাড়লেন!

আর কোনো আশা আমাদের নেই ভেবে যখন হাল ছেড়ে দিয়েছি তখন হঠাৎ অঘটন ঘটে গেল। ঘটল শিশিরেরই ডুবতে গিয়ে কুটো ধরার এক চালে।

আমরা যখন ঘনাদার মুখের দিকে আকুল হয়ে চেয়ে আছি তখন হঠাৎ বারান্দা থেকে তার বাজখাঁই গলা শোনা গেল,—বনোয়ারী রামভুজ! বলি, তোমরা কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছ নাকি! খাবারগুলো কি ভিজে ন্যাকড়া করে আনবে।

বাস ওই কটা কথাতেই অমন ভোজবাজি হয়ে যাবে কে ভেবেছিল!

ঘনাদাকে আরাম কেদারায় হেলান দেওয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসতে দেখা গেল। তারপর আমাদের সকলের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি মুখও খুললেন!

কিন্তু যা আশা করছিলাম সে বজ্রস্বর কোথায়? তার বদলে নরম গলায় যেন একটু আস্কারা দেওয়া জিজ্ঞাসা—শিশির খাণ্ডবদাহের বৃত্তান্তটা বেঠিক বলছে, না?

তা গলাটা খাদেই হোক বা নিখাদে, আমরা ওই মুখ খোলাটুকুতেই কৃতার্থ। আগুনের ওই

শ্রীকৃষ্ণ বলে দিলেন,—তথাস্তু। [পৃ. ৩৩১

ফুলকিটুকুই গনগনে করে তোলবার আশায় প্রাণপণে হাওয়া দিলাম।

শিশির তখন বারান্দা থেকে তার জায়গায় এসে বসেছে। তাকে প্রায় খুনের আসামীর কাঠগড়ায় তুলে কড়া নালিশ জানালাম,—শুধু বেঠিক কি! ও বলছে ভুল না হলে গুলও হতে পারে। কৃষ্ণ আর অর্জুন নাকি খাণ্ডব বনে আগুনই লাগায় নি!

তা, শিশির ভুল আর কি বলেছে!

একেবারে হাঁ হয়ে গিয়ে ঘনাদার দিকে তাকালাম। না, আমাদের শোনার কিছু ভুল হয় নি। কথাগুলো ঘনাদার মুখ থেকেই বেরিয়েছে।

কিন্তু, খাণ্ডববনে আগুন তাহলে লাগল কি করে?—হতভম্ব মুখে আগের মিথ্যে করে বানানো প্রশ্নটা এবার সত্যি করেই বললাম ঘনাদাকে।

উত্তর তখনই মিলল না। ঘনাদার চোখ তখন বনোয়ারী যেখান দিয়ে ঢুকছে সেই দরজার দিকে।

উত্তরের জন্যে একটু অপেক্ষা করতে হল তাই। একটু মানে, আলুর দম সমেত ডজন খানেক হিঙের কচুরি আর প্রায় ততগুলি ইলিশ ভাজার সদ্‌গতির পর বনোয়ারীর দেওয়া প্লেটটি চাঁছাপোঁছা হয়ে যতক্ষণ না ঘনাদার কোল থেকে আবার সামনের টেবিলে নামল।

প্লেট নামিয়ে চায়ের পেয়ালাটা মুখে তোলবার পর নিজে থেকেই আমাদের প্রশ্নটা স্মরণ করে বললেন—কেমন করে খাণ্ডববনে আগুন লাগল জিজ্ঞাসা করছ? কেমন করে আর! অগ্নিদেব নিজেই আগুন লাগালেন নিজের গরজে।

মহাভারতেও ত তাই আছে—আমরা উৎসাহিত হয়ে যা বলতে যাচ্ছিলাম তা আর বলা হল না। ঘনাদা তর্জনী আর মধ্যম আঙুলের মাঝে শিশিরের জ্বালিয়ে দেওয়া পরের সিগারেটটি ধরে বাধা দিয়ে বললেন,—ওইটুকুই মহাভারতে ঠিক আছে, তার বেশী নয়।

তার মানে?—আমাদের বিস্ফারিত চোখে বলতেই হ'ল—ইন্দ্রদেব মেঘের পাল নিয়ে বৃষ্টিতে আগুন নেভাতে আসেন নি?

আসবেন না কেন?—ঘনাদা এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, ইন্দ্রদেবও বৃষ্টি নামিয়েছেন, কৃষ্ণার্জুনও সে বৃষ্টি উড়িয়ে দিয়েছেন অস্ত্রের কেরামতিতে, কিন্তু সে লড়াই ত আপোসের। তলায়

তলায় ইন্দ্রদেবের সঙ্গে কৃষ্ণার্জুনের সড়্-ই ছিল ওই রকম।

ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণ আর অর্জুনের সড়্!—আমরা সত্যিই এবার থ,—অগ্নিদেবের বিরুদ্ধে।

বিরুদ্ধে কেন হবে। তাঁরই মঙ্গলের জন্যে!—ঘনাদা কেদারায় হেলান দিয়ে এবার করুণা করে একটু বিশদ হলেন।—আসলে কৃষ্ণ আর অর্জুন খাণ্ডব বনে এসেছিলেন ময়দানবকে খুঁজতে। দুনিয়ায় ময়দানবের মত এত বড় কারিগর আর নেই। ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের যে সভাঘর তৈরী হবে তার জন্যে ময়দানবকে দরকার।

খাণ্ডব বনে ছোটাতে ছোটাতে ওঁর কাল ঘাম বার করার ব্যবস্থা করব। [পৃ. ৩৩২

কিন্তু খাণ্ডব বনের কাছে পৌঁছোতে এক চিমসে হাড্ডিসার বামুন ধুঁকতে ধুঁকতে তাঁদের সামনে এসে হাজির। ধনঞ্জয় চিনতে না পারলেও বাসুদেব তাঁকে দেখেই চিনেছেন।

এ কি অগ্নিদেব! একি চেহারা হয়েছে আপনার!

আর বল কেন!—বলে অগ্নিদেব তাঁর অসুখের যে লম্বা ইতিহাস শুরু করলেন তা আর শেষই হতে চায় না। শেষ পর্যন্ত তা থেকে মোদ্দা কথা যা জানা গেল তা এই যে শ্বেতকী নামে এক রাজার যজ্ঞের বাতিকেই অগ্নিদেবের শরীরের এই দশা। শ্বেতকী রাজার যজ্ঞ করে আর আশ মেটে না। বছরের পরে বছর এক পুরুত হার মানলে রাজা অন্য পুরুত দিয়ে শুধু যজ্ঞই করে যায়, আর অগ্নিদেবকে সেই অফুরন্ত যজ্ঞে বসে বসে জালা জালা ঘি খেতে হয়। সেই ঘি খেয়ে খেয়েই অগ্নিদেবের এমন অগ্নিমান্দ্য যে কিছু আর হজম হয় না, কিছু মুখে রোচে না। সারাক্ষণ শুধু পেট জ্বালা আর চোঁয়া ঢেঁকুর।

তা আপনাদের স্বর্গের অতবড় কবিরাজ অশ্বিনীকুমারদের একবার দেখালেই ত পারেন!—না বলে পারলেন না ধনঞ্জয়।

তা কি আর দেখাই নি!—করুণ স্বরে বললেন অগ্নিদেব,—আর তাঁদের বিধান শুনেই ত আপনাদের কাছে এসেছি।

তাঁদের বিধান শুনে আমাদের কাছে—অর্জুনও অবাক্,—কি তাঁদের বিধান?

বড় কুমার বলেছেন, মাংস খান যত পারেন আর ছোট বলেছেন, সেদ্ধ টেদ্ধ নয়, শুধু আগুনে ঝলসানো টাটকা মাংস খেতে।—অগ্নিদেব নিজের সমস্যাটা ব্যক্ত করলেন,—তাই এই খাণ্ডব বনটা

জ্বালাতে এসেছিলাম। কিন্তু এ বন আবার দেবরাজ ইন্দ্রের খাস তালুক। কোথাও দুটো মরা গাছের শুকনো কাঠ একটু ধরাতে না ধরাতেই একেবারে আকাশ-ফুটো-করা জল ঢেলে নিভিয়ে দেন। এই দুঃখেই আপনাদের কাছে এসেছি। দোহাই আপনাদের, দেবরাজ ইন্দ্রকে যেমন করে হোক ঠেকিয়ে খাণ্ডব বনটা আমায় পুড়িয়ে খেতে দিন।

অগ্নিদেবের মিনতি শেষ হতে না হতেই শ্রীকৃষ্ণ বলে দিলেন,—তথাস্তু। আপনি খুশিমত খাণ্ডব বন পোড়ান গিয়ে যান। দেবরাজ ইন্দ্রকে আমরা সামলাচ্ছি।

অগ্নিদেব ত শুনেই খুশী হয়ে চলে গেলেন। অর্জুন কিন্তু হতভম্ব।

এ কি করলে বন্ধু!—কৃষ্ণকে তিনি অবাক্ হয়ে বললেন,—কিছু না ভেবেচিন্তে অগ্নিদেবকে তথাস্তু বলে দিলে! খাণ্ডব বন আমরা পোড়াতে দেব কেন? এত কষ্ট করে যাঁকে খুঁজতে এসেছি সেই ময়দানব ওখানে থাকেন। তা ছাড়া বনের জন্তু-জানোয়ার আমাদের কি করেছে যে তাদের এমন সর্বনাশে সাহায্য করব! দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গেই বা এমন অন্যায় করে যুদ্ধ করতে যাব কেন?

আহা সত্যি কি ওসব করব নাকি!—হেসে বললেন শ্রীকৃষ্ণ,—দেবরাজকে স্মরণ করে এখুনি চালটা সব বুঝিয়ে দিচ্ছি। অগ্নিদেব নিজে যা পারেন করুন, আমরা বাইরে থেকে তাঁর হয়ে দারুণ যুদ্ধ করার ভান করে ইন্দ্রদেবকে আগুন নেভাতেই সাহায্য করব।

বলছ কি?—ধনঞ্জয়ের দু চোখ এবার কপালে,—অগ্নিদেবকে অমন মিথ্যে ভরসা দিলে!

দিলাম ওঁরই ভালোর জন্যে!—আশ্বাস দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন বাসুদেব,—শুধু ঘি খেয়ে ত নয়, নাগাড়ে যজ্ঞস্থানে থুস হয়ে বসে বসে ভুজ্যি খেয়ে ওঁর পেটের ওই অবস্থা। মাংসের চেয়ে ওঁর বেশী দরকার একটু ছোটাছুটি। তা এই খাণ্ডব বনে ছোটাতে ছোটাতে ওঁর কাল ঘাম বার করবার ব্যবস্থা করব। উনি কোথাও দুটো শুকনো কাঠ ধরাতে না ধরাতেই দেবরাজ পশলা পশলা বৃষ্টি ঢালবেন তা নেভাতে, আমরাও তা ঠেকাবার নামে পবনদেবকেই রাখব রুখে যাতে আগুন না ছড়ায়। তাতে অগ্নিদেবকে সারাক্ষণ ছোটাছুটিই করতে হবে সারা বন, শুকনো জায়গার খোঁজে। তাতে শিকার যা পান বা না পান তাঁর পেটের রোগ একেবারে যাবে সেরে।

কিন্তু,—অর্জুন একটু আপত্তি জানাতেই শ্রীকৃষ্ণ হেঁকে বললেন,—অগ্নিদেব যদি জানতে পারেন সেই ভয় করছ ত? না সে ভয় নেই। অগ্নিদেব জানবেন আমরা দুজনে যুদ্ধ করে একেবারে ফাটিয়ে দিয়েছি। কেমন করে জানাবেন? ওই যে বায়স কটি দেখছ। মাথার ওপর কা কা করছে। ওরা হ'ল বার্তা বিশারদ, সংবাদ দেবার নেবার সাংবাদিকও বলতে পারো। কা, কা করে ওরা খবর কুড়িয়ে আর ছড়িয়ে বেড়ায়। ওদের মুখেই আমাদের চুটিয়ে লড়াই করার খবর অগ্নিদেবকে আমি পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। আপাততঃ ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসভাতেও এই বিবরণই যাবে। শেষ কালে শুধু ছোট একটু টীকা থাকবে, এ অলীক বিবরণের কারণ বুঝিয়ে তা সংশোধন করার।

ঘনাদা থামলেন।

তারপর নিজে থেকেই আমাদের জিজ্ঞাসাটা আঁচ করে নিয়ে বললেন,—মহাভারতে সে টীকাটা

কেন নেই জানতে চাইছ ত? না, দারুক মূষিক কোম্পানি কি বল্মী বিশারদের কাজ এটা নয়। দোষ তালপাতা যোগান যে দিয়েছিল সেই ব্যাপারীর। গণেশঠাকুরকে যে সব তালপাতার যোগান দেওয়া হয়েছিল তার কিছু ছিল রীতিমত পুরোন, ঘুন-ধরা মুচমুচে। পুঁথির রাশ নাড়া-চাড়ার সময় তার খাস্তা হয়ে যাওয়া একটা টুকরো কখন কোথায় খসে পড়েছে কেউ টেরই পায় নি। টীকাটুকু ওখানেই ছিল।

ঘনাদা কেদারা ছেড়ে উঠলেন। তাঁকে আর চাইতে হল না। পকেট থেকে গোটা একটা সিগারেটের টিন বার করে শিশির নিজেই তাঁর হাতে গুঁজে দিলে।

● **বাসে চড়ার সহজ উপায়—**

ব্রাহ্মণ
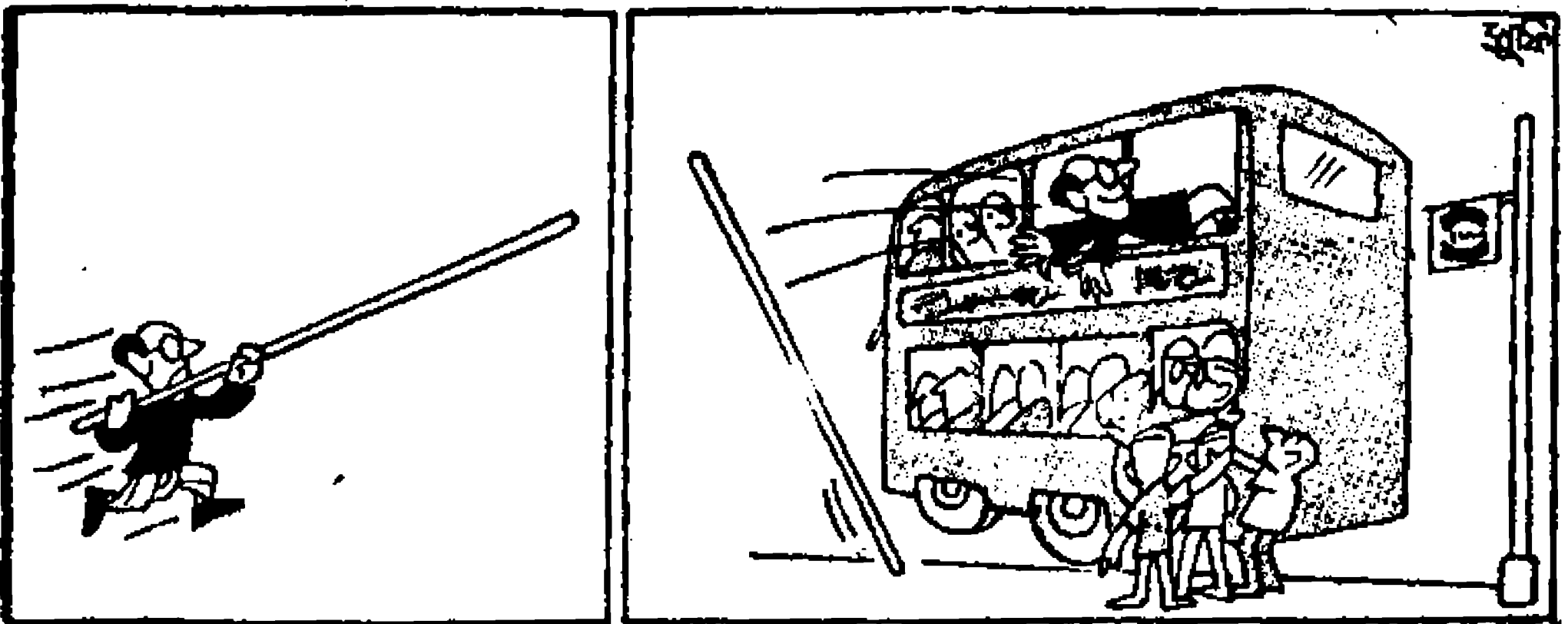
—শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

বশিষ্ঠের তপোবনে একদিন নিরজনে প্রবেশেন বিশ্বামিত্র ঋষি।
নয়নে অনল জ্বলে, সিদ্ধকাম তপোবলে, সেই গর্ব আছে অঙ্গে মিশি।
ব্রহ্মা দিয়াছেন বর আর আছে কারে ডর, পদানত ভয়ে ঋষি, মুনি।
এত যদি হ'ল তবে বশিষ্ঠে দেখিতে হবে, কিসে তিনি তাঁর চেয়ে গুণী ?
সৌম্য শান্ত তপোবন, আসিলেন তপোধন, বশিষ্ঠ আছেন যেথা বসি,
বিহরিছে মৃগকুল, বিকশিত কত ফুল, গগনে শোভিছে রাকা শশী।
বলিলেন দৃঢ় স্বরে, 'হয়েছি ব্রহ্মার বলে দুর্লভ দ্বিজত্ব অধিকারী,
সবি আজ হস্তগত, ষড়রিপু পদানত, আমি পূত যজ্ঞসূত্রধারী।
স্বীকার করুন মোরে, নহে তপঃতেজ-জোরে প্রলয় ঘটাব পুনঃ আজি'
বশিষ্ঠের ওষ্ঠ নড়ে গভীর আবেগভরে, কম্বুকণ্ঠ ধীরে উঠে বাজি—
'ব্রাহ্মণের গুণপনা যাঁর নাই এককণা, কেমনে ব্রাহ্মণ তাঁরে ধরি ?'
বিশ্বামিত্র গর্জি উঠে, নয়নে অনল ছুটে, রোষে অঙ্গ কাঁপে থরথরি।

শপথ করিয়া কন, 'শোন তবে হে ব্রাহ্মণ, মারণ যজ্ঞের হও হোতা।
করি যজ্ঞ অভিনব মস্তক খসুক তব, শোনে নাই যাহা কেহ কোথা।'

বশিষ্ঠ 'তথাস্তু' বলি ধীর পদে গেল চলি। বিশ্বামিত্র ভাবিল বিস্ময়ে,
নিজমৃত্যু কথা শুনি কোন গুণে হয়ে গুণী মুখ ম্লান হইল না ভয়ে।
যজ্ঞকুণ্ড উঠে জ্বলি—হায়, একি হ'ল বলি কাঁদে লোক তপোবন ঘিরে,
হস্তে কমণ্ডলু ধরি, বশিষ্ঠ গায়ত্রী স্মরি' যজ্ঞভূমে প্রবেশেন ধীরে।
যজ্ঞ করি বিধিমত উচ্চারিয়া মন্ত্র যত পূর্ণাহুতি দিতে উঠে হোতা,
হাতে মুখ ঢাকে সবে, বীভৎস দেখিতে হবে, অঙ্গুলি কানেতে দেয় শ্রোতা।
প্রথম আহুতি হ'লে বিশ্বামিত্র পুনঃ বলে, এখনো বলুন মোরে দ্বিজ,
তা না হলে মাথা খসি যাবে হোমানলে পশি—বৃথা বাহিরিবে প্রাণ নিজ।'
হাসিয়া বশিষ্ঠ কন, 'যে জন ব্রাহ্মণ ন'ন, কেমনে ব্রাহ্মণ বলি তাঁরে ?
প্রাণ তুচ্ছ বলে মানি, সত্যই শাশ্বত জানি, মৃত্যু ধ্রুব অনিত্য সংসারে।'

এত বলি মন্ত্র পড়ি পাত্রে ঘৃত-অর্ঘ ধরি ব্রহ্মর্ষি আহুতি দেন পুনঃ।
বিশ্বামিত্র মূঢ় প্রায় বশিষ্ঠ সমীপে ধায়, বলে, 'প্রভু নিবেদন শুন।'

সময় বহিয়া যায়—যজ্ঞ শেষ হ'ল প্রায়, শেষ আহুতির লগ্ন আসে,
বশিষ্ঠের পায়ে পড়ি বিশ্বামিত্র গড়াগড়ি দিয়ে নয়নের জলে ভাসে।
উদাত্ত সহজ স্বরে বশিষ্ঠ প্রচার করে, 'ওঠ, ক্ষমা-সুন্দর, ব্রাহ্মণ,
গেছে দম্ভ, অভিমান, প্রেমে, ক্ষেমে পূর্ণ প্রাণ—ত্যাগ, তিতিক্ষায় ভরা মন।''

—দক্ষিণারঞ্জন বসু

তিস্তা নদীর মতোই পুরোনো এ কাহিনী।

লোকের মুখে মুখে যেমন তিস্তার কথা, সেই দুঃখের নদী তিস্তার মতোই দুঃখের কাহিনী দুখাতির লোককথা যুগ যুগ ধরে লোকের মুখে মুখে চলে আসছে।

ভৈচালু দেউনিয়ার ছেলের বৌ হয়ে হাসিখুশি যে বালিকাটি এলো সে সচ্ছল ঘরেরই মেয়ে। অদূরের এক গাঁয়ে বেড়াতে গিয়ে সে গ্রামের এক বৃদ্ধ সম্পন্ন চাষীর এই মেয়েকে দেখেই খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল ভৈচালুর। সঙ্গে সঙ্গেই সে ঐ বুড়ো গৃহস্থের কাছে গিয়ে প্রস্তাব নিয়ে হাজির হলো। রাজবংশী ভাষায় সরাসরিই বলে বসলো, বুড়ার মেয়েটিকে তার চাই। তার একমাত্র ছেলের বৌ করে সে ওকে নিয়ে যাবে। মহাসুখে থাকবে তার মেয়ে। প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করবে। মেয়ের জন্যে কোনো ভাবনাই তাকে করতে হবে না, ইত্যাদি নানা লোভের কথা শুনিয়ে বুড়োকে একরকম রাজী করিয়ে ফেললো ভৈচালু। তবু একটু হাতে রেখেই বৃদ্ধ তার মত দিলে। বললে, মা-মরা মেয়ে। ওর একটা দাদা আছে, বড়ো ভালোবাসে সে বোনকে। আমার সেই ছেলে চাষে বেরিয়ে গেছে। ফিরলেই আমি তাকে সব কথা জানাবো। সে নিজে গিয়ে মশাইয়ের বাড়িতে বসে বিয়ের ব্যাপারটা সব পাকাপাকি করে আসবে।

মেয়ের বাপ এই বলে তার ভাবী বেয়াইয়ের নাম-ঠিকানা ইত্যাদি রেখে দিলে। ছেলের বাপ বেশ খুশী মনেই তার নিজের গাঁয়ে চলে গেল।

ছেলে বাড়ি ফিরতেই বুড়ো ভৈরব ডাকুয়া তাকে কাছে ডেকে বললে, শোন ভানু, পাশের গাঁও থেকে দেওকীর বেশ ভালো একটা সম্বন্ধ এসেছে। আমি একটু হাতে রেখেই ছেলের বাপকে কথা দিয়েছি। তুই কালই গিয়ে ছেলেদের অবস্থা ও অন্য সব খোঁজখবর নিয়ে আয়। সব দিক্ থেকে ভালো মনে হলে একেবারে পাকাপাকি করে আসলেই বা কি ক্ষতি। আমার শরীরের যে অবস্থা তাতে ক'দিন টিকে থাকবো তার কিছুই তো আঁচ করা যায় না।

বলেই ছেলের হাতে ভৈচালু দেউনিয়ার নিজের হাতের লেখা নাম-ঠিকানাটা তুলে দিলে ভৈরব ডাকুয়া।

নামটা পড়েই হাঁক দিয়ে উঠলো ভানু, এ-সম্বন্ধের ব্যাপারে দেখাদেখির আর কিছুই নেই বাবা। ভৈচালু দেউনিয়াকে এক ডাকে চিনবে না তেমন মানুষ এ তল্লাটে নেই। তবু কালই সকালে দেউনিয়াদের বাড়িতে আমি চলে যাবো এবং দেওকীর বিয়ের ব্যবস্থা একেবারে পাকা করে আসবো।

যেমন কথা তেমন কাজ। বয়েস কম হলে কি হবে ভানু ডাকুয়া সত্যি কাজের মানুষ। সঙ্গীসাথী ও সমবয়সীরা ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজে কেউ এঁটে উঠতে পারে না বলেই ওরা ওকে ডাকে ডাক্কু বলে। ডাকুয়ার পরিবর্তে ডাক্কু। এভাবে ওর পুরো নামটাই সবাই মিলে করে নিয়েছে ভানু ডাক্কু।

যাই হোক ভানুর ব্যবস্থা মতোই নির্দিষ্ট দিনে বেশ সমারোহ সহকারেই দেওকীর বিয়ে হয়ে গেল ইন্দর দেউনিয়ার সঙ্গে। দুই তরফেই অনেক খরচপত্র হলো বিয়েতে। দু'পক্ষই বেশ খুশী।

খুব সুখ শান্তির মধ্যেই দিন কাটছিল দেওকীর। ভানু মাঝে মাঝেই বোনের বাড়িতে গিয়ে সেই সুখশান্তির খবর নিয়ে এসে তার প্রায় শয্যাশায়ী বাপকে এসে জানায় এবং তা জানতে পেরে বুড়ো ভৈরব ডাকুয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। আর একটা মাত্র কাজ তার বাকী। ছেলেটাকে বিয়ে দিয়ে যেতে পারলেই ভৈরব হাসতে হাসতে যমের বাড়ি চলে যেতে পারে, একথা সে বহু লোককেই একাধিকবার বলেছে।

সেই ভানুরও বিয়ে হয়ে গেছে তার বোনের বিয়ের এক বছর যেতেই। সে বিয়েতে প্রচুর উপহারাদি দিয়েছিল দেওকী আর ইন্দর এবং খাটাখাটুনিও করেছিল যথেষ্ট।

তার পরে আরো প্রায় বছর দেড়েক কাটিয়ে দিয়ে চিরবিদায় নিতে হয়েছিল ভৈরব ডাকুয়াকে। ঠিক সময়েই চলে গেছে ভৈরব। তা না হলে তার আদুরে মেয়ে দেওকীর "দুখাতি" নামটা তাকে শুনে যেতে হতো। তা কি সে সহ্য করতে পারতো? কিছুতেই পারতো না।

রাজবংশীদের মধ্যে একটা প্রবাদবাক্য চালু আছে যাতে বলা হয়েছে—'বেটীর কপাল আর বান্দীর কপালের সুখদুঃখ কায় গণিবার পারে?'

দেওকীর বেলায় সেই প্রবাদটা সত্যি সত্যি প্রমাণিত হয়ে গেল।

তিস্তার তীরে সুন্দর সাজানো বাড়ি ভৈচালু দেউনিয়ার। প্রায় বছরই দুঃখের নদী তিস্তায় বান

ডাকে, বন্যায় ভাসিয়ে নেয় চারদিক। কিন্তু সেই বন্যায় কোনোবারই চূড়ান্তভাবে বিপন্ন হয়নি দেউনিয়া-বাড়ি, যে জন্যে একটা কথা অনেককাল ধরেই এ অঞ্চলে চালু হয়ে গিয়েছিল যে ভৈচালু দেউনিয়া সত্যি সত্যি একজন ভাগ্যবান পুরুষ এবং সে কারণেই এমন কি তিস্তার রুদ্ররোষও তাকে তেমনভাবে স্পর্শ করে না।

কিন্তু সেবারের বন্যায় ভাগ্যবান ভৈচালুর বাড়িঘর, জমিজমা ও গরু-মোষ ইত্যাদি কোথায় যে ভাসিয়ে নিয়ে গেল তার আর কোনো হদিসই পাওয়া গেল না। ইন্দর আর দেওকীর দুঃখের জীবন শুরু হলো সেই থেকে। সেই অপরিসীম দুঃখের জন্যেই আশপাশের সব লোকরা দেওকীকে ডাকতে আরম্ভ করলো দুখাতি বলে। দেখতে দেখতে তার এই দুখাত্তি নামটাই সর্বত্র চালু হয়ে গেল।

সোনাদানা সব গিয়েছে দেওকীর। টাকা-পয়সা, বিছানাপত্তর এবং সব সাজ-সরঞ্জামই চলে গেছে তিস্তার কবলে। বাপ-মা ও স্ত্রীকে নিয়ে ইন্দর এখন ভিখারীর মতোই চারদিকে ঘুরে বেড়ায়।

কোনো দিন খাওয়া জোটে, কোনো দিন জোটে না। এমনি ভাবেই ওদের দিন কাটে। বাপ না থাকলেও দেওকী তার বাপের বাড়ির গ্রামেই চলে এসেছে সবাইকে নিয়ে। কোনো রকমে একটু মাথা গুঁজতে পারার মতো একটা ডেরা বেঁধে নিয়েছে ওরা মাঠের মধ্যে একটা গাছের তলায়।

বিপদের ওপর আবার বিপদ। হঠাৎ ভৈচালু তার নিজের বৌকে নিয়ে কোথায় যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল তার কোনো পাত্তাই করতে পারলো না ইন্দর আর দেওকী। ঘুরে ঘুরে খুঁজে খুঁজে ওরা খুবই হয়রান হয়ে পড়লো।

না খেয়েদেয়ে আর কত ঘোরাঘুরি করা যায়? দেওকীর মনে একটা প্রশ্ন জাগলো, দাদার বাড়িতে একবার ঘুরে এলে হয় না? একবেলা অন্ততঃ পেট পুরে খেয়েও আসা যাবে এবং ইন্দরের জন্যে কিছু খাবারদাবার নিয়েও আসা যাবে। ওদের কষ্টের কথা শুনে দাদা-বৌদির হয়তো দয়াও হতে পারে, ওরা হয়তো নিজেদের কাছে ওদের দু'জনকে নিয়েও রাখতে পারে কিছুদিনের জন্যে। এমনি আশা-দুরাশায় দেওকীর মন বেশ চঞ্চলই হয়ে উঠলো। শত হলেও ভানু ডাকুয়ার বাড়ি তো দেওকীরই বাপের বাড়ি। এরকম বিপদে পড়লে মেয়েদের মন স্বভাবতঃই বাপের বাড়ির দিকে চলে যায়।

কিন্তু দেওকীর মুশকিল হয়েছে ইন্দরকে নিয়ে। বড়ো তেজী ছেলে ইন্দর। তার কাছে আত্মসম্মানটাই সবচেয়ে বড়ো বিষয়। সেই আত্মসম্মানে আঘাত লাগবে এমন কিছু করা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। এই অবস্থায় ইন্দরের অনুমতি নিয়ে দাদার কাছে যাবে, দেওকী এমন আশাই করতে পারে না। তাই সে একটা ফন্দি আঁটলো। ইন্দর তার বাপ-মার সন্ধানে বেরিয়ে গেলে দেও দাদার বাড়ির দিকে রওনা হয়ে যাবে। ইন্দর তো সন্ধ্যার আগে ফেরে না, তার আগেই সে ডেরায় চলে আসবে বাপের বাড়ি থেকে, তা হলেই তো আর কোনো গোলমাল ঘটবে না।

মতলব মতোই কাজ করলো দেওকী। পরদিন সকালে ইন্দর বেরিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই

দেওকীও একটা থলে হাতে করে তার বাপের বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল। পথ চলতে চলতে সর্বক্ষণই তার একমাত্র চিন্তা, ইন্দর এ ব্যাপারটা জানতে পারলে তাঁর আর রক্ষা নেই! কি একটা ব্যাপার নিয়ে সামান্য একটু কথা কাটাকাটি হয়েছিল ভগ্নীপতির সঙ্গে, তারপর থেকে ভানু আর বোনের বাড়িতে আসে নি এবং ইন্দরও আর শ্বশুরবাড়ির দিকে পা বাড়ায় নি। ইন্দরের ধারণা, ভানু তার বৌয়ের পাল্লায় পড়েই বোনকে এমনভাবে ভুলে থাকতে বাধ্য হচ্ছে যে বোনকে সে এত ভালোবাসে।

ভুল বোঝাবুঝির ফলেই ইন্দরের সঙ্গে ওর দাদার যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে আছে তার একটা ফয়সালা করার জন্যে দেওকী ভাবছিল অনেকদিন ধরেই। বাপের বাড়ির দিকে আসতে আসতে ওর মনে হলো, এবার হয়তো সে সুযোগটা পাওয়া যাবে। বন্যায় ওদের বাড়িঘর যে সব ভেসে গেছে সে খবর কি ভানু ডাকুয়া পায় নি? তা হতেই পারে না। যে দাদা তাকে এত গভীরভাবে ভালোবাসে, নিশ্চয় সে তার ও ইন্দরের খোঁজখবর করছে মরীয়া হয়ে। দেওকীকে বাড়িতে দেখতে পেয়ে সেই দাদা যে আনন্দে কত অধীর হয়ে উঠবে সে কথা ভাবতে ভাবতেই দেওকী গিয়ে বহু পুরোনো স্মৃতিবিজড়িত তার বাপের বাড়ির অন্দরে গিয়ে ঢুকে পড়লো। তার মনে হলো ঃ

'এক পহরি পথ দুখাতি এক নিমেষে গেল,
ধনী ভাইয়ের বাড়ি আসি উপনীত হইল।'

বাড়িতে ঢুকেই ইন্দরের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল দেওকীর। একটা চিন্তা যেন তাকে গ্রাস করে ফেললো। যদি অনেক আগেই ইন্দর ডেরায় ফিরে আসে। যদি ক্লান্ত হয়ে সে জল চায়, কে দেবে তাকে জলের গ্লাসটি এগিয়ে। তাড়াতাড়ি কিছু খেতেই বা দেবে কে? এমনি সব কথা ভাবতে ভাবতে দেওকীর মাথাটা ঘুরে গেল। সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ঠিক করে ফেললো, সে আর বেশিক্ষণ বাপের বাড়িতে থাকবে না, ভাজের কাছ থেকে কিছু খুদকুঁড়া চেয়ে নিয়েই সে ফিরে চলে যাবে।

দেওকীর ভাজ দুর্গা (ওরা ভাজকে অর্থাৎ বৌদিকে বলে ভাউজ) তখন দাওয়ায় বসে চাল ঝাড়ছিল। ভাজের কাছে খুদকুঁড়া চাইতে গিয়ে সে কেমন যেন থমকে দাঁড়ালো। ভাবলো, এটা কেমন হলো, ওকে এতদিন পরে দেখেও ভাজ যখন ডেকে ওর সঙ্গে কথা বলছে না, তখন তার কাছে চেয়ে কিছু যে পাওয়া যাবে এমন আশা সে কি করে করবে? তাই দুর্গার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেওকী কোনো প্রার্থনাই করলো না; শুধু জানতে চাইলো, দাদা কোথায়? 'ক' বৌদি দাদা কোটে গেইসে?'

ননদের জিজ্ঞাসা থেকে ভাজ ধরে নেয়, দাদার সন্ধান পেয়ে গেলেই দেওকী তার স্বামীকে নিয়ে তাদের বাড়িতে থেকে যাবার ব্যবস্থা করে নেবে। কিন্তু সেটি হবে না। তাই চাল ঝাড়তে ঝাড়তে মাথা নীচু করেই দুর্গা একটা ভয় দেখিয়ে ননদকে জানালো, এই গাঁয়ে একটা বাঘ পড়েছে। ঐ বাঘটাকে মারতে গিয়েছে তোমার দাদা। সেই বাঘটাকেই তোমার দাদা মারবে না তোমার

দাদাকেই ঐ বাঘটা মারবে, সে ভাবনাতেই আমি এখন অস্থির।

ব্যাপারটা বুঝতে পারলো দেওকী। তবু একবার দেখতে চাইলো ওর ভাইপোটাকে। কয়েক মাস আগেই তারা খবর পেয়েছিল যে তার দাদার ঘরে এক নন্দনের আবির্ভাব হয়েছে। এমন আনন্দের সংবাদ পেয়েও ভাইপোর মুখ দেখে যেতে পারেনি ওর দাদার সঙ্গে ইন্দরের ঝগড়ার জন্যে, সে কি দেওকীর কম দুঃখ? ঘটনাচক্রে একটা সুযোগ যখন এসে গেছে তা কি হাতছাড়া করা চলে? তাই বিদায় নিয়ে চলে যাবার আগে ভাজকে সে জিজ্ঞেস করলো, 'ক' বৌদি সোনা কোটে রইসে?'

ননদের এ জিজ্ঞাসায় স্পষ্ট করে এ ধারণাই হলো দুর্গার যে এমনি এক একটা প্রশ্ন তুলে সময় কাটিয়ে দিয়ে ভাতের সময় হলেই দেওকী পিঁড়া নিয়ে বসে পড়বে

দেওকী একটা থলে হাতে করে তার বাপের বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল। [পৃ. ৩৪০

খাওয়ার জন্যে। কিন্তু সেটি হচ্ছে না। তা ভেবে নিয়েই এমন আরেকটা ভাঁওতা দিলে দুর্গা যা শুনে মনটা একদম ভেঙে গেল দেওকীর এবং সে নিজের ডেরার দিকে পা বাড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে তার সেই ভাঙা মনেই কতগুলি প্রশ্ন এসে জড়ো হলো। মুহূর্তের মধ্যেই তার মনে হলো, সে নিজে না হয় না খেয়ে কিংবা শুধু শাক পাতা খেয়ে আরো দুটো দিন কাটিয়ে দিতে পারবে কিন্তু যে লোকটা দিন নেই রাত নেই কেবল ঘুরে ঘুরে হারানো বাপ-মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে যদি কিছু খেতে দিতে না পারা যায়, তা হলে ইন্দরের কি দশা হবে? তাই ঝাড়া খুদ কিছু চেয়ে নিলেই বোধ হয় ভালো হতো, এমন একটা চিন্তা দেওকীর মনের আকাশে যেন বিদ্যুতের মতো খেলে গেল।

আশ্চর্য ব্যাপার, যে মুহূর্তে দেওকী বাড়ির বাইরে পা বাড়াতে যাবে ঠিক তখনি দুর্গা দোরে ছুটে এসে ডাকলোঃ

'ক্যানে আসিলু দেওকী, ক্যানে যাছিৎ বা,
ফিরি আসিয়া মোর একটা কাথা শুনি যা।'

ভাজের ডাক শুনে দেওকীর আনন্দ হলো। সে ভাবলো, নিজে থেকেই দুর্গা যখন ডেকেছে তখন মনে তার বোধহয় একটু দয়া হয়েছে। কী করেই বা ওরা ভুলবে দেওকীদের ভালো সময়ে

দু'হাতে ওরা কি দেদার খরচ করেছে ডাকুয়া বাড়িতে এসে? সে কথাই বোধহয় ভগবান দুর্গাকে মনে করিয়ে দিয়েছেন।

এমনি চিন্তায় যত আনন্দ নিয়েই দেওকী আবার ঘরে ফিরে আসুক না কেন সে তো আর জানে না যে, মাথায় উকুনের কামড়ে দুর্গার পাগল হয়ে যাবার উপক্রম। চাল ঝাড়তে-ঝাড়তেও উকুনের কামড়ে সে অস্থির হয়ে উঠছিল। তাই হঠাৎ তার মনে হলো, দেওকী যখন এসেছেই তখন তাকে দিয়ে মাথাটা ভালো করে বাছিয়ে নেওয়া যাক।

এদিকে দেওকী ঘরে ফিরে এসে ভাজকে বললে

'তোক কয়া কি হবে বৌদি
দাদায় বাড়িতে নাই,
আসিনু চাইরটা খুদির বাদে
সাতদিন খাঁওকে নাই।"

দেওকীর এ কথা শুনেই ননদকে চার মুঠো খুদ দিয়ে দুর্গা বললেঃ

'এই দিনু মাই খুদি তোক
কাপেড়াতে বান্দি নে,
তার বদলে মোর মাথাটার
উঁকুন বাছি দে।'

খুদ পেয়ে ভারী খুশী দেওকী। চার মুঠো খুদ সঙ্গের থলেতে ভরে নিয়ে পিঁড়া পেতে বসে ভাজের মাথায় উকুন বাছতে লাগলো সে। কিন্তু তার উকুন বাছা আর শেষ হয় না। দুর্গা একবার তার মাথার ডান দিকে, আরেকবার বাঁদিকে উকুন খুঁজতে বলে। অনেকক্ষণ ধরে বৌদির কথামত কাজ করেও তাকে যখন খুশী করা গেল না, তখন এক সময়ে দেওকী উঠেই পড়লো চলে যাবার জন্যে। ভাজকে বললে, ঘরে বলে তো আসিনি। তোমাদের জামাই এসে গেলে আমাকে আর আস্ত রাখবে না।

ও, আমার খুদ চালগুলি তুমি বুঝি এমনি এমনি নিয়ে যাবে! তা হবে না। —এই বলে দুর্গা রেগেমেগে দেওকীর হাত থেকে থলেটা কেড়ে নিয়ে খুদ কটা ঢেলে রেখে ননদকে ঝামটা মেরে বললে, যা যেখানে ইচ্ছে সেখানেই এবার চলে যা!

দুখাতির দুঃখ শতগুণ বেড়ে গেল ভাজের এরকম নিষ্ঠুরতায়। সে ভগবানের বিচারে কোনো আস্থাই আর রাখতে পারছিল না, তবু তাঁর কাছেই কাঁদতে কাঁদতে আবার প্রাণ খুলে আবেদন করছিল, হে ঈশ্বর, তুমি নাকি করুণাময়, এই কি তোমার করুণার রকম? মানুষ কিভাবে কখন তোমার করুণা লাভ করে?

দুচোখ থেকে গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরছে দেওকীর, কাঁদতে কাঁদতে সে একা বনপথ ধরে এগিয়ে চলেছে তার ডেরার দিকে। হঠাৎ এক সন্ন্যাসী তার সমুখে পড়ে গেলে সে থেমে গেল। সন্ন্যাসী তাকে দেখেই বললেন, তোর দুঃখে বড়ো কষ্ট পাচ্ছি আমি। তোর দুখাতি নামটা ঘুচিয়ে দেবার

সময় হয়েছে।—এই বলে সন্ন্যাসী একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ওখানে একটা মস্ত বড়ো সোনার ডেলা লুকনো রয়েছে। ওটাকে তুলে নিয়ে তুমি সোজা বাজারে গিয়ে স্যাকরার দোকানে বিক্রি করে দেবে। কোনো অভাবই আর তোমার থাকবে না তখন। তুমি তখন যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে।

সন্ন্যাসীর কথা মত নির্দিষ্ট জায়গা থেকে দুখাতি সোনার ডেলাটা উদ্ধার করে নিয়ে এলো। বাজারে গিয়ে সেটা স্যাকরার দোকানে বিক্রি করে প্রচুর টাকা পেয়ে গেল। তখনই সে দোকান থেকে সুন্দর এক ছড়া সোনার হার কিনে নিল ভাইপোর মুখ দেখবে বলে। ভাইপোর জন্যে আরো কিছু সুন্দর সুন্দর পোশাকপত্তরও কিনলো। সেসব নিয়ে ডেরায় এসে দেওকী ইন্দরের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো এবং সে আসামাত্র তাকে সমস্ত বিষয়টা খুলে বলতে সে অবাক্ হয়ে গেল।

সন্ন্যাসী একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বললেন

দেওকী এখন আর দুখাতি নয়, সে আবার সেই আগের দেওকী। তার ভাগ্য ও বুদ্ধির প্রশংসা করে ইন্দর দেওকীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি যেতে রাজী হলো।

নতুন পোশাক-পরিচ্ছদে সেজেগুজে দিন দুই বাদেই ভৈরব ডাকুয়ার মেয়ে-জামাই ডাকুয়া বাড়িতে গিয়ে হাজির হলে সকলেই যেন তাজ্জব বনে গেল। দেওকী প্রথমেই তার ভাজকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, 'ক' বৌদি আমাগো সোনা কোটে?' এ প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই সোনার হারটা ও লাল জামা দেখিয়ে সেগুলি ভাইপোকে পরিয়ে দেবার আগ্রহ দেখাতেই দুর্গা তার ননদ আর নন্দাইয়ের আদর-আপ্যায়নের যে ধুম লাগিয়ে দিল বাড়িতে সে এক দেখবার মতো ব্যাপার। ভানুও সে সময়ে বাড়িতে থাকায় ধুম-ধাড়াক্কাটা আরো বেশী হলো। কিন্তু খাবারদাবারের অতো আয়োজন করলে কি হবে, কিছুই খেতে চাইলো না দেওকী। সে কেবল মনে মনে একটা কথাই ভাবছিল, দু'দিনের মধ্যেই মানুষের মনের কত পরিবর্তনই না ঘটতে পারে। কিন্তু এত আদর, এত খাতির কার?
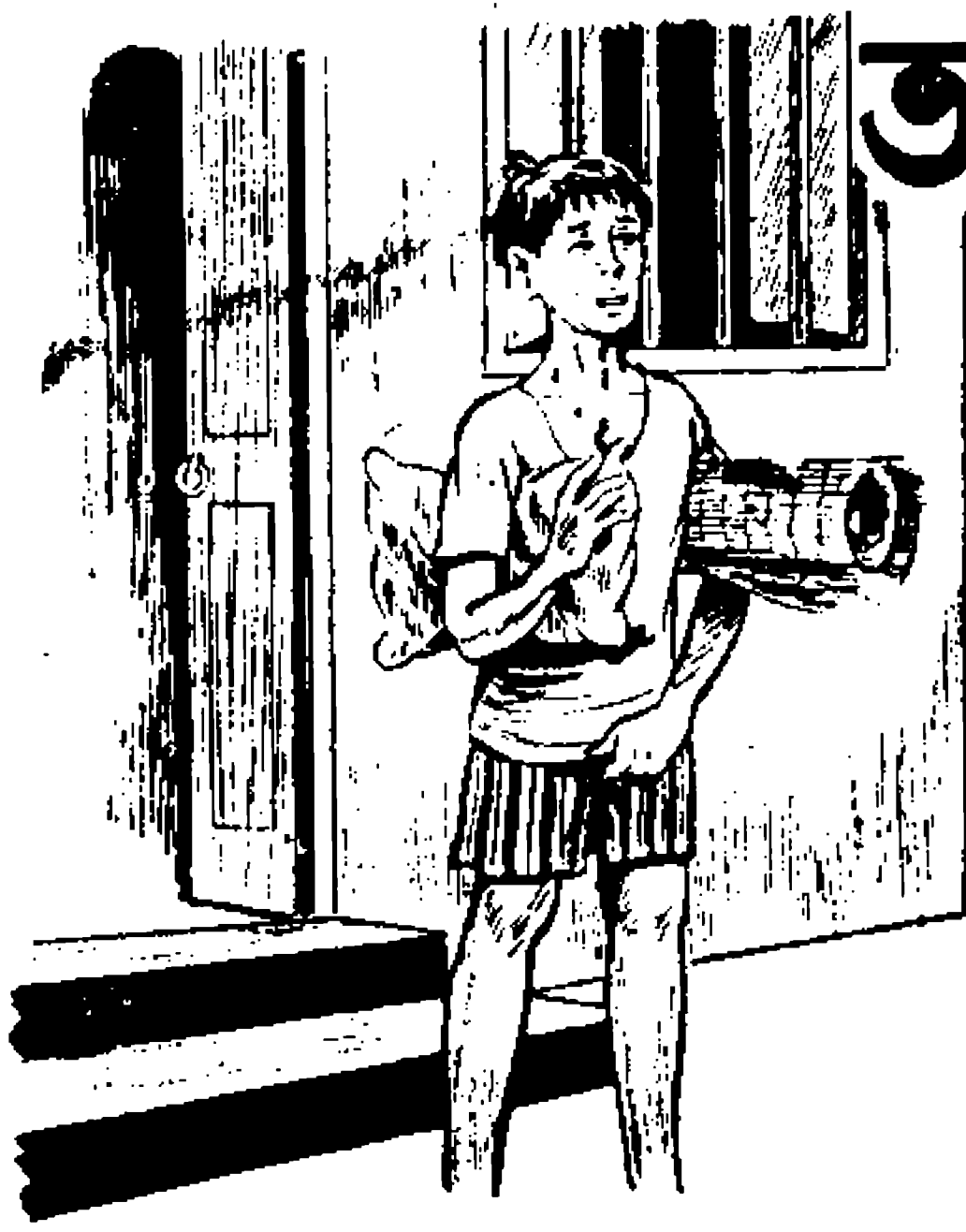
অনিদ্রা রোগ

—সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন বন্ধুবর অমির সঙ্গে অনিদ্রা রোগ সম্পর্কে কথা হচ্ছিল। কথাটা আরম্ভ হয়েছিল আমাদের দুজনেরই এক সাধারণ বন্ধুর অনিদ্রা রোগ থেকে। কথাটা শেষ পর্যন্ত ঘুরল ভারী থেকে হালকা দিকে। সেই প্রসঙ্গে আমি অমিকে একটা দুটো গল্প বললাম। গল্প নয়, সত্য ঘটনা। পড়েছিলাম তরুণ বয়সে 'ডেটেনিউ' বলে একখানি বইয়ে! সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের কাহিনী। স্বাধীনতার আগেকার কালের মানুষ।

অমিকে বলছিলাম—ছোকরার নামটা মনে আছে, পদবীটা ভুলে গিয়েছি। নামটা হল ফণী। ফণী সারা জীবন 'ইনসমনিয়া' রোগে ভুগে গেল ফাঁসি কাঠে যাবার আগে পর্যন্ত। ইনসমনিয়ায় জেগে থেকে ফণী কখনও কখনও সরু চাপা গলায় গান গাইত, যা অন্ধকারের মধ্যে শুনলে ভুল হত পেত্নীর নাকী সুরের কান্না বলে।

কেমন ইনসমনিয়া ছিল ফণীর? সে সাংঘাতিক ইনসমনিয়া!

ফণী ছিল কলকাতার ছেলে। বাপ নেই, মা নেই, বাউণ্ডুলে হয়ে মামার বাড়িতে থাকত উটকো লোকের মত। সারাদিন ঘুরত হেথাহোথা আপন কাজে। বাইরের ঘরে রাত্তিরের খাবার ঢাকা থাকত। এসে খেত ফণী। তারপর ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে তেলচিটে বালিশে মাথা দিয়ে শয়ন। তার সঙ্গে সঙ্গে 'ইনসমনিয়া'—মানে অনিদ্রা রোগ!

একদিন রাত্রিতে ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে, ঘরে শুয়ে গরম লাগতে লাগল ফণীর। তখন ফণী প্রায়ই যা করত তাই করলে। ছেঁড়া মাদুর আর তেলচিটে বালিশ বগলে ফণী সামনেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। তারপর ফুটপাথে সারি সারি শয়ান ভিখিরীদের ফাঁকে খালি জায়গা বেছে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল।

তারপরই ইনসমনিয়া। ইনসমনিয়ার মধ্যেই অনেক অনেক চিৎকার-কোলাহল শুনে সে দেখলে তাকে ঘিরে এক দল উৎকণ্ঠিত মানুষ তারই দিকে তাকিয়ে আছে। সে সবারই দিকে চাইতে লাগল ফ্যাল ফ্যাল করে। কি হল? এমন করে সবাই তাকে দেখছে কেন? তার তো ভীষণ ইনসমনিয়া!

সে অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কি হয়েছে?

এক বুড়ী তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে তাকে বললে—হ্যাঁ বাবা, তুমি শুধোচ্ছ কি হয়েছে? দুটো ষাঁড়ে মারামারি করে ছুটে যেতে যেতে একটা ষাঁড় তোমার উরুতে হেঁটে দিয়ে গেল বাবা, আর তুমি বলছ কি হল?

ফণী ইনসমনিয়ার রোগী। সে আর কি করে! মাথা হেঁট করে মাদুর বালিশ নিয়ে ফুটপাথ থেকে উঠে গেল। সবাই চেয়ে রইল তার দিকে।

আর এক দিনের কথা।

সেদিনও ফুটপাথে শুয়েছিল ফণী। বৈশাখের শেষ, জ্যৈষ্ঠীর প্রথম। ইনসমনিয়ার মাঝখানে ফণীর হঠাৎ শীত শীত করতে লাগল। এ কি হল? সে তো গরমের জন্যেই ঘর থেকে বেরিয়ে ফুটপাথে শুতে এসেছিল! তবে আবার শীত-শীত করে কেন এখন?

সে চারিপাশে চেয়ে দেখলে রাস্তা জলে ডুবে গিয়েছে। ফুটপাথের অনেকখানি ডুবুডুবু। তার গলা পর্যন্ত ডুবে আছে জলে। সারারাত বর্ষণের ফলে এই কাণ্ড! সে শুয়ে আছে সমুদ্রের মধ্যে অনন্ত শয্যায় নারায়ণের মত। তার গায়ে সমুদ্রের স্পর্শ লেগে শীত-শীত করছে তার!

শুনে বন্ধু অমি বলল, গম্ভীর ভাবেই বললে—হ্যাঁ, সত্যি সত্যি ইনসমনিয়া হয়েছিল ভদ্রলোকের। তা তার ইনসমনিয়া কি সারেনি কখনও?

বললাম—হ্যাঁ সেরেছিল। ফাঁসিতে। ফাঁসির দিন ভোর রাতেও তাকে ইনসমনিয়া থেকে তুলতে হয়েছিল।

একটু থেমে বললাম—তবে হ্যাঁ, একদিন তার ইনসমনিয়া হয়নি। সেদিনের কথাটাই কেবল বলি। ফণী তখন সিউড়ী জেলে। ডেটেনিউ, প্রথম শ্রেণীর কয়েদী একদল থাকতেন তখন সিউড়ী জেলে। তাঁদেরই একজন ফণী। একদিন বর্ষার রাত্রিতে 'ফিস্ট' ছিল। ফণী এমনিই সাধারণতঃ পঞ্চাশখানা রুটি খেত। সেদিন খাওয়া একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল। দু আড়াই সের মাংস, সের দেড়েক ক্ষীর, এর উপরে এক কাঁদি পাকা মর্তমান কলা খেয়ে শুয়ে পড়ল ফণী। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। এমন সময় একজনের ঘুম ভেঙে গেল। কে কাঁদছে! সেই কান্না শুনে!

—কে?

—কান্না থেমে গেল। ফণী বললে—আমি!

জেগে উঠে দাদা বললেন—কি হল, কাঁদছিস কেন? পেট ব্যথা করছে না কি?
ফণীর রাগ হল। বললে—কাঁদব কেন? গান গাইছিলাম!
—তুই আবার গান গাইতে গেলি কেন?
ফণী কাতরভাবে বললে—কি করব, আজ যে ইনসমনিয়া ভাল হয়ে গিয়েছে!

আমার গল্প শুনে বন্ধু অমি বললে—তুমি তো ইনসমনিয়ার নামে ঘুমের গল্প বললে। আমি এবার একটা সত্যি সত্যি ইনসমনিয়ার গল্প বলি। বন্ধুবর অমি যে গল্প বলেছিল, সেই গল্পই বললাম নীচে।

অমির বাবা ছিলেন হিতেনবাবু। কৃতী পুরুষ সব দিক দিয়েই। কি ব্যবসায়ী হিসেবে, কি পুত্র বা পিতা হিসেবে। পুরনো আমলের মস্ত বড় তিন মহলা বাড়ি কিনে তাকে মেরামত করে নতুন করে নিয়েছিলেন। তিন মহলা বাড়ির সামনে মস্ত বাগান, আউট হাউস, গাড়ি বারান্দা, একাধিক গেরাজ। বাড়ির পিছনে ঘেরা সীমানার মধ্যে মস্ত পুকুর মাছে ভরতি, পাড়ে নানা রকমের ফলের গাছ। ছেলেমেয়ে অনেকগুলি, তিন মহলা বাড়ি তাদের কলরবে পাখির কলকল্লানির মত সব সময় হাসছে যেন। আর আছেন তাঁর বুড়ী মা, পঁচাত্তর থেকে আশির মধ্যে বয়েস। হিতেনবাবু এই পরিপূর্ণ ও কল্লোলিত আনন্দের এই সংসারকে দেখে মনে মনে গভীর পরিতৃপ্তি অনুভব করেন। মুখে অবশ্য তার কোন প্রকাশ থাকে না। সেই সঙ্গে তিনি মাকে এই সংসারের সব চেয়ে সম্মানের বস্তু বলে জ্ঞান করেন। মা তাঁর কাছে উৎকৃষ্ট সুগন্ধী আতপের চূড়া-করা নৈবেদ্যের উপর মণ্ডার মত। সে কথা অবশ্য সব সময়েই তাঁর ভাবভঙ্গিতেই প্রকাশ পায় না, মুখেও বলেন সে কথা। তাঁর মাও সেটুকু ভালই জানেন। তাই ছেলের কাছে আদুরে মেয়ের মত তাঁর আবদার-অভিযোগের শেষ থাকে না।

বাড়িতে কাজ করার লোকজন আছে অনেক। সেই সঙ্গে তাঁর কারখানায় কাজ করে এমন লোকের মধ্যে বাড়তি লোকও বাড়িতে থাকে দু চারজন। তা সত্ত্বেও বাজারটা নিজের হাতেই করেন হিতেনবাবু। গাড়িতে করে দুজন চাকর নিয়ে বাজারে যান। চাকরের হাতে ঝুড়ি, থলে, ঝোলা, মাছ আনার তার-বাঁধা টিন। সকালবেলা চকমিলানো অন্দরমহলের চওড়া বারান্দা বেয়ে মায়ের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ান, ডাকেন—মা!

মায়ের এই সময়টা পুজোয় বসার সময়। তবু ছেলের জন্যে কাচা কাপড় পরে বসে থাকেন, সময় হাত জোড় করে। স্বামীর ছবিতে প্রণাম করে ছেলের অপেক্ষা করেন। ছেলে দরজার মুখে এসে দাঁড়াতেই মা বেরিয়ে এসে দাঁড়ান। হিতেনবাবু মাথা হেঁট করে মাটিতে হাত দিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলেন—কি আনতে হবে মা?

মা হেসে ছেলের চিবুকে হাত দিয়ে হাতখানি মুখে ঠেকিয়ে বলেন—কি আবার আনবে বাবা? সবই তো আন! তবে যা মুখে দিই তাই তেতো লাগে! এ মুখে কি স্বাদ-আস্বাদ আছে?

—তবু বল! এ সব মাতা-পুত্রের প্রতিদিনের কথা।

—তা হলে বাবা, পলতা পাতা এনো দেখি ভাল দেখে।

—আনব। আর আমসত্ত্ব?

—আনবে? এনো! বলে বৃদ্ধা বলেন—তোমার মন মানে না তুমি আন! কিন্তু আমার কি আর রুচি আছে? আর বাবা, রুচি থাকবেই বা কি করে? রাত্তিরে ঘুম না হলে কি শরীর ভাল থাকে না রুচি থাকে?

—কেন, কাল ঘুম হয়নি?—এও প্রায় প্রতিদিনের প্রশ্ন ও উত্তরের বিষয় মাতা-পুত্রের কাছে।

—না বাবা, দু চোখের পাতা এক করতে পারি নি। রাত তখন বারোটা, খাটে ঠায় বসে বসে দু চোখের পাতাটা বুজে এসেছে এমন সময় কি বলব বাবা তোমাকে বারান্দার ওই কোণে সিঁড়ির মুখে একটা বালতি পড়ল দুম করে। ব্যস, চমকে উঠে সেই যে ঘুম ভাঙল আর রাত চারটে পর্যন্ত ঘুম এল না!

—বিনু, এই বিনু!

—বালতি ফেললে কে? বিরক্ত হয়ে বললেন হিতেনবাবু।

—আমি উঠে দেখতে গেলাম। বোধহয় বিনু চাকরটা। আমি বুড়ো মানুষ। খাট থেকে নামতে নামতে তখন পালিয়েছে। আমি আবার খাটে উঠলাম। তখন শমীটা আবার পাশ ফিরে শুল। কি বলব বাবা, শমীর কি ঘুম কি ঘুম। বালতি পড়তেই আমি ওর গায়ে ধাক্কা দিয়ে বললাম—এই শমী, দেখ তো কে বালতি ফেললে? তা কাকে বলছি!

হিতেনবাবু হাসতে লাগলেন মায়ের কথা শুনে। বড় ছেলে অমি তাঁর বেশী প্রিয়, আর এই মেজ নাতি শমী প্রিয় মায়ের।

হিতেনবাবু বললেন—দেখছি দাঁড়াও।

বারান্দার রেলিংয়ে ভর দিয়ে গলা তুলে তিনি ডাকলেন—বিনু, এই বিনু! সে ডাকে ধমকের সুর।

নীচে থেকে সাড়া এল—যাই বাবু!

ছুটতে ছুটতে উপরে উঠে এল বাচ্চা চাকরটা। সেই সঙ্গে বাবার চড়া গলা শুনে পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এল অমি আর শমী।

চাকরটাকে সামনে পেয়ে ধমকে উঠলেন হিতেনবাবু—কাল রাত্তিরে সিঁড়ির মুখে বালতি ফেলে মায়ের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিস বাঁদর কোথাকার! আর এমনিতে মায়ের ঘুম হয় না।
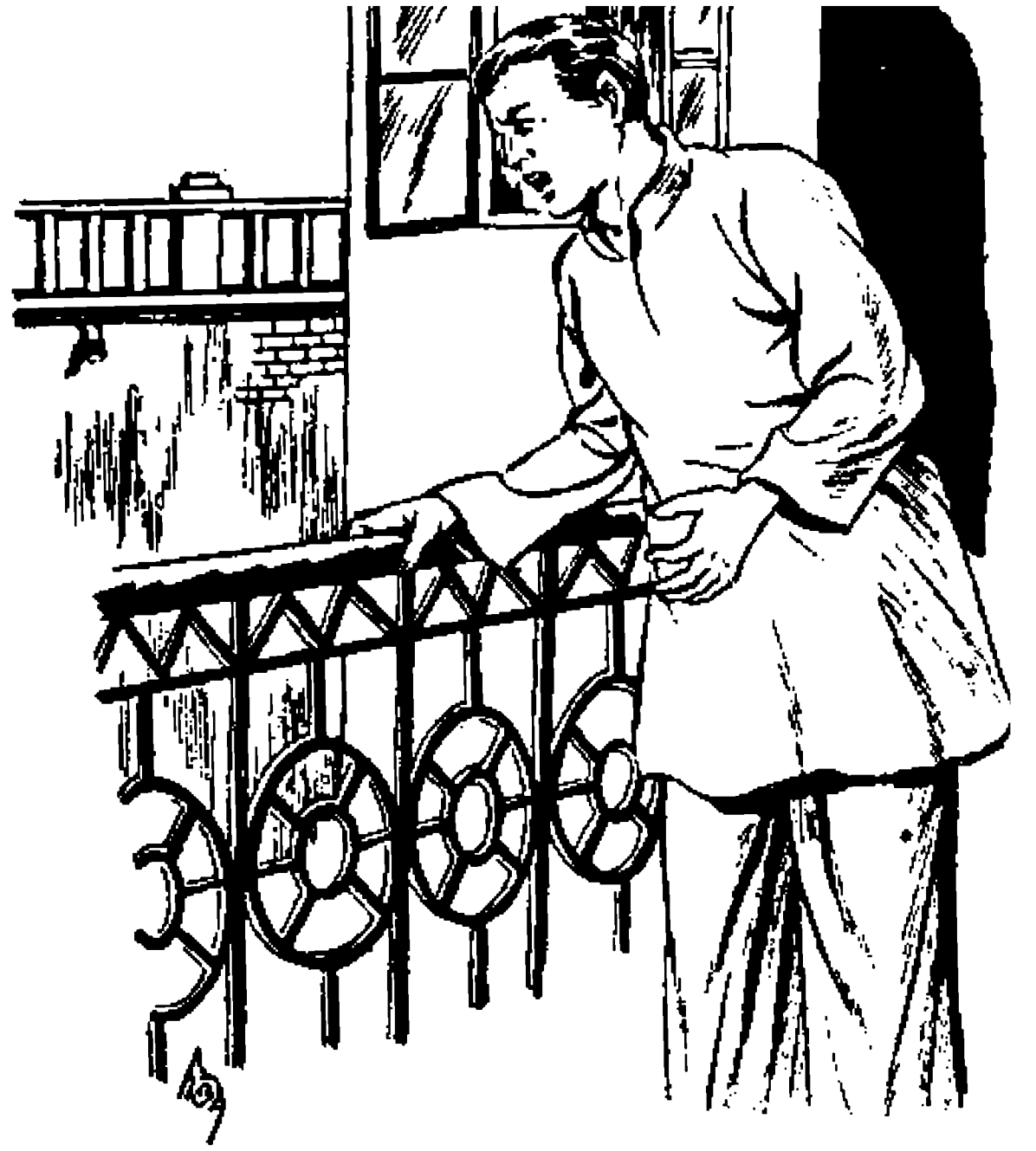
মা সঙ্গে সঙ্গে মৃদু প্রতিবাদ করে উঠলেন—না বাবা, ঘুমুচ্ছিলাম আর কোথায়। বিছানায় ঠায় বসে থাকতে থাকতে চোখ দুটো সবে জুড়ে এসেছিল, এমন সময়—

হিতেনবাবু মায়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আবার ধমক কষলেন—তাই তো বলছি! এরপর যদি শব্দটব্দ করে মায়ের চোখ বোঁজার অসুবিধে করিস—

এবার মা দয়াময়ী হয়ে বললেন—আহা, ওকে আর বকিস না বাবু! আমার কপাল, চোখে ঘুম নেই! ও কি করবে?

চাকরটা এতক্ষণে মিনমিন করে বললে—আমি ওপরে আসিইনি বাবু। আমি এগারোটার সময় শুয়ে পড়েছিলাম! আর ঠাকুমা তো বলছেন বারোটায় বালতির শব্দ হয়েছে।

এক ধমক দিয়ে সব শেষ করে দিলেন হিতেনবাবু—আবার কথা! যাঃ, কাজ কর গিয়ে।

চাকরটা পালিয়ে বাঁচল। হিতেনবাবুও থলে-ঝুলি চাকর নিয়ে নেমে গেলেন। ঠাকুমা ফিরে গিয়ে পুজোর আসনে বসলেন। অমি আর শমী বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। অমি দেখলে শমী হাসছে মুচকি মুচকি।

—হাসছিস কেন আবার?

শমী বললে—কেন হাসছি তোমাকে বলি, আর তুমি বাবাকে বলে দাও!

—বলে দিলে কি ক্ষতি হবে?

—আমি মার খাব।

অমি ভাইকে ধমক দিলে। কিন্তু অমি ধমকে শমীর কিছুই হল না, সে হাসতে হাসতে চলে গেল।

সন্ধ্যের পর একটু রাত্রি হলে কিন্তু সবাই, মানে অমি-শমী আর তার ভাই বোনেরা সবাই এসে জমে ঠাকুমার খাটে আর খাটের চারিদিকে। এই সময় তিনি নাতি-নাতনীদের গল্প বলেন। বড় নাতনী নমির বিয়ে হয়ে সে শ্বশুরঘর করছে। তার অভাব উল্লেখ করেন বার বার। অন্যেরা অধৈর্য হয়ে ওঠে—গল্প বল ঠাকুমা!

সন্ধ্যেতে সন্ধ্যাহ্নিক করে রাত্রির আহারটুকু করেন ঠাকুমা। বেশ খানিকটা আফিং আর ক্ষীর। ক্ষীরের সঙ্গে কোন দিন আমসত্ত্ব, কোন দিন খেজুর থাকে। সেটুকু নিজে খানিকটা খান, আর অনেকগুলি নাতি-নাতনীর মধ্যে কেবল শমীর জন্যে রেখে দেন খানিকটা। গল্প শুনবার সময় শমী সেটুকু খায় আর বলে—কতটুকু রেখেছ ঠাকুমা? অমি তাকে ধমক দেয়।

ঠাকুমার যত গল্প সব হয় ভূতের নয় চোরের। তিনি গল্প বলেন আর ঢোলেন। মধ্যে মধ্যে ঢুলতে ঢুলতে তাঁর নাক ডাকতে লাগে ফুরফুর করে। মধ্যে মধ্যে মাথা নেমে ঝুঁকে পড়ে। শ্রোতারা কৌতুক বোধ করে চুপচাপ থাকে।

তিনি ঘুমিয়ে পড়ার আগে সেদিন বলছিলেন ভূতের গল্প। রাত্রিকাল, মস্ত ঝাঁকড়া শ্যাওড়া গাছের তলায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। সেই শ্যাওড়া গাছে ভূত থাকে, সন্ধ্যে হলেই বসে পা ঝুলিয়ে।

মিটি মিটি হাসতে লাগল নাতি নাতনিরা।
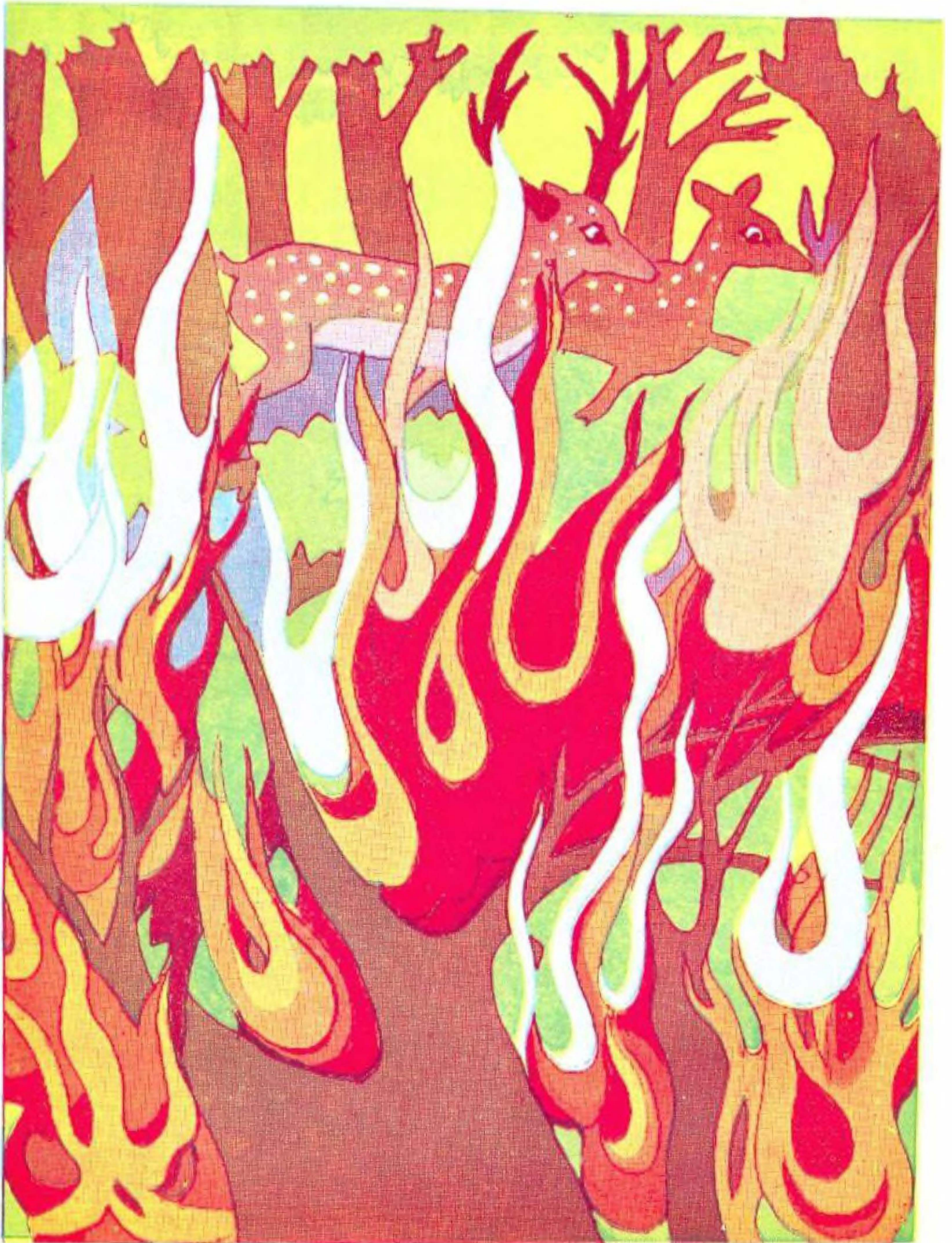
তার তলা দিয়ে কেউ গেলেই ভূত তাকে লাথি মারে। ঠাকুমার দাদা নিবারণ ভয়ে গাছতলার আগে দাঁড়িয়ে গেল।

এই সময় ঠাকুমা ঘুমিয়ে পড়লেন। নাক ডাকতে লাগল ফুরফুর করে। দেখে মিটিমিটি হাসতে লাগল নাতি-নাতনীরা। কিন্তু নিঃশব্দ হাসি। ঠাকুমা তাদের হাসির কথা জানতে পারলে নির্ঘাত বলে দেবেন বাবাকে। তখন আর বকাবকির সীমা-পরিসীমা থাকবে না। কিন্তু শমীটার দুঃসাহসের শেষ নেই। সে অধৈর্য হয়ে বললে—ও ঠাক্‌মা, ঘুমিয়ে পড়লে যে! গল্প বল!

চটকা ভেঙে চমকে জেগে উঠলেন ঠাকুমা। চমকে উঠে বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ! তারপর না আমার বড়দা নিবারণকে দেখে চোরটা ভয়ে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে দে দৌড়, দে দৌড়! দাদাও ছুটল তার পেছনে পেছনে!

প্রথমটায় সবাই অবাক্, তারপরই হো হো করে হেসে উঠল সবাই। সবচেয়ে বেশী জোরে আর বেশীক্ষণ ধরে হাসতে লাগল শমী। ঠাকুমা চটে বললেন—কি হল?

এক নাতনী করুণভাবে বললে—ভূতের গল্প যে চোরের গল্প হয়ে গেল ঠাক্‌মা।

শমী বললে—হবে না? সন্ধ্যে থেকে অতখানি আফিং আর ক্ষীর খেয়ে ঢুলতে ঢুলতে গল্প বললে হবে না?

চটে উঠলেন ঠাকুমা—আমি সন্ধ্যে থেকে ঢুলছিলাম? ঘুমুচ্ছিলাম? দাঁড়া কাল সকালে তোর বাবাকে বলে দেবো! আমি বলে সারা রাত দু চোখের পাতা এক করতে পারি না!

শমী চুপ করে থেকে ঠোঁট বেঁকালে, তারপর উঠে গেল।

সেই দিন রাত্রেই ঠাকুমা যে ঘুমোন না তার প্রমাণ দিলেন। মাঝ রাত্রি তখন। তিনি বিছানা থেকে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন—কে? কে? কে গেল?

সঙ্গে সঙ্গে তিনিই চিৎকার করে উঠলেন—চোর! চোর! চোর!

সঙ্গে সঙ্গে সারা বাড়িটা জেগে উঠল। চোর? কোথায়?

ঠাকুমা বললেন—আমার ঘরের সামনে দিয়ে চুপি চুপি পা টিপে টিপে যে আমি যেতে শুনলাম।

হিতেনবাবু খুঁজতে লাগলেন—তা তো হল। কিন্তু চোর গেল কোথায়?

খোঁজ! খোঁজ! খোঁজ! অল্প একটু খুঁজতেই চোরের সন্ধান মিলল। সারা বারান্দায় ঠাকুমার ঘরের সামনে দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা দুধ একটি দীর্ঘ রেখায় চোরের সন্ধান দিচ্ছে স্পষ্ট করে। চোর বারান্দা দিয়ে দুধ চুরি করে নিয়ে গিয়েছে নীচের চাকরদের ঘরে। চোর হল চাকর রাধাশ্যাম। ধরা পড়ে সে হাত জোড় করে স্বীকার করলে সেই দুই চুরি করেছে। করেছে আফিংয়ের নেশার প্রয়োজনে।

ঠাকুমা বললেন—আহা বাবা, ওকে ছেড়ে দে! রাধাও তো আমারই মত আফিং খায়। আহা, ওকে বরং রোজ খানিকটা করে দুধ দিস! আর—

ঠাকুমা বললেন—আহা বাবা, ওকে ছেড়ে দে! [পৃ. ৩৪৯

সদর্পে বললেন—আর দেখলি তো, রাত্রে আমি কেমন ঘুমোই!

ঠাকুমা যে ঘুমোন না, সারা রাত জেগে থাকেন এটা আবার প্রমাণিত হল। এই সময়েই হিতেনবাবুর বড় মেয়ে নমি এল শ্বশুরবাড়ি থেকে। শাশুড়ী তাকে নতুন এক সেট মুক্তোর গহনা দিয়েছেন। সেইটাই দেখাতে এসেছে নমি বাপের বাড়িতে।

গহনা দেখে, শ্বশুরবাড়িতে মেয়ের সৌভাগ্য দেখে সবাই খুব খুশী। নমির বাবা মা সবাই বললেন—নমির বাক্স দুটো মায়ের ঘরে ওঁর খাটের তলায় থাকুক। কোন ভাবনা থাকবে না। মা তো জেগেই থাকেন সারা রাত।

ঠাকুমা বললেন—থাকুক। নিশ্চিন্ত মনে ঘুমো গিয়ে বাপু তোরা!

কিন্তু পরদিন ভোরে দাঁত মাজতে মাজতে দোতলার ছাদে বেড়াবার সময় শমী চিৎকার করে উঠল—মা, ওমা, ছুটে এস! পুকুরঘাটে দুটো বাক্স ভাঙা পড়ে রয়েছে!

হইহই কাণ্ড! যে বাক্স দুটো ভাঙা খালি অবস্থায় পড়ে আছে পুকুরঘাটে সে তো নমিরই বাক্স!

বাক্সে কাপড় গহনা কিছুই নেই। কিন্তু যে ঠাকুমা সারা রাত জেগে থেকে চোরের পায়ের অতি মৃদু শব্দও শুনতে পান তাঁর সামনে থেকে, তাঁর ঘরের খাটের তলা থেকে বাক্স কি করে গেল পুকুরপাড়ে?

নমি তার চুরি-যাওয়া কাপড় গহনার দুঃখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। অপ্রস্তুত ঠাকুমা তাকে সস্নেহ সান্ত্বনা দিয়ে তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললেন—তুই কাঁদিস না ভাই নমি। তোর কাপড় গহনা যা যা গিয়েছে সব আবার করে দেব!

তারপর সখেদে বললেন—কালকেই কি দু চোখ ভরে আমার ঘুম এসেছিল গো! পোড়া কপাল আমার!

ভিড় থেকে দূরে দাঁড়িয়ে শমী কেবল হাসছিল মুখ বাঁকিয়ে।

কাব্যরসিক সিম্পু

—বিমলচন্দ্র ঘোষ

এবার করো সবাই চুপ,
সিম্পু খুড়োর নতুন রূপ
দেখবে নতুন ছড়ায়,
দেখবে ক্ষুদে এক ফোঁটা
খুড়োর পাজী ভাইপোটা
ডিগবাজিতে গড়ায়।

লেখায় পড়ায় নেইকো মন
পাড়ায় ঘোরে সারাক্ষণ
মন বসে না ঘরে,
রাত্তিরেও নেইকো ঘুম
লাফায় ঝাঁপায় দড়াম দুম্
অপাট কুপাট করে।

সিম্পু খুড়ো নির্বিকার
বলেন, "সবি ফক্কিকার
কে কার ভাইপো খুড়ো?"
মাপেন সীমা আকাশটার
অন্ত আদি নেইকো যার
নেইকো ল্যাজা মুড়ো।

ঠেসান দিয়ে চেয়ারটাতে
চুরুট মুখে কেতাব হাতে
ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ।
ভাবেন খুড়ো প্রাচীনকালে
ডাকতো পদ্যে বর্ষাকালে
ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ব্যাঙ।
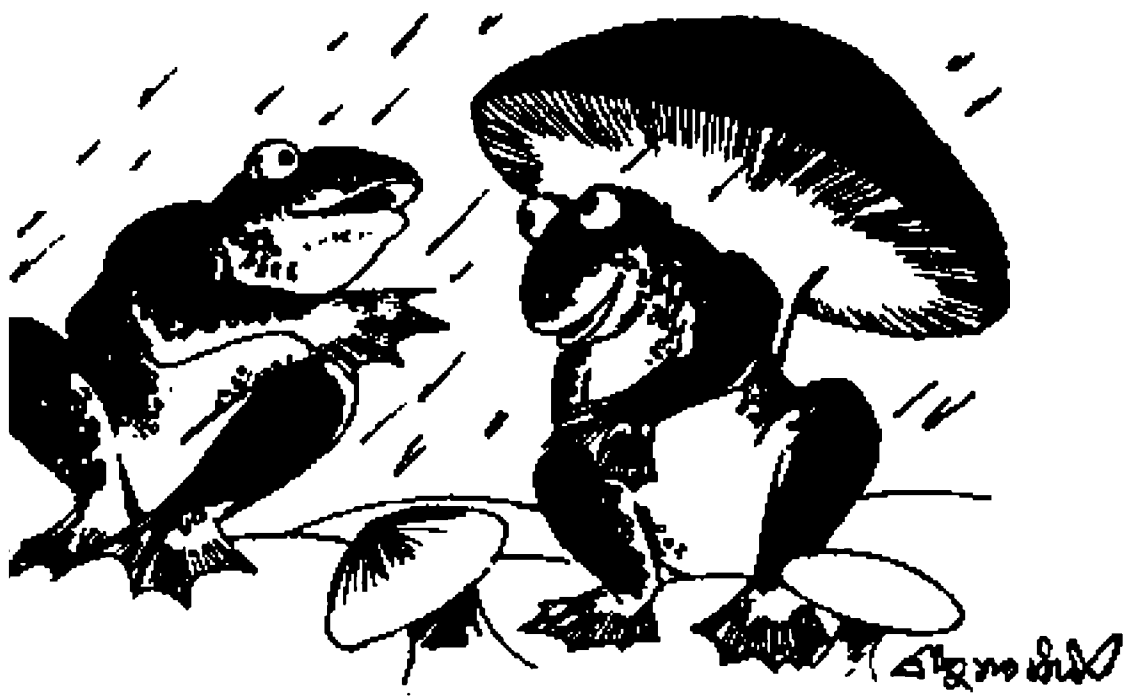
ব্যাঙের বেঙি আদুরী
বলতো তাকে দাদুরী
রসিক কবির দল,
একাল ঝুড়ি ভর্তি করে
পাঠায় তাদের দেশান্তরে
মুদ্রা আনার কল?

পড়েন খুড়ো পত্রিকা
জ্বালিয়ে মোমের বর্তিকা
লোড-শেডিঙের জ্বালায়,

আঁধার আলো কোন্‌টা কি ?
খুঁজতে গিয়ে মন-পাখি
কল্পলোকে পালায়।

নতুন কালের কাব্যতে
নতুন মনের ভাব পেতে
ঠোকেন খুড়ো মাথা,
দেখেন ভাষায় বঞ্চনার
ছন্দহারা অন্ধকার
উদ্ভুটে ফাঁদ পাতা।

নয়টি রসের নয়ছয়ে
ব্যর্থ লোকের মন জয়ে
আজগুবী সব লেখা,
নেইকো মাথা মুণ্ডু যার
মর্মকথা বোঝাই ভার
যায় না কিছুই শেখা।

সিম্পু ভাবেন, ভীষণ ভাবেন
রাবিশগুলো সব পোড়াবেন
নিজেই হবেন কবি,
বঙ্গ কঙ্গ টাঙ্গানিকার
রঙ বেরঙের কাব্যকলার
স্বপ্নে আঁকেন ছবি।

ঘুমের ঘোরে খুড়োর হাড়
হিম হয়ে যায়, মন অসাড়
বলেন, "নি'আয় আগুন!"
জ্বালিয়ে বাতি চেয়ারটার
তলায় রেখে ভাইপো তাঁর
চেঁচায়, "খুড়ো জাগুন।"

বাতির শিখায় চেয়ার পোড়ে
কাব্যকলা ধোঁয়ায় ওড়ে
লাফিয়ে ওঠেন সিম্পু।
খুন চেপে যায় মাথার টাকে
ধরতে ছোটেন বিচ্ছুটাকে
দৌড়ে পালায় লিম্পু।

● অচল গাড়ি সচল হল—

—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

পাড়ায় থিয়েটার হল সেবার। সার্বজনীন দুর্গাপুজো। পুজোর কটা দিন ছোকরাবাবুরা সকাল-সন্ধ্যে লাউড্‌স্পীকার মারফত হিন্দী গান শুনিয়ে পাড়ার লোকের কানের দফা সেরে দিত—ছ'খানা সাতখানা রেকর্ড যদি চারদিন ধরে বাজে তাহলে কি দারুণ অবস্থা হয় তা আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝতুম। বিজয়া দশমীর পর জোর আর একদিন বা দুদিন ঠাকুরকে না-খাইয়ে রেখে বাজনা বাজানো হত আগে, কিন্তু পরে, পুলিস একটু তাড়া মারতে এখন জোর, একদিন প্রতিমাকে উপবাস করিয়ে রাখতে পারা যায়, কিন্তু তারপর বিসর্জন দিতে বাধ্য হতে হয়। প্যাণ্ডেলটা খাঁখাঁ করে। বাবুরা শুধু রকে বসে বিড়ি টানে, দু'চারদিন পরে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো নিয়ে আবার একটু লাউড্‌-স্পীকার গাঁক গাঁক করে ওঠে কিন্তু সে-রকম হাঁকডাক বা ভিড় হয় না। তাই পাড়ার ছোকরাবাবুরা ঠিক করলেন যে এবার খালি প্যাণ্ডেলে একাদশী কিংবা দ্বাদশীর দিনে একটু থিয়েটার করা যাক।

পাড়ায় রামহরিবাবু বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি আটখানা নাটক লিখেছেন কোথাও কেউ সে নাটক প্লে করে নি—শুনলুম তিনি ওদের বলেছেন, তোরা ঠিক রাস্তা ধরেছিস্। আমি তোদের নাটক

পাড়ার ছেলেরা আমার একখানা নাটক করছে— [পৃ. ৩৫৭

দেব, একেবারে নতুন নাটক, কোথাও প্লে হয় নি, তোরা কর, আমি তোদের দেখিয়ে দেব।

ছেলেদের তখন কী উৎসাহ! বারোয়ারি পুজো কমিটির সেক্রেটারি ভ্যাবলা বললে, দেখুন, রামহরিদা, নাটকে অনেকগুলো পার্ট আছে সেই রকম একটা নাটক দেবেন কিন্তু। নইলে গোলমাল হবে।

রামহরিবাবু মহোৎসাহে বলে উঠলেন, বহু পার্ট আছে। কতজনের পার্ট চাও?

ভ্যাবলা গুণে বললে, তা গোটা চোদ্দ তো বটেই। ধরুন না, এই পেটকো, কানকো, ফুলকো এদের জন্যে একটু ভাল পার্ট রাখবেন, আর জোরদার ধরনের পার্টের জন্যে গোঁত্তা, হাম্বা, চোনা, পোনা, ঢেব্‌লা, ট্যাড়স ওরা তো রয়েছেই, তাছাড়া ছোটখাট পার্টের জন্যে খুঁটে, খট্‌খটে, ক্যাবলা, মিচকে এরা তো রইলই, আর কি চান?

রামহরিবাবু জিজ্ঞেস করলেন কিন্তু ফিমেল পার্টের জন্যে বাইরে থেকে কিছু মেয়েছেলে আনতে হবে তো?

ভ্যাবলা বললে, না না, অত খরচ করতে পারা যাবে না। পট্‌পটে, ফুচকে, হোঁৎকা ওরা ও-সব পার্ট করে দেবে। আপনি একটা ঐতিহাসিক নাটক দিন। ওরা খুব মেয়েদের হাবভাব নকল করতে পারে।

রামহরিবাবু বললেন, ওরে বাবা, তোরা যে-রকম নাটক চাস্ তাই দেব। আমার আট ন খানা নাটক লেখা হয়ে গেছে। উল্লম্ফন, গুল্‌তি, বেঁটে বজ্জাত, পারের খেয়া, দুর্ধর্ষ বীরমল্ল, মতিভ্রম, আরও তিনটে রয়েছে—এর মধ্যে তোরা দুর্ধর্ষ বীরমল্ল বইটা কর। খুব জমাটি নাটক—সাজ সজ্জে আছে, তিনটে যুদ্ধ, দুটো আত্মহত্যা, ছটা খুন নাটকে আছে। লোকে দেখে তাক্ লেগে যাবে।

ছেলেরা তাই শুনে একেবারে লাফিয়ে উঠে বলে ফেললে, তাহলে আমরা কেল্লামাৎ করে দেব। ও-পাড়ার ছোঁড়াগুলো নাটক করে খুব রোয়াব দেখায়—এইবার ঝামা দিয়ে ওদের মুখ ঘষে দেব। কিন্তু রামহরিদা, একটা ভাল ডিরেক্টর না হলে আমাদের শেখাবে কে?

রামহরিবাবু বললেন, শেখাবার লোক আমি ঠিক করে দেব। আমাদের আপিসের কাতুবাবুকে বলব—ওঁকে রোজ গাড়ি ভাড়াটা দিস, আর একটু চা জলখাবার দিলেই চলবে। পয়সাকড়ি কিছু দিতে হবে না।

সকলে সোল্লাসে বলে উঠল, ওঃ! তাহলে তো গ্র্যাণ্ড হবে। আমরা পরের হপ্তা থেকেই রিহার্সেল শুরু করে দিচ্ছি আপনি কাতুবাবুকে খবর দিন।

হপ্তাখানেক পরে একদিন হঠাৎ রাস্তায় আমার সঙ্গে রামহরিবাবুর দেখা হতে তিনি একগাল হেসে বলে উঠলেন, এবার পাড়ার ছেলেরা আমার একখানা নাটক করছে, পুজোটা কেটে গেলেই প্লে হবে—আপনি আসবেন তো দেখতে?

আমি একটু অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, আমাদের পাড়ার ছেলেরা মানে, কারা?

—এই যারা বারোয়ারি পুজো-টুজো করে যেমন ভেব্‌লা, কানকো, হাম্বা এরাই সব উয্‌যোগী হয়ে করছে বইটা। ঐতিহাসিক বই, খুব জমাটি করেই লিখেছি, দেখলে খুশীই হবেন।

আমি বললুম, হ্যাঁ নাটক হয় তো আপনি ভালই লিখেছেন। কিন্তু ওরা তো জন্মে কখনও থিয়েটার করে নি। আপনি ওদের দিয়ে—

রামহরিবাবু তাড়াতাড়ি আমার কথা শেষ না হবার আগেই বলে উঠলেন, আরে মশাই, দেখবেন! কাঁচা মাটিতেই হাঁড়ি, কড়া, পুতুল যা খুশী গড়া যায়—পোড়া মাটিতে কিছু করা যায় কি? আমাদের আপিসের কাতুবাবু তো সেইজন্যেই বিনা পয়সায় ওদের রিহার্সেল দিতে রাজী হয়েচেন—উনিই এ নাটকের ডাইরেক্টর কিনা। উনি সবাইকে গড়ে তুলবেন।

আমি ভ্রূকুঞ্চিত করে বলে উঠলুম, সবই জানি, কিন্তু ওরা তো ভাল করে কথা বলতেই জানে না, ওদের দিয়ে আপনি নাটক করাচ্ছেন?

রামহরিবাবু চোখটি একটু টিপে বলে উঠলেন, হ্যাঁ তাই করাচ্ছি—আমার নাটকে উচ্চারণ টুচ্চারণের জন্যে প্লে খারাপ হবে না—এমন সব কায়দা করেছি যে একবার নেমে হাতমুখ নেড়ে গেলেই নাটক জমে যাবে। একজন যদি পট্‌কায়, আর একজন চট্ করে এক ঝট্‌কায় তাকে শুইয়ে দেবে এমন কায়দায় লেখা। তিনটে যুদ্ধ, দুটো আত্মহত্যা, ছ'টা খুন। শুধু একশান্ আর একশান্। ওরা যাহ'কে করে যাতা তাড়াতাড়ি বলে চলে গেলেই হল—আজকালকার যুগ। কে কি ভুল বললে ও-সব দেখে না—শুধু প্যাঁচ দেখালেই দেখবেন নাটক কুলপি বরফের মত জমে যাবে। দু চারটে ভুলভাল হলেও কিছু এসে যাবে না। আমি আর কাতুবাবু বলেই দিয়েচি পার্ট গড়গড় করে স্পীডে বলে যাও ভুল হলেও থেমো না—লোককে ভাবতে দেবে না, সবাই সবাইয়ের ভুলভাল হলে যাতে ম্যানেজ করে নিতে পারে তার বন্দোবস্ত থাকবে—আলো টালো নিভিয়ে, দুম্‌দাম শব্দ করে সব ভুল-ত্রুটি ঢাকা দেওয়া যাবে। কাতুবাবু বলে দিয়েছেন ও-সবের জন্যে মাথা ঘামিও না, আমি উইংসের পাশেই থাকবো।

বুঝলুম, যেমনি নাট্যকার, তেমনি তার পরিচালক, তেমনি অভিনেতার দল। কোন মন্তব্য না করে শুধু নাট্যকার রামহরিবাবুকে বললুম, তাহলে ভালই হবে। রিহার্সেল শুরু করে দিয়েছেন তো?

রামহরিবাবু বললেন, না আজ বিকেল থেকে হবে। দেখতে আসবেন নাকি? চুনিবাবুর বৈঠকখানায় রোজ রিহার্সেলের বন্দোবস্ত হয়েছে। নাহলে পনেরো দিনের মধ্যে পুজো, একটু চেপে

মহলা না-দিলে চলবে না। আসুন না সন্ধ্যের সময় বেড়াতে বেড়াতে, ওরা খুব উৎসাহ পাবে, আপনি এলে।

আমি বললুম, না সেইদিনই যাব'খন। তাতে আমার আনন্দটা বেশী হবে বুঝছেন না।—বলে সরে পড়লুম।

সেদিন এল। লোকে লোকারণ্য পাড়ার সব বাড়ি থেকে মেয়ে পুরুষ বাচ্চা ছেলেদের ভিড় তো আছেই, তা ছাড়া বে-পাড়া থেকেও কম লোকের আমদানি হয় নি। রাত দশটায় প্লে, সন্ধ্যে থেকেই কিন্তু ভিড় শুরু হয়েছে। আমি আর পাড়ার দু-একজন প্রবীণ ব্যক্তির জন্যে একধারে একটা বেঞ্চি রিজার্ভ করা ছিল, তাইতে আসন গ্রহণ করলুম।

রামহরিবাবুর দুর্ধর্ষ বীরমল্ল দশটার সময় ঠিক আরম্ভ হল না, সেটা শুরু হল রাত সাড়ে এগারোটায়। অবশ্য বারোয়ারি পুজো প্যান্ডেলে তাই হয়। যবনিকা উঠল।

হাম্বা বীরমল্ল সেজে দাঁড়িয়ে আছে—সামনে তার মন্ত্রী ট্যাঁড়স বলছে—মহারাজ, কান্তিপুরের দূত এসেছিল আপনার কাছে সন্ধির প্রস্রাব নিয়ে, আমি তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছি।

প্রস্তাবের জায়গায় প্রস্রাব বলে ফেলায়, হাসির রোল উঠল প্রচণ্ড। তারপরেই স্টেজের ভেতর থেকে একটা দমাস্ করে পটকার আওয়াজ পাওয়া গেল। ট্যাঁড়স কিন্তু দমেনি সে গড়গড় করে বলে যেতে লাগল। শত্তুররা আক্রমণ করতে আসছে মহারাজ, আপনি অপপ্‌তিহৃত বেগে ছুটে যান—

বীরমল্ল সেজে খুব জোর গলায় হাম্বা চেঁচিয়ে উঠে বললে, হ্যাঁ যাব আমি—ডাক ডাক, যে যেখানে আছে—মাত্রীভূমি রক্ষে করবার জন্যে সবাইকে ছুটে আসতে বল, আমার সঙ্গে দেশবাসী সবাই যাবে। শত্তুরের সঙ্গে মোকাবেলা কেমন করে করতে হয় আমি জানি—মা, মা, দেশজননী আমার বাহুতে শক্তি দাও, এই তরবারি দিয়ে—বলে তরোয়ালটা খুলতে গিয়ে সেটা আবার আটকে গেল—ট্যাঁড়স একবার পাশে গিয়ে তাকে সাহায্য করতে এমন টান মারলে যে তার কোমর থেকে খাপটা পর্যন্ত ছিঁড়ে বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড হাসির হুল্লোড়—তার মধ্যে এই রকম গোলমাল উঠতে দেখে ডাইরেক্টর কাতুবাবু উইংসের পাশ থেকে বলে উঠলেন—ম্যানেজ। সঙ্গে সঙ্গে ট্যাঁড়স খাপটা থেকে তাড়াতাড়ি তরোয়াল বার করে নিয়ে তরোয়ালটা নিজে নিয়ে খাপটা বীরমল্লরূপী হাম্বার হাতে দিয়ে নাচতে নাচতে বলতে লাগল, আয় আয় শালা কে-কোথায় আছিস, সবার মুণ্ডু কেটে ফেলবো। বীরমল্লর তখন হুঁশ নেই সে খাপটা নিয়েই চেঁচাচ্ছে আর লাফাতে লাফাতে বলছে, এই শাণিত তরবারির এখন রক্তপিপাসা জেগেছে, শত্রুর গলায় চোপ দিয়ে দিয়ে একে আরও শাণিত করে নেব, বলে দ্রুত প্রস্থান করলে। ব্যাকগ্রাউণ্ডে তেমনি জোর বাজনা আর পট্‌কা ফাটছে—আলোটা নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওদিকে দর্শকদের হাসির হুল্লোড়—মনে হল সত্যি যেন যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে আমরা বসে আছি। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় দৃশ্যের পট উঠে গেছে—হঠাৎ দেখা গেল ক্রান্তিপুরের রাজার জন্যে রানী বিম্ববতী মালা গেঁথে বসে গান গাইছে। রানী সেজেছে হোঁৎকা। তার মুখে লাইট ফেলা হয়েছে।

হোঁৎকা গান গাইতে একটু পারতো, কিন্তু বেঁটে হোঁৎকা কি করে একটু রোগা হয়ে গেল আমি তার তাল পেলুম না। তার সখি হয়েচে ফুচকে। সে রোগা প্যাংলা। সে হোঁৎকার মাথায় ফুল গুঁজে দিয়ে বোধ হয় তাকে সাজাচ্ছে। গানের শেষে ক্রান্তিপুরের রাজা সেজে গোঁত্তা ঢুকলো—জব্বর রাজা বটে, যেমনি ধুমশো চেহারা তেমনি ষাঁড়ের মত গলা। রানী তার গলায় মালা দিয়ে বলতে লাগল, তুমি আজ যুদ্ধে যাচ্চ, আমার যে কী অভূতপুব্ব আনন্দ হচ্ছে কি বলবো—তুমি একটু শিগগির ফিরে এস নাথ। নইলে বড় ভয় করবে আমার।

এক হাত দিয়ে গোঁফ জোড়াটা চেপে ধরে রইল।

গোঁত্তা বলতে শুরু করলে, কিছু ভয় নেই তোমার—রাজ্য জয় করে কাল পরশুর মধ্যেই ফিরছি—বীরমল্লের বড় তেজ হয়েছে, আমি তাকে নাজেহাল করে ছাড়বো তবে আমি কান্তিপুরের অপপতিদ্বন্দী রাজা জয়সিংহ বলে সবার কাছে পরিচিত হব। বলেই মন্ত্রীকে ডাকলে, বিশ্বনাথ।

'হুজুর' বলে বিশ্বনাথ এসেই পা ঠুকে পাহারাওয়ালাদের কায়দায় সেলাম ঠুকতে যেতেই তার একদিকের গোঁফটা খুলে গেল। সেটা সেজেছিল পোনা।

ঝুলন্ত গোঁফটা পাছে পড়ে যায় তার জন্যে সে এক হাত দিয়ে গোঁফ জোড়াটা চেপে ধরে রইল। কিন্তু গোঁত্তা ম্যানেজ করে নিয়ে বললে, তোমাকে যেন আজ বড় চিন্তান্বিত দেখছি। কিন্তু চিন্তা নেই আমি ঠিক ফিরে আসবো। তুমি ভাল করে দুর্গটা রক্ষা করবে।

পোনা ঐ অবস্থাতেই ঘাড় নেড়ে ভেতরে ঢুকে গেল। তখন রানীর দিকে ফিরে গোঁত্তা বলে উঠল, 'রানী তুমি আমার পত্নী বীরা রমণী ধৈর্য ধরে থেকো—ভয় পেয়ো না' বলে চলে গেল।

রানী আবার জয়গান গাইতে আরম্ভ করলে কিন্তু বীরা রমণী গাইতে গাইতে হঠাৎ লাফ মারলে। কি ব্যাপার—স্টেজে একটা আরশোলা এগিয়ে আসচে শুনেই ওরেঃ ফাদার বলেই ছুট। গানের সময় আরশোলাটা ওর নজরে পড়েনি। ফুচকেটা সখি সেজে কানের কাছে ফিসফিস করে দিতেই কেলেঙ্কারি হল। কিন্তু কাতুবাবু সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজ করে দিলেন আলো নিবিয়ে আর বাজনা বাজিয়ে।

আমার মাথা ঝিমঝিম করছে তখন। এর পরই এক কমিক সীন—খুঁটে, ক্যাবলা, মিচকে

ঢুকে যা আরম্ভ করলে সে কহ্তব্য নয়। দন্ত্য স-এর রাজত্ব—বিস্সাস্ কর দাদা আমি বলছি রাজা বীরমল্ল মরে এবার গোভূত হবে।

ক্যাবলার আবার 'ড়' দোষ সেটা কানে শোনা আরও অসহ্য। সে বলে উঠল, ওর ঘড় বাড়ি নগড় সব পুড়িয়ে ছইছতাকাড় না হয়ে যায় তো কি বলেছি।

আমি আর থাকতে পারলুম না। উপবিষ্ট মুখুজ্যে মশাই, ননী দত্ত ও ঘোষালবাবুকে আসছি বলে স্রেফ বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়লুম।

পরদিন বিবরণ শুনলুম, চরম কেলেঙ্কারী হয়েছে। বীরমল্লকে জয়সিংহ ধরে এনে যখন রাজসভায় বিচার করতে যাচ্ছে আর রাজা বলছে, সৈন্যগণ ওকে কারাগারে বন্দী করে নিয়ে যাও। সেই সময় খুঁটে আর খটখটে ভাল করে রিহার্সেলে না আসায় পাশেই রানী দাঁড়িয়েছিল তাকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। জয়সিংহ তখন সামলাতে গিয়ে রানীরূপী হোঁৎকাকে টানতে টানতে ফিসফিস করে বলতে আরম্ভ করলে, কি কচ্ছিস্ হাম্বাকে টান! কে কার কথা শোনে—দর্শকেরা হেসে অস্থির। তাড়াতাড়ি ড্রপ ফেলে দিয়ে গ্রীণরুমের মধ্যে মারপিট শুরু হয়ে গেল। অতি কষ্টে সেটা সবাই থামালে।

কিন্তু প্লে আর হল না। হোঁৎকার নাকি সর্দিগর্মীর মত হয়ে গেছে। তার কারণ কাতুবাবু তাকে রোগা দেখাবার জন্যে সারা দেহে লাকলাইন দড়ি দিয়ে এমন বুক থেকে ভুঁড়ি পর্যন্ত বেঁধেছিলেন যে বেচারা কাৎ হয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিল।

বেগতিক দেখে কাতুবাবু পালিয়েছিলেন। নাট্যকার রামহরিবাবুও পালিয়ে বাড়িতে পনেরো দিন আসেননি। সবাই বলছে এরা ভালই করেছিলেন নইলে দুজনেই খুন হয়ে যেতেন।